মৃত্যুচক্রে
বাজপাখী
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—১নং

মৃত্যুচক্রে বাজপাখি

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক :—
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন্
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :—
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

এবছরের সবচেয়ে সেরা
ডিটেক্‌টিভ সিরিজ
শ্রীস্বপনকুমারের লেখা
"—বাজপাখি সিরিজ—"

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি, ২। বাজপাখির পুনরাভিযান,
৩। বাজপাখির রক্তলীলা, ৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা,
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার, ৬। হত্যাকারী বাজপাখি,
৭। বাজপাখির রহস্যজাল, ৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি,
৯। বাজপাখির কূটচক্র, ১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব।

মূল্য : ২·৫০ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য্য
জোনাকি প্রেস
৭৯/এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মৃত্যুচক্রে বাজপাখি

—এক—

—আঁধার রাতের আগন্তুক—

অমাবস্যার রাত্রির প্রগাঢ় তমসা একটা বিরাট কালো দৈত্যের মতই দিক্ বিদিক্ গ্রাস করেছে। ওপরে তারকাখচিত স্থির আকাশ। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধরণী নীরবে প্রহর গুণে চলেছে।

ইরাবতীর তীরে ব্রহ্মদেশের মৌলমেন সহর। নিস্তব্ধ রাত্রির শেষ প্রহরের আঁধারের গহ্বরে আত্মগোপন করে বসে আছে।

নগরীর দীপমালা একে একে সবই নিভে গেছে। সুষুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন কোনও গৃহকোণ থেকে একটি আলোকরেখাও চোখে পড়ে না। শুধু জ্বলছে পথের মোড়ে মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টগুলি। তাদের ক্ষীণ আলোক-বর্তিকা রাত্রের আঁধারকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

শান্ত, স্বচ্ছ ইরাবতী বয়ে চলেছে আপন গতিবেগের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে···

ঝুপ ঝাপ্ শব্দ করতে করতে দাঁড় ঠেলে নৌকাখানা এগিয়ে চলেছে। সে যেন ইরাবতীর কুলুকুলু সঙ্গীতের মূর্ছনায় মিথ্যা বাধা সৃষ্টি করছে।

নৌকাখানায় একটিও আলো জ্বলছে না। চারিদিকের আঁধারের থেকে সে কিছুতেই নিজের সত্তাকে পৃথক্ করে ধরতে প্রস্তুত নয়।

একটু ভাল করে চাইলেই চোখে পড়ে নৌকার মধ্যে বসে একটি মাত্র প্রাণী। ছোট্ট নৌকাখানাকে সে একাই দাঁড় ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

পূবের আকাশে তখনও ঊষার আলোকরেখা দেখা দেয় নি পাখিরা তখনও শুরু করেনি প্রভাতী-সঙ্গীত।

ধীরে ধীরে সহরের সামনে এসে নৌকাটা বাঁধা হলো। দাঁড় ঠেলে যে লোকটি নৌকাখানা নিয়ে আসছিল, সে ধীরে ধীরে তীরে নামল।

দেখা গেল, তার সারা দেহে একটা লম্বা কালো আলখাল্লা। মুখেও একটা কৃষ্ণবর্ণের কাপড়ের আবরণ। তার মাঝ দিয়ে তার চোখ দু'টি জ্বলছে ক্ষুধার্ত, হিংস্র পশুর মতই।

তীরে নেমেই সে নৌকাখানাকে ঠেলে দিল গভীর জলের দিকে। ধীরে ধীরে ডিঙ্গিখানা স্রোতের বেগে ভেসে চলল আপন মনে। কূল থেকে সীমাহারা অকূলের পানে···

রহস্যময়ী নগরী তার আধো ছায়ার অবগুণ্ঠন দিয়ে নীরব, সর্পিল পথ-রেখাকে করে তুলেছে স্বপ্নাতুর। তার মাঝ দিয়ে ধীর, সদম্ভ পদে লোকটা এগিয়ে চলল। তার হাবভাব দেখে মনে হয়, পৃথিবীর কোনও কিছুকেই গ্রাহ্য করতে সে প্রস্তুত নয়। কিছুটা এগিয়ে আঁকাবাঁকা যে পথকে সে অবলম্বন করল, সে পথ ধরে কোনও সুসভ্য মানুষ কখনও যাতায়াত করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। গলি-ঘুঁপচির গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে একটা ক্ষুদ্র, অপরিসর গলির প্রায়ান্ধকার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে আচম্‌কা পর পর তিনবার হাততালি দিল।

নিমেষের মধ্যে যেন আকাশ ফুঁড়ে একটি ঢ্যাঙা মূর্তি এসে দাঁড়াল তার সামনে। কৃষ্ণ-বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তিটি বিচিত্র কায়দায় হাতদুটি একত্র করে হাঁটুটা একটু বেঁকিয়ে নবাগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

নবাগত ঢ্যাঙা লোকটি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নতজানু হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাতদুটি একত্র করল। তারপর বাঙ্গিষ ভাষায় বলল—আসুন!

দু'জনে এগিয়ে চলল।

গৃহটি অন্ধকার। দু'জনে ভিতরে প্রবেশ করে কিছু ঘুরে একটি বড় হলঘরে এসে দাঁড়াল।

হলঘরে একটি আলোও জ্বলছে না। বাইরের পৃথিবীর কোনও লোক জানতেও পারবে না এদের অস্তিত্ব।

ঘরের এক কোণে একটা বিরাট মর্মরনির্মিত সিংহ বসান। তার চোখ দু'টি যে বহুমূল্য প্রস্তর নির্মিত তা সহজেই বোঝা যায়। এই জমাট আঁধারের মধ্যেও তা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

ঢ্যাঙা লোকটি হলঘরেই দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত আগন্তুকটি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সিংহটির চোখ দুটির উপর পর পর দু'বার চাপ দিল।

অভূতপূর্ব পরিবর্তন! একটা ঘড় ঘড় শব্দ। সিংহটা কিছুটা বাঁ দিকে সরে গেল। সেখানে দেখা দিল একটা গোপন গহ্বরের মুখ।

কৃষ্ণ-বস্ত্রাচ্ছাদিত লোকটি গহ্বরের আঁধারের মধ্যে নিমেষে মিশে গেল। পেছনের গহ্বরটাও বন্ধ হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এল সিংহটি।

বাইরের পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাস থেকে লোকটি কোন্ অজানা গোপনতার মাঝে যে তলিয়ে গেল তার চিহ্ন পড়ে রইল না একটুও। কে জানে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এভাবে লোক-চক্ষুর আড়ালে নিজেকে গোপন করল সে?

কিন্তু যবনিকার আড়ালে আর এক নূতন দৃশ্যের দ্বার উন্মোচন করলেই বোঝা যাবে কোথায় সে গোপন রহস্যের উৎস···

মাটির তলে ছোট্ট একটা ঘর। পৃথিবীর আলো-বাতাস ও মুক্ত প্রকৃতির অবারিত আনন্দ-কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন।

প্রায়ান্ধকার কক্ষটিতে বসে পাঁচটি প্রাণী।

ওদের পাঁচজনই পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের চোখে সন্দেহপূর্ণ ও রহস্যজনক মানুষ। জীবনে ওরা পেছনে এমন কোন প্রমাণ ফেলে যায়নি যার বলে কেউ ওদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

ষষ্ঠ যে লোকটি দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করল সে আমাদের পূর্ব-দৃষ্ট ঢ্যাঙা লোকটি।

সকলেই বসল সন্ত্রস্ত ও উৎকর্ণ হয়ে। ডুবে গেল মনোনিবেশের গভীরতায়।

নিস্তব্ধ, নিঝুম পরিবেশের মাঝে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল ওরা।

একটু পরেই ঘরটার মধ্যে শোনা গেল একটা গম্ভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি। শঙ্খধ্বনির মত উদাত্ত। অসির মত ক্ষুরধার। একটি মাইক্রোফোনের মধ্য দিয়ে কে যেন বলছে—বন্ধুগণ, বহুদিন পরে আবার তোমাদের কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে আমার আহ্বান। সারা ভারতের বুকে একচ্ছত্র ক্ষমতা স্থাপন করে আমি এসেছি বর্মায়। এখান থেকে যাব ইন্দোচীন, তারপরে বাটাভিয়া, মালয়, শ্যাম এবং চীন।

কিন্তু তোমরা ছয়জনই হচ্ছ আমার সমস্ত আদেশ পালনের প্রথম সোপান। দিকে দিকে আমার যে অজস্র অনুচরেরা ছড়িয়ে আছে, তারা জানে 'বাজপাখিকে'। বাজপাখির নাম শুনে বুকের স্পন্দন দ্রুততর না হয় এমন লোক সারা পূর্ব এশিয়ায় একটিও নাই। কিন্তু এ সমস্তই তোমাদের কল্যাণে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়েই আমার আদেশ-বাণী গিয়ে পৌঁছবে আমার সহস্রাধিক অনুচরের কানে। তাদের প্রাণকে বিপন্ন করেও তারা আমরণ কাজ করবে আমার আদেশ অবলম্বন করে।

এবার তোমাদের প্রত্যেকের উপরে আমি যে সব স্থানের ভার অর্পণ করব, বেশ ভাল করে শুনে রাখ তোমরা।

শোন মহম্মদ খাঁ—তোমার অজস্র শক্তি, সাহস ও একনিষ্ঠতার পরিচয় আমি পেয়েছি; তাই তোমার উপর থাকছে সমস্ত ভারতের ভার। তবে উত্তর ভারতের দিকেই তোমার অনুচরের সংখ্যা বেশি। দক্ষিণ ভারতেও তুমি আমার দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবে।

শামসুল সর্দার, তোমার উপর ব্রহ্মদেশের দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

ইন্দোচীনের ভার থাকল রুস্তমজীর উপরে। বলবন্ত সিংয়ের কর্মক্ষেত্র হবে বাটাভিয়া ও শ্যাম। হোয়াংলি থাকবে মালয়ের তত্ত্বাবধানে। আর ফুঁচাও হবে চীনের প্রতিনিধি।

তোমাদের প্রত্যেকেরই প্রচুর সাহস, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও প্রভু-ভক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমাদের প্রত্যেকের উপরেই যথেষ্ট বিশ্বাস আছে আমার। কিন্তু তোমরা মনে রেখো, তোমাদের উপরে আমার তীব্র দৃষ্টি অনুক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও আদেশ পালনে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও যেন না হয়—কারণ, আমার রোষবহ্নি যার উপরে পড়ে তার যে কি পরিণাম হয় তার প্রমাণ পেয়েছ তোমরা বহুবার। সুতরাং তা থেকে নিজেদের দূরে রাখবার চেষ্টা যে করবে, তা আশা করি তোমাদের মতো বুদ্ধিমানদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। এবার তোমাদের পরবর্তী কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি যে উপদেশ দিচ্ছি, তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে চেষ্টা করবে......শোন...

—দুই—

—বাজপাখির অভিযান—

প্রিয় লালা যোধমল হরপ্রসাদ—

তুমি দশ বছর আগে প্রথম যখন ব্রহ্মদেশে পদার্পণ করো তখন তোমার সম্বল ছিল মাত্র দেড়শো টাকা আর মাথায় সামান্য বুদ্ধি! কিন্তু এই সামান্য জিনিষের উপর ভরসা করেই তুমি সুদূর আজমীর থেকে বর্মার মাটিতে পদার্পণ করেছিলে। ভেবে দেখ তুমি আজ, তোমার পুরানো দিনের কথা।

আজ তুমি লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী তা আমি জানি। কিন্তু কি ভাবে তুমি তোমার পার্টনারদের ফাঁকি দিয়েছ, কি ভাবে নকল কাঠকে আসল শালকাঠ বলে চালিয়েছ, কি ভাবে ভাল ঘিয়ের সাথে

বিষাক্ত চর্বি মিশিয়ে অজস্র টাকা লাভ করেছ, তা আর কেউ না জানলেও এর প্রত্যেকটির উপরেই আমার তীব্র দৃষ্টি রয়েছে।

তোমার বয়স আজ চল্লিশের কোঠায়। হয়ত বড় জোর আর পনর বিশ বছর তুমি বাঁচতে পার। সুতরাং এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে? ব্যাঙ্কের সেফ্ ভল্টে তোমার টাকা পড়ে থেকে থেকে তাতে ছাতা ধরে যাচ্ছে। তাই তুমি যদি তোমার এই বিরাট অঙ্কের সামান্য একটা অংশ আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দান কর, তবে সেটা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে অনেকটা সবল করে তুলবে। মাত্র একলক্ষ টাকা আমাদের দাবী। এর বেশি অনেক টাকাই হয়তো দাবী করতে পারতাম কিন্তু আমাদের লোভ বেশিতে নয়।

কিন্তু তোমার অজস্র টাকার সামান্য এই অংশটা যদি তুমি আমাদের দিতে গররাজী হও, তবে তা তোমার জীবনের বাকী পরমায়ুটিকেও সংক্ষিপ্ত করে···দেবে। অর্থাৎ তিন দিনের মধ্যে টাকাটা না পেলে বুঝব যে এই টাকাটা দেওয়া তোমার অভিপ্রেত নয়। সেক্ষেত্রে আমি বাধ্য হব তোমার কাছ থেকে তিনগুণ অর্থাৎ তিনলক্ষ টাকা আদায় করতে। আর সেই সঙ্গে তোমার জীবনবায়ুটাও বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

আশা করি, তোমার মত বুদ্ধিমান লোক এতে আপত্তি করবে না।

টাকাটা কি ভাবে আমাদের হাতে পৌঁছে দেবে তা জানতে চাও? যে কোনও দিন (তিনদিনের মধ্যে) তুমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে এনে তোমার শোবার ঘরের খোলা ডেস্কের ভেতরে রেখে দিলেই তা আমাদের হস্তগত হবে। কিন্তু এই চিঠিকে যদি নেহাৎ ভাঁওতা অথবা মিথ্যা ভয়প্রদর্শন বলে মনে করো, তবে তোমার ভবিষ্যৎ ভাবতেও আমার আতঙ্ক হচ্ছে। যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা কোরো। ইতি—

বাজপাখি

চিঠিটা পড়া শেষ করে লালা যোধমল তাঁর দৃষ্টিটাকে তুলে ধরলেন

চিঠির কোণের দিকে। সেখানে আঁকা রয়েছে বিরাট একটা বীভৎস আকৃতির বাজপাখি, শিকারের প্রত্যাশায় ওঁৎ পেতে বসে আছে সেটা।

লালা যোধমলের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল। হাতদুটো থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা পড়ে গেল। বাজপাখির কথা তিনি ইতিপূর্বেও যে ছিটে-ফোঁটা না শুনেছিলেন তা নয়, তবে এভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে নানাভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুতেই এই চিঠিটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না তিনি। কিছুক্ষণ পরে বসে পড়লেন ঘরের কোণে একটা সোফায়। তারপরে ড্রয়ারটা খুলে একটা মদের বোতল বের করে একঢোঁকে চোখ বুঁজে খেয়ে ফেললেন সবটুকু। লালা যোধমলের জীবনে তিনি এভাবে মদে আসক্ত হয়ে পড়েছেন যে ও জিনিষটি ছাড়া কোনও কাজেই মনসংযোগ করতে পারেন না।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর খাস ভৃত্য রামটহলকে ডাকলেন গাড়ি বের করতে হুকুম দেবার জন্যে।

রামটহল ঘরে প্রবেশ করে লালা যোধমলের হাতে তুলে দিল একটা ছোট্ট চিঠি। বলল—বাবু, কারখানা থেকে একটা লোক এসে এই চিঠিটা দিয়ে গেল।

লালা যোধমল চিঠিটা খুলে দেখলেন তাতে লেখা—

প্রিয় লালা যোধমল!

পুলিশের সাহায্য নিতে চেষ্টা করো না। বর্মার পুলিশ যে কি রকম অকর্মণ্য তা ত তুমিও আমার চেয়ে কম জান না! কারণ, ওরা কর্মক্ষম হলে কি তোমার মত একজন বুদ্ধিহীন লোক আজ এত টাকার মালিক হ'তে পারে?

যাক, আমার দৃষ্টি যে সর্বদা তোমার চারপাশে ঘুরছে এই চিঠিটা তার আরও একটা প্রমাণ। ইতি—বাজপাখি

লালা যোধমল ধমক দিলেন—এই চিঠি কে দিয়ে গেল কারখানা থেকে ?

রামটহল বলল—তা ত জানি না বাবু। লোকটাকে আগে কোনও দিন দেখি নি। বলল—আপনি নাকি ওকে নতুন নিযুক্ত করেছেন। চিঠিটা দিয়েই একটা মোটরে উঠে চলে গেল তক্ষুণি।

লালা যোধমল ওদের কর্মপদ্ধতি ও নিপুণতা দেখে অবাক হয়ে বসে পড়লেন। তারপরে হেঁকে বললেন—যা, গাড়ি বের করতে বল্।

—তিন—

—সমুদ্রবক্ষে শত্রুর চর—

সকাল সাতটা।

সামনে অফুরন্ত নীল জল—দিগন্তরেখা চোখে পড়ে না। শুধু অনন্ত নীলিমার মেলা।

সেদিকে চেয়ে প্রাইভেট ডিটেক্টিভ দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতনলাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সময় আপন তালে বয়ে চলেছে। বিচিত্র একটা শব্দের সাথে জাহাজ এগিয়ে চলেছে সাগর-জলে তরঙ্গের আলোড়ন তুলে।

রতনলাল তার উদাস দৃষ্টিটা মেলে ধরল সুনীল আকাশের প্রান্তে। সেখানে হালকা মেঘের ফাঁকে দেখা দিয়েছে উদীয়মান সূর্যের রক্তাভ বর্ণচ্ছটা। তারপর দীপকের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলতে থাকে—অপূর্ব! সামান্য কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কোলাহলে পূর্ণ মহানগরীর জনবহুল পরিবেশ, আর এখন সুনীল সমুদ্রের তরঙ্গের দোলা আর সামনে আকাশের বুকে নবারুণের দীপ্তি।

দীপক যোগ দেয়—হ্যাঁ, তারপরেই দেখা দেবে আবার বর্মার মাটি! সেখানে নানাধরনের বিচিত্রবেশী অদ্ভুত কতো সব নতুন লোক। নতুন ঘটনা। নতুন আবহাওয়া!

রতন বলে—কিন্তু হঠাৎ এভাবে লালবাজারে একটা ফোন করেই খামখেয়ালের বশে সাগরের বুকে ভাসলি কেন ?

দীপক হেসে বলে—এই একটু সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া আর নতুন দেশ দেখার লোভ হল কিনা, তাই! এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার কথা কি কল্পনা করতে পেরেছিলি ?

রতন প্রতিবাদ করে—কক্ষণো না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লোভে হঠাৎ এভাবে সমুদ্রের পথে পাড়ি দিয়ে বর্মার দিকে রওনা হওয়া আর যে কোন লোকের দ্বারাই সম্ভব হোক না কেন, তোর দ্বারা যে হ'তে পারে না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

দীপক বলল—যদি অবিশ্বাস করিস ত কি ভাবে আর তোকে বোঝাব ? তোর কথাই নির্বিবাদে মেনে নেব যে, কারণ একটা কিছু আছে। তবে কারণ থাক্ আর নাই থাক্, জাহাজে খুব সাবধানে থাকবি। আর কাউকে ভুলেও নিজের পরিচয় দিবি না। একটা বাজে নাম বলবি। আমরা টুরিষ্ট। নেহাৎ সখের খাতিরেই বর্মার দিকে বেড়াতে চলেছি।

রতন বলে—কিন্তু তোর কারণটার একটু আঁচও কি আমি পেতে পারি না ?

দীপক বলে—যদিও আমার হঠাৎ এভাবে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবার আসল উদ্দেশ্য শুনে হাসবি, তবুও সংক্ষেপে বুঝতে পারবি খবরের কাগজের একটা অংশ পড়লেই। আর জানিস ত, আমি অনেক সময় একটা অদ্ভুত 'ইনটুাইসন' অনুভব করি মনে মনে। এও হয়ত সেরকম একটা কিছু। আমার মন যেন বলছে যে, কিছুদিন আগে ভারত তথা কলকাতার বুকে কয়েকটা যে মারাত্মক ও দুঃসাহসিক ডাকাতি, লুট, ব্যাকমেল ইত্যাদি ঘটে গেল তার মূলাধার হলো ওই দলটা, যারা 'বাজপাখি' বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আর দলের কর্তা যে বর্তমানে বর্মার মাটিতে পা দিয়েছে তার প্রমাণ পেলাম খবরের কাগজের ওই লাইন কয়েকটির মধ্যেই। তাই হয়ত নেহাৎ একটা

অনুসন্ধিৎসু মনের তাগিদই আমাকে হঠাৎ টেনে নিয়ে চলল সুদূর বর্মার দিকে। জানি না, এ অভিযানের শেষ কোথায়!

তারপর একটু থেমে বলে—পরশু দিনের খবরের কাগজের অংশটুকুর কাটিং' আমি রেখে দিয়েছি। চল্, কেবিনে গিয়ে তোকে দেখাচ্ছি!

দু'জনেই ডেক ছেড়ে কেবিনের দিকে পা বাড়াল।

কেবিনের দিকে চলেছে তারা—হঠাৎ সামনের একটা লোকের সঙ্গে রতনের ধাক্কা লাগল।

রতন এভাবে ধাক্কা লাগার জন্য প্রস্তুত ছিল না; সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বলল—মাফ্ করবেন, আপনাকে দেখতে পাইনি···

লোকটি বোধ হয় বার্মিজ। ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলল—না, আমার ত তত বেশি লাগেনি। ধন্যবাদ।

লোকটির পাশ কাটিয়ে ওরা দু'জনে কেবিনে গিয়ে পৌছল।

কেবিনে পৌছে দীপক হাসতে হাসতে বলল—শত্রুপক্ষের নজর আমাদের উপর পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। এবার কিন্তু খুব সাবধানে প্রত্যেকটি পা ফেলতে হবে!

রতন বলল—একথা তোর মনে হল কেন?

দীপক বলল—যে লোকটির সাথে তোর আচমকা ধাক্কা লাগল, ও নিশ্চয়ই ওই কোণটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আমরা কেউ দেখতে পাইনি বলেই পাশ কাটাতে গিয়ে ওর সাথে ধাক্কা লাগল। যদিও সবই আমার অনুমান······

রতন বলল—তবে ত এই দল অদ্ভুত শক্তিশালী।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, তবে বর্তমানে বর্মার দিকেই এরা চাপ দিয়েছে বেশি। এই দেখ, সেদিনের খবরের কাগজের কাটিংটা।

অংশটুকুর ওপর রতন চোখ বুলিয়ে চলল—

কিছুদিন পূর্বে ভারতের বুকে কতকগুলি মারাত্মক চুরি, ডাকাতি, ব্ল্যাকমেল, ব্যাঙ্কলুট ইত্যাদি যেভাবে চলছিল তার পুনরাবৃত্তি কিছুদিন

ধরে হচ্ছে বর্মার বুকে; বলা বাহুল্য পুলিশ একটি ক্ষেত্রেও কৃতকার্য হ'তে পারেনি। এ ছাড়াও রেঙ্গুন, মৌলমেন, মান্দালয় প্রভৃতি সহরের বিখ্যাত কয়েকজন ধনীর কাছে একদল লোক চিঠি দিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চেষ্টা করছে। এই দলটি নিজেদের পরিচয় দেয় 'বাজপাখি' বলে। অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে পারলে দেশের ঘোরতর অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

রতনলাল খবরটির উপর থেকে মুখ তুলল।

দীপক বলল—এই ছোট্ট খবরটির পেছনেই আমি দেখছি বিরাট সুসংবদ্ধ, ক্ষিপ্রগতি এবং শিক্ষিত একটি দলের অস্তিত্ব। আমার মনে হয়, এদের অনুচরের সংখ্যা অনেক বেশি, আর এদের রীতি-নীতি নিয়মকানুনও বোধ হয় খুব সুদূরপ্রসারী। এত সাবধানে যাত্রা করা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, এদের দলের নজর আমরা এড়াতে পারিনি। রেঙ্গুনগামী জাহাজের ওপরেও এদের চর ছড়িয়ে আছে, যাদের একজন একটু আগেই আমাদের মুখোমুখি দেখা দিল। রেঙ্গুনে নেমে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশ ধরে পুলিশের সাহায্যে অগ্রসর না হলে এদের উপরে অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব।

—চার—

—বাজপাখির নতুন শিকার—

আলোকোজ্জ্বল রেঙ্গুন নগরী। যেন সাজান একটি ছোট্ট কবিতা। নিজের অপূর্ব রূপকে সবার দৃষ্টির সামনে অতীব রমণীয় করে তুলে ধরেছে। সেদিকে চেয়ে কারো ধারণা করা দুষ্কর, কি ভাবে এই মহানগরীরই কোনও এক নিরালা কোণে গোপন চক্রান্তের বিষাক্ত বাষ্প উদ্বেলিত হয়ে উঠছে।

ক্রোনি পার্ক। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা।

দুটি লোক হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের পরিবেশের প্রতি বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেবার সময় নেই তাদের।

একজনের পরনে কালো স্যুট, পায়ে কালো জুতো, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, মুখে দামি টোব্যাকো পাইপ। পুরো সাহেবি পোষাক। অপর জন অনেকটা পাঞ্জাবীর মত দেখতে। মুখে চাপ দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, পরনে আঁটা পাজামার ওপরে পাঞ্জাবি আর জহরকোট।

সামনেই বিরাট 'নিয়ন' আলোকে লেখা রয়েছে 'হ্যাপি ভ্যালি রেষ্টুরেন্ট'……

দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানে চলেছে বয়-বেয়ারাদের ছুটোছুটি। বিক্ষিপ্ত কলগুঞ্জন। কাপ, চামচ, ছুরির ঠুং ঠাং আওয়াজ।

এককোণে দু'জন লোক বসে গোগ্রাসে খাবার গিলছে আর চারধারে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তারা যেন কারোও প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

সাহেবি ও পাঞ্জাবীবেশী লোক দু'জন ভেতরে প্রবেশ করেই সোজা গিয়ে ঐ দু'জন লোকের কাছেই দুটি ফাঁকা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল। তারপরে দিলদরিয়া মেজাজে বয়কে ডেকে প্রচুর খাবারের অর্ডার দিল।

পূর্বোক্ত লোক দু'টির দৃষ্টি এদের দিকে আকৃষ্ট হল বটে—কিন্তু এদের হাবভাব আর নিশ্চিন্ত দ্রুত কথাবার্তায় সন্দেহ দূর হ'তে দেরী হল না।

মিনিট পনর কেটে গেল। চারিদিকের পরিবেশের থেকে এদের কাউকেই পৃথক্ করে ধরা হয় না।

দ্বারপ্রান্তে একজন বাঙ্গিজকে দেখা গেল। সবে সে হোটেলের ভিতর প্রবেশ করেছে, এমন সময় শোনা গেল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ।

সমস্ত হোটেলটির উপর দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলোড়নের ঢেউ বয়ে গেল। ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর আচ্ছন্ন। প্রবেশোন্মুখ বাঙ্গিজটি ততক্ষণে ক্ষীণ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ছুটোছুটি, হৈচৈ, হুল্লোড় ··

পাঞ্জাবীবেশী লোকটি সাহেববেশী লোকটিকে কি একটা ইঙ্গিত করল। দু'জনে ছুটে এল পতিত বার্মিজটার দিকে। তার সারা মুখখানি ঘিরে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া পরিব্যাপ্ত। সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে যেন ভয়ানক বীভৎস কি একটা ঘটে গেছে। বার দু'য়েক অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে চারদিকে চেয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করল।

সাহেবি-পোষাকধারী লোকটা তার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি কিছু বলতে চাও?

লোকটা অদ্ভুত, আতঙ্কিত, ভয়ার্ত দৃষ্টিটা চারিদিকে ফেলতে চেষ্টা করল তারপরে অনেক কষ্টে মুখটা তুলে বিড়বিড় করে শুধু বলল—বাজ-পাখি···বাজ···পিকাডিলি স্কোয়ার···তারপরেই ঢলে পড়ল অনন্তনিদ্রায়···

কোণের যে বার্মিজ দু'টি এতক্ষণ খাবার খাচ্ছিল তারা অনেক আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এইবার দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল। অকস্মাৎ সাহেববেশী লোকটা ছুটে গিয়ে একটা উদ্যত রিভলভার তাদের দিকে তুলে ধরে বলল—এই, এক পাও নড়তে চেষ্টা করলে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তোমাদের বাঁচাতে পারবে না বন্ধু······

লোক দু'টি এভাবে বাধা পাবার জন্যে বোধ হয় আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। দু'জনে হাত তুলে দাঁড়াল বটে কিন্তু একটু ফাঁক পেতেই সামনের বার্মিজটি আচমকা একটা লাথি মারল সাহেবি পোষাক পরা লোকটির তলপেটে। আর্তনাদ করে সে ছিটকে পড়তেই বার্মিজ দু'টি এক লাফে পথে পড়তে চেষ্টা করল।

পাঞ্জাবিবেশী লোকটির হাতেও একটি রিভলভার গর্জে উঠল। একজন বার্মিজ লুটিয়ে পড়ল—কিন্তু অপর জন ততক্ষণে অদৃশ্য···

সাহেববেশী লোকটা একটু পরেই উঠে দাঁড়াল।

হোটেলের ম্যানেজার ছুটে এলেন। সাহেব ও পাঞ্জাবিবেশী লোক দু'টির দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের আমি শান্তিভঙ্গের অভিযোগে পুলিশে দিতে চাই।

লোক দু'টির একজন ম্যানেজারের কাণে কি সব কথা বলেই একটা কি যেন বের করে দেখাল। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যানেজারের মুখ।

আহত বাসিন্দাটিকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দু'জনে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে হুকুম দিল—এই, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স···

লোক দু'টির একজন যে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর অপরজন রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনার মিঃ স্যামুয়েল জনসন তা একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যেত।

ট্যাক্সিটা কিছুটা এগুতেই ক্রোনি পার্কের বাঁ কোণে একটা ছোট রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছল।

দীপক চ্যাটার্জী ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল—এক মিনিট অপেক্ষা কর।

রাস্তার ধারেই একজন খঞ্জ বিকৃতাঙ্গ ভিখারি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে একঘেয়ে করুণ-সুরে ভিক্ষা করছিল। তার নিকটবর্তী হয়ে তার হাতে একটা দুয়ানি ফেলে দিয়ে ফিসফিস্ করে দীপক জিজ্ঞাসা করল—খবর কিরে···আমাদের 'হ্যাপি ভ্যালি' থেকে বেরিয়ে আসা বাসিন্দাটি······

ভিখারিটি মৃদু হেসে বলল—পিকাডিলি স্কোয়ার···

দীপক আবার গাড়িতে উঠে বসে চালাতে বলল।

* * *

রেঙ্গুনের সবচেয়ে নির্জন অঞ্চলগুলির অন্যতম পিকাডিলি স্কোয়ার···

গাঢ় আঁধারের বুকে আবছা ছায়ার মত তিনতলা বহু পুরোনো বাড়িটা—বাইরে থেকে দেখে ধারণা করা যায় না এই বাড়িটাতে কেউ বাস করে। এ অঞ্চলটা সত্যই অন্ধকার—তার উপর বাড়িটার কোনও অংশ থেকে বিন্দুমাত্রও আলোকরেখা চোখে পড়ে না। কল্পনা করাও যায় না এ বাড়িটার কোথাও কোনও জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব!

জীবনে বার্মিজটি বহুবার বহু দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সত্য—কিন্তু এতটা সাহস তার মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নি, একথা অনেকটা স্বীকার্য! পিকাডিলি স্কোয়ারের নৈশ মহোৎসবে সে ছুটে এসেছে একা, কোমারে বাঁধা একটিমাত্র রিভলবার সম্বল করে।

পিকাডিলি স্কোয়ারের বাড়িটার সামনে এসে যে বার্মিজটা দাঁড়াল তাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করলেও তার দেহাভ্যন্তরস্থ রিভলবারটি সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসম্ভব। তাছাড়া একটা গরিব বার্মিজ। দামি রিভলবার-সে পাবেই বা কোত্থেকে?

বার্মিজটি পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো বের করল, তাতে বেশ স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—১১৭···

লোকটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল।

বাড়িটার সামনের দিকটা ভাল করে দেখে সে ঘুরে ঠিক পেছনে এসে উপস্থিত হল। বারকয়েক কান পেতে শুনল কোনও শব্দ তার শ্রুতিগোচর হয় কিনা। শোনা গেল ঝিঁঝির একটানা করুণ-কান্না। আর প্রবহমান বাতাসের দোলায় গাছের পাতার হিস্-হিস্ শব্দ···

এবার সে যে জিনিষটা দোতলার বারান্দার রেলিং লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল তা একটা বড় দড়ির প্রান্তে কতকগুলি লোহার হুক্ লাগান··· ভাল করে একবার টেনে সে নিঃসন্দেহ হল যে বাড়িটা পুরানো হলেও এখনও বেশ মজবুত আছে। ধীরে ধীরে দড়িটা বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে সে ওপরে উঠতে লাগল। একটু ভাল করে নজর করলেই বোঝা যায়, যে একাজে সে বেশ অভ্যস্ত···

দোতলার বারান্দায় পা দিয়ে ভাল করে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল সে। নাঃ। জনমানবের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই বাড়ির কোথাও। তবে কি সে ভুল খবর পেয়ে এসেছে? মার্জারের মত লঘুপদে সে এগিয়ে চলল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটাকে যতদূর সম্ভব চারিদিকে ভাল করে মেলে ধরে।

আঁকাবাঁকা একটা করিডর। তার শেষ প্রান্তে সারি সারি কয়েকটি ঘর। অধিকাংশই তালাবন্ধ। একটিমাত্র ঘরের দরজা খোলা।

ঘরের মধ্যে পা বাড়াল লোকটি। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘর। কোথাও জনমানবের সাড়া মাত্রও নাই। লোকটি একটু কাঁপরে পড়ল। এবার কোন দিকে যাওয়া যায়?

মিনিট দেড়েক নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শোনা গেল কার একটা কণ্ঠস্বর। ফিস্ ফিস্ করে একজন লোক কাকে উপদেশ দিচ্ছে বলে মনে হয়। অন্ধকার চোখে অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে। লোকটি ভাল করে দৃষ্টিটাকে মেলে ধরে দেখল। ঘরে একজন লোকও নেই। তবে কথা ভেসে আসছে কোত্থেকে?

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল লোকটা পায়ে পায়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। বেশ স্পষ্ট শব্দ শোনা গেল এবার। দেওয়ালের ওপাশে কোনও গোপন কক্ষে বোধ হয় কেউ কথা বলছে। কিন্তু ওদিকে যাবার ত কোন পথ নেই! সব ঘরগুলিই ত একদিকে দরজা আর ওধারে ত করিডর—তারপর নিচে নামবার সিঁড়ি…

বেশ ভালভাবে দালানের গায়ে কান পেতে রইল বার্মিজটি। একটু পরেই শোনা গেল কথোপকথনের শব্দটা স্পষ্ট করে। একজন লোক অপর একজনকে কিছু বলছে যেন। কণ্ঠস্বর ভারী, গম্ভীর।

কণ্ঠস্বর বলছে—শামসুল সর্দার, তোমায় মূর্খতার পরিচয় আজ পেলাম। তুমি কেন আউলীংকে কোনও নিরালা স্থানে না নিয়ে গিয়ে সবার সমক্ষে ওই 'হ্যাপি ভ্যালির' দরজায় মারতে গেলে?

উত্তরে যেন কে একজন বলল—ওখানে আউলীংকে না মারলে সে নিশ্চয়ই দলের অনেক কথা ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছে গিয়ে ফাঁস করত। ওই 'হ্যাপি ভ্যালি'তে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আর মিঃ স্যামুয়েল জনসন্ ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছিল। আমার মনে

হয় এভাবে তাকে হত্যা না করলে সে সব কথা প্রকাশ করে আমাদের বিপদ ডেকে আনতো···

কণ্ঠস্বর বলল—কিন্তু আমাদের যে লোকটি ধরা পড়েছে···

উত্তর হল—ওকে বিশেষ ভয় নেই, সবে ও দলে প্রবেশ করবে স্থির করেছিল। দলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ও জানে না। আমাদের দলের অপর লোকটি ত নির্বিঘ্নে গা ঢাকা দিয়েছে···

কিন্তু আউলীং মৃত্যুর পূর্বে কিছু প্রকাশ করতে পারে নি ত!

—না বিশেষ কিছুই নয়···

তীব্র হুঙ্কার ভেসে এল—অপদার্থের দল! 'বিশেষ কিছুই নয়' এ কথা শুনে লাভ কি? কোনও একটা কথা প্রকাশ করাও আমাদের পক্ষে কতটা মারাত্মক তা জান না? দিনের পর দিন তোমাদের কর্মক্ষমতায় যেন ভাটা পড়ে আসছে। আমাদের নজর রাখতে হবে প্রতিটি কোণে, প্রতিটি লোকের উপর, প্রতিটি কাজের সূক্ষ্মতম অংশের প্রতি। বাজে কথা আমি শুনতে চাই না—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী এখন কোথায়?

—পুলিশ হেডকোয়ার্টারে···

—তার সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওই বাঙ্গালী শয়তানকে আমি চিনি বেশ ভালভাবে। সারা বর্মার পুলিশের যা সাধ্য নেই তার চেয়ে অনেক বেশী কর্মক্ষম ওই একটি মাত্র লোক। তোমাদের মধ্যে কে ওর সম্বন্ধে ভার নিতে প্রস্তুত আছ জানাও।···

এতক্ষণ পরে বার্মিজটির দেহে যেন সম্বিত ফিরে এল; নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তদ্বার দিয়ে ওপাশে গিয়ে আবার তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তদ্বারের চাবি কাঠি? একটু তৎপর না হলে ওরা এখুনি এসে হয়ত তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ওধারে তখন শোনা গেল—হোয়াংলি দীপক চ্যাটার্জী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে···

ওধার থেকে শোনা গেল একটা অদ্ভুত অট্টহাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তারপর শোনা গেল, কণ্ঠস্বর বলছে—তবে শোন অপদার্থের দল। তোমরা যা কল্পনা করতেও পার না, সে সব প্রতিটি ঘটনা থাকে আমার নখদর্পণে। তোমরা মনে করেছ গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী নির্বিঘ্নে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বসে খানা খাচ্ছে? না। তোমাদের ভুল আর একটু হলেই টেনে নিয়ে যেত সর্বনাশের পথে! তোমাদের ঠিক পাশের ঘরেই গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী দাঁড়িয়ে শুনছে তোমাদের কথা—সে ভেবেছে বার্মিজের ছদ্মবেশে সে আমার চোখে ধুলো দেবে। কিন্তু তা পারে নি। যাও, মুহূর্তের বিলম্ব নয়! ও পলায়ন করবার চেষ্টা করছে।

বার্মিজবেশী দীপক প্রথমে পলায়ন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে নির্ভীকভাবে কোমর থেকে অটোমেটিক রিভলবারটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। যে কোনও উপায়েই হোক না কেন শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবেই। এই সাহসে নির্ভর করেই একদিন সে বিখ্যাত দস্যু প্রদ্যুম্নের সাথে মুখোমুখি সংগ্রাম করেছিল।...

ক্লিক্ করে একটা কিসের শব্দ হল। দীপক ঠিক বুঝতে পারল না। ওটা কিসের শব্দ হল। ওধার থেকে একটা ক্রিং ক্রিং শব্দও শোনা গেল। আর তার সাথে সাথেই দালানের খানিকটা অংশ সরে গেল। দেখা গেল একটা দরজা। তিনজন লোক দরজাটা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। দপ করে একটা আলো জ্বলে উঠে ঘরটিকে উদ্ভাসিত করে তুলল।

দীপকের সারা দেহের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। একটা অদ্ভুত উন্মাদনা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। অগ্রবর্তী লোকটিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল।

গুড়ুম! গুড়ুম!

ভেঙ্গে খান্‌খান্ হয়ে গেল নৈশ নিস্তব্ধতা।

কিন্তু লোকগুলি তেমনি দাঁড়িয়ে। সারা দেহে সামান্য মাত্রও আঘাত লেগেছে বলে মনে হল না।

দীপক এক পা এগুতেই দেখল অদ্ভুত একটা স্বচ্ছ কাঁচের দেয়াল দিয়ে তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।···জীবনে এ রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সে ইতিপূর্বে সঞ্চয় করে নি।

হাতে রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে দীপক শত্রুর হাতে বন্দী হল।

ওধারে লোকগুলি দাঁড়িয়ে দীপকের দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে লাগল। অদ্ভুত একটা ক্রোধে ও উত্তেজনায় দীপকের সর্বশরীর যেন জ্বালা করে উঠল।

নেপথ্যে অবস্থিত একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল—তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে অগ্রসর হও। হোয়াংলী দীপক চ্যাটার্জীকে পাহারা দিক। ওর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হবে তা তোমাদের পরে জানাব।

দুইজন বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। একজন বাসিন্দ বসে রইল ক্রুদ্ধ হৃতভম্ব দীপকের তত্ত্বাবধানের জন্যে···

দীপকের কানে এসে বাজতে লাগল নেপথ্যস্থিত কণ্ঠস্বরের অপস্রিয়মান অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ···

—পাঁচ—

—নৈশ অভিযান—

নৈশ আহার শেষ করে দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল তাদের নেওয়া ফ্ল্যাটে শয্যার উপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু তার মাথার মধ্যে তখন দ্রুত বয়ে চলেছে অজস্র চিন্তা। সামান্যতম নিদ্রাকর্ষণও হল না তার।

সন্ধ্যার সময় সে 'হ্যাপি ভ্যালি'র কাছে ভিখিরিটার বেশে পাহারা দিচ্ছিল। তারপর পলায়নরত বার্মিজটি পিকাডিলি স্কোয়ারের দিকে গেল এ কথাটা দীপককে জানাল সে। দীপক পুলিশ অফিসে গেছে। সেখান থেকে একজন বার্মিজের ছদ্মবেশে সে কোথায় যে গেল তার আর পাত্তা নেই।

অবশ্য দীপকের কাছে এরূপ ব্যাপার নতুন নয়। কোথায় সে অদৃশ্য হয়, কি ভাবে দিনের পর দিন ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস করে এ সব অনেক কথাই ত সে জানে! তবু এই সুদূর বর্মা মুলুকে এত বড় শক্তিশালী একটা দলের বিরুদ্ধে লড়তে হলে যে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে নামতে হয় তা তার অজ্ঞাত নয়।

চিন্তার ফাঁকে সবেমাত্র চোখ দু'টো একটু বুজে এসেছে এমন সময়···ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল রতন! বাইরে কোথা থেকে যেন ভেসে এল ভয়ার্ত নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ! রক্ষা কর, কে কোথায় আছ!···

এক লাফে বিছানা ছেড়ে নামল রতন। তারপর জানালা দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে চোখকে মেলে ধরল সে। সুদূর এই বর্মা মুলুকে এ কোন বাঙ্গালী নারীর করুণ আর্তনাদ? সে অপ্রকৃতিস্থ হয়নি ত?

না। ঐ আর একবার সেই আর্তকণ্ঠ! ধ্বনিত হয়ে যেন দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলল তা।

ঊর্ধ্বশ্বাসে নিচে ছুটে গিয়ে এক দৌড়ে পথে···

আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় আলোকিত চারদিক। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে সে পড়ল একটা সরু গলিতে। চাঁদের আলোও যেন অনেক কষ্টে সেখানে প্রবেশ করেছে।

রতনের চোখে পড়ল একটি যুবতীকে দু'টি মুখোসধারী লোক প্রাণ-পণে একটি মোটর গাড়িতে তোলবার চেষ্টা করছে। মেয়েটির মুখটা বাঁধা হয়ে গেছে। তবুও মুক্ত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় হাত পা ছুঁড়ছে সে।

রতনের দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথার মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচে। ক্ষিপ্ত, হিংস্র শার্দূলের মত তার মুখ দিয়ে বের হলো একটা হুঙ্কার—ছেড়ে দাও! তারপর এক লাফে সে লোক দু'টিকে অতর্কিতে আক্রমণ করল।

প্রথম লোকটি সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু তার হতচকিত ভাবটা কাটে নি তখনও। তাকে প্রস্তুত হবার মুহূর্ত মাত্র অবকাশ না দিয়ে রতনের সুপুষ্ট হাতের একটি বজ্রমুষ্টি এসে পড়ল তার চোয়ালে।

লোকটা দম দেওয়া পুতুলের মত বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল। রতন বুঝতে পারল তার জ্ঞান ফিরে পেতে অন্ততঃ আধঘণ্টার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় লোকটি একটা ছোরা কোমর থেকে টেনে বের করে সদম্ভে এবং সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রতনকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু রতন পূর্ব হ'তেই প্রস্তুত ছিল। ধাঁ করে সে একপাশে সরে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে লোকটি একেবারে পপাত ধরণীতলে!

রতন এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। লোকটি উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই সে তার উপর চেপে বসে হাত থেকে ছোরাটা এক প্যাঁচে কেড়ে নিল। তারপর এত জোরে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরল যে তার জ্ঞান হারাতে আধ মিনিটও লাগল না।

এবার রতন মেয়েটির দিকে চাইল। মেয়েটি বাঙ্গালী। বেশ লম্বা দোহারা ও সুন্দরী। মেয়েটির দেহে অপূর্ব লাবণ্যসম্ভার। তাকে পাঞ্জাবী কিম্বা পার্শী মনে করা বিচিত্র নয়!

রতন জিজ্ঞাসা করল—আশা করি আহত হন নি?

—বিশেষ নয়। ধন্যবাদ।

রতন একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল যে মেয়েটির চোখমুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছবি। সাহস দিয়ে বলল—আমার

শক্তির পরিচয় ত পেলেন আপনি। আমিও বাঙ্গালী। আপনার জন্য জীবন পণ করে লড়াই করতে প্রস্তুত—কারণ এই আমার পেশা...

—আপনার নাম?

রতন ফিসফিস করে বলল—চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক...তারপরে সব বলছি।

ভিতরে গিয়ে দু'খানা চেয়ারে দু'জন বসে পড়ল। রতন বলল—দেখুন আমাকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। বিখ্যাত ডিটেক্টিভ দীপক চ্যাটার্জীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। আমি তারই সহকারী এবং বন্ধু রতনলাল।

মেয়েটির ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা গেল যে সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। একটু থেমে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে রতন সমস্ত ঘটনাটা জানতে চাইল।

মেয়েটি সংক্ষেপে জানাল যে তার নাম মিস্ অনীতা সেনগুপ্তা। বাল্যেই মাতৃহীনা। বাবা বছর আষ্টেক হল বর্মায় চাকরী করছেন। তার ভাই কিংবা বোন কেউ নেই। তাকে এই আট বছর বর্মাতেই কাটাতে হয়েছে তার বাবার সঙ্গে।

মাসখানেক আগে বাবা রেঙ্গুনের বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি যেন অন্য একটা মানুষ! সর্বদা কেমন যেন সচকিত, সন্ত্রস্ত একটা ভাব। শরীর দিনের পর দিন ভেঙে পড়ছিল। অথচ জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তরই দিতেন না। শুধু বলতেন—আমার মেয়াদ আর বেশীদিন নয় মা।

দিন তিনেক আগে এক ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বাবা আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে তার সঙ্গে নির্জন-কক্ষে দেখা করেন। ভদ্রলোক মিনিট পনের পর বেরিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর আমি ঘরে প্রবেশ করে দেখি বাবা মৃত অবস্থায় একটি ফাঁসীর দড়িতে ঝুলছেন। উঃ, কি ভীষণ সে দৃশ্য...

ডাক্তারের মত—তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আমার ধারণা তিনি···

রতন হঠাৎ টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে জানালা লক্ষ্য করে সেটা উঁচিয়ে বলল—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক বাছাধন, নইলে এক্ষুণি ইহলীলা সংবরণ করতে হবে···

লোকটি এই বিপাকে পড়ে আর পালাতে পারল না। রতন রিভলবারটা তার বুক লক্ষ্য ক'রে উঁচিয়ে ধরে থেকে তাকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এল। তারপরে বলল—কি বাছাধন, খুব ত গোয়েন্দাগিরি করছিলে! এখন মুখ খুলবে না ঘা কতক দিতে হবে···

লোকটি রেগে উঠে বাধিক্ষ ভাষায় বলতে শুরু করল—একজন ভদ্রলোককে এভাবে অপমান···

রতন হেসে বলল—ওহে ভদ্রলোক, অভ্যর্থনার জন্য পুলিশ ডাকব নাকি? বলতে হয় বল, না হয় দেখাচ্ছি মজা···

রতন একটি আলপিন ফুটিয়ে দিল তার আঙ্গুলে। লোকটি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে বলল—আমি সব বলতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাহলে ওরা আমায় আস্ত রাখবে না···

রতন হেসে বলল—তুমি যদি সত্য কথা বল কে তোমাকে এখানে দাঁড়াতে বলেছে এবং তাদের আস্তানা কোথায়, তাহলে তোমাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আর নগদ একশো টাকা তোমাকে পুরস্কার দেব···

লোকটি বার কয়েক একটু ইতস্ততঃ করে বলতে শুরু করল: আমাকে উপযুক্ত টাকা দিয়ে একজন লোক নিযুক্ত করেছিল। আপনাদের সমস্ত কথাবার্তাগুলো শোনবার জন্যে···আর সে লোকটি কে জানেন? বিখ্যাত···

তার কথা শেষ হল না। শোনা গেল একটা অস্পষ্ট শব্দ হি স্ স···একটা তীব্র আর্তনাদ···লোকটি লুটিয়ে পড়ল।

রতন রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে ছুটে গেল। দেখা গেল একজন লোক। সর্বাঙ্গে কালো পোষাকে-আবৃত। দৌড়ে একটা মোটরে ঝাঁপ দিয়ে উঠে পড়ল। মোটরটি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। তীব্রবেগে ছুটে চলে গেল বাগানের বাইরে……

অপস্রিয়মান মোটরটির দিকে চেয়ে রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই যে একটি সুসংবদ্ধ এত বড় দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছে এর শেষ কোথায়?

— ছয় —

—অদৃশ্য আততায়ী—

চোখের সামনে এতগুলি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় অনীতা কেমন যেন আড়ষ্ট নির্জীবের মতো হয়ে পড়েছিল!

তার দিকে চেয়ে রতন প্রশ্ন করল—আপনাকে এখন কোথায় পৌঁছে দিতে হবে বলুন?

মেয়েটি মুহূর্তের জন্য কি যেন চিন্তা করে বলল—দুনিয়ার আমার প্রতি সমবেদনা জানাবার মত লোক একজনই আছেন……আমার বাবার বন্ধু বিখ্যাত এটর্নী মিঃ পট্টভী। সুদূর ভারত থেকে তিনি এখানে প্রাকটিস করতে এসেছেন। বাবার সমস্ত কাজও পরিচালনা করতেন তিনিই। আমার মনে হয় তাঁকে যথেষ্ট বিশ্বাস করা চলে। বাবার মৃত্যুর পর আমার প্রায় মাথা খারাপ হওয়ার মতই অবস্থা। যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সেখানে একাকী রাত কাটাতে ভরসা হয় না…

রতন বলল—তাঁর বাড়িটা কোন্‌দিকে?

—তিনি থাকেন ব্লু ভিউ এভেনিউতে—৮৪নং…

—বেশ চলুন!

রাত বারটার পর রেঙ্গুনের পথঘাটে তখন জনমানবের লেশমাত্রও

আর অবশিষ্ট নেই। অনিতাকে নিয়ে রতন এসে যখন মোড়ের মাথায় ট্যাক্সিতে চেপে বসল তখন দু' একটি চলমান ট্যাক্সি বা রিক্সা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

রতন ও অনীতাকে নিয়ে ট্যাক্সি চলতে শুরু করামাত্রই রতনের কি যেন একটা মনে হল। সে পেছন ফিরে চেয়ে দেখল যে তার ধারণা ঠিক। তার গাড়ি থেকে হাত পঁচিশেক দূরে নিকষ কালো রঙের আর একটা মোটর গাড়ি নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে চলেছে। তার হেডলাইটের একটিমাত্র আলো যেন আহত, ক্ষিপ্ত শার্দুলের মত হিংস্র ক্রোধে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে···

একটা অজানা ভয় রতনের দেহের উপর পরশ বুলিয়ে দিল। কিন্তু পাছে অনীতা ভয় পায় তাই এ সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই বলল না।

গাড়িখানা ছুটে চলেছে উল্কার গতিতে······

পথের দু'ধারে শোভিত গাছের সারি—তার মাঝ দিয়ে দীর্ঘ, সর্পিল পথ এঁকে বেঁকে চলেছে। কোনও অতিকায় অজগর নৈশ অন্ধকারে শিকারের প্রত্যাশায় ওৎ পেতে রয়েছে যেন। দূরে দূরে আলোকস্তম্ভ-গুলি ক্লান্ত নিস্তব্ধ প্রহরীর মত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দাঁড়িয়ে। তাতে অন্ধকার মোটেই দূর হয় নি।

রতন অনীতার দিকে চেয়ে অনেকটা যেন অকারণেই ড্রাইভারকে আদেশ দিল—জোরে···আরও জোরে···

তীব্রবেগে গাড়িখানা একটা ঝাঁকি দিয়ে ছুটে চলল গতিসীমার বাঁধন না মেনে।

রতন পেছনে ফিরে মনোযোগ দিয়ে দেখল পেছনের গাড়িখানাও প্রাণপণে তাদের অনুসরণ করে চলেছে। ক্ষিপ্র তার গতি। কিন্তু ঠিক পেছন ছাড়া পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা তাদের নেই। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোটি নিভে গিয়ে, পেছনের গাড়িটাকে একটা চলমান বিরাট দৈত্যের মতই দেখাচ্ছে।

এইভাবে কতক্ষণ প্রতিযোগিতা চলত ঠিক নেই। কিন্তু অনীতা একটু পরেই রতনকে লক্ষ্য করে বলল—এইবার বাঁ দিকে ঘুরে থামতে বলুন।

রতন ড্রাইভারকে অনুরূপ আদেশ দিল। পেছনের গাড়িটা তাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

রতনের মাথার মধ্যে যেন হু-হু করে দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে।

অনীতার সঙ্গে সে গিয়ে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল।

দোতলা বাড়ি কাঠা পাঁচেক জমির ওপরে। সামনে ছোট্ট একটি অর্চার্ডের মতো ঘেরা জমি। বাড়িখানা হালকা হলেও তার মধ্যে গৃহস্বামীর যথেষ্ট রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।···

ভেতরে প্রবেশ করে অনীতা কলিং বেলটা টিপল।

ক্রিং ক্রিং···দরজা খুলে গেল একটু পরেই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি বালিক ভৃত্য!

অনীতা রতনকে নিয়ে বাইরের ঘরটায় বসল। মিঃ পট্টভীকে খবর দিতে বলা হল।

মিনিট কুড়ি পরে যে ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন তাকে দেখে অভিজাত শ্রেণীর বলে মনে করা স্বাভাবিক।

রতন হাত দু'টি কপালে ঠেকিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

মিঃ পট্টভীর নিদ্রাজড়িত চোখে বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল। মিস্ অনীতা, তুমি এত রাত্রে? আর আপনি?

রতন হেসে বলল—উনি দিন-কয়েকের জন্য আপনার এখানে একটু থাকতে চান। পিতার মৃত্যুর পর একাকী সে বাড়িতে থাকতে ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

মিঃ পট্টভী হেসে বললেন—মোষ্ট গ্ল্যাড্লি! কিন্তু আপনার পরিচয়···

রতন হেসে বলল—এবার আপনি ভেতরে যান অনীতা দেবী, এর সঙ্গে আমি গোপনে কয়েকটি কথা বলতে চাই···

অনীতা উঠে ভেতরে গেল।

প্রৌঢ় মিঃ পট্টভীর দিকে চেয়ে রতন বলল—দেখুন আমি ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর বন্ধু ও সহকর্মী রতনলাল। আই য়্যাম্ য়্যান্ ইণ্ডিয়ান··· আই থিঙ্ক ইউ উইল কো-অপারেট···

মিঃ পট্টভী গলায় জোর দিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই! আপনি কি জানতে চান বলুন?

রতন বারেকের জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ পট্টভীর দিকে চেয়ে তাঁর মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট করে দেখে নিল। তারপর স্পষ্ট কথায় বলল—দেখুন, মিস্ অনীতা সেনগুপ্তার পেছনে একটি সুসংবদ্ধ দল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আপনি তাকে সাহায্য করতে চান নিশ্চয়ই···

স্থির অবিচলিত কণ্ঠে মিঃ পট্টভী বললেন—মিঃ সেনগুপ্ত আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর মৃত্যুর মধ্যে গভীর রহস্য আছে। অনীতা এ বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে জানি, কিন্তু ঠিক কেমন করে তা বলতে পারি না···

রতন প্রশ্ন করল—অনীতা দেবীই ত পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী?

মিঃ পট্টভী হেসে বললেন—হ্যাঁ। ওর পিতার বাড়ি এবং হাজার দশেক টাকার ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সব ও পাবে। কিন্তু এ সামান্য জিনিষ ছাড়াও এমন কোনও বড় জিনিষ থাকতে পারে, যার জন্যে একটা বিরাট দস্যুদলের নজর ওর উপরে পড়ে আছে।

রতন প্রশ্ন করল—আচ্ছা মৃত মিঃ সেনগুপ্তের জীবনে কোনও রহস্যজনক অধ্যায় ছিল বলে কি আপনার মনে হয়?

মিঃ পট্টভী একটু চিন্তা করে বললেন—ঠিক বলতে পারছি না রতনবাবু, তবে মৃত্যুর কিছু পূর্বে যে তিনি বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন দিন কয়েকের জন্যে, তা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। একবার তাঁর মুখে 'বাজপাখি' নামে একটি দস্যুদলের কথাও শুনেছিলাম, কিন্তু দু'টির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য আছে কিনা বলা শক্ত···

রতন যেন আনন্দে নেচে উঠল—ঠিক ঠিক…এইটাই আমি আন্দাজ করেছিলাম মিঃ পট্টভী। তাছাড়া আমার মনে হয় এমন একটা কিছু মিঃ সেনগুপ্তের দখলে ছিল যার দাম কয়েক লাখ টাকার কম নয় এখন বোধ হয় সেই রহস্যটি অনিতা দেবী জানেন। তাই তাঁকে হস্তগত। করবার জন্যে শত্রুপক্ষের আপ্রাণ চেষ্টা শুরু হয়েছে। আচ্ছা সে সম্বন্ধে কাল আরও আলোচনা করব। আর রাতে আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন মিঃ পট্টভী…গুড নাইট…

মিঃ পট্টভী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না রতনবাবু। শত্রুর চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে যত্নের অভাব হবে না। আচ্ছা, গুড্ নাইট্…

—সাত—

—সিংহের গুহায়—

শত্রুর চক্রান্তে এভাবে বন্দী হয়ে দীপক কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। হাতে গুলিভরা রিভলবার, সামনে শত্রুর অট্টহাসি অথচ তার কিছুই করবার নেই। স্বচ্ছ কাঁচের মত বস্তুনির্মিত যে দেওয়ালটা তাকে ঘিরে রেখেছে তা গুলি দ্বারা ভঙ্গুর নয়। সে প্রমাণ সে আগেই পেয়েছে। অথচ এভাবে কয়েক ঘণ্টা থাকলেই ধীরে ধীরে বাতাসের অক্সিজেনের অভাবে সে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়বে!

কি করা উচিত তা স্থির করা দীপকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ভাবনাগুলো সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে তার।

যে লোকটি পাহারা দিচ্ছিল তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মোটাসোটা গড়ন। ঘাড়ে গর্দানে মিশে গেছে। মাথায় ঘন চুল। নাক চ্যাপ্টা। মুখে অজস্র বসন্তের দাগ তার চেহারাকে যেন আরও ভয়ঙ্কর ও রহস্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ওধারে একটা ঘড়ি চলেছে ঠক্ ঠক্ করে···লোকটা দীপকের হতাশাপূর্ণ ভাবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সে হাসিটাও যেন তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মতই বিভীষিকাপূর্ণ।

এই বন্দী অবস্থা থেকে কে তাকে মুক্তি দেবে?

ঝোঁকের মাথায় এভাবে অতগুলি শত্রুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়ান ভুল হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তখন ও ছাড়া উপায়ও আর ছিল না কিছু।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে যেন একটু কষ্ট হচ্ছে। দপ্ দপ্ করছে কপালের রগ দুটো।

শরীরের সর্বত্র একটা ক্লান্ত অবসাদ। মৃত্যু যেন অক্টোপাসের মত অষ্টবাহু জড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে। বন্ধ ঘরের বায়ুতে শ্বাসকষ্টে, সে হয়ত জ্ঞানহীন হয়ে পড়বে। তারপর ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। জানবেও না কেউ। শুনতেও পাবে না তার দেয়ালের গায়ে মাথা কুটে ফিরে আসা আর্ত চিৎকার···

যদি কেউ বা দেখে তা হয়ত ওই সব শত্রুপক্ষের লোকেরা—যারা তার দুর্দশা দেখে দাঁত বের করে হাসবে। বিদ্রূপের হাসি।

তবে সে কি সুদূর বর্মার বুকে এসে একটা দস্যুদলের চক্রান্তে প্রাণ হারাবে? সারা ভারত-বিখ্যাত ডিটেক্টিভ দীপক চ্যাটার্জীর হবে এমনি পরাজয়? অদ্ভুত একটা উত্তেজনার স্রোত যেন বয়ে গেল তার সারা দেহের মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড একটা আশার জোয়ার তার মনের সবকিছু হতাশাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বাঁচবার নূতন প্রেরণা পেয়ে যেন সবল হয়ে উঠল সে।

বাঁচতে তাকে হবেই—

বিপদে সাহস হারালে চলবে না—

ঘরের মধ্যে যে লোকটা পাহারায় ছিল সে বাইরে বোধ হয় সঙ্গিদের সাথে গল্প করতে ব্যস্ত। যে নিরেট শক্ত দেওয়াল দিয়ে তাকে ঘেরা আছে তা থেকে বের হবার উপায় যে তার নেই তা সে জানে—

দীপক ভাবল, স্বচ্ছ দেওয়ালটি রিভলবারের গুলি প্রতিরোধ করতে পারে সত্য কিন্তু জোরে ধাক্কা দিলে কেমন হয় ?

প্রাণপণে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ও দেওয়ালে চাপ দিল।

কিন্তু দেওয়ালটা যেন পাথরের তৈরী !

বৃথা চেষ্টা—

হতাশ হয়ে ও চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল—যদি কোনও উপায় পাওয়া যায় ! অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করেও কোনও উপায় পেল না দীপক ! ক্লান্তিতে ওর কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

এবার ও ঘরের মেঝেটা পরীক্ষা করতে লাগল। মেঝেতে পুরু ধুলো জমে আছে।

জোরে জোরে মেঝেতে পা ঠুকে দেখল কোথাও ফাঁপা আছে কি না।

শক্ত সিমেন্টের তৈরী মেঝে। লোহার মতই কঠিন।

ধুলো সরিয়ে দেখতে দেখতে নজরে পড়ল এক জায়গায় একটা বল্টুর মত কি মাথা উঁচু করে রয়েছে।

দীপক প্রাণপণে সেটাতে চাপ দিল। নাঃ সে রকম কিছুই নয়। সিমেন্টের সাথে গাঁথা বল্টুটা কোনও কাজেই লাগে না।

হঠাৎ কি তার মনে হল। চারিদিকে একবার ভাল করে চেয়ে বল্টুটার চারপাশে তার পকেটের জাপানী ছোরাটা দিয়ে কুরতে শুরু করে দিল দীপক। কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে বল্টুটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

এবার সে দাঁড়িয়ে জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে সেটার উপরে প্রাণপণে চাপ দিল।

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়।

মেঝের খানিকটা অংশশুদ্ধ দীপক নিচের দিকে নেমে চলেছে। জানে না কোথায় সে নামার শেষ। পাতালপুরীর কোন অজানা গর্তে মিলিয়ে যাবে সে কে জানে ?

ধপ করে সে একটা নরম মাটিতে এসে পড়ল।

মেঝের অংশটা আবার আপনা থেকেই উপরে উঠে গেল, তার মাথার উপরের ফাঁকা অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

দীপকের চোখে ধীরে ধীরে আঁধারটা সহ্য হয়ে এসেছে। বুঝল যে সে পাতালপুরীর একটা ঘরে।

দীপকের বুকে উত্তেজনা। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বের করে আলো ফেলল। সামনে একটা বিরাট গহ্বর, বুঝতে পারল যে সেটা গোপন সুড়ঙ্গের মুখ।

দীপক ভাবতে লাগল, আশ্চর্য্য! কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে? এই সুড়ঙ্গ পথ—কোন না জানা বিভীষিকা হয়ত লুকিয়ে আছে এর মধ্যে! কিন্তু না এগিয়েই বা কী করবে সে? চুপ করে বসে থাকলে মুক্তির উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না।

দীপক এগিয়ে চলল।

কী অসম্ভব অন্ধকার! বন্ধ বাতাসের গুমোট গন্ধ। হাতের আলোটা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল। পথ কোথায় শেষ হয়েছে বোঝবার উপায় নেই। যেন মুখব্যাদিত একটা ভয়ঙ্কর সরীসৃপ।

পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে অপর একটি ঘরে। কিন্তু একি?

ঘরের মধ্যে একজন লোক বসে আছে। হাতে উদ্যত পিস্তল। কোমরে গোঁজা একটি ছোরা। লোকটার সারা মুখে যেন একটা হিংস্র অভিব্যক্তি!

মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে মার্জারের মত লঘুপদে এগিয়ে গেল দীপক। তারপরে আচমকা লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকটি প্রস্তুত ছিল না। দীপক যুযুৎসুর একটি প্যাঁচে ওকে কাবু করে মুখে একটি রুমাল গুঁজে দিল।

দীপক বলল—বাইরে বেরুবার পথ দেখিয়ে দাও, নইলে একগুলিতে এখনই তোমাকে শেষ করতে একটুকু দ্বিধা করব না।

লোকটির বাঁ কপালে বিরাট একটা ক্ষতচিহ্ন। ছুরির ফলার মত ধারাল দৃষ্টিটা যেন রক্তের নেশায় উদগ্র।

লোকটি অগ্রসর হল। দীপক পেছনে।

ঘরের শেষে একটা দরজা। লোকটি দ্বার খুলে দিল।

দীপক লোকটির দিকে চেয়ে বলল—এবারের মত তুমি আমার মুক্তিদাতা তাই তোমায় কিছু বললাম না। বিদায়···

দীপক যখন পথে পা দিল তখন দিকচক্রবালের প্রান্তে অরুণোদয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতী রৌদ্রাভা দেবতার আশীষের মতো ঝরে পড়তে সুরু করেছে।

—আট—

—চক্রান্তের ফাঁদে—

মিঃ পট্টভীর বাড়ী থেকে রতনলাল যখন তার ফ্লাটে ফিরে এল তখন রাত দু'টো বেজে গেছে।

দীপক তখনো ফেরে নি। রতন চিন্তিত হলো।

ভাল ঘুম পায়নি তার। মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তা যেন জট পাকাচ্ছে। বাথরুমে গিয়ে হাত-পা মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হল। খাটের নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঢলে পড়ল ঘুমের কোলে।

স্তব্ধ রাত্রির কালো প্রহর গড়িয়ে চলল···

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল রতন জানে না। ঘুমের ঘোরটা যেন অনেকটা কমে এল কেমন একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধে।···

নাকের উপর নরম একটা স্পর্শ। রতন সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুঝলো কেউ তার নাকের উপর ক্লোরোফর্মের ভেজা একটা তুলোর প্যাড চাপা দিয়ে রেখেছিল।

মাথার মধ্যে ক্লোরোফর্মের ঘোরটা তখনও যেন সম্পূর্ণ কাটেনি।···

চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র নিটোল অন্ধকার মুখব্যাদন করে রয়েছে।

তার মধ্যেই শোনা গেল ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট পদশব্দ। যেন লঘুপদে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ।

বালিশের তলা থেকে সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক রিভলভারটা তুলে নিল রতন। সেফটি ক্যাচটা অন করে ট্রিগারে আঙ্গুলটা ঠেকিয়ে এগিয়ে চলল যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল সেদিকে।

টেবিলের ড্রয়ারের সামনে একটি পেন্সিল টর্চ জ্বলে উঠল। দু'জন লোক ড্রয়ারের মধ্যে কি যেন খুঁজছে মনে হল।

রাগে রতনের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যেন জ্বালা করে উঠল।

রিভলভারটা ওদের দিকে নির্দেশ করে ধরে আদেশের সুরে বলে উঠল—যেখানে দাঁড়িয়ে আছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক বাছাধনেরা—একটু নড়বার চেষ্টা করলেই তোমাদের কুকুরের মত গুলি করতে দ্বিধা করব না।

আলোটা ততক্ষণে নিভে গেছে।

অন্ধকারে সামনের দিকে দৃষ্টি চলে না……

লোক দু'টি জানালার দিকে ছুটে গেল বলে মনে হল।

অন্ধকারের মধ্যেই রতন ট্রিগার টিপল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

রতন ছুটে গেল সুইচ বোর্ডের কাছে। সুইচ টিপতেই ঘরটি আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ঘরের মধ্যে কেউ নেই। টেবিলের ড্রয়ার এবং আলমারী খোলা। ঘরের মধ্যে পড়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত আর…

রতন কৌতূহলী হয়ে ছুটে গেল। রক্তের ফোঁটাটার কিছুদূরেই পড়ে রয়েছে একটা কাগজ……

রতন কাগজটার ভাঁজ খুলে পড়তে সুরু করল। একটা চিঠি। বার্মিজ ভাষায় লেখা :

শেখজী ও মংলু—

তোমরা দুজনে আজই রাত তিনটের গোয়েন্দার সহকারী

রতনের ড্রয়ার ও আলমারীটা খুঁজে তার মধ্য থেকে মূর্তিটি ও কাগজগুলো নিয়ে আসবে। অনিতা ওগুলো নিশ্চয় ওকে দিয়েছে।

ক্লোরোফর্ম দিয়ে কাজ সারবে। ফ্লাটের সব চাবি ১১ নং এর কাছেই পাবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে। তারপর তোমরা ওগুলো নিয়ে "নিউ চায়না" কেবিনে দেখা করবে কাল সকালে। তোমাদের প্রাপ্য টাকাও ওখানেই পাবে। ইতি—

বাজপাখি

* *

*

সেই দিনই রাত্রি।

অনিতার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না কখনও শুয়ে, কখনও বসে, কখনও বা পায়চারী করে সে সময় কাটাচ্ছিল।

বাইরে তরল জ্যোৎস্না ক্রমেই মলিন হয়ে আসছে। তার মনও সেই সঙ্গে যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। পিতার মৃত্যু এবং তারপরের অজস্র ঘটনা যেন তার চোখের উপরে ভেসে উঠছিল একে একে।

এক দুর্ধর্ষ দস্যুদলের হাত থেকে কি আত্মরক্ষা করতে পারবে?

যে মূর্তিটি এবং কাগজপত্রগুলোর জন্য তার পিতার মৃত্যু, তা কি সে তার নিজের কাছে রেখে ভাল করেছে? সেগুলি সে রতনের কাছে দিলেই হয়ত তা অনেক নিরাপদে থাকত।

নিদারুণ অবসাদে শরীর ভেঙে পড়বার উপক্রম হলেও এইগুলিই তার নিদ্রার পথে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে নিকষ কালো আঁধার। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সবে চোখ দুটো বুঁজে এসেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে থেকে কে যেন দ্বারে আঘাত করছে, ঠক ঠক্ ঠক্······

অনিতা উঠে বসল। জানালার ওপাশে একটা ছায়ামূর্তি······

বাইরে থেকে কে যেন ঘরের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছে······

ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করছে—যেন এক্ষুণি শ্বাসরোধ হবে।

বহু কষ্টে বিছানার উপরে বসে ভয়-কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করল কে ?

উঠবার বহু চেষ্টা করেও অনিতা উঠতে পারল না। একটা বিদ্যুতের স্পার্ক লেগে যেন তার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

জানালার গরাদটা বেঁকিয়ে ঘরে প্রবেশ করল একটি লোক। তারপর গিয়ে দরজাটা খুলে দিল ধীরে ধীরে···

পরমুহূর্তে দরজা দিয়ে যে লোক দুটি প্রবেশ করল তাদের দেখবার সৌভাগ্য অনিতার ছিল না। সে তখন অচৈতন্য—

অনিতার নিস্পন্দ দেহকে বয়ে নিয়ে গিয়ে একটা মোটরে তুলে তারা যখন ষ্টার্ট দিল তখনও পূর্বাকাশে উষার আলো দেখা দেয়নি।

—নয়—

—আর একটি প্রাণ বলি—

রাত্রি শেষ হয়েছে।

প্রভাতের আলো তখনও সম্পূর্ণ ফোটে নি।

বাকি রাতটুকু রতনের ঘুম হয়নি। একটু ভোরেই সে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল···

টেলিফোন আহ্বান জানাল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

রতন ছুটে গেল। রিসিভারটা তুলে প্রশ্ন করল—হ্যালো কে ?

ওধার থেকে জবাব ভেসে এল—এটর্ণী মিঃ পট্টভী···

মিঃ পট্টভী ? হঠাৎ এত ভোরে ? কি আবার হলো হঠাৎ ?

—একবার আমার এখানে আসতে পারবেন কি ? খুব শীঘ্র কিন্তু··· সম্ভব হলে দীপকবাবুকেও সঙ্গে আনবেন। জরুরী কাজ আছে একটা···

ব্যাপার কি সংক্ষেপে বলুন ত ?

উত্তর নাই···

—মিঃ পট্টভী ? হ্যালো···হ্যালো···

সহসা ঝন্ ঝন্ একটা শব্দ এসে রতনের কানে আঘাত করল। যেন মিঃ পট্টভীর হাত থেকে রিসিভারটা মেঝেয় ঠিকরে পড়ল।

ব্যগ্র কণ্ঠে রতন প্রশ্ন করল—কি হলো আপনার, মিঃ পট্টভী···

কোনও সাড়া নাই। সব শান্ত, স্থির···

রতন বিস্ময়ে হতবাক। কাল যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, যার হাতে অনিতার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করল, হঠাৎ তার এমন কি হলো যে···

সমস্তটাই যেন প্রহেলিকা। ভদ্রলোকের কম্পিত আর্তকণ্ঠের মধ্যে সত্যিই বিপদের আভাস রতন পেয়েছিল, কিন্তু সে বিপদটা যে এত তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

নষ্ট করবার বা বৃথা চিন্তা করবার মতো সময় হাতে নাই। মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করে রতন পথে এসে দাঁড়াল এবং সামনেই ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ড্রাইভারকে আদেশ দিল—ব্লু ভিউ এভেনিউ···

একটু পরেই এটর্ণী মিঃ পট্টভীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

সমস্ত বাড়িখানা তখন যেন মৃত্যুর মত নিথর, নিস্পন্দ। কোথাও মানুষের এতটুকুও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে রতনলাল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে কলিং বেলটা টিপল।

কোনও উত্তর নাই। সামনের দরজাটা খোলা।

ভেতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে সে সোজা উপরে উঠে এল। মিঃ পট্টভীর ঘরের দ্বার রুদ্ধ। তার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভৃত্য।

রতন জোরে দ্বারে আঘাত করল—কিন্তু দ্বার খুলল না। তখন সে ভৃত্যকে লক্ষ্য করে বলল—এস আমরা দরজাটা ভেঙ্গে ফেলি। এক্ষুণি আমি ভেতরে প্রবেশ করতে চাই···

দুজনে অনেক কষ্টে দরজাটা ভেঙ্গে ফেলল।

প্রভাতী রোদ ঘরের মধ্যে সবে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে।

সেই আলোতে রতন যা দেখল তাতে তার মুখ দিয়ে একটা আতঙ্কসূচক অব্যক্ত ধ্বনি ফুটে উঠল।

মিঃ পট্টভীর হাত থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা ছিটকে মেঝের উপরে পড়ে আছে। কেশবিরল মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ, রক্ত পড়ে মেঝের একটা অংশে জমতে শুরু করেছে। দেহে প্রাণের স্পন্দন নাই।

টেবিল চেয়ার উল্টানো সমস্ত কাগজপত্র তছনছ করে ইতস্তত: ছড়ানো, ঘরের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেছে। হত্যাকারী যে একটা জিনিষ খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টা করেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এখন প্রথম কর্তব্য পুলিশে ঘটনাটা জানান—রতন রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুলিশে ফোন করল···

সহসা পেছনে একটা শব্দ···

রতন উৎকর্ণ হয়ে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। শত্রুদের কেউ তাকে আক্রমণ করতে আসেনি ত?

ঘরের দ্বারপ্রান্তে মৃদু হাসি মুখে দাঁড়িয়ে তারই অভিন্নহৃদয় বন্ধু দীপক চ্যাটার্জী। দেহে তার একটি কুলীশ্রেণীর লোকের পোষাক।

রতন ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করল—কাল সারা দিনরাত তুই কোথায় ছিলি দীপক!

দীপক সতর্ক হয়ে বলল—চুপ! আমি এখন একজন কুলী মাত্র! তুই সামনে দিয়ে বের হবি বটে, কিন্তু আমি যাব পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে। কেন এই লুকোচুরি পরে জানতে পারবি! কাল তোর উপরেও নিশ্চয়ই আক্রমণ হয়েছিল। ওরা কোনও চিহ্ন ফেলে গেছে কি?

রতন রাতের পাওয়া চিঠিটা দীপকের হাতে তুলে দিল।

দীপক হেসে বলল—'নিউ চায়না' কেবিন? ঠিক আছে রতন, তুই সেখানে যাবি চিনেম্যানের বেশে ঠিক আটটায়। সেখানে দেখা হবে আমার সাথে। তারপরেই সুরু হবে যুদ্ধ।

তারপর একটু থেমে বলল—এদিকে অনীতা দেবীও অপহৃতা হয়েছে।

সংবাদটা তোকে দিয়ে রাখলাম। তুই দেখ ওদিকে কোনও কিছু সূত্র পেতে পারিস্। আচ্ছা চলি, গুড্ বাই।

দীপক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

—দশ—

—শয়তানের কবলে—

জ্ঞান ফিরে আসতেই অনিতা ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল।

সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। শিরাগুলি যেন ফেটে পড়বে। মাথার মধ্যে বিরাট মিছিল চলেছে। তৃষ্ণায় কণ্ঠনালী শুকনো। ঘামে দেহ ভিজা।

কোথা দিয়ে কি ঘটল সে চিন্তা করতে গিয়ে ব্যর্থ হল—কিছুই ভাল মনে আসছে না। কোনও অদৃশ্য শত্রুর হাতে যে সে বন্দিনী তা নিশ্চিত? কিন্তু কে সে শত্রু? কি তার পরিচয়?

ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার। দিন কি রাত বোঝা যায় না। ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখল। কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। মাথার উপরে ছোট্ট দুটি ফোঁকর দিয়ে বাতাস প্রবেশ করছে। সামনে দরজা রুদ্ধ। যেন একটা নিশ্ছিদ্র পাষাণপুরী।

অসহায়ের মতো নিশ্চল দেহে সে পড়ে রইল। ধীরে ধীরে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসছে। ভালভাবে লক্ষ্য করল, ঘরে জন-মানবের কোনও চিহ্নই নাই।

একবার প্রাণপণে নিজের সমস্ত জড়ত্বকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেহের সমস্ত পেশীগুলিতে ব্যথা। আবার শুয়ে পড়ল।

দেহের সামান্য শক্তিটুকুও যেন নিঃশেষিত—সাধারণভাবে শ্বাস গ্রহণের ক্ষমতাও যেন অনেকটা কমে এসেছে···

ধীরে ধীরে এবার অনিতার মানসপটে ভেসে উঠল অতীতের ঘটনাগুলো একে একে। মনে পড়ল রতনলালের কাছে তার সাহায্যের প্রার্থনা। একটি লোকের উপর ডাকাতদের আক্রমণ। মিঃ পট্টভীর কাছে

তার সাহায্যের জন্য যাওয়া। এমন কি অবশেষে কিভাবে তার ঘরে শত্রুরা প্রবেশ করেছিল তা পর্যন্ত তার বেশ মনে পড়ল।

তারপরের স্মৃতিগুলো অনেকটা অস্পষ্ট। কিছুটা অসংলগ্ন। খাপছাড়া। যা মনে পড়ল তা হচ্ছে দু'চারটে অস্ফুট কথা ও মোটরের মধ্যে মৃদু ঝাঁকুনি ও নড়াচড়া। তা ছাড়া বিশেষ কোনও ঘটনাই আর তার মনে পড়ে না।

কিন্তু এখন তার কি কর্তব্য ? মুক্তির চিন্তায় তার দেহে যেন নতুন বলের সৃষ্টি হল। বিছানার উপরে উঠে বসল সে। কিন্তু শক্তিহীন। দুর্বল। একটু পরেই এলিয়ে পড়ল। সমস্ত দুর্বলতা জয় করে মুক্তির পথ তাকে বের করতেই হবে তা সে যে উপায়েই হোক্…

মুক্তির কোনও উপায়ই সামনে খোলা নেই…

বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল কপালে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার মত।

সহসা ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল। মৃদু নীলাভ একটা আলো। ঘরের পরিবেশ যেন আরোও রহস্যময় হয়ে উঠল।

অনিতার বুকের রক্ত যেন জমে গেছে। অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে সংযত করে চুপচাপ শুয়ে রইল।

এমন সময় শোনা গেল একটা কণ্ঠধ্বনি। কে যেন কথা বলছে তার পাশেই, অথচ ভাল করে লক্ষ্য করেও সে কিছুই দেখতে পেল না।

দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে কে যেন কথা বলছে—অনিতা দেবী আপনাকে এনে আমি বন্দিনী করে রেখেছি। আপনার সাথে কিছু আলোচনা করবার জন্যে। আমার কথার সত্যি জবাব দেবেন আশা করি…

অনিতা ধীরে ধীরে বলল—কিন্তু তারও আগে আমার চাই একগ্লাস ঠাণ্ডা জল…

কণ্ঠস্বর শোনা গেল—নিশ্চয়ই জল পাবেন। আপনার আতিথ্যের কোনও ত্রুটিই হবে না। আর আমার কথার সত্যি জবাব দিলে আপনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাবেন…

দ্বার খুলে গেল।

একজন বিকৃতদর্শন লোক ঘরে প্রবেশ করল। হাতে তার একগ্লাস লেমনেড। বরফ দেওয়া।

লেমনেডটা খেয়ে অনীতা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। প্রশ্ন করল—আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

কণ্ঠস্বর হেসে উঠল। তারপর বলল—হ্যাঁ, আমায় সবাই বাজপাখি বলে জানে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আপনার বাবার যে মূল্যবান কাগজগুলো ও মূর্তিটা আপনার কাছে তিনি রেখেছেন সেগুলি আমি চাই। ঠিক সময়ে সেগুলি যদি সে আমাকে দিত তবে হয়ত তাকে মরতে হত না। বেচারা! যাক্ উপযুক্ত মূল্য আপনাকে দেব। আপনি মুক্তি পাবেনই—আর হাজার পাঁচেক টাকা! আর কি চান?

অনিতা নির্ভীক কণ্ঠে বলল—কিন্তু সেগুলি ত আমার কাছে নেই।

—তা আমি না হয় স্বীকার করছি, কিন্তু কার কাছে আছে তা যদি···

—সেগুলির সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তা হচ্ছে তার অস্তিত্ব। শুনেছিলাম বাবার কাছে সেগুলির কথা, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগে কার কাছে দিয়ে গেছেন তা ঠিক জানি না। কিন্তু সেগুলি এমন কি প্রয়োজনীয় জিনিষ যে তার জন্যে এত উতলা হচ্ছেন?···

ওপারে কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠল—তুমি ঠিক বলছ?

অনিতা সরল ভঙ্গীতে বলল—মিথ্যা বলে আমার লাভ?

—সেগুলি আমার চাই ই···রতনের কাছে এগুলি তুমি দাওনি?

বললুম ত কিছুই আমি জানি না এর বেশী···

—বেশ, তোমার কথায় বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এগুলো না পেলে তোমার মুক্তি নাই জেনো।

—এগারো—

—অনুসরণ—

বেলা আটটার সময় রতনলাল যখন 'নিউ চায়না' কেবিনের উদ্দেশ্যে বের হলো তখন তার চেহারার অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে কালি। মাথার চুল সব রুক্ষ। এলোমেলো।

গায়ে তার ডোরাকাটা ছিটের ময়লা হাফ সার্ট। পরণে মলিন পাজামা। পায়ে ক্যাম্বিসের ছেঁড়া জুতো···

ফ্লাটের পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে পথে এসে একটি ট্যাক্সিতে চেপে বসে নিজের পরিচয় দিল। তারপর বলল—জোরে···

ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

চলমান গাড়ির পেছনের সীটে বসে চোখ বুজে রতন ভাবতে লাগল —দিনের পর দিন ঘটনাচক্র তাদের কোন দিকে নিয়ে চলেছে—

বড় রাস্তা ছেড়ে গলির মধ্যে ট্যাক্সি প্রবেশ করল। তারপর আরও সরু একটি গলির মোড়ে এসে ড্রাইভার জানাল যে সে গলির ভেতরে প্রবেশ দুঃসাধ্য! গলির মধ্যে গেলেই কেবিনটা পাওয়া যাবে।

গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সিকে বড় রাস্তায় অপেক্ষা করতে বলে সে ভেতরে প্রবেশ করল।

গলির ভেতরে ছোট্ট একটি রেষ্টুরেন্ট 'নিউ চায়না' কেবিন।

বিরাট একটা উনুন জ্বলছে। চা তৈরী হচ্ছে বিরাট একটা কেটলীতে। পাশেই একটা বড় আলমারীতে খাবার সাজানো—চপ, কাটলেট, ডিম পাউরুটি···

চার পাঁচজন নিম্নশ্রেণীর লোক জটলা করছে। ঘরে কয়েকটি কুৎসিত ছবি······

একপাশে দুজন লোক ফিশফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে।

রতন লোক দুজনের কিছু দূরে বসে হুকুম দিল—এক কাপ চা···

ভালভাবে লোক দুটির দিকে চেয়ে দেখল। দুজনেই গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক—তবে একজনের বাঁ-হাতে একটা পট্টি বাঁধা। রতন বুঝল তারই গুলির চিহ্ন ওটা। দুজনেরই পরণে ময়লা পাজামা ও হাফসার্ট—

রতন শুনল একজন বলছে—উঃ! ক্লোরোফর্মে কাজ ত হলই না, মিছিমিছি প্রাণটা যাবার জোগাড়!

অপর জন বলল—কিন্তু জিনিষ ত পেলাম না, টাকা দেবে ত?

—টাকা দেবে না মানে? মিথ্যা আমাদের হয়রাণ করল কেন? ওসব বাজে কথায় ভোলবার লোক মংলু নয়।

ঠিক এমনি সময়ে একজন নতুন লোকের আবির্ভাব। পরণে দামী স্যুট। চোখে সান গগল্‌স্। লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি।

রতনের দিকে পেছন ফিরে লোকটা দাঁড়িয়েছিল—রতন শত চেষ্টাতেও তার মুখটা দেখতে পেল না। ওদের কথা শুনে মনে হলো কোনও একটা বিষয় নিয়ে ওদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর লম্বা লোকটি পথে বেরিয়ে পড়ল। অন্য দুটি লোক কেবিন থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

রতন লম্বা কিছুটা দূরত্ব রেখে লোকটাকে অনুসরণ করে চলল।

লম্বা পা ফেলে লোকটি এগিয়ে চলল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। কোটের কলারটা এমনভাবে তুলে দিল যে মুখের নিম্নাংশ সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কালো ঢাকা মোটর এসে দাঁড়াল তার সামনে। লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে তাতে উঠে বসতেই হুশ করে সেটি ছুটে চলল নগরীর রাজপথ ধরে।

রতনও তার অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বলল অগ্রগামী গাড়িটাকে অনুসরণ করতে। দুটি গাড়িই কিছুটা দূরত্ব রেখে ছুটে চলল।

—বারো—

—অভিযান—

রেঙ্গুন নগরীর প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। আগের গাড়িটাও ঠিক এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িটা

থেকে যে নামল একজন সাধারণ বার্মিজ ছাড়া তাকে আর কিছু মনে করা যায় না।

রতন বুঝল লোকটি গাড়ির মধ্যেই বেশভূষার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছে। ওদের অদ্ভুত কর্মকুশলতায় রতন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

রতন ট্যাক্সিওয়ালাকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। কিছুদূর গিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাড়িটার উপর নজর রাখল।

সারাদিন বাড়িটা থেকে কিছুদূরে পাগলের ছদ্মবেশে সে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কাউকেই ভিতরে যেতে বা বেরুতে দেখলে না···

সন্ধ্যার অল্প আগেই জীর্ণ, প্রায়ান্ধকার বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু বিশেষ কোনও লোকেরই সমাগম দেখা গেল না!

রতনের মনে হল দরজা ছাড়াও বাড়িটার মধ্যে প্রবেশের অন্য কোনও গুপ্ত পথ আছে।

ঘন্টাখানেক পরে সে উঠে গিয়ে ডেপুটি কমিশনার মিঃ স্যামুয়েল জনসনকে ফোন করল বাড়িটা সার্চ করে আসবার জন্যে।

তারপর বাড়ির পেছন দিক দিয়ে কোনও উপায়ে ভেতরে প্রবেশ করবার সংকল্প করল।

* * * *

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

কুয়াশাচ্ছন্ন রেঙ্গুন নগরী। আধো-ছায়ার ঘোমটায় আবৃত হয়ে অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশ ধারণ করেছে।

নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে বাড়িটার জীর্ণ ভগ্নাবশেষ আরও যেন রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে···

একটি ঘরের মধ্যে তিনজন লোক বসে আছে বিমর্ষ গাম্ভীর্য নিয়ে। তাদের ঠিক মনোভাব যে কি তা বোঝা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত।

একটু পরেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর —শ্যামসুন্দর সর্দার, হোয়াংলি, তোমাদের উপর সর্ব্বতোভাবে আমি নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু সামান্য একটা মূর্তি আর কতকগুলি কাগজ তোমরা বের করতে পারলে না। ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে আমি বন্দী করলাম, কিন্তু তোমাদের চোখে ধূলি দিয়ে সে সাফল্যের সঙ্গে পলায়ন করল। এরূপ বারবার অসাফল্যের সম্মুখীন হতে হয়নি আমাকে কোনও দিন। যে ভাবে হোক তোমরা মূর্তি আর কাগজগুলো উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে। আর দীপক ও রতন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে হবে তোমাদের অবিলম্বে। ব্যর্থতার কালিমা কোনওদিন কলঙ্কিত করেনি 'বাজপাখির' ইতিহাস। আজও করবে না তা।

আর মিস্ অনিতা যতদিন স্বীকার না করে কোথায় ঐ জিনিষগুলি আছে ততদিন তার মুক্তি নাই। নিজের থেকে সে স্বীকার না করলে তার উপরে আমার বাধ্য হয়ে দৈহিক অত্যাচার করতে হবে। কিন্তু তা আমি চাই না···

হঠাৎ কথার মধ্যে ছেদ পড়লো।

ঘরটির ঠিক দরজায় দাঁড়িয়ে উদ্যত রিভলভার হাতে রতনলাল। বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল—ব্যর্থতা তোমাদের জীবনে কোনদিনও আসেনি সত্য, কিন্তু আজ তৈরী হবে নূতন ইতিহাস। মাথার উপরে হাত তোল শয়তানের দল···

তিনজনেই মাথার উপরে হাত তুললো।

কিন্তু আচমকা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল রতনের মাথার উপরে। অস্ফুট আর্তনাদ করে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল সে।

সর্বাঙ্গে কালো পোষাক, মুখে কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে আবৃত এক ব্যক্তি বলে উঠল—তোমাকে সে চেষ্টা করতে দেব না শয়তান!

উপস্থিত তিনজনে ছুটে এসে রতনের হাত পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। টুঁ শব্দ পর্যন্ত না করে রতন শত্রু হস্তে বন্দী হলো।

—তেরো—

—পরিশেষ—

বন্দী রতনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত লোকটি বলল—এখনও বল মূর্তিটি আর কাগজগুলো কোথায়। নইলে তোমার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে···

রতন মৃদু হেসে বলল—সেই চেষ্টাই কর মিঃ বাজপাখি······

তার কথা শেষ হল না। বিরাট একটা হুইসল্ বেজে উঠল। চার জনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী, ডেপুটি কমিশনার স্যামুয়েল জনসন্ আর অজস্র পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে···

দীপক মৃদু হাসিমুখে বলল—মাথার উপরে হাত তোল বাজপাখি ওরফে এটর্ণী মিঃ পট্টভী···

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত লোকটি ঘরের কোণে গিয়ে দাড়িয়েছিল। সেদিকে চেয়ে মিঃ জনসন্ বললেন—সে কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ, এই দেখুন···

সকলেই অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব! তাদের সামনে এটর্ণী মিঃ পট্টভী!

সকলের হাতেই হাতকড়া পরানো হলো। রতনের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। রতন দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—তুই কি করে বুঝলি যে উনিই মিঃ পট্টভী? মৃত লোকটিই বা কে? আর মিস্ অনিতার মূর্তি ও কাগজগুলো কি হলো?

দীপক হেসে বলল—যিনি নিহত হয়েছেন তিনি ওঁদেরই দলের এক জন। বিশ্বাস ভঙ্গ করে সে পুলিশকে জানাতে চেয়েছিল, তাই তার

মাথাটা এমন বিকৃত করা হয়েছিল যে তাকে ঠিক চিনতে পারা যায় না। আর এটর্ণী মিঃ পট্টভীর সাথে তার চেহারার অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। তাই পুলিশের চোখে ঠিক এভাবে ধূলি নিক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল। বহুদিন ধরেই তিনি একদল লোকের নেতা হয়ে এভাবে সবার চোখের আড়াল থেকে মাইক্রোফোনে নির্দেশ দিয়ে কাজ করে চলেছিলেন, কি বলেন মিঃ পট্টভী ?

আর মিস্ অনিতার মূর্তি ও কাগজগুলো আমিই অপহরণ করেছিলাম মিঃ জন্সন্। তখন দেখলাম যে নকল মিঃ পট্টভী ও অনিতা অপহৃতা তখন ও ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু রতনের কাছে ওগুলি আছে মনে করে বাজপাখির নজর গিয়ে পড়েছিল সে দিকেই বেশি। অনিতার উপরেও কম সন্দেহ ছিল না। আর অনিতার পিতার মৃত্যুর জন্য ইনিই দায়ী। এঁরই প্রেরিত লোক··

—যাক্ সে কথা। এই ঘরেরই নীচের তলায় মিস্ অনিতা বন্দী আছেন—আসুন আমরা তাঁকে উদ্ধার করি···

* * *

আদালতের বিচারে মিঃ পট্টভীর দশ বছর দীপান্তর ও দলের অন্যান্য সকলের সশ্রম কারাদণ্ডের কথা আমরা সংবাদপত্র পাঠেই অবগত হয়েছি।

—শেষ—

এর পরের ঘটনা জানতে হলে **বাজপাখির পুনরভিযান** পড়ুন।

বাজপাখির পুনরাভিযান

শ্রীস্বপনকুমার

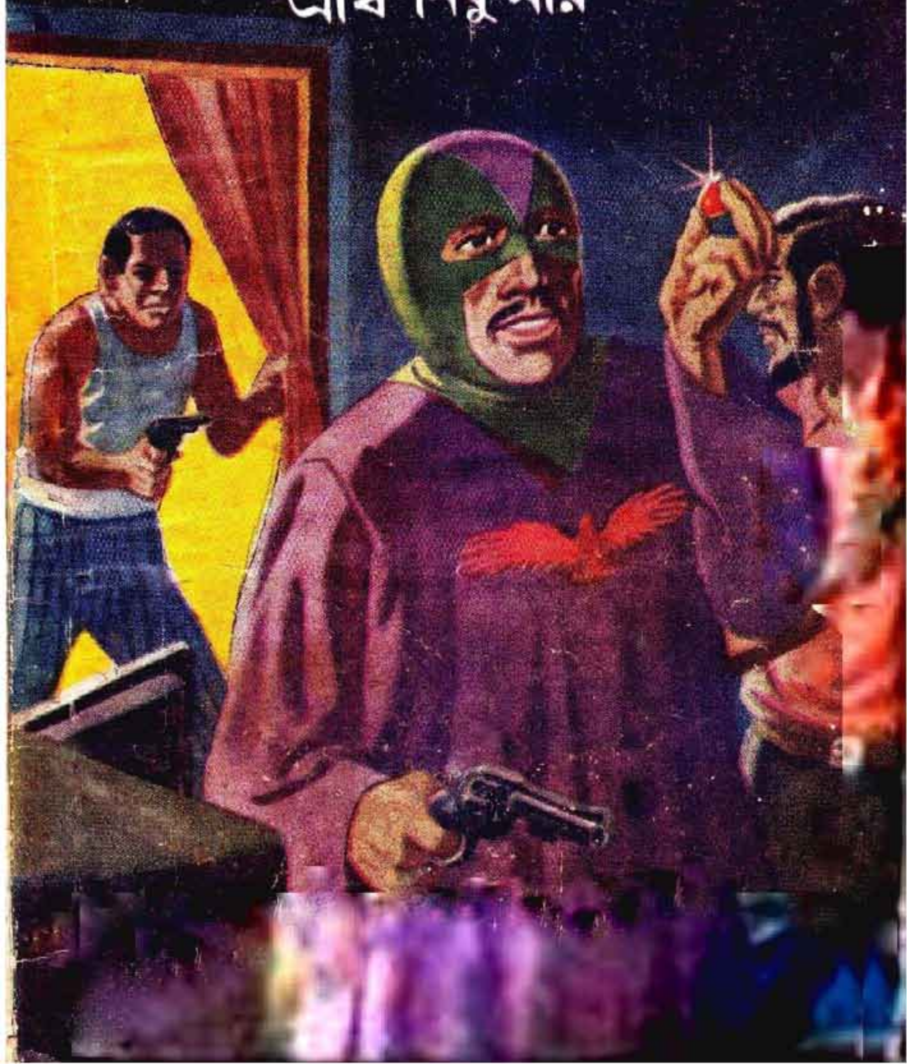

বাজপাখি সিরিজ ২ নং

বাজপাখীর পুনরভিযান

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক :
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ২·৫০

মুদ্রক :
মিনতী সরকার
মিণ্টু প্রেস
১।১।১ ফকির চক্রবর্ত্তী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাজপাখির পুনরভিযান

এক

—নীল সাগরে রক্তলীলা—

ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্……..

সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ সমুদ্রের নিবিড় নীলিমা। জল কেটে, ফেনা ভেঙ্গে তরঙ্গ তুলে তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছে বিরাট জাহাজখানি—এস্ এস্ ইণ্ডিয়ানা……..

জাহাজখানি চলেছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে। বিচারে দ্বীপান্তর প্রাপ্ত বন্দীদের এই জাহাজে করেই আন্দামানে প্রেরণ করা হচ্ছে।

অজস্র পুলিশ এবং সশস্ত্র মিলিটারীতে জাহাজখানি বোঝাই। পাছে কোনও এক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে কোন অপরাধী পালিয়ে যায়, তাই সর্বপ্র রয়েছে পুলিশের তীব্র দৃষ্টি।

এছাড়া এস্ এস্ ইণ্ডিয়ানার উপরে পুলিশের নজর একটু বেশি পরিমাণেই আছে। এই জাহাজটিতে করেই বিখ্যাত দস্যুসর্দার পুলিশত্রাস, ভয়াবহ কুটচক্রী দস্যু বাজপাখিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আন্দামানের বন্দীশালায়।

পৃথক একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা হয়েছে বাজপাখির জন্যে।

তার প্রত্যেকটি জানালা মোটা লৌহগরাদ দিয়ে তৈরী। দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ।

কক্ষটির দেওয়ালে সরু একটি ফোকর—তার মধ্য দিয়েই খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করাছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় কক্ষটির সামনে পাহারারত সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবলটি লক্ষ্য করল বাজপাখি ঘরের মধ্যে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে।

চোখে মুখে তার অদ্ভুত সংকল্পের দৃঢ়তা।

প্রতিটি ভঙ্গির মধ্যে ব্যাকুলতা মাখান প্রতীক্ষা ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত আগ্রহে সে যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

বারকয়েক পায়চারি করে সে এক গ্লাস জল খেতে চাইল। পুলিশ প্রহরীটি জল আনতে চলে গেল পাশের সঙ্গীকে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে।

বাজপাখি জানালার ভিতর দিয়ে আকুল দৃষ্টি মেলে দিল সমুদ্রের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে উদ্বেগ সহকারে চারিদিকে চেয়ে সে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সহসা নজরে পড়ল বহুদূরে একটা ছোট্ট সাবমেরিণ। মাথাটা একটু তুলেই আবার ভুস্ করে গভীর জলের মাঝে তলিয়ে গেল।

বহুদূরে অবস্থিত এই ডুবো জাহাজটি জাহাজের আর কারোর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না।

বাজপাখি একটু হেসে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়ল চুপচাপ। ভাব দেখে মনে হয়, সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কিন্তু কেন যে হঠাৎ বাজপাখি আজ এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল তা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ।

* *

সেদিনই গভীর রাত্রি।

জাহাজের আলো অধিকাংশই নিভে গেছে। সামনের সার্চলাইট্‌টা তীব্র আলো ফেলে যেন কোন একটা রোমাঞ্চের যবনিকা তুলে ধরেছে।

প্রত্যেক কক্ষের আরোহীরা নিমগ্ন সুষুপ্তির কোলে। কয়েকজন পুলিশ ও মিলিটারী খট্‌খট্ শব্দে নৈশ স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

সমুদ্রের কালো জলের সাথে কালো আঁধার মিশে একাকার হয়ে গেছে।

নিঃশব্দে একটি ডুবো জাহাজ ভুস করে ভেসে উঠল জাহাজের পাশে।

জাহাজের পাহারারত পুলিশ কিংবা মিলিটারী তখন সবাই কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—কারোরই নজর তাই সেদিকে আকৃষ্ট হল না।

একটি কক্ষে দেখা গেল একটি লোক টর্চ জ্বেলে সমুদ্রের বুকে আলো ফেলে হাতটা আন্দোলিত করছে। এটিই বাজপাখির কক্ষ।

ডুবো জাহাজ থেকে দু'জন লোক জাহাজের মোটা কতকগুলি দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে জাহাজে উঠে পড়ল।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যেত, যে কক্ষটি থেকে দড়ি ঝুলছিল সেটাই বাজ-পাখির কক্ষ।

মার্জারের মত লঘুপদে লোক দুটি জাহাজে উঠে পড়ল। তারপর ধীর পদে দু'এক পা এগুতেই চোখে পড়ল ঠিক সামনেই দু'জন পাহারাদার পুলিশ একটা মোটা থামে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

পেছন থেকে দু'জন লোক পাহারাদার দু'জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাথার প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। একটুকুও শব্দ বেরুল না তাদের মুখ দিয়ে।

পাহারাদার লোক দুটির হাত পা বেশ ভাল করে বেঁধে রেখে এবং মুখে একটা রুমাল গুঁজে মুখটাও বেশ ভাল করে বেঁধে তারা এগিয়ে চলল।

ঠিক যে ঘরে বাজপাখি বন্দী ছিল তার সামনে অপর একজন লোক পায়চারি করছিল।

আকাশ ফুঁড়ে দু'জন লোককে আচমকা তার সামনে আবির্ভূত হ'তে দেখে সে বেচারী হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার এই বিমূঢ়তার সুযোগে এরা দু'জনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপরে।

এমন সময় দূরে পদশব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই আরো কয়েকজন পাহারাদার এগিয়ে আসছে।

ওরা আর বিলম্ব না করে এই লোকটাকে চ্যাং-দোলা করে তুলে রেলিং টপকে গভীর সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

একটা ঋপ্ করে শব্দ হল। হতভাগ্য পাহারাদারটি মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল সমুদ্রের গভীর কালো জলের অভ্যন্তরে।

আততায়ী দু'জন একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করল। ভারী বুটের খটাখট্ খটাখট্ শব্দ তুলে চারজন পাহারাদার ওদের সামনে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল দ্রুতপদে।

ওরা অদৃশ্য হবার পর আততায়ী দু'জন একটা ব্যাগ বের করল। একটা অদ্ভুত রাসায়নিক পদার্থ বের করে বাজপাখির ঘরের তালার উপরে রাখল। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যে একটা ক্ষীণ শব্দ তুলে তালাটা খুলে গেল। জাহাজের ইঞ্জিনের গর্জনে সেই ক্ষীণ শব্দ কোথায় তলিয়ে গেল।

বাজপাখির ঘরটি একটু পরেই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

বাজপাখি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দু'জনের সাথে পরপর করমর্দন করল। তারপর বলল—এবার পৃথিবীর কোনও শক্তি আর বাজপাখিকে বাধা দিতে পারবে না। বাজপাখি আবার দুনিয়ার বুকে জেগে উঠবে। এবার সে হবে অপরাজের দুর্ধর্ষ, অদম্য····

তারপর বলল—এবার আর চোরের মত লুকিয়ে নয়। পিস্তল তিনটি বের কর। এক্ষুনি·······

ওদের একজন কোমর থেকে তিনটি পিস্তল বের করল। একটি দিল বাজপাখির হাতে, অপর দুটি নিজেরা গ্রহণ করল।

তিনজনে ছুটে চলল সামনের দিকে। কিন্তু অাঁধারে স্থির করতে পারল না কোন্ দিকে ডুবো জাহাজটি অবস্থান করছে।

ওধার থেকে এগিয়ে আসছে তিনজন সশস্ত্র মিলিটারী।

বাজপাখি সাবধান করবার জন্যে ফিস ফিস্ করে বলে উঠল—প্রস্তুত হও। যে কোনও মুহূর্তে পিস্তলের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।

—হুইজ দেয়ার? একজন মিলিটারী হেঁকে উঠল।

—গুড়ুম্। গুড়ুম্। গুড়ুম্।

দুজন মিলিটারী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

জাহাজের বুকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি হল যেন প্রচণ্ড গোলমাল হুলুস্থুল। অজস্র পুলিশ এবং মিলিটারী ছুটে এল।

ওরাও এগিয়ে একেবারে রেলিংএর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার আর একটি মুহূর্ত সময় পেলেই আর ওরা কারও নাগালের মধ্যে থাকবে না।

গাঁড় মেরে ওরা একটি থামের আড়ালে লুকিয়েছিল। এবার মুহূর্তের বিলম্ব না করে একজন উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা একটি বিরাট হাতবোমা ছুঁড়ে দিল পুলিশবূহে লক্ষ্য করে····

বুবুম্, বুবুম্, বুম্—

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের বিপুল আলোড়নে জাহাজটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠল।

অজস্র চীৎকার, হট্টগোল। মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসে ওদের বিমূঢ় করে তুলল। আহতদের রক্তে ডেক ভিজে গেল····

ঝপাং ঝপাং। দুজন রেলিং টপকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জন ধরা পড়ল ওদের হাতে। কিন্তু সে ত বাজপাখি নয়। বাজপাখি তবে কোথায় গেল?

*　　　*　　　*

সেদিন মধ্যরাত্রে ঢং ঢং শব্দে যখন জাহাজের পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল বাজপাখি তখন তার সাবমেরিণে চড়ে কোন অনির্দেশের পানে উধাও হয়ে গেছে।

সমস্ত জাহাজে কেব্‌ল্ করে জানিয়ে দেওয়া হল। বাজপাখি পলায়ন করেছে। তাকে ধরা চাইই। জীবিত কিংবা মৃত ক্ষতি নেই····

কিন্তু বাজপাখিকে ধরা গেল না। অন্ধকার রাত্রির গহ্বরেই যেন হলো তার সমাধি।

দুই

—মুখোমুখি—

তমসাচ্ছন্ন আকাশের বুকে মেঘ, আর বর্ষণক্লান্ত ধরণীর উপর ক্ষুধিত শ্বাপদের মত মুখোমুখি দণ্ডায়মান দুজন মানব।

—বাজপাখি, আত্মসমর্পণ কর। ডিটেক্টিভ দীপক চ্যাটার্জী জীবনে যতবার তীব্রভাবে প্রতিপক্ষকে তার আদেশবাণী স্থির কঠোর গাম্ভীর্যে বিচলিত করেছে তার সব কিছু ছাপিয়ে আজকের সঙ্কটময় মুহূর্তের এই দীপ্ত হুঙ্কার····

নিস্পন্দ পৃথিবীর বুককে উদ্ভাসিত করে জ্বলে উঠল তীব্র, ক্ষণস্থায়ী বিজলীর চকিত চমক। দীপ্ত হয়ে উঠল দীপকের চোখ দুটো····

—বাজপাখি জীবনে আত্মসমর্পণ করে নি দীপক! সে অপরাজেয়। সে দুর্ধর্ষ। সে ভয়াল। সে ভীষণ! সে অদম্য। ব্যর্থ হল তোমাদের সমস্ত চেষ্টা। আমাকে বন্দী করে জাহাজের বুকে সুদূর আন্দামানের পথে চালান দিয়েছিলে; কিন্তু বাজপাখি কারও হুকুমের চাকর নয়। বাজপাখি কারও খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকতে জন্মগ্রহণ করে নি। তাই নীল সাগর সাঁতারে, লোহার খাঁচা ভেঙ্গে ছুটে এসেছে আজ সে সুদূর মহানগরী কলকাতার বুকে বাজপাখি এবার জেগে উঠেছে রক্তলোলুপ হিংস্র নতুন এক রূপে। মিথ্যাই তুমি ভয় দেখাচ্ছ দীপক চ্যাটার্জী। আমি চাই তোমার সাথে বোঝাপড়া করতে —এক্ষুণি। আমি চাই সংগ্রাম। তাই লোকজন, দলবল নিয়ে আসিনি। ঘনিয়ে এসেছে তোমার হুমকির আর হুকুমের শেষ সময়। যদি সাধ্য থাকে তবে এই মুহূর্তে আমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করো।

বাজপাখির হাতে অসিলেখার মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল চকচকে ছোরাটা— যেন কোনও ক্ষুধার্ত, শার্দুল শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে তীব্রদৃষ্টিতে প্রতিপক্ষকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে।

বাজপাখিরর চোখে-মুখে কোথাও হিংস্র ভাব জেগে উঠেছিল কিনা তা মুখোসের আড়ালে অবশিষ্ট তার চোখ দুটোর পাথরের মত স্থির অবিচলিত

দৃষ্টিতে বোঝা গেল না, তবে নিশীথিনীর স্তব্ধ প্রহরকে খান্ খান্ করে দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল একটা অট্টহাসির শব্দ····হাঃ হাঃ হাঃ····

দীপকের চেহারায় কোনও ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছিল কিনা গভীর রাত্রির নিকষ কালো আঁধারে তা দেখা গেল না। শুধুমাত্র হাসির শব্দকে ডুবিয়ে শোনা গেল একটা পিস্তলের গর্জন। শব্দিত পরিবেশ কোন সুষুপ্ত লোকের নিদ্রাহরণ করল কিনা বোঝা গেল না, শুধু কোনও আহতের কাতর, একটানা গোঙানোর শব্দ আর ভিজে বাতাসের প্রবহমানতায় ভেসে যাওয়া শন্‌শন্—শব্দ—অশরীরীর দীর্ঘশ্বাসের মতোই····

একটু পরেই কাতর গোঙানির শব্দ যায় মিলিয়ে।

আঁধারের বুকে জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের আলো। ভালো করে চেয়ে দেখে দীপক সেই ক্ষণিক আলোতে।

কই, কেউ ত আহত হয় নি। তবে কাতর গোঙানির শব্দ কি শুধু তাকে প্রতারিত করবার জন্যেই ?

দূরে আঁধারের কোলে মিলিয়ে যাচ্ছে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। নিবিড় আঁধারের কোলে।

বহুদূর থেকে ভেসে আসে—শুভরাত্রি দীপক চ্যাটার্জী, আবার দেখা হবে····

দীপক ছুটে যায় সেদিকে····কিন্তু সে শুধু মরীচিকার পেছনে ছুটে যাওয়া তৃষ্ণার্ত পথিকের মতোই—বাজপাখি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে কোন অজানার রাজ্যে।

শুধু বাজপাখির অন্তর্ধানের চিহ্নস্বরূপ পড়ে আছে একটুকরো সাদা কাগজ। তাতে কি যেন সব লেখা। ছোট্ট একটি চিঠি। দীপক সেটি তুলে নেয় উৎসুক আগ্রহে।

ছোট্ট একটি চিঠি :

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

তোমার সাথে শুধু মুখোমুখি দেখা করতে এসেছিলাম। লোহার খাঁচা থেকে মুক্তি পাবার পর এই সাধটা আমার মনে খুব বড় করে জেগেছিল। তোমাকে হত্যা করতে আমি আসিনি—কারণ, সংগ্রাম আমি বড়ো ভালবাসি এবং তা তোমারই মত সুচতুর গোয়েন্দার সাথে।

জীবনে অজস্র সংগ্রাম করেই সুকৌশলে আমাকে বন্দী করেছিলে তুমি ; কিন্ত আমাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা তোমাদের পুলিশ বাহিনীর নেই। আবার সুরু হল বাজপাখির পুনরাভিযান। নতুন তার স্বরূপ—অভিনব এ পদ্ধতি। এবার আর সামনে থেকে লড়াই নয়—সুকৌশলে কাজ হাসিল করা। যদি ক্ষমতা থাকে বাধা দিতে পার তুমি। পরীক্ষা হবে তোমার শক্তির ক্ষমতা। কিন্তু বাহুবল নয়—এবার পরীক্ষা হবে বুদ্ধির বল। দেখা যাক্ বুদ্ধির বলে কে বড় ?····গোয়েন্দা-শ্রেষ্ঠ দীপক চ্যাটার্জী, না দস্যুশ্রেষ্ঠ বাজপাখি।

ইতি—তোমার একান্ত বন্ধু ও শত্রু

বাজপাখি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপক চিঠিটা শেষ করল। তারপর ধীরপদে অগ্রসর হল তার মোটরের দিকে মোটরটিতে স্টার্ট দিয়ে উল্কাবেগে ছুটিয়ে দিল তার গৃহের দিকে। মনে মনে ভাবতে লাগল কি অদ্ভুত সাহস এই দস্যুটার—তাকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করে এনে এভাবে তাকে আক্রমণ করল—অথচ তাকে হত্যা না করে তার হাতে শুধু তুলে দিল একটা চিঠি।

কে জানে বাজপাখি কি অভিনব উপায়ে সুরু করবে তার পুনরাভিযান ? কে জানে কত নিরীহের রক্ত-ঝরা করুণ ক্রন্দনে হবে তার সমাধি ?

পরিবেশে আসে পরিবর্তন····

প্রকৃতি বদলায় তার রূপ····

স্তব্ধ, ভয়াল রাত্রির জড়িমা কেটে যায় প্রভাতের প্রথম প্রহরে দিক-চক্রবালের প্রান্তে উদীয়মান নবারুণের দীপ্তিতে।

মানুষেরও হয় পরিবর্তন। হত্যাকারীর বীভৎস মুখের উপর ফুটে ওঠে নিরীহের সুন্দর মুখোস।

মানুষ করুক বিচার তাদে পাপের আর পুণ্যের—আমরা এগিয়ে চলি ঘটনার সংঘাত ধরে····

———

তিন

—বাজপাখির নতুন অভিযান—

সকাল সাতটা।

কলকাতার বিখ্যাত সব খবরের কাগজে একটি সংবাদ বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা হয়েছে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মহানগরী। চারিদিকে বিস্ময়ের গুঞ্জন। শহরের সমস্ত লোক ভয়ে আড়ষ্ট। আবার কোন পথে তাদের উপরে হয়ত নেমে আসবে ভয়ঙ্কর, বীভৎস এক চক্রান্তের জাল।

সমুদ্রবক্ষ থেকে বাজপাখির পলায়ন !

পুলিশের চেষ্টা সত্বেও গ্রেপ্তার করতে অসমর্থ !!

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সাথে মুখোমুখি সংগ্রাম !!!

বিখ্যাত কূটচক্রী, পরাক্রান্ত দস্যুসর্দার বাজপাখি বর্মার বুকে দীপক চ্যাটার্জীর হাতে ধৃত হয়, এ সংবাদ ইতিপূর্বেই পাঠকগণ অবগত আছেন। পুলিশ ও মিলিটারীর কড়া পাহারায় এস্ এস্ ইণ্ডিয়ানা জাহাজে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কিন্তু পুলিশ ও মিলিটারীর বাধা ডিঙ্গাইয়া তার অনুচরদের সাহায্যে জাহাজের বুকে বিরাট এক সংগ্রামের পর একখানা সাবমেরিণের সাহায্যে বাজপাখি পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এরূপ ঘটনা শুধু আশ্চর্যজনক নয়—অভূতপূর্ব ! ইতিপূর্বে এরূপ ঘটনা আমাদের গোচরে বিশেষ আসে নাই ! ইহা হইতেই বোঝা যায় বাজপাখি এবং তাহার সুসংবদ্ধ দল কিরূপ ক্ষমতাশালী !

আর সবার চেয়ে আশ্চর্য পরবর্তী ঘটনাটি। দস্যুসর্দার বাজপাখি জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া মহানগরী কলিকাতার বুকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীকে সে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ব্যারাকপুরের একটি

পোড়ো বাড়িতে লইয়া যায় এবং তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। দীপক অনেক কষ্টে তাহার হাত হইতে নিস্তার পায় সত্য—কিন্তু বাজপাখি তাহাকে ভয় দেখাইয়াছে এবং পরবর্তী সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানাইয়াছে।

অপর একটি পত্রিকা আরও লিখেছে ঃ

এভাবে দিনের পর দিন যদি পুলিশবাহিনী নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে এবং দস্যুদল ইচ্ছামত সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া যা ইচ্ছা তাই সাধন করিয়া চলে, তবে মহানগরী শীঘ্রই অরাজকত্ব লাভ করিবে। আমরা চাই পুলিশ বিভাগ অবিলম্বে সক্রিয় হইয়া উঠুক। দস্যুদলকে যত শীঘ্র গ্রেপ্তার করিয়া নাগরিকদের জীবন ও সম্মান নিরাপদ করা হউক।

* * *

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন রায় বাহাদুর রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

চায়ের পেয়ালা শেষ হল। চাকরের হাতে এল চিঠির তোড়া। ছোট একটি চিঠির দিকে রায় বাহাদুরের নজর পড়ল। নিজের চোখকে যেন তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। নিঃশ্বাস হল দ্রুত। কপালের শিরাটা ফুলে উঠল, দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল চোখ দুটো অব্যক্ত জ্বালায়----

চিঠিটা একটা খাম---তার উপরে রক্তাক্ত অক্ষরে আঁকা কুশ্রী একটি বাজপাখি যেন ঠিক শিকারের উপরে ছোঁ মারছে। রায় বাহাদুরের মনে জেগে উঠল মুহূর্ত পূর্বে খবরের কাগজের পৃষ্ঠার সঠিক ঘটনার স্মৃতি। একি ? তবে কি বাজপাখি—দ্বীপান্তরের আদেশপ্রাপ্ত পলায়িত দস্যুসর্দার বাজপাখি তার উপরেই প্রথম ছোবল মেরেছে ? মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কি ফিরে এল মরণ-সাগরের ওপার থেকে কোনও মৃত সৈনিক ? না না, এ হতে পারে না কিছুতেই। এ অসম্ভব !

হাত দুটো তাঁর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। আবার ছুটে গিয়ে তুলে এনে মেলে ধরলেন চোখের সামনে।

ছিঁড়ে ফেললেন খামের মুখটা। ভেতরে একটা পুরু নীলাভ কাগজের বুকে শুধু লেখা—'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান আবির্ভাব হয়েছে তাদেরই একজনের। স্মরণ কর রায় বাহাদুর, বিশ বছর পূর্বেকার কোনও একটি তমসাচ্ছন্ন সুপ্ত নিশিকে। তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিল একজন হতভাগ্য। তারই টাকায় তোমার এই বিপুল ঐশ্বর্য। এ সংবাদ পৃথিবীর আর কেউ জানে না—এক আমি ছাড়া। কিন্তু একটি সর্তে এ কথাটা আমিও সম্পূর্ণ ভুলে যেতে রাজি আছি·········বিশ হাজার টাকা। হ্যাঁ, বিশ হাজারের এক পয়সাও কম নয়।

আর যদি আমার সর্ত মেনে না নাও, তবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক জানতে পারবে তোমার স্বরূপ। তোমার ঘৃণ্য, বীভৎস রূপকে। আর আমার শাণিত তরবারি নিয়তির মত নেমে আসবে তোমার উপরে। আগামী ১৩ই মে ধার্য হবে তোমার বিচারের দিন। সেজন্য ভেবে দেখ একদিকে বিশ হাজার টাকা মাত্র। আর অপরদিকে তোমার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি এবং তোমার নিজের জীবন।

যদি আমার সর্তে প্রস্তুত থাক, তিনবার চীৎকার করে বলবে—ও কে। তাহলেই আমি বুঝতে পারব। তোমার প্রতিটি গতিবিধির উপরে আমার দৃষ্টি আছে। —বাজপাখি।

রায় বাহাদুর ভাবতে লাগলেন—একি অবিশ্বাস্য ঘটনা-প্রবাহ? বিশ বছর আগে কালের করালগ্রাসে নিপতিত হয়েছে যে হতভাগ্য, তার সংবাদ কি করে পেঁছল বাজপাখির কানে। লোকটি কি মায়াবী না যাদুকর? কোথায় কোন এক মুখোসের আড়ালে বসে সে পেতে চলেছে তার চক্রান্তের ফাঁদ?

রায় বাহাদুরের চোখ দু'টি জ্বালা করে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল—কণ্ঠনালী উঠল শুকিয়ে। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেললেন তিনি মেঝের ওপরে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বারকয়েক অস্থির পায়চারি····আবার চেয়ারের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে হাঁক দিলেন—ভজুয়া, ইধার আও····জলদি····

চাকর ভজুয়া ঘরের দিকে দ্রুতপদে ছুটে এল। হাতে তার একটুকরো কাগজ।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন—কি ওটা ?

—আপনার চিঠি, একটু আগে একটা লোক এটা দিয়ে চলে গেল। রায় বাহাদুর ভজুয়ার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। তাতে লেখা ঃ

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পার রায় বাহাদুর, কিন্তু নিস্তার নেই জেনো। আমার চোখের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই তোমার, এক মুহূর্তের জন্যও আশা করি ভুলবে না।

—বাজপাখি।

রায় বাহাদুর ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা তুললেন—হ্যালো, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, লালবাজার, ডি, ডি, নর্থ····

চার

—অদৃশ্য চক্রান্ত ?—

চা থেকে সুরু করে পানাহার অনেক কিছুরই জোগান দিতে পারে সিঁথির মোড়ের ছোট্ট অখ্যাত কিংবা কুখ্যাত দোকানটি— 'নিউ বেঙ্গল রেষ্টুরেণ্ট।"

দিনের বেলায় খদ্দেররা হাঁক দেয়—এই, হাফ্ কাপ চা জলদি····

রাতের অঁাধারে আত্মগোপন করে যে নৈশ অভিযানকারীদের গুপ্ত চক্রান্তের ফেনিল ঢেউ বয়ে যায়, সে সব বৈঠকের উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের যোগান দিতে কসুর করে না, দোকানের প্রায় চলচ্ছক্তিহীন মালিক 'বটকেষ্ট।

ভোরের আলো-অঁাধারের খেলা চলছে পৃথিবীর বুকে, এখনও সম্পূর্ণ দূর হয়নি অঁাধার তার কালো আবছায়ার রহস্যজাল নিয়ে।....

দোকানের ঝঁাপ তোলা হয়েছে। খদ্দের নেই....

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন দোকানের চারদিকে দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে। তিনি দোকানের পরিচিত খদ্দের বোধ হয়—কারণ, মালিক বটকেষ্ট কোনও কথা না বললেও তার চোখের দৃষ্টির মাঝে যে মূক ভাষা ফুটে উঠল তা বুঝে নিতে লোকটির মোটেই কষ্ট হল না।

চা এল, আর তার সাথে খাদ্যের প্রাচুর্য।

লোকটি গো-গ্রাসে খাদ্য গিলে চলল—বটকেষ্ট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার পাশে এসে বসে পড়ল।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক মৃদু মুচকি হাসলেন শুধু।

বটকেষ্ট ফিস্ ফিস্ করে কি যে কথা বলে চলল তার সাক্ষ্য রইল না কেউ। অনেকক্ষণ পরে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক তার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন কথা বলল।

সামান্য খাবারের জন্য দশ টাকা বটকেষ্টর প্রাপ্য নয়—তবুও সে নির্বিবাদে টাকাটা নিজের পকেটে পুরে ফেলল।

মৃদু হেসে বটকেষ্টর হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে লোকটি বেরিয়ে পড়ল দোকান ছেড়ে। তার এই নিভৃত চক্রান্তের সাক্ষী রইল না কেউ।

শুধু দোকানের কাপ, ডিস্ ধোয় যে বোবা আর কালা ছোকরা চাকরটি, তার মুখের ওপর দিয়ে যেন মৃদু হাসির ঢেউ বয়ে গেল—বোঝা গেল না তার মাঝে লুকিয়ে আছে দুর্বোধ্য অভিসন্ধি না নির্বোধ অবাস্তবতা....

দোকানের সামনেই যে ভিখিরিটা সর্বাঙ্গে গলিত ঘা আর দাড়ি-গোঁফপূর্ণ নোংরা দেহ নিয়ে একঘেয়ে সুরে ভিক্ষা চেয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল সে কি কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল ওদের ফিস্‌ফিসানি ?

ঠিক তা বোঝা না গেলেও দেখা গেল একটু পরেই ও জীর্ণ পোষাকটা অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীর পদে একটা বাঁকে ছোট গলির মধ্যে অদৃশ্য হল।

একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে বোধ হয় চিনতে পারা যেত যে, এই ভিখিরিটা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল ছাড়া অন্য কেউ নয় !

* * *

ঢং ঢং ঢং....রাত তিনটে।....

জনবিরল পথের উপর দিয়ে ধীরপদে এগিয়ে চলেছে যে সুদীর্ঘ বলিষ্ঠকায় ডকের খালাসী শ্রেণীর লোকটি তার দিকে সামান্যতম নজর দেবার অবকাশও কারুও নেই। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়াতেই উল্টো থেকে আগত একটি কালো বিরাট শেভ্রলে গাড়ি এসে হঠাৎ থেমে পড়ল তার ঠিক পাশে।

দিক লোকটি মৃদু হেসে হাত দু'টি মাথার উপরে তুলল। গাড়ির ভিতরে উপবিষ্ট ড্রাইভার শ্রেণীর লোকটিও হাত দু'টি মাথার উপরে তুলে ধরল।

খালাসী শ্রেণীর লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির ভিতরে উঠে বসল।

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে গাড়িখানা ছুটে চলল।

ওপাশে সরু গলিটার বাঁকে একটা ছোট্ট অষ্টিন গাড়ি আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ঝিমুচ্ছিল। সেও যেন এবার হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল। পূর্বোক্ত শেভ্রলে গাড়িটিকে অনুসরণ করে এটিও ছুটে চলল তীব্রবেগে, বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরত্ব রেখে।....

গাড়ি দু'টি ছুটে চলল গতির শেষ সীমায়—যেন বাঁধনহারা কল্পনার অগ্রদূত....

যশোহর রোড ধরে এগিয়ে চলেছে দুটি গাড়িই তীব্রবেগে। একটি বাঁকের মোড়ে এসে সামনের গাড়িখানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে দ্রুত লক্ষ্যহীন ইতস্ততঃ গুলিবর্ষণ করে চলল—গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্....

পেছনের গাড়ির আরোহী অনুসরণকারী যেন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষায় তৎপর হয়ে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ গুলিবর্ষণের পর সামনের গাড়িটি আবার যখন ছুটতে সুরু করল তখন পেছনের গাড়িখানির টায়ারটা ফেটে গিয়ে সমস্ত গাড়িখানাকে সম্পূর্ণ অচল করে তুলেছে।

সম্মুখের গাড়ীটি চলে যাবার পর পেছনের গাড়ির আরোহী কিছুটা এগিয়ে চাকার দাগগুলোর দিকে মনঃসংযোগ করল। এভাবে সামনে থেকে শিকার ফস্কে যাওয়ায় সে যে যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে তা তার ভাবভঙ্গির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ নজরে পড়ল এক টুকরো কাগজ পড়ে রয়েছে! ওটা কি? হঠাৎ কোত্থেকে এল? এগিয়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিল সে। ভাঁজ করা পাতা থেকে চিঠিটা বের করে দেখতে পেল একটা চিঠি :

বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী—

বহুদিন পরে তোমার সাথে মুখোমুখি দেখা হল! কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, পাশার দানে হেরে গেলে তুমি! কিন্তু সাবধান! যা করেছ, যা যতদূর এগিয়েছ তার সব সংবাদটুকুই আমি রাখি। কিন্তু আর এক পা-ও নয়। হুঁসিয়ার, এরপর আর এক পা এগুলেই ধ্বংস সুনিশ্চিত জেনো। মনে রেখো বাজপাখি মিথ্যা ভয় দেখায় না। তার প্রমাণ তুমি মুখোমুখি বহুবার পেয়েছ, তোমার মত একজন ধীশক্তিসম্পন্ন লোককে বৃথা হত্যা করতে চাই না, তাই এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালে যে সরাতে আমার এতটুকুও দ্বিধা হবে না, তা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বেশ ভাল করে....

তোমার বহু পুরানো বন্ধু—
বাজপাখি

দীপকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল কিনা রাতের অন্ধকারে তা বোঝা গেল না।

—পাঁচ—

—বাজপাখির রণহুঙ্কার—

১৩ই মে—বেলা আটটা।

রায়বাহাদুর রণেন্দ্রনারায়ণের বাড়িটা অসংখ্য পুলিশ প্রহরীবেষ্টিত হয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতই পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

দোতলার হলঘরে বসেছিল রায়বাহাদুর একটা বড় সোফায়। পাশে বসে স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ চ্যাটার্সন। কোমরে ঝোলান ছয়ঘড়া অটোমেটিক্‌টা যেন রায়বাহাদুরের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে অটুট গাম্ভীর্যে শোভা পাচ্ছিল····

মিঃ চ্যাটার্সন বললেন—অহেতুক ভয় আপনার রায়বাহাদুর। কবে হরদয়ালের ফাঁসী হয়ে গেছে। আইন অমান্য ও হত্যার অপরাধে. আর বিশ বছর পরে আপনি দেখলেন আর একজন আপনাকে ভয় দেখিয়েছে। এত কথা লিখে ব্ল্যাকমেল করছে····

—ঠিক বুঝতে পারছি না! আমার মনে হয় ওর মধ্যে কোনও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় যে গলদ এবং কি তা বোঝবার সাধ্য আমার নেই····

—আপনার স্নায়ু বড় দুর্বল রায়বাহাদুর····

রায়বাহাদুর হেসে মৃদু তোয়াজের ভঙ্গিতে বললেন—হয়ত তা হবে মিঃ চ্যাটার্সন। তবু কেন যে আজ সামান্য কারণে আমার মনটা এত উতলা····

রায়বাহাদুর এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ার থেকে হুইস্কীর বোতল বের করে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিলেন! এতে তার স্নায়ু সবল হল কিনা জানি না, তবে সাময়িক দুশ্চিন্তার লাঘব হয়ত হল কিছুটা—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং····

—হ্যালো কে?····রায়বাহাদুর ফোন তুললেন।

—তোমার নিয়তি····বাজপাখি····আমার পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না রায়বাহাদুর রণেন্দ্রনারায়ণ ওরফে শয়তান কিষণচাঁদ! সামান্য পুলিশবাহিনী কেন সমস্ত লালবাজারের সমস্ত পুলিশবাহিনী আমার দুর্বার গতির কাছে একগুচ্ছ তৃণের মত তুচ্ছ। মিঃ চ্যাটার্সনের মত শত লোকেরও সাধ্য নাই নিয়তির মত করাল আমার রোষবহ্নিকে বাধা দেয়। আর আধ ঘণ্টা পরমায়ু কিষণচাঁদ। এবার ভগবানের ধ্যান করতে সুরু কর তুমি····হাঃ হাঃ হাঃ····

রায়বাহাদুর আর থাকতে পারলেন না। প্রাণপণে আত্মদমন করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও হাত থেকে ফোনটি ছিটকে পড়ল। কোনও প্রকারে সেটাকে চেপে রেখে তিনি চুপ্‌চাপ চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন. তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতে সুরু করলেন—আমি ওকে টাকাটাই দিয়ে দিই মিঃ চ্যাটার্সন আর। আমি এভাবে ঠিক সহ্য করতে পারছি না।

চ্যাটার্সন বললেন—হ্যালো রায়বাহাদুর, হোয়াই সো নার্ভাস? এভাবে ডাকাতকে প্রশ্রয় দিলে তারা ত আরও পেয়ে বসবে! একটা বাজে ফোন শুনেই এত ভয় পেয়ে গেলেন? হোয়াট্ এ চাইল্ড ইউ আর?

রায়বাহাদুরের কম্পমান ঠোঁট দিয়ে শুধু ফুটে উঠল একটিমাত্র কথা—বাজপাখি····

—ড্যাম্ ব্লাডি বাজপাখি! ইউ আর সো হোপলেসলী এক্জস্টেড দ্যাট আই য়্যাম অলসো অব্ নো ইউজ····

রায়বাহাদুরের চোখেমুখে যেন হঠাৎ ফুটে উঠ্ল অদ্ভুত দৃঢ়তা। বললেন—না না, এ হতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ চ্যাটার্সন, দেখি তার কতবড় সাধ্য····

দীপ নিভে যাবার পূর্বমুহূর্তে একবার দপ্ করে জ্বলে উঠে। এও কি তবে তাই?

*　　*　　*

ঠক্ ঠক্ ঠক্। পেন্ডুলামের দোলনের সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে সেকেন্ড আর মিনিট। সময় এগিয়ে চলে যেন বিদ্যুতের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে। পনর মিনিট কেটে গেল কুড়ি··· পঁচিশ··· আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি····

একজন পুলিশ কনেষ্টবল প্রবেশ করল খটাখট্, খটাখট্—

—কি চাই? খেঁকিয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর····

মিঃ চ্যাটার্সনের দিকে চেয়ে সে বলল—আজ্ঞে, গোয়েন্দা দীপকবাবু আর তার সহকারী রতনলাল হুজুর····

মিঃ চ্যাটার্সনের মুখখানি আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দীপক এসেছে? এক্ষুণি এখানে পাঠিয়ে দাও তাকে, কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন তিনি।

খট্ খট্ খট্····পদশব্দ মিলিয়ে গেল।

দু'মিনিট কেটে গেছে। ঘরে প্রবেশ করল দু'জন লোক, মুখে তাদের অদ্ভুত দু'টি মুখোস। দু'হাতে দু'টি উদ্যত নিকষ কালো পিস্তল।

—মাথার উপরে হাত তোল চ্যাটার্সন এণ্ড রায়বাহাদুর····

চ্যাটার্সন স্তম্ভিতের মত বলে উঠলেন—ও, তুমি দীপক নও? জাল দীপক চ্যাটার্জী সেজে এভাবে আমাদের প্রতারণা করেছ!

মূর্তি দু'টি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

একজন চ্যাটার্সনের কপালের উপর পিস্তলটা উঁচিয়ে চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে রইল। বলল—টুঁ শব্দ করেছ কি তোমার মৃত্যু নিশ্চিত চ্যাটার্সন!

চ্যাটার্সন বিমূঢ়ের মতো বলে উঠল—মাই গড্!

অপর জন রায়বাহাদুরের বুকের সামনে পিস্তল ধরে হুকুম করল—সোজা ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঐ সিন্দুকটা খুলে ফেলুন।

রায়বাহাদুর বিস্মিত ভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন—কেন?

লোক্‌টি খল্ খল্ করে হেসে উঠে বলল—ঐ সিন্দুকে আছে বিশ হাজার টাকা। আমি জানি রায়বাহাদুর! আরও জানি যে ঐ লৌহ সিন্দুকের চাবি আছে আপনার কোমরের সাথে বাঁধা! মুহূর্তের বিলম্ব না করে ঐ সিন্দুকের চাবি খুলে বিশ হাজার টাকা আমায় দিন নইলে এই মুহূর্তেই আপনার জীবনের শেষ মুহূর্ত বলে জানবেন।

রায়বাহাদুর বলে উঠলেন—না না, তোমার কথামতই কাজ করছি আমি। কিন্তু এভাবে ভয় দেখিও না, দোহাই তোমার!

দস্যুর কথামত বিশ হাজার টাকা রায়বাহাদুর তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর ওরা দু'জনে পিস্তলটি উঁচিয়ে ধরে পায়ে পায়ে পিছনের দিকে সরে ঘরের কোণে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু তারা ঘর থেকে বের হবার অবকাশ পেল না। ওদের দু'জনের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল বিরাট শক্তিশালী এক ব্যক্তি····দু'হাতে উদ্যত দু'টি পিস্তল যেন বিদ্যুতের মত চকচক করছে····

—এক মুহূর্তের মধ্যে হাত থেকে পিস্তল ফেলে দাও বাজপাখি, এক পাও নড়বার চেষ্টা করলে মৃত্যু তোমাদের অবধারিত জেনো····

—কে তুমি ? আবার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

—যে দীপক চ্যাটার্জীর ছদ্মবেশে তোমরা পুলিশব্যূহ ভেদ করেছ শয়তান আমি স্বয়ং তোমার সেই বন্ধু দীপক চ্যাটার্জী। একটুও নড়বার চেষ্টা করলে মৃত্যু····

মুখোসধারী দু'জনে পাশে দু'টি চেয়ারে বসে পড়ল। দীপক তাদের দিকে এক পা এগিয়ে গেছে এমন সময় তাদের একজন পা দিয়ে মেঝের একস্থানে চাপ দিল····

সবার চোখের সামনে চেয়ার সমেত দু'জনে ভূগর্ভের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন ধরণী গভীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে গ্রাস করে নিল তাদের····

দীপক বিপুল আক্ষেপে দু'টি গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু সব ব্যর্থ····

ঘরে উপস্থিত অপর দু'জনের দেহে যেন তখন চেতনার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই।

দীপক রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে বলল—আপনার ঘরে যদি এমন একটা পলায়নের সুযোগ করা থাকে তবে কি করে আর তাদের ধরতে পারি বলুন ?

রায়বাহাদুর অবাক হয়ে বলে উঠলেন—কিন্তু ওরা কি করে জানল ঐ গোপন সুড়ঙ্গ পথের কথা ? উঃ, আমার বিশ হাজার টাকা আর কোনও অবশিষ্ট রইল না। দস্যুরা সবার চোখের সামনে দিয়ে এভাবে টাকা নিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিল।

দীপক রায়বাহাদুরের কথায় মনোযোগ না দিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

*　　　*　　　*

মিনিট দু'য়েক পরের কথা।

রায়বাহাদুরের বাড়ির কিছুটা দূরে যে চকোলেট রঙের মরিস গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল তা চলতে সুরু করল !

মোড়ের মাথায় একটা পাগল এতক্ষণ ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিল। এইবার সে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ডেকে বলল—এই ট্যাক্সি····

ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার দিকে চেয়েছিল নেহাৎ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে, কিন্তু পাগলটা একখানা গোল চাকতি তার সামনে তুলে ধরতেই সে সেলাম ঠুকে গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—আইয়ে হুজুর !

একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত যে, সে আমাদের গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল ছাড়া আর কেউ নয়····

———

—ছয়—

—গুপ্ত বৈঠক—

সহরের প্রান্তে চীনে পাড়ার ক্ষুদ্র অপরিসর একটি গৃহের প্রায়ান্ধকার একটি কক্ষে চলেছে একটি মিটিং।

বড়ো একটা মিটিঙের মতো জনসমাগম এখানে হয় নি! একটি ঘরের মধ্যে গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন লোক। ঘরের কোণে টিমটিমে যে বাতিটা জ্বলছে তাতে আলোর চেয়ে বোধ হয় ধোঁয়া উঠছে আরও বেশি। অন্ধকার তাতে খুব বেশি দূরে হয় নি। সবার মুখই দেখাচ্ছে আবছায়ার মত!

ঘরে কোনও জানলা নাই—মাত্র দুটি দরজা। একটি বন্ধ। অন্যটি এমন অদ্ভুত ভাবে আটকান যে, বৈদ্যুতিক বোতাম না টিপলে বোঝাই যায় না যে এখানে এভাবে একটি দরজা বর্তমান।

দেওয়ালের একদিকে বিরাট একটা কাপড়ের উপর কালো কালি দিয়ে আঁকা বিরাট একটা বাজপাখির ছবি। ঠিক যেন শিকারের উপরে ছোঁ মারতে উদ্যত। নিচে টকটকে লাল কালিতে লেখা—বাজপাখি।

সভার লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচজন। চারজন পুরুষ ও একটি নারী। পুলিশের কালোখাতায় এদের পাঁচজনেরই নাম লেখা আছে। তবে জন-সমাজে সবাই পরিচিত নয়। শুধু রুস্তমজী ও হোয়াংলি জনসাধারণের আতঙ্কের পাত্র। নারীর নাম—চিনলান। বর্মার বুকে একসময় সবাই ওঁকে ভয় করত যমের মতো। তবে ভারতে এর নাম ততটা পরিচিত নয়। চৈনিক, বার্মিজ, ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং····

একটা ঘণ্টা পর পর তিনবার বেজে উঠল।

সভার উপস্থিত সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসল।

ইলেকট্রিক কারেণ্ট সংযুক্ত দরজাটা খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করল মুখোসাবৃত একজন লোক। পোষাক-পরিচ্ছদ তার বোপনুরস্ত। এঁকেই এই সভার সভাপতি বলা চলে। ইনিই কলকাতার ধনীত্রাস, পুলিশের বিহ্বলকারী দস্যু বাজপাখি।

উপস্থিত সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতিকে সম্মান জানাল। বাজপাখি আদেশের ভঙ্গিতে হাত দুটো নেড়ে বলল—বসুন আপনারা····

তারপর একটু থেমে বলল—রুস্তমজী, তোমার খবর বল····

কণ্ঠে তার ভদ্রতার লেশমাত্র নেই—প্রকৃতি ও ব্যবহার রুক্ষ।

রুস্তমজী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল—ধীর অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলতে সুরু করল—রায়বাহাদুরের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা আমরা ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছি। দীপক চ্যাটার্জী বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। একটি টাকার তোড়া রুস্তমজী বাজপাখির হাতে তুলে দিল। তারপর বলল—গোয়েন্দা দীপক আমাকেই বাজপাখি বলে ভুল করেছিল। কিন্তু আমি রুস্তমজী অর্থাৎ রায়বাহাদুরের ছদ্মবেশী চাকর ভজুয়া, তা ওরা জানত না। যখন রায়বাহাদুরের কাছে চাকরী করতাম তখনই জানতাম যে ওর ঘরের মধ্যে একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই পথ ধরেই আমরা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছি।

বাজপাখি বলল—এবার হোয়াংলি, তোমার খবর বল····

একটা বিরাট মোটা, ফর্সা বার্মিজ উঠে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গি ও সার্ট পায়ে শ্লীপার। সে বলে চলল—আমরা যখন পলায়ন করছিলাম তখন দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল একটা মোটরে চড়ে আমাদের ঠিক পেছনে পেছনে অনুসরণ করছিল। আমি ব্যারাকপুরের মোড়ে একটা আগুনে-বোমা ছুঁড়ে তার মোটরে আগুন ধরিয়ে দিই। সে এ যাত্রা বেঁচে গেলেও, আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি····

ঠিক এমনি সময়ে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করল একজন লোক।

বাজপাখি প্রশ্ন করল—কি সামসুল সর্দার, কি খবর ?

লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আজ্ঞে তেরো নম্বর কুঠির উপরে পুলিশ দৃষ্টি দিয়েছে !

বাজপাখি মৃদু হেসে বলল—ও, সেজন্যে কোনও দুশ্চিন্তা নেই সামসুল। এ খবর আমি আগেই জানতাম। ওখান থেকে সব কিছুই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আপাততঃ আমাদের পরবর্তী কাজের সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক্।

তারপর একটু থেমে বলল—ইনি হচ্ছেন মহামান্য চীন গভর্ণমেণ্টের প্রেরিত দূত। এর নাম ফু-চাও। আগামী ছাব্বিশে মে তারিখে ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি গুপ্ত দলিলপত্র মিলিটারীর পাহারায় চালান যাবে। আমাদের কাজ হবে সেগুলি মিলিটারীর কাছ থেকে লুঠ করে এর হাতে দেওয়া। এজন্য চীন গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ আমরা দু লক্ষ টাকা পাব।

ফু-চাও হেসে বলল—এই কাজের জন্য যে টাকা পাওয়া যাবে তার সিকি ভাগ আমার প্রাপ্য আর বাকি বারো আনাই পাবেন বাজপাখি এবং তার দলবল।

উপস্থিত সকলেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

মা-তান একটু রসিকতা করে বলে উঠল—আমার ভাগে কত পড়বে মিঃ বাজপাখি ?

বাজপাখি হেসে বলল—দেড় লক্ষ টাকা। পঞ্চাশ হাজার আমি—আর বাকি এক লক্ষ আপনারা চারজন এবং আপনাদের দলবল—

মা-তান একটা কটাক্ষ হেসে বলল—এ কিন্তু বড় কম হয়ে গেল মিঃ বাজপাখি !

বাজপাখি বলল—এ কাজে এর বেশি পাবে না সুন্দরি, তবে তোমার জন্য আরও কয়েকটি কাজ আছে, তাতে পুষিয়ে যাবে। শোন তোমরা সে সব কাজগুলি বেশ মনোযোগ দিয়ে····

এরপর একঘণ্টা সেখানে যে আলোচনার স্রোত বয়ে গেল তা শুনলে বাইরের কোনও লোক হয়ত ভয়ে আঁতকে উঠবে। কিন্তু ওরা বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই সেগুলি আলোচনা করল। পুলিশবিভাগের পক্ষেও এ আলোচনার কথা ধারণা করা দুঃসাধ্য!

—সাত—

—বিশালগড়ের রক্তহীরা—

সকাল সাড়ে আটটা।

টেলিফোনের শব্দিত রিসিভারটা তুলে বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

—হ্যালো, কে?

—সুপ্রভাত দীপক, আমি ইনস্পেক্টর মি চ্যাটার্সন কথা বলছি।

—আরে, এত ভোরে মিঃ চ্যাটার্সন, আপনি? নিশ্চয়ই নতুন কোনও সংবাদ এবং আশা করি সেটা বাজপাখি সম্পর্কেই····

—হাঃ হাঃ হাঃ, সত্যই তুমি বড় বুদ্ধিমান দীপক! ঠিকই ধরেছ দেখছি। বিনা কারণে তোমাকে এত সকালে বিরক্ত করব না নিশ্চয়ই! কিন্তু এবার ব্যাপারটা আরও একটু গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। বিশালগড়ের মহারাজার বিখ্যাত রক্তহীরাটা চুরি গেছে গত পরশু রাতে। মহারাজের বংশানুক্রমিক বিখ্যাত এই হীরা। দাম প্রায় দুই লক্ষ টাকা। তিনি তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে আমাদের অস্থির করে তুলেছেন। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। এখন তোমার সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।····তাছাড়া শুধু

চুরির বিষয়ই নয়, মহারাজের মেজ ছেলে রমেন্দ্র দস্যুদের হাতে আহত হয়েছেন তাদের বাধা দিতে গিয়ে। তাকে ভাল চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখলেও তার অবস্থা খুব ভাল নয়····এখনও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না সে বাঁচবে কি মারা যাবে! উপর থেকেও জোর চাপ আসছে যত শীঘ্র সম্ভব এ ব্যাপারের কিনারা করবার জন্যে। এখন তুমিই যা কিছু ভরসা দীপক····

দীপক হেসে বলল—কিন্তু বাজপাখির গন্ধ এর মধ্যে পেলেন কি করে ইন্‌স্পেক্টর চ্যাটার্সন ?

মিঃ চ্যাটার্সন বললেন—ঘরের মধ্যে একটা কার্ড কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাতে রক্তবর্ণে আঁকা রয়েছে শিকারোদ্যত একটি বাজপাখির ছবি। তার ঠিক নিচে বাংলা ভাষায় লেখা ঃ

রক্তহীরাটা আমার প্রয়োজনের জন্যে নিয়ে গেলাম।

—বাজপাখি।

দীপক বলল—আর সন্দেহজনক কোনও সূত্র····

মিঃ চ্যাটার্সন বললেন—সে সব গোপন কথা ফোনে বলা চলে না। তুমি সমক্ষে এসেই শুনতে পাবে····

দীপক হেসে বলল—আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি মিঃ চ্যাটার্সন।

তারপর ফোনটা ছেড়ে দিয়ে সহকারী রতনলালের দিকে চেয়ে বলল—তৈরী হয়ে নে রতন, এক্ষুণি আবার রওনা হতে হবে।

* * *

মহানগরীর প্রান্তে টালিগঞ্জের গড়িয়া অঞ্চলে বিরাট একটা স্থান জুড়ে বিশালগড়ের মহারাজার রাজপ্রাসাদ

দোতলায় একটা মস্ত বড় হলঘর। এইটাই মহারাজের হীরা জহরত রাখবার কক্ষ। এক কোণে বিরাট লৌহ সিন্দুক—পাল্লাটা বন্ধ। এটার ভিতরেই সমস্ত হীরা-জহরত রাখা হয়। একটা তালা ঝোলান ঠিক সামনেই।

সেটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বঙ্কিমবাবু দীপকের দিকে চেয়ে বললেন —গত বুধবার রাত প্রায় দুটোর সময় দু'জন লোক এই ঘরে প্রবেশ করে এবং অদ্ভুত একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এই সামনের পাল্লাটা কেটে ফেলে। তারপর এসিড্ দিয়ে তালাটি খুলে ফেলতেও তাদের বেগ পেতে হয়নি।

সেদিন অত্যধিক গরমে মহারাজার মেজ পুত্র রমেন্দ্র ভাল ঘুমোতে পারছিল না। এ ঘরে সামান্য খটাখট্ শব্দ শুনে সে চমকে ওঠে। বুঝতে পারে যে এ ঘরে নিশ্চয়ই চোর এসেছে। বন্দুকটা নিয়ে সে লঘুপদে পাশে ঘর থেকে এ ঘরে প্রবেশ করে। সে ঢুকেই দেখতে পায় যে দস্যুদলের একজন রক্ত-হীরাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে অপর জনকে বলছে—মাল ঠিকই পাওয়া গেছে রুস্তমজী, এবার চল যাওয়া যাক্....

রমেন্দ্র সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে! ওরাও এভাবে আকস্মিক বাধা পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রমেন্দ্রের দিকে গুলিবর্ষণ করে। রমেন্দ্র আহত হয়েছে বটে—তবে ওদের মধ্যেও একজন সামান্য আহত হয়েছে রমেন্দ্রের গুলিতে! কারণ মেঝের এদিকেও এক ফোঁটা রক্তের দাগ দেখা গেছে।

দীপক হেসে বললে—সত্যি, ওদের চক্রান্ত অদ্ভুত, সুপরিকল্পিতও দুঃসাহসী। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিন্দুক খোলা! সত্যি বাজপাখি এবার ফিরে এসে যেন আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে মিঃ চ্যাটার্সন....

তারপর একটু থেমে বলল—কিন্তু মহারাজের সিন্দুক থেকে হীরাটা ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি ?

মিঃ চ্যাটার্সন বললেন—হ্যাঁ, আর কতকগুলি গহনা ইত্যাদি কিছু চুরি গেছে সত্য—তবে হীরাটার মত এত দামী নয় সেগুলো....

দীপক বলল—সেগুলোর বিবরণ দিয়ে প্রত্যেক থানায় রিপোর্ট করেছেন ত ? আর প্রত্যেক জুয়েলারী দোকানে বিষয়টা জানান....

মিঃ চ্যাটার্সন বললেন—হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে, তবে ওরা যদি গহনাগুলো গলিয়ে ফেলে সোনা বিক্রী করে....

দীপক বলল—দেখাই যাক না, একটা চান্স··· অনেক সময় ধীশক্তি-সম্পন্ন লোকেরাও তুচ্ছ ব্যাপারে মারাত্মক ভুল করে ফেলে।

মিঃ চ্যাটার্সন প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন!

———

আট

—চ্যাং-ফুর হোটেল

সেদিন সন্ধ্যার দিকে মিঃ চ্যাটার্সনের কাছ থেকে জরুরী ফোন পেয়ে দীপক সোজা চলে গেল লালবাজারে।

মিঃ চ্যাটার্সন দীপককে দেখেই হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন— তোমার ধারণাই সত্য দীপক। আজ একজন লোক মহারাজের একখানি চোরাই গহনা একটি জুয়েলারী দোকানে বিক্রী করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

দীপক বলল—তার কাছ থেকে কোনও কথা আদায় করতে পেরেছেন কি?

মিঃ চ্যাটার্সন বললেন—না। লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

দীপকের কথায় লোকটিকে মিঃ চ্যাটার্সনের কামরায় আনা হল।

দীপক লোকটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—গহনাটি তুমি কোথায় পেয়েছ সত্যি করে বল দেখি ?

লোকটি বলল—আজ্ঞে কাল বিকেলে রেস-কোর্সে একটি লোক ঘোড়দৌড়ে বহু টাকা হেরে যায়। তারপর সে পকেট থেকে ঐ গহনাটি বের করে বলে যে আমি তাকে দু'শ টাকা দিলে যে গহনাটি আমাকে দেবে। সত্যি কথা বললে কি হুজুর, ওটি দেখেই মনে হল ওর দাম নিশ্চয়ই সাত আটশো টাকার কম নয়। তাই তক্ষুণি ওকে টাকাটা দিয়ে ওটা নিয়ে নিলাম।

দীপক ধীরকণ্ঠে বলল—লোকটিকে কি তুমি দেখেছ কোনদিন এর আগে ?

লোকটি বলল—সত্যি কথা বলতে কি, ওকে আমি বার-কয়েক এর আগে···· সত্যি কথা বলতে কি····বেশির ভাগ সময়েই রেসের মাঠে। কিন্তু এর আগে কোনওদিন গহনা-টহনা বিক্রী করেনি সত্যি কথা বলতে কি···· তাই সেদিন গহনা দেখে ভাবলাম ওটা বোধ হয় ওর নিজেরই মাল। যদি জানতে পারতাম ওটা চোরাই মাল তবে কি আর কিনতাম ? ওর নাম হল গিয়ে আপনার সামসুল সত্যি কথা বলতে কি ?

দীপক এবার হেসে মোলায়েম কণ্ঠে বলল—তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম। তোমাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না, কালই তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব—যদি তুমি একটা সত্যি বথা বল। তোমার সত্যি কথা বলতে কি' শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল।

লোকটি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কি কথা স্যার····

দীপক ফিস্ ফিস্ করে লোকটির কানে কানে কি বলল—রুস্তমজীর নাম তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই ? তার সম্বন্ধে যা জান, সংক্ষেপে বলে ফেল দেখি····

লোকটি বলল—বিশেষ আর কি জানাব হুজুর, সত্যি কথা বল্‌তে কি···· আমার যাদের সাথে পরিচয় সব রেসের ব্যাপারে। তবে রুস্তমজীর নামটা

কোথায় যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। সে হল গিয়ে আপনার বাজপাখির ডান হাত। সত্যি কথা বলতে কি—বাজপাখিকে কেউ চেনে না এ পৃথিবীতে। যদি কোনও হতভাগ্য..মুখোসহীন বাজপাখিকে দেখতে পায় তক্ষুণি তাকে প্রাণ হারাতে হয়··

দীপক হেসে বলল—তা আমি জানি। তবে রুস্তমজীর নামটা কোথায় যেন শুনেছিলে বললে না? চিন্তা করে দেখ ত মনে পড়ে কি না····

লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। নামটা শুনেছিলাম আমি সামসুলের মুখেই। সেদিন চীনে গলির চ্যাং-ফুর হোটেলে রেসের 'টিপ' নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সামসুল থাকে ঐ চ্যাং-ফুর হোটেলে। সেদিন সামসুল ফোনে বলছিল—শোন রুস্তমজী, আজ তোমার সাথে দেখা করতে যেতে পারব না। আশা করি ভালই আছ তুমি। ব্যস ঐ পর্যন্তই····ঐ একবারই রুস্তমজীর নাম শুনেছি, সত্যি কথা বলতে কি····

দীপক বলল—আচ্ছা তুমি যেদিন সামসুলের কাছ থেকে মালটা কিনলে, সেদিন কি ওর দেহের কোথাও আঘাতের চিহ্ন দেখেছিলে?

লোকটি বলল—না, তা ত মনে পড়ছে না। আর আহত হলে কি আর স্ফূর্তি করে রেস খেলতে যায়, সত্যি কথা বলতে কি····।

দীপক বলল—হ্যাঁ, তাও ত বটে। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

লোকটি চলে গেলে দীপক মিঃ চ্যাটার্সনের দিকে চেয়ে বলল—সামসুল আর রুস্তমজী ছিল রাজবাড়ি লুটের সময়। সামসুল যখন আহত হয়নি তখন নিশ্চয় ক্ষতাঘাত পেয়েছে রুস্তমজী। সামসুল থাকে চ্যাং-ফুর হোটেলে। আচ্ছা চলুন মিঃ চ্যাটার্সন, চ্যাং-ফুর হোটেলে একবার হানা দেওয়া যাক। অবশ্য আপনি থাকবেন দূরে—প্রয়োজন হলে সাহায্যের জন্য। আমি আর রতন ঢুকব ঐ চক্রের মধ্যে। এখন দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।

তারপর রতনের দিকে চেয়ে বলল—তুই যাবি চীনেম্যানের ছদ্মবেশে আর বসবি অন্য টেবিলে। খাবি কফি কিংবা ঐ ধরনের কিছু। আর আমি এ্যাংলো

ইণ্ডিয়ান। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দুজনে কথা বলব না—আর বললেও হবে ইশারায়। বুঝলি?

———

—সম্ম—

—বাঘের গুহায়—

বহুবাজার অঞ্চলের চীনেপাড়ার প্রান্তে গলিখুপচির মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে একটি প্রায়ান্ধকার গলির মধ্যে জমজমে একটি হোটেল। এ অঞ্চলের লোকে এটাকে চ্যাং-ফুর হোটেল নামেই অভিহিত করে থাকে।

সন্ধ্যা সাড়ে আটটা। দোকানে জনসমাবেশ বিশেষ নেই বলেই মনে হয় বাইরে থেকে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় যে, লোকগুলি সব ঝিমিয়ে নিঃশব্দে ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্তা চালালেও তারা সংখ্যায় নেহাৎ নগণ্য নয়।

হোটেলের এককোণে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক চুপচাপ দু কাপ চা নিঃশেষ করে বয়ের বিলটা চুকিয়ে দিয়ে তার হাতে একখানা দু টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল—বকশিশ।

বয় লম্বা সেলাম ঠুকে একপাশে সরে দাঁড়াতেই বলল—তোমাদের মনিবের সাথে একটু দেখা করতে চাই··· জরুরী প্রয়োজন····

বয় তাকে বসতে বলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর মিনিট দুয়েক পরে এসে বলল—আসুন আমার সাথে···

বয়ের অনুগমন করে ভদ্রলোক উপনীত হল হোটেলের ভিতরে ছোট্ট একটি কক্ষে। একটা মিট্‌মিটে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে এককোণে। কিন্তু তাতে আঁধার দূর হচ্ছে না ভালভাবে।

একটা কৌচে বসে আছে একজন মোটা চীনেম্যান···অদ্ভুত পেশীবহুল তার দেহ, আর লম্বায় প্রায় ছয়ফুট।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক ভাবতে লাগল চীনেম্যানেরা ত সাধারণত এত মোটা আর লম্বা হয় না। তবে কি লোকটি চ্যাং-ফু নয়?

কিন্তু তার ভাবনা শেষ হবার আগেই চীনেম্যানটি বলে উঠল ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে—নমস্কার, কি প্রয়োজনে আপনার আগমন?

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল—সামসুলের জন্যে কতকগুলি জিনিস ছিল। কিন্তু সে কোন্ ঘরে থাকে তা ত জানি না। আমি পরশু বর্মা থেকে সবে কলকাতার বুকে পা দিয়েছি। আপনিই কি চ্যাং-ফু?

চীনেম্যানটি কুৎসিত হাসি ফুটিয়ে বলল—লোকে আমাকে ওই নামেই জানে বটে। কিন্তু কোন্ সামসুলের কথা তুমি বলছ?

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এ প্রশ্নে চটে উঠে বলল—কোন্ সামসুল মানে? তোমার হোটেলে ক'জন সামসুল থাকে? সামসুল মানে আমাদের সামসুল—কর্তার দলের সামসুল।

যেন একটা কথা মনে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে চ্যাং-ফু বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, তা সামসুলের জন্যে কি মাল এনেছ দেখি।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এর জন্যে প্রস্তুত ছিল। হাসিমুখে একটা

ছোট পুঁটুলি চ্যাং-ফুর হাতে দিয়ে বলে উঠল—এই মাল আছে পুরো পঞ্চাশ পাউণ্ড। দামও খুব সস্তা—সামাস্য নমুনা দেখেই বুঝতে পারবেন।

চ্যাং-ফু নিবিষ্টমনে কোকেনটুকু দেখে বলল—হ্যাঁ, মাল ত ভাল আছে বলেই মনে হচ্ছে। তা সামসুলকে সম্পূর্ণ না দিয়ে আমাকেই কিছু দাও না—

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—তাহলে ত সুবিধাই হয়। শুনেছি সামসুলের দিকে পুলিশের নজর আছে, আর ওর পাত্তা পাওয়াও মুস্কিল। তা আপনি যদি নেন ত খুব সুবিধা হয়। তবে সামসুল পুরনো বন্ধু, ওর সাথে একবার দেখা করা উচিত।

চ্যাং-ফু বলল—ও থাকে দোতলার সাত নম্বর কেবিনে। আচ্ছা কাল তাহলে দাম মিটিয়ে ফেলব⋯

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক হেসে বিদায় নিল।

চ্যাং-ফুর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বড় হলঘরে চলে এল সে। তারপর সে এক কোণে একজন চীনাম্যান বসে কফি খাচ্ছিল, তাকে কি একটা ইসারা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

পথের মোড়ে দেখা গেল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চীনেম্যানকে বলল—তুই যে কোন জায়গা থেকে চ্যাং-ফুর হোটেলে ফোন করবি। ফোনে বলবি যে রুস্তমজীর আঘাতের ক্ষতটা খারাপের দিকে চলেছে, সে এক্ষুনি একবার সামসুলের সাথে দেখা করতে চায়। বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ফোনটা রেখে দিবি।

চীনেম্যানটি চলে গেল সোজা পথে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়াম ভদ্রলোক আবার ফিরে এসে চ্যাং-ফুর হোটেলে বসে এক কাপ কোকোর অর্ডার দিল।

* * *

ক্রিং ক্রিং ক্রিং⋯

একটু পরেই ফোনটা বেজে উঠল।

হোটেলের ম্যানেজার ফোনটা ধরেই ভিতরে চলে গেল। একটু পরে একজন ঢ্যাঙ্গা কালো লোককে সঙ্গে করে ফিরে এল। তার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে, প্রচুর শক্তি তার দেহে বিদ্যমান।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক বুঝল যে, এই লোকটি সামসুল সর্দার।

সামসুল সর্দার ফোনটা ধরে চুপচাপ কি যেন কথা শুনল। তারপরেই ফোনটা নামিয়ে চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। মোড়ের মাথায় একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানবেশী দীপক ও চীনেম্যানবেশী রতন চুপচাপ আর একটা ট্যাক্সি করে পূর্বোক্ত ট্যাক্সিখানাকে অনুসরণ করে চলল।

কলকাতার বুকের উপর দিয়ে দু'টি ট্যাক্সি এগিয়ে চলল বেশ একটু নিরাপদ দূরত্ব রেখে।

—দুই—

—দুঃসাহসী অভিযান—

ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট।

জি. পি. ও-র ঠিক সামনে একটা মরিস গাড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে বসে দু'জন আরোহী আর সামনে একজন ড্রাইভার....

ঢং ঢং ঢং....

বেলা দশটা।

দ্ু'টি গাড়ি ডালহৌসী স্কোয়ার ধরে এগিয়ে চলেছে। একটি জালি দ্বারা ঘেরা আর অপরটি মিলিটারী লরী।

মিলিটারী লরীতে আটজন মিলিটারী সশস্ত্র অবস্থায় বসে আছে। ঘেরা গাড়িটা চলেছে আগে আর মিলিটারী লরীটা পেছনে।

বুম্ বুম্ বুম্....

বাতাসকে মথিত করে হাতবোমার সঘন গর্জন ছুটে গেল চারদিকে।

মিলিটারী লরী থেকে মিলিটারী কয়েকজন ছিট্কে পড়েছে চারধারে। ঠিক লরীটির উপরে মরিস গাড়ির আরোহী কেউ হাত বোমা ফেলেছে।

এমন সময় উল্টোদিক থেকে ছুটে এল একখানা শেভ্রলে গাড়ি। তার উপরে বসে আছে আটজন আরোহী।

প্রত্যেকের হাতে পিস্তল উদ্যত হয়ে রয়েছে রক্ত পিপাসায়।

মরিস গাড়ির প্রত্যেকের হাতেও উদ্যত পিস্তল।

জাল দিয়ে ঘেরা গাড়ির সাম্নে এসে ড্রাইভারের বুকের উপরে চারজন পিস্তল উঁচিয়ে ধরল।

অবশিষ্ট চারজন ছুটে গেল আহত মিলিটারীদের বাধা দিতে। দু'জন ধরাধরি করে কতকগুলি প্যাকেট মরিস গাড়ীতে তুলল।

দস্যুদের সকলে ছুটে গাড়ি লক্ষ্য করে। প্রত্যেকে গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি দু'টি ষ্টার্ট দিল। ছুটে বেরিয়ে গেল উল্কার গতিতে।

কিছুক্ষণ পরেই যখন চারিদিকে টেলিফোনযোগে প্রচারিত হল যে ডালহৌসী স্কোয়ারের বুকের উপরে প্রকাশ্য দিবালোকে ভারত গভর্ণমেণ্টের জরুরী দলিলপত্রগুলি খোয়া গিয়েছে, তখন জনসাধারণের মধ্যে বিপুল বিস্ময়ের অব্যক্ত গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল।

সবাই বলতে লাগল—এ নিশ্চয়ই বাজপাখির কাজ।

প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে খবর প্রচারিত হয়ে গেল—যে করেই হোক বাজপাখিকে ধরা চাই-ই।

বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী ও তার সহকারী রতনলাল খবরটা শুনে মৃদু হাসল মাত্র। যেন তারা আগেই জানত যে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে।

—এগার—

—পরিশেষ—

বিকেল পাঁচটা।

দীপক চ্যাটার্জীর চেম্বারে বসে আছে তার সহকারী রতনলাল আর ইন্‌স্পেক্টর মিঃ চ্যাটার্সন।

মিঃ চ্যাটার্সন জিজ্ঞাসা করলেন—উঃ, এভাবে আমরা দিনের পর দিন শুধু পশ্চাদনুসরণ করব আর বাজপাখি সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাবে, বেশিদিন এভাবে চললে আমাদের চাকরী ছেড়ে বিশ্রাম নিতে হবে। মহারাজের হীরে চুরির কিনারা হতে না হতেই ভারত গভর্ণমেণ্টের মূল্যবান দলিল চুরি—এর পেছনে যে বিরাট চক্রান্ত চলেছে তাতে এ থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুস্কিল!

রতনলাল বলল—আজ রাত্রি নটায় আপনি প্রস্তুত থাকবেন মিঃ চ্যাটার্সন। সত্যি বলতে কি রুস্তমজী, শাহজাদা ইত্যাদির খোঁজ আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি। কিন্তু ওদের ধরলে বাজপাখি সাবধান হয়ে যাবে, সেই ভয়ে ওদের আমরা ধরিনি।

কিন্তু এখন না ধরলে সম্মান রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে!

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল একজন উন্মাদ শ্রেণীর চীনেম্যান-বেশী লোক।

তাকে দেখেই চ্যাটার্সন চমকে উঠতেই সে হেসে বলল—ভয় পাবেন না মিঃ চ্যাটার্সন—আমি দীপক। আপনাদের সম্মান রক্ষার কোনও ভয় নাই। শুধু আজ সন্ধ্যা আটটায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে আপনি হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করবেন। আপনাদের দেহে থাকবে সাধারণ যাত্রীর পোষাক কিন্তু প্রত্যেকেই থাকবেন সশস্ত্র। বাজপাখি দলবল নিয়ে আজ পালাচ্ছে মিঃ চ্যাটার্সন। আমি শেষ মুহূর্তে ওকে ধরে ওকে শেষ কিস্তিতে মাত্ করতে চাই।

মিঃ চ্যাটার্সন নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

* * *

ঢং ঢং ঢং····

রাত ন'টা।

হাওড়া ষ্টেশনে আট নং প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে একখানি এক্সপ্রেস ট্রেন।

আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে ট্রেনটির প্লাটফর্ম ছাড়তে। ওয়ার্নিং ঘণ্টা পড়ে গেছে।

একটি থুনখুনে বুড়ী একটি লাঠি ভর দিয়ে গেট দিয়ে ঢুকল। একজন টিকিট চেকার টিকিটটা দেখেই তাকে ছেড়ে দিল····

—মাথার উপর হাত তোল বাজপাখি···একটুও চালাকি করলে মৃত্যু অনিবার্য।

দীপক চ্যাটার্জী নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দিল। ছুটে এল চ্যাটার্সন, ছুটে এল রতনলাল। বাজপাখিকে ঘিরে ফেলল পুলিশ ফৌজ।

দীপক হাসতে হাসতে বলল—এই যে মিঃ চ্যাটার্সন আমাদের বাজপাখি ওরফে হোয়েল পরিচালক চ্যাং-ফু—ছদ্মবেশ ধরতে এর জুড়ি সারা ভারতে আর একটিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ!

তারপর বলল—ওই সেকেণ্ড ক্লাস কামরা দুটো ঘিরে ফেলুন। ওতে যারা আছে সবাই ছদ্মবেশী বাজপাখির অনুচর—রুস্তমজী, হোয়াংলি,

সামসুল। এমন কি ওই যে বাঙালী ভদ্রমহিলা দেখছেন—উনিও বাঙ্গালী নন। উনি বার্মিজ, নাম মা-তান্।

দু'টি কামরাই ঘিরে ফেলা হল।

সমস্ত লোককে কামরা থেকে টেনে নামাল হল। একটি বড় সুটকেশে গোপন দলিলগুলিও পাওয়া গেল।

একটি ছোট্ট ট্রাঙ্কে একটি চীনেমাটির বুদ্ধমূর্তি বের হল। সেটি আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল বিশালগড়ের মহারাজা অপহৃত রক্তহীরা।

অপরাধীদের পুলিস বেষ্টনীর মধ্যে করে পুলিশ লরীতে তোলা হল।

বাজপাখিকে একটি গাড়িতে বসিয়ে তার দু'দিকে দু'জন মিলিটারী বন্দুক উঁচিয়ে বসে রইল।

গাড়ি দু'টি যখন লালবাজারের দিকে রওনা হল রাত তখন দশটা।

* * *

পরদিন ভোরে মিঃ চ্যাটার্জি দীপককে ফোন্ করে জানালেন যে গতকাল রাত্রে বাজপাখি কারারক্ষীকে অদ্ভুত কৌশলে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেছে। তিনি শীঘ্রই সাক্ষাৎ করে দীপককে সমস্ত জানাবেন।

অবশিষ্ট বন্দীদের আদালতের বিচারে কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল সে খবর আমরা জানি।

শেষ

এর পরের ঘটনা জানতে হলে 'বাজপাখির রক্তলীলা" পড়ুন।

কালনাগিনী

—স্বপনকুমার—

হট্টগোলের মধ্য দিয়ে দীপকের ঘুম ভাঙ্‌ল।

—কি ব্যাপার? এত সকালে এ ধরনের গোলমাল কিসের? ঘুম থেকে উঠে বসে আপনমনেই চিন্তা করে দীপক।

দিনকয়েকের জন্যে দীপক বেড়াতে এসেছিল কলকাতার বাইরে।

কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে না হলেও বেশ একটা শান্ত স্থৈর্য আছে এ অঞ্চলটায়।

এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল ওরা দু'জন—দীপক আর রতন। কর্মক্লান্ত কলকাতায় থাকতে ওদের আর ভাল লাগছিল না বলেই এই অজ্ঞাতবাস।

কিন্তু ভগবান ওদের ভাগ্যে কোনও দিন সুখ লেখেননি। তাঁর ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই এখানে পদার্পণের পরেই দীপককে নতুন এক ঘটনাসংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হল।

অঞ্চলটা একটা গণ্ডগ্রামের মতই। থানা থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। তাই কিছুটা চোর-ডাকাতের উপদ্রব লেগেই থাকে।

কিন্তু এবার ঘটনা আরও মারাত্মক। মানুষ-খুন! দীপকের বন্ধুর বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতেই এক ভদ্রলোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার গলায় বিরাট একটা ক্ষতচিহ্ন দিয়ে রক্ত গড়িয়ে মেঝে

ভিজে গেছে। দেখেই বোঝা যায় যে রক্তপাতে লোকটার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কেন যে এই রক্তপাত সংঘটিত হয়েছে তা বোঝা যায়নি।

লোকটা এ অঞ্চলে গরীব বলেই খ্যাত। এ ধরণের একটা গরীব লোককে হঠাৎ বিনা প্রয়োজনে কে হত্যা করল তাও চিন্তার বিষয়।

দীপকের বন্ধু প্রিয়তোষ দীপককে ঘুম থেকে ডেকে তুলল।

—হ্যাঁরে, এত সকালে তোর সাথে কি আমাকে আবার সেই বিটকেল খুনের জায়গায় যেতে হবে নাকি? দীপক হেসে প্রশ্ন করে।

—যখন তোর মতো গোয়েন্দা এই অজ গ্রামে পা দিয়েছে তখন না গিয়ে আর উপায় কি বল? হেসে বলে পরিতোষ।

অগত্যা দীপক হাতমুখ ধুয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেয়। রতনও দীপককে অনুগমন করতে প্রস্তুত হয়ে বেশভূষা পাল্টে নেয়।

* * *

খুনের বাড়িতে পা দেবার আগেই দীপক হঠাৎ দরজার উল্টোদিকে চল্‌তে থাকে।

—হ্যাঁরে ওধারে কোথায় চলেছিস্? পরিতোষ প্রশ্ন করে।

দীপক হেসে বলে—বাড়ির ভিতরে শুধু লাস আসে, আর এদিকে আছে প্রকৃত খুনী। চল্ দেখি। দীপকের স্বরে গাম্ভীর্য।

রতন দীপকের এ ধরণের খেয়ালের সাথে সুপরিচিত। সে আপত্তি করে না। পায়ে পায়ে এগোয় ওরা সকলে। একটা সরু পায়ে চলার পথ। চার পাশে ঝোপঝাড় বনবাদাড়। খানিকটা এগিয়ে এক্স্থানে এসে থম্‌কে দাঁড়ায় দীপক। সেখানে কাদার উপরে অনেকগুলি পায়ের দাগ। মাটিতে ধস্তাধস্তির দাগ। কয়েক ফোটা রক্তের দাগও মাটির উপরে।

রতন ও পরিতোষ চমকে ওঠে। বলে—তুই কি করে জানলি দীপক এখানে এ ধরনের একটা কিছু আছে?

দীপক হেসে বলে—সে এমন কিছু কঠিন নয়। তোরা বোধ হয় দেখিসনি বাড়ির সামনে এক জায়গায় শুকনো মাটির উপরে খানিকটা চুন-সুরকি পড়েছিল। একটা জুতোর দাগের মতো। তারপর এদিকে ছিল আরও দু একটা এ ধরনের দাগ। বাকিটা আন্দাজ বলতে পারিস্।

ঝোপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল একটা লম্বা গুপ্তির মতো অস্ত্র। তার আগায় রক্ত মাখানো।

দীপক হেসে বলল—এই অস্ত্রটা দিয়ে বোধ হয় খুন করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাক্, চল্, এবার বাড়ির ভিতরে যাওয়া যাক্।

* * *

সদাশিববাবুর ভাই হরিদাসবাবু বেশ অমায়িক লোক। দীপককে গোয়েন্দা শুনে তিনি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বললেন—বাঃ, বেশ ভালই হল দেখছি। আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনার মত বিখ্যাত গোয়েন্দার পদার্পণ····

—সদাশিববাবু এ অঞ্চলে বেশ ভাল লোক বলেই পরিচিত ছিলেন। পরিতোষ হেসে বলল। কিন্তু কে তাকে এ ধরনের নৃশংসভাবে হত্যা করল? আশ্চর্য!

দীপকের দৃষ্টি কিন্তু ওসব কথার দিকে ছিল না। ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে কি যেন দেখছিল।

মিনিট কয়েক পরে প্রশ্ন করল—আপনাদের বাড়ির সকলের সাথে কি একবার দেখা করতে পারি হরিদাসবাবু?

হরিদাসবাবু হেসে বললেন—নিশ্চয়ই! এর মধ্যে আর আপত্তির কি থাকতে পারে বলুন?

মৃতদেহ থানায় পাচার হবার আগে দীপক সে ঘরটা একবার বেশ ভাল করে ঘুরে দেখে এল।

তারপর একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করে হরিদাসবাবুকে বলল— আপনার বাড়িতে কতজন স্ত্রীলোক আছেন বলতে পারেন?

হরিদাসবাবু বললেন—দাদা অবিবাহিত ছিলেন! স্ত্রীলোক বলতে আমার স্ত্রী বাড়ির বুড়ী ঝি আর····

দীপক ধমক দিয়ে বলল—আর একজনের কথা চেপে যাবেন না হরিদাসবাবু! আমরা গোয়েন্দা লোক। আমাদের কিছুই জানতে বাকি থাকে না, একথাটা আশা করি ভুলে যাবেন না।

হরিদাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, মৃত্যুর কিছু আগে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তিনি একজন নারীর প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার নাম করবী গুপ্তা। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন।

দীপক হেসে বলল—বুঝেছি। তিনি কি এখন এ বাড়িতে আছেন?

হরিদাসবাবু বললেন—না, তিনি কয়েকদিন থেকে এখানে নেই। তবে বোধ হয় কাল তার কাছে সংবাদ গেছে। আজ তিনি আসতে পারেন।

দীপক বলল—যাক্, অন্য সকলকে পাঠিয়ে দিন।

* * * *

কিছুক্ষণ পরেই দারোগা সাহেব এসে হাজির হলেন।

তিনি শান্ত, ধীর-স্থির লোক। দীপক সকলকে জেরা করছে শুনে খুসী হলেন। লাসের ঘর আর একবার খানা-তল্লাসী করলেন। মর্গে লাসটা চালান করে দেওয়া হল। অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে দীপকের দিকে চেয়ে বললেন—না মশাই, সুবিধে হচ্ছে না। করবী গুপ্তাকে এ ব্যাপারে জড়িত বলে মনে হচ্ছে।

একটু পরেই ঘরে প্রবেশ করলেন করবী গুপ্তা। সাথে হরিদাসবাবু। তিনিই সকলের সাথে মিস্ গুপ্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে গল্প চলল। যেন বিশেষ কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব। দীপক এক ফাঁকে মিস্ গুপ্তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—কাল রাতে আপনি এবাড়িতে এসেছিলেন কেন?

থতমত খেয়ে মিস্ গুপ্তা বললেন—কই, না ত!

হেসে দীপক বলল—আপনার জুতো আর গোড়ালিতে লেগে থাকা চুন-সুরকিই তার প্রমাণ দিচ্ছে মিস্ গুপ্তা। লুকিয়ে লাভ নেই।

হরিদাসবাবুও চম্‌কে উঠলেন।

দারোগাবাবু বলে উঠলেন—এ ধরনের 'কালনাগিনীকে' এক্ষুনি গ্রেপ্তার করা উচিত দীপকবাবু। উনিই বোধ হয় খুনী।

দীপক হেসে বলল—না। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দারোগা সাহেব? এ বাড়ির সকলে বিস্ময়ে হতবাক্! কারো মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

হঠাৎ দীপক হরিদাসবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—আপনার দাদার গোপন টাকা পয়সা আর হীরে-জহরতগুলো কোথায় হরিদাসবাবু?

—সে কি?

—হ্যাঁ, মৃতদেহ যে ঘরে ছিল, সে ঘরের এক কোণে আমি একটা দামী মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি। যাওয়ার সময় ওটা বোধ হয় হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল।

হরিদাসবাবু নিরুত্তর।

দীপক আবার প্রশ্ন করল—করবী গুপ্তাকে কতদিন থেকে ভালবাসতেন আপনি? দাদার প্রেম আর সহ্য হল না, কি বলেন?

হরিদাসবাবু পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন।

কোমর থেকে রিভলবারটা বের করে দীপক হরিদাসবাবুর দিকে উঁচিয়ে রেখে

উঁচিয়ে ধরে বললেন—ও চেষ্টা করবেন না হরিদাসবাবু। বৃথা চেষ্টা। ভেবেছিলেন দাদাকে শেষ করে ধন-দৌলত নিয়ে আর করবী দেবীকে বিয়ে করে নিশ্চিন্তমনে সুখী হবেন! কিন্তু ভগবান বিরূপ। বুঝলেন হরিদাসবাবু?

হরিদাসবাবুকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হল।

করবী গুপ্তা কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়লো।

* * *

সমাপ্ত

বাজপাখীর
রক্তলীলা

বাজপাখি সিরিজ—৬ নং

বাজপাখির রক্তলীলা

শ্রীস্বপন কুমার

প্রকাশক :
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ২.৫০ টাকা

মুদ্রক :
মিনতি সরকার
মিণ্টু প্রেস
৩, জগবন্ধু মোদক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৫

বাজপাখির রক্তলীলা

—এক—

—রাঙা আলোর নিশানা—

রাত্রি।

নিকষ কালো রাত্রি। নিথর। মৌন।

আকাশে চাঁদ নেই। তারারা ভয়ে কাঁপছে। নিস্তব্ধ অরণ্য। বিরাট গাছগুলো আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে তাদের যেন ভয়ার্ত চাউনি।

শোঁ-ও-ও ···হুস্···

আকাশ একটি লাল আলোয় রাঙা হয়ে উঠলো।

কে জ্বাললো ঐ আলো? ঐ রাঙা হাউই? কে? কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর?

দুম্! দুম্! দুম্!

যেন হিংস্র শার্দুলের গর্জন। ক্ষিপ্ত হিংস্রের উন্মত্ত হুঙ্কার।

তীক্ষ্ন শব্দে নিস্তব্ধ বনের গাছপালারা কেঁপে কেঁপে উঠল।

কোথা থেকে এলো এই অদ্ভুত শব্দতরঙ্গ। কে জানে তা? সাক্ষী রইলো শুধু বনের গাছপালা আর আকাশের তারারা।

ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে কতকগুলো নিশাচর পাখি উড়ে পালাল প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে।

—কে কোথায় আছ রক্ষা কর! রক্ষা কর····রক্ষা কর····

ভেসে গেল প্রাণভয়ে ভীত এক মানুষের চীৎকার। ভেসে গেল দূরে দূরান্তরে। ছড়িয়ে পড়ল সারা বনের বুকে নিমেষের মধ্যে।

কিন্তু কে তাকে রক্ষা করবে? কে দেবে এই চীৎকারের প্রত্যুত্তর।

হাঃ হাঃ হাঃ····

ভয়ার্ত বীভৎস হাসি হেসে উঠলো কে যেন। বিদ্রূপ করে উঠলো ভয়ার্ত হাসির ঢেউ খেলিয়ে।

কে হেসে উঠল এই বীভৎস তীক্ষ্ন, হিংস্র কণ্ঠে? কে?

গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুম্!

হাসির প্রত্যুত্তরে গর্জে উঠলো বন্দুক। রিভলভার না পিস্তল? কে দেবে তার উত্তর?

কে ছুঁড়ল এই বন্দুক? কাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল? জানা গেল না তা রাত্রির অন্ধকারে।

শুধু শোনা গেল পাগল হাওয়া বয়ে চলেছে। শন্ শন্····শন্ শন্···· যেন কোন একটা বোবা উন্মাদের বুকফাটা অট্টহাসি।

—সরে যাও! ছেড়ে দাও! নইলে····

—দস্যুসর্দার বাজপাখি ওসব সামান্য হুংকারকে ভয় করে না শয়তান! তোর অন্তিম সময় আসন্ন! হাঃ হাঃ হাঃ····

—সাবধান! আর এক মুহূর্ত সময় দিচ্ছি। ছেড়ে দাও—নইলে····

কথা শেষ হল না। শোনা গেল একটা বাঘের প্রচণ্ড গর্জন। এই নিস্তব্ধ গভীর অরণ্যে কোথা থেকে ছুটে এসেছে নরমাংসলোভী বাঘটা মানুষের গন্ধ পেয়ে?

শন্ শন্! বাজপাখির হাত থেকে একটা ধারালো ছোরা ছুটে গেল। ছুটে গেল লোকটির দিকে। অন্যমনস্ক লোকটির কাঁধে এসে বিঁধে গেল।

—হাঃ হাঃ হাঃ! আবার অট্টহাসি।

—আঃ··

কানে এক আহত মানুষের করুণ অন্তিম ক্রন্দন।

বাঘটা আবার ডেকে উঠল আরও কাছে। মেতে উঠেছে নরমাংসের লোলুপ লালসায়।

শোঁ-ও-ও····দামাল হাওয়া আর এক ঝলক বয়ে গেল।

—শুভরাত্রি বন্ধু। চললাম। আবার দেখা হবে। এবার প্রত্যেকটি মানুষের বুকে হিংস্র ছুরি বেঁধাবার আগে বাজপাখি..এমনি লাল আলোর নিশানা জ্বালবে। ওড়াবে লাল হাউই। আকাশ রাঙা হয়ে উঠবে। আর রাঙা হয়ে উঠবে পৃথিবী। মানুষের বুকের তাজা লাল রক্তে। রক্তপাত করবার আগে বাজপাখি ঘোষণা করবে। জানাবে পৃথিবীর মানুষকে যে সে করছে কোনও এক হিংস্র নরহত্যা। যার ক্ষমতা আছে বাজপাখিকে বাধা দেবে। সামান্য বাধায় বাজপাখি ভয় পায় না।

—আচ্ছা চলি বন্ধু বিদায়····

পদশব্দ মিলিয়ে গেল।

বাতাস আর এক ঝলক বয়ে গেল—শোঁ-ও-ও····

—দুই—

—আবার চক্রান্ত—

সেদিন সকালে শহরের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে এক নতুন খবর প্রকাশিত হয়েছে সারা মহানগরীতে আলোড়ন পড়ে গেছে সেই ছোট্ট খবরটিকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকের একমাত্র প্রশ্ন এ নারকীয় হত্যালীলার নায়ক কে?

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীও সেদিন সকালে চায়ের কাপটা সামনে নিয়ে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে এই কথাটাই ভাবছিল।

কাগজে বড় বড় হরফে শিরোনামা প্রকাশিত হয়েছে :

মোহনপুরের জঙ্গলে আবার নরহত্যা !

আকাশের বুকে লাল রঙের হাউই বাজী !!

মহানগরী এবং সহরতলীর সর্বত্র

বিপুল আতঙ্ক !!!

গত পরশু রাত্রে মোহনপুরের জঙ্গলে এক বীভৎস নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে। রাত প্রায় দুটো। হঠাৎ দেখা গেল আকাশের বুকে জ্বলে উঠ্‌লো একটা লাল রঙের হাউইবাজী! তারপর পর পর তিনবার বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ করে একটা ভয়ার্ত শব্দ উঠলো। তারপর কে যেন চীৎকার করে উঠলো—রক্ষা কর····

মোহনপুরের জঙ্গলের আশে পাশে যেসব অধিবাসীরা বাস করে তারা কেউ ভয়ে বের হয়নি। এই ব্যাপারটাকে তারা কোনও ভৌতিক উপদ্রব বলে মনে করেছে। কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের মোতায়েন করা পুলিশ হরদেও সিং ছুটে যায়। প্রথমটা আততায়ীর রিভলভারের শব্দে ভয় পেলেও পরে ভয় ত্যাগ করে এগিয়ে যায় সে। কিন্তু আততায়ীর ছোরার আঘাতে সে আহত হয়।

আততায়ী একজন অচেনা ব্যক্তিকে খুন করেছে বীভৎসভাবে। তার সারা মুখ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে যে তাকে দেখে আর ভাল করে চেনা যায় না। নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার জন্য পুলিশ মর্গে পাঠান হয়েছে।

আততায়ীর মুখ মুখোস-ঢাকা ছিল! আর রাতের গভীর আঁধার। হরদেও সিং আততায়ীকে চেনবার চেষ্টা করেও পারেনি। কিন্তু আততায়ী নিজেকে দস্যু 'বাজপাখি'* বলে পরিচয় দিয়েছে।

বাজপাখি বলেছে যে এর পর সে নিজেকে আর গোপন রাখবে

---

* বাজপাখি সম্বন্ধে এর আগে প্রকাশিত 'মৃত্যুচক্রে বাজপাখি', 'বাজপাখির পুনরভিযান' পড়ুন।

না। সর্বত্র হত্যা করার আগে আকাশের বুকে উড়িয়ে দেবে আলোর রাঙা নিশান। বাজপাখিকে এর আগেও অজস্র বার চেষ্টা করেও গ্রেপ্তার করা যায়নি। আমাদের প্রশ্ন এই যে, পুলিশ বিভাগের কর্মক্ষমতা কি এতই কমে গেছে যে, বাজপাখির মত একজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না?

আমাদের অপর প্রশ্ন গোয়েন্দা এবং ভারত বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছে। তিনি এর আগে বাজপাখিকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ত কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু বাজপাখিকে আরও অগ্রসর হবার সুযোগ তিনি দিচ্ছেন কেন? এতে সাধারণ মানুষ যে কি ভয় ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে তা কি তিনি জানেন না?

* * *

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রতনলাল।

দীপক হেসে খবরের কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—এই দ্যাখ, এরা আমাদের জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে আর কি? উঃ, আর কতদিন ধরে এমনি করে বাজপাখির সাথে সংগ্রাম করতে হবে কে জানে তা?

রতন খবরের কাগজের অংশটা পড়ে শেষ করে বলল—কিন্তু হঠাৎ মোহনপুরের জঙ্গলে বাজপাখি হানা দিল কেন রে? আমি ত এর কোনও সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

দীপক হেসে বলল—বাজপাখি বিনা হিসেবে কোনও কাজ করে না বন্ধু। বিনা উদ্দেশ্যে এক পাও এগোয় না। একথা সত্যি যে বাজপাখির কোনও একটা উদ্দেশ্য আছেই। তবে তা কি, আপাততঃ বুঝতে পারছি না।

রতন বলল—একটা কাজ করলে হয় না? মোহনপুরের সমস্ত

জঙ্গলটা বিরাট একটা পুলিশবাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে বাজপাখিকে খুঁজে বের করলে কেমন হয় ?

দীপক হেসে বলল—তুই কি বাজপাখির কায়দা-কানুন জানিস্ না ? সবই ত দেখেছিস্। একবার যদি বুঝতে পারে যে আমরা এতটুকুও এগিয়েছি, ওরা এমনভাবে গা ঢাকা দেবে যে, সারা জীবন খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

রতন বলল—তবে কি করতে চাস্ তুই ?

দীপক বলল—আমাদের এগোতে হবে ধীরে ধীরে। প্রত্যেকটি পা ফেল্‌তে হবে হিসেব করে। একটুকু গন্ধও যাতে ওরা আঁচ করতে না পারে। তুই কি মনে করিস্ বাজপাখি আমাদের উপরে নজর রাখে নি ?

রতন বলল—কি করে নজর রাখবে রে ? ও টের পাবে কেমন করে যে আমরা পুরনো বাড়ি পাল্‌টে নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি ?

দীপক হেসে উঠল!

প্রচণ্ড অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ!

ভেঙে ভেঙে পড়ল যেই হাসির গভীর আবেগ। অহেতুক উত্তেজনায়। তারপর সোজা হয়ে উঠে বসল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে তুলে নিল রিভলভারটা। রতনেরর কাঁধের উপর দিয়ে জানালার দিকে উঁচিয়ে বলে উঠল—এই, খবরদার এক পা নড়লেও আর রক্ষা নেই তোমার।

রতন সেদিকে চেয়ে দেখল জানালার পাশ থেকে সাঁ করে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল যেন।

দীপক একটা বড় লাফে টেবিলটা ডিঙিয়ে পার হয়ে জানালার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল।

কিন্তু কালো মূর্তি ততক্ষণে একটা ছোট মটরে চড়ে ষ্টার্ট দিয়েছে।....

—তিন—

—নতুন চিঠির রহস্য—

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে রতন বলল—আশ্চর্য !

দীপক হেসে বলল—আশ্চর্য কিছুই নয় রে। আমি এই ধরনের একটা কিছুর জন্যেই প্রস্তুত ছিলাম।

রতন বলল—কেন ?

দীপক হেসে বলল—বাজপাখির ধরণ-ধারণ সবই আমার নয়নাগ্রে কিনা ! ওরা যে আমাদের উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে নজর সরিয়ে নেবে না, এ প্রায় জানা কথা।

রতন বলল—তুই কি বলতে চাস্ এই লোকটা ছাড়াও অন্য কেউ আমাদের উপর দৃষ্টি রেখেছে ?

দীপক হেসে বলল—নির্ঘাৎ ! হয়ত বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখবি আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে।

রতন বলল—তবে চুপচাপ বসে আছিস্ কেন !

দীপক বলল—ওসব চুনো-পুঁটির দিকে নজর ফেলে লাভ কি বল ? ওরা ত সর্দারের হুকুম মেনে চলে মাত্র। ওদের ধরলে বাজপাখির কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। উলটে বাজপাখি সাবধান হয়ে যাবে। তার পাত্তা পাওয়া সম্ভব হবে না আর।

তারপর হঠাৎ থেমে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—কিন্তু ওকি ? ওটা কি পড়ে আছে ওখানে ?

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো।

জানালার ঠিক বাইরে পড়ে আছে একখানা নীল রঙের কাগজ। বেশ ভাল করে ভাঁজ করা।

দীপক কৌতূহলী হয়ে ভাঁজটা খুলে ফেলল !

ছোট একটা চিঠি।

উপরে একটা বাজপাখি আঁকা আছে। বিরাট একটা বাজপাখি যেন শিকারের প্রত্যাশায় ওৎ পেতে রয়েছে!

নীচে লেখা—

প্রিয় গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী,

আমার অনুচর মারফৎ আমার এই চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন আমি তোমার থেকে মাত্র তিনশো হাত দূরে কোনও একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে নির্বিবাদে পলায়ন করব।

আজীবন তুমি আমার সাথে সংগ্রাম করেছ। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাকে ধরে আটকে রাখা ত দূরের কথা আমার টিকির সন্ধান পর্যন্ত পাওনি। কি হবে আর মিথ্যা চেষ্টা করে? তাই আমি বলছি, মিছামিছি আমার পিছনে কানা ঘোড়ার মত দৌড়ান বন্ধ কর। চুপচাপ ঘরে বসে থাক এখন যেমন আছ। তোমার মত বোকা 'গোয়েন্দাকে যে আমি এতটুকুও ভয় করি না তা তুমি জান। কোনও দিন পাবও না। যদি ইচ্ছা হয় যদি প্রাণের ভয় না থাকে যতবার ইচ্ছা ছুটোছুটি কর। আমি এক ফোঁটাও ভয় পাব না তাতে।

হাঁ, আর একটা কথা! তোমাদের বোকা পুলিশবাহিনীকে জানিয়ে দিও যে, মাত্র তিনদিন পরে আমি কলকাতার কোনও এক বিখ্যাত ধনীর একমাত্র পুত্রকে অপহরণ করবো এবং সেই বোকা বড় লোকটার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় না করে তাকে ছেড়ে দেব না। সাধ্য থাকে বাধা দিও তোমরা।

চিঠি এখানেই শেষ করছি।

তোমার বহু পুরণো বন্ধু,
'বাজপাখি'

চার

—বাজপাখির আরও কীর্তি—

গুড়ুম ! গুড়ুম ! গুম্ !

রিভলভারের গর্জনে দীপক ও রতনের চমক ভাঙল।

দুজনেই একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ছুটলো শব্দ লক্ষ্য করে। কিন্তু বেশি দূর এগোতে হ'ল না। কয়েক শ' গজ দূরেই দি গ্রেট সাউদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ'র সামনে থেকে একটা কালো মোটর তীব্রবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বহুদূর থেকে তিন চারজন পুলিশ কনেষ্টবল ছুটে এল। কিন্তু কাছে এসেও বিশেষ কিছু করবার ছিল না। আততায়ী অদৃশ্য !

দু' একজন গাড়িটার নম্বর লিখে রাখল।

দীপক হেসে বলল—আচ্ছা বোকা বটে ! ওরা কি আর মোটর গাড়ীর নম্বর না পাল্টেই এসেছিল নাকি ? বাজপাখিকে এখনও চেনেনি ত ওরা !

ব্যাঙ্কের উপরে উঠে গেল দীপক এবং রতন ! কিন্তু এগিয়ে যা চোখে পড়ল তা ভয়ানক ও বীভৎস। ব্যাঙ্কের দ্বার-রক্ষী হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে। কর্মচারীদের অবস্থাও তথৈবচ ! একজন সামান্য আহত হয়েছে বন্দুকের গুলীতে।

সমস্ত টাকা, পয়সা, নোট ইতস্ততঃ ছড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। তিন চারটি থলিও দস্যুদলের সাথে সাথে অন্তর্হিত হয়েছে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বাঁধন খুলে দিতেই তিনি দীপকের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মশাই, আপনি ?

দীপক পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড'টা বের করে তার দিকে তুলে ধরে বলল —ডিটেক্টিভ দীপক চ্যাটার্জী !

ম্যানেজার শুকনো মুখে হালকা হাসি টেনে এনে বললেন—কিন্তু এখন এসে আর কি হবে? কিছুই ত আর বাকী নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। সামান্য চারজন ডাকাত এসে এভাবে এতগুলো লোককে বেঁধে ফেলে কি করে যে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেল এখনও বুঝতে পারছি না আমি।

দীপক ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বলল—সামান্য চারজন ডাকাত নয় মশাই! এরাই হচ্ছে বিখ্যাত বাজপাখির দল!

চোখ দুটো বড় বড় করে শুকনো মুখে আশ্চর্যের ভাব ফুটিয়ে ম্যানেজার প্রশ্ন করল—বাজপাখি! আশ্চর্য·······

দীপক বলল—আশ্চর্যের কিছু নেই। আপনারা যেভাবে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখেছেন তাতে বাজপাখি কেন, যে কেউ এসে লুণ্ঠন করতে পারত। এমনি একজন বোকা দারোয়ানকে দিয়ে কি ব্যাঙ্ক পাহারা দেওয়া চলে? ও ত বন্দুক হাতে নিয়ে বসে আছে। আমার মনে হয়, চালাতেও জানে না। না হলে এমনি করে বাঁধা পড়ে! যাক্ আফশোষ করুন ততক্ষণ। আমরা যাই।

বিস্মিত ম্যানেজারকে ভাববার সময় না দিয়েই দীপক বেরিয়ে পড়ল।

* * *

ক্রিং ক্রিং ক্রিং····

ফোন তুললেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার।

—হ্যালো, কে?

—আমি পুলিশ কমিশনার মিঃ জোন্সকে চাই।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ফোন ছেড়ে দিয়ে পুলিশ কমিশনারকে ডেকে পাঠালেন তক্ষুণি।

—হ্যালো, কাকে চান?

—আপনিই কি পুলিশ কমিশনার মিঃ জোন্স?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে ত চিন্‌তে পার্‌লাম না।

—আমিই কলকাতার পুলিশ—মানে আপনাদের ত্রাসের একমাত্র কারণ। আমি দস্যুসর্দার বাজপাখি।

চম্‌কে উঠলেন পুলিশ কমিশনার—আপনি—মানে—বাজপাখি—হঠাৎ………

—হাঃ হাঃ হাঃ। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তীক্ষ্ন অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো।

—হ্যাঁ, আমি পুলিশের ভয়ের একমাত্র কারণ, ধনীত্রাস, বিখ্যাত দস্যুসর্দার বাজপাখি! হ্যাঁ শুনুন। ঠিক তিন দিনের মধ্যে আমি কলকাতার কোনও এক বিখ্যাত ধনীর একমাত্র পুত্রকে অপহরণ করব। তারপর তার কাছ থেকে একলক্ষ টাকা না নিয়ে তাকে ছেড়ে দেব না। আপনাদের পুলিশের যদি ক্ষমতা থাকে আমার এই কাজে বাধা দেবেন।

—আর একটা কথা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের উপর এবং আপনাদের বড় বড় গোয়েন্দার উপর আমার তীক্ষ্ন দৃষ্টি রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। আমি এখান থেকেই বলে দিচ্ছি যে, আপনি এখন নীল রঙের স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার গলায় স্পটলেট নেকটাই। আর কিছু শুনতে চান?

পুলিশ কমিশনার বললেন—কিন্তু আপনি কি মনে করেন আপনি কোনদিন ধরা পড়বেন না?

হেসে উঠল বাজপাখি। বলল—না, অসম্ভব। যুগ যুগ ধরে সাধনা করলেও আপনাদের পুলিশ বিভাগের সাধ্যও নেই আমাকে আটকে রাখতে পারে, মিথ্যা তর্ক করে লাভ নেই আপনারা চেষ্টা করতে ত্রুটি করবেন না। কিন্তু ভাগ্য আপনাদের বিরুদ্ধে। এর আগেও ত বহুবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমাকে ধরে রাখতে পেরেছেন কি? আপনাদের হাতে ধরা পড়েও নীল সাগরের বুকে জাহাজ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি।

আপনাদের ক্ষমতা আমার কাছে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ তা যদি জানতেন, তবে আজই পুলিশ বিভাগের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতেন। আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি।

হতভম্ব মিঃ জোন্স চুপ্‌চাপ্‌ চেয়ারে বসে পড়লেন।

—পাঁচ—

—বাজপাখির হুঙ্কার—

কল্‌কাতা থেকে মাইল দশেক দূরে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি।

একজন লোককে দেখা গেল সতর্কভাবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে বাড়িটার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে। তারপর মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে দিয়ে ঠিক পেঁচার ডাকের অনুরূপ শব্দে ডেকে উঠল।

ভেতর থেকেও তেমনি আর একটা শব্দ ভেসে এল।

লোকটা পায়ে পায়ে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল।

বাড়িটা দেখে বাইরে থেকে কারও সন্দেহ করবার উপায় নেই যে, এর মধ্যে কেউ বাস করে। এমন ভীতি-বহুল, লোক-বিরল অঞ্চলে কেই বা থাকতে যাবে?

বাড়ির সাম্‌নের মাঠটা পার হয়েই বড় হলঘর।

ভেতরে চুন, বালি খসে খসে পড়ছে। ইঁটগুলো দাঁত বের করে হাস্‌ছে মিটিমিটি।

লোকটা হলঘরে পা দেবার সাথে সাথে কতকগুলি চামচিকা ও বাদুড় ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে উড়ে গেল।

সবে সন্ধ্যা নেমে আসছে। তাই ঘরটা বেশ অন্ধকার। নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু কতকগুলি ঝিঁঝি পোকা ডেকে চলেছে একটানা করুণ সুরে। নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

আকাশে মেঘ, জমাট অন্ধকার। বাইরে শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে। লোকটা একটু ভয় পেল। তবুও ধীর পায়ে এগিয়ে চলল। ঘরের ঠিক মাঝখানে বসানো আছে একটি মার্বেল পাথরের মূর্তি। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে লোকটি মনে মনে ভাবল—যাক্, এতদূর পর্যন্ত সে ঠিক এসেছে।

পাথরের মূর্তির মাথাটা ধরে সজোরে চাপ দিতেই শোনা গেল একটা ঘটাং ঘটাং শব্দ।

তারপরই লোকটি অনুভব করল যে মেঝেটার খানিকটা অংশ তাকে নিয়ে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে।

লোকটার বিস্মিত ভাবটা সম্পূর্ণ কাটবার আগেই ধপ্ করে মেঝের অংশটা এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। লোকটি অবাক হয়ে দেখল মাটির নিচে একটা ছোট ঘরে এসে প্রবেশ করেছে সে।

ঘরের মধ্যে আরও তিনজন লোক চুপচাপ বসেছিল। চতুর্থ লোকটাকে দেখে তারা ইঙ্গিতে অভ্যর্থনা করে তাকে বসতে বলল।

চতুর্থ লোকটি বসতেই শোনা গেল একটা সুস্পষ্ট শব্দ। কে যেন চীৎকার করে কিছু বলছে। গম্ গম্ করছে স্বরটা মাইক্রোস্কোপের মত।

শোনা গেল স্বরটি বলছে—যাক্, তোমরা চারজনই এসেছ দেখে খুসী হলাম আমি। তোমরা অক্ষরে অক্ষরে আমার উপদেশ মেনে চলেছ। তোমাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সেজন্যে। এই নাও।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ঠিক মাঝখানে চারটি নোটের তোড়া এসে পড়ল ধপ্ করে। যেন আকাশ ফুঁড়ে আবির্ভূত হল সেগুলি।

শোনা গেল স্বরটি বলছে—দস্যু বাজপাখিকে তোমরা জান। জীবনে প্রত্যেকদিন সে তার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কিন্তু সাবধান, তাকে যেন কখনো ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। এটাও জেনে রাখ যে, বিশ্বাসঘাতককে আমি মাত্র একটি শাস্তি দিই। আর, তা হচ্ছে মৃত্যু!

আধো আলো, আধো-অন্ধকারে দেখা গেল যে ঘরের মধ্যে উপস্থিত চারজন লোকই বিস্ময়ে বিমূঢ়—স্তব্ধ ভয়ে ফ্যাকাশে মুহ্যমান!

—এবারে তোমাদের উপরে যে সব কাজের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করছি তা বেশ মনোযোগের সঙ্গে শুনে রাখ। দায়িত্ব শুধু নয়—আমি চাই প্রত্যেকটি কাজ যাতে সুসম্পন্ন হয়।

শোনো রহমত খাঁ, তোমার উপরে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে বন্দী করবার দায়িত্ব অর্পণ করলাম। যে কোনও দিন এবং যেখানে খুসী, তাঁকে বন্দী করা চাই-ই।

শ্যামসুন্দর সর্দার থাকবে নতুন ব্যাঙ্ক দি গ্লোরিয়াস্ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর কাজে। তোমাকে কি কি করতে হবে তা একটু পরে বলছি।

বাকী দুজন যাবে পরশু আমার সাথে বিখ্যাত ধনী রায় বাহাদুর এন মুখার্জীর একমাত্র ছেলেকে চুরি করে আনতে। তাকে এনে রাখা হবে মোহনপুরের জঙ্গলের তেরো নম্বর-কুঠিতে। মোহনপুরের জঙ্গলের গুপ্তধনের সন্ধানও ওই সময় করা হবে। যার জন্যে ক'দিন আগে গুর্জর সিংকে খুন করা হলো।

আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন কাজ বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছ। তাই আমার আর কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই।

আচ্ছা বন্ধুগণ, শুভরাত্রি।

—ছয়—

— দীপক-রতন কথা—

সেদিন বৈকাল।

দীপক চ্যাটার্জী সারাদিনের অজস্র খাটুনীর পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে বিশ্রাম করছিল।

চাকর এসে খানিকটা খাবার তার সাম্‌নে রাখল।

সেগুলি খেতে খেতে চিন্তা করছিল দীপক।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করল রতনলাল। মুখটা গম্ভীর। খানিকটা ব্যস্ত ভাব।

—কি খবর রে? হঠাৎ এভাবে হন্তদন্ত অবস্থায়?

রতন মৃদু হাসল। দীপকের দিকে চেয়ে বলল—সাধে কি আর এত ব্যস্ত অবস্থায়? ওদিকে খবর বড় অদ্ভুত। একটা নতুন সূত্র এসে পড়েছে হাতে।

—কি সূত্র? দীপক আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—তুই জানিস্, এর মধ্যে বাজপাখি পুলিশ কমিশনারকে ফোন করেছিল।

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—সে বলেছিল যে, সে সহরের কোনও এক ধনীর একমাত্র পুত্রকে অপহরণ করবে।

—হ্যাঁ, তাও জানি আমি।

—সেই ধনী কে জানিস্?

—না।

—শোন তবে।

—আজ বিকেলে হোটেল স্যাভয় তে তুই যে লোকটির কথা বলেছিলি, তাকে অনুসরণ করেছিলাম।

—তারপর ?

—তারপর সেই লোকটির সাথে আর একজন লোকও এসে জুটল ওই হোটেলটিতে। তার সামনের দুটো দাঁত আধভাঙ্গা। ওই লোকটা পুরোন দাগী আসামী। ওকে আমি আগে দু' একটা খারাপ জায়গায় দেখেছি।

—ভাল কথা। তোকে কি ওরা চিনতে পেরেছিল ?

—পাগল! আমার তখন কাবুলীর ছদ্মবেশ। আমি ওদের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে বসে একমনে মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিলাম। ওদের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে, ওরা বাজপাখির দল। ওদের হাবভাব আর দু' একবার বাজপাখির নাম উচ্চারণ করতে দেখেই আমার সন্দেহ হলো এই বিষয়ে! আমি ওদের দিকে মনোযোগ অর্পণ করলাম।

তারপর একটু থেমে রতন বলে চলল—আধঘণ্টা ওরা কথা বলে চলল। তারপর এক সময় গল্প করতে করতে উঠে চলে গেল।

এই সময় দেখলাম একখানা চিঠি ওদের একজনের পকেট থেকে ছিটকে পড়েছে। আমি আনমনা দেখে এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিলাম।

সেই চিঠিটায় লেখা আছে ঃ

—প্রিয় যৌঠন হরপ্রসাদ।

তোমাদের দুজনকে কাল রায়বাহাদুর এন্ মুখার্জীর ছেলের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে আড্ডায় এসে পেঁছিবে আশা করি। ইতি—

বাজপাখি।

দীপক বলল—ও, বাজপাখির শিকার তাহলে রায়বাহাদুর এন্‌ মুখার্জীর ছেলে ?

রতন হেসে বলল—হ্যাঁ। আমি মনে করছি পুলিশকে এ বিষয়ে জানাব না কিছু।

দীপক বলল—নিশ্চয়। আমাদের নিজেদেরই এগুতে হবে ওদের বিরুদ্ধে। পুলিশের সাহায্য পরে। কাল তুই রায়বাহাদুর এন্‌ মুখার্জীর বাড়িতে পাহারা দিবি।

রতন বলল—আচ্ছা।

—সাত—

—খুন-ডাকাতি-গুম—

বর্ষণক্লান্ত কল্‌কাতার বুকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

পথে শুধু জল আর কাদা। মাঝে মাঝে কাদা ছিটিয়ে ট্রাম বাস দু'চারটে যাতায়াত করছে। রিক্সারা ঠুং-ঠাং শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে খদ্দেরের আশায়।

সেণ্ট্রাল এভিনিউর ওপরে বিরাট চারতলা বাড়িটা।

ওপরের ঘরগুলিতে আলো জ্বলছে। নিচের ঘরগুলি সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

একটা কালো মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়িটার ঠিক সাম্‌নে।

গাড়ি থেকে নামল চারজন লোক। প্রত্যেকের পরনে দামি স্যুট্, নেকটাই আর জুতো। মাথায় ফেল্ট হ্যাট বা অন্য ধরনের টুপি।

দারোয়ান নেপালী। লম্বা সেলাম ঠুকে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল—কিস্‌কো চাহিয়ে সাব্‌ ?

একজন স্যুটধারী বলল—রায়বাহাদুর মিঃ মুখার্জীকে।

দারোয়ান বলল—তিনি উপরে আছেন। আচ্ছা, আপনারা এধারের ঘরে বসুন।

কিন্তু তাকে আর বেশি দূর এগোতে হল না। হঠাৎ পেছন থেকে একজন সজোরে আঘাত করল লোকটির মাথায়। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সে। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

তিনজনে ধরাধরি করে ওকে বেঁধে ফেলল। হাত, পা, মুখ বেশ ভাল করে বেঁধে ফেলে একজন ছুটে গিয়ে কলিং বেল টিপে দিল। অন্য দু'জন আহত লোকটাকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে রেখে এলো।

কলিং বেল টিপতেই একজন উর্দি পরা বেয়ারা ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।

ক্ষ্যাপা বাঘের মত তিনজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপরে। সামান্য শব্দ করবার আগেই এদের মিলিত আক্রমণে বন্দী হল লোকটি। তারও হাত পা বেশ ভালভাবে বেঁধে চারজনে একসঙ্গে এগিয়ে চলল বাড়ীর মধ্যে।

একসঙ্গে এতগুলো লোকের পায়ের শব্দ উপর থেকে টের পেয়ে মিঃ মুখার্জী তৎক্ষণাৎ পুলিশে ফোন করবার জন্য রিসিভারটা তুললেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! টেলিফোনের তার অনেক আগেই কাটা হয়ে গেছে।

সমস্ত বাড়িটার উপর দিয়ে বয়ে গেল একটা তীব্র অত্যাচারের ঢেউ।

হৈ-চৈ, চ্যাঁচামেচি, হুল্লোড়।

ধস্তাধস্তির শব্দ। চীৎকার আর কোলাহল।

একটা বড় সিন্দুক ভাঙবার শব্দ শোনা গেল। একটা ভয়ার্ত শিশু কোথা থেকে চীৎকার করে উঠল।

ভেসে উঠল একটা আতঙ্কসূচক তীক্ষ্ন আর্তনাদ।

আধ ঘণ্টা পরে যখন চারজনেই মোটরে উঠে ষ্টার্ট দিল, তখন

দেখা গেল তাদের সাথে একটি অজ্ঞান শিশু আর টাকা ও অলঙ্কার বোঝাই দুটি থলি।

বাড়িটায় পড়ে রইলো শুধু কয়েকজন আহত ও ভয়ার্ত নরনারী আর জিনিসপত্রগুলি লণ্ডভণ্ড অবস্থায়।

মোটরটা অদৃশ্য হবার আগেই দেখা গেল মোড়ের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা পাগলটা হঠাৎ মৃদু হাসল! এতক্ষণ ও শুধু কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া, ডাবের খোসা আর কাগজের টুকরো নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছিল! এবার এগিয়ে গেল জোর পায়ে দূরের একটা ট্যাক্সির দিকে, তারপর গাড়িতে উঠবার চেষ্টা করতেই ড্রাইভার বলে উঠলো—এই উল্লুক, ভাগ্ হিঁয়াসে।

কিন্তু পাগলটা পকেট থেকে একটা চাকতি বের করে দেখাতেই লম্বা সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত যে, এই লোকটাই বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল।

গাড়িটা তীব্র বেগে এগিয়ে চলল দূরের কালো গাড়িটার পিছনে পিছনে।

—আট—

—মৃত্যু-গুহার পথে—

নৈশ আঁধারে মহানগরীর পথ ধরে ছুটে চলেছে দুখানা মোটর গাড়ি তীব্রবেগে গতি সীমার বাঁধন না মেনে। যেন কক্ষচ্যুত উল্কা। বাঁধন-হারা কল্পনার অগ্রদূত।

প্রশস্ত রাজপথ পড়ে আছে চুপ্‌চাপ্। বাধা নেই কোথাও। অসুবিধা নেই সবচেয়ে বেশি জোরে চালাতে।

মোড়ের মাথায় বীটের কনেষ্টবল হাত তুলল প্রথম গাড়িখানাকে থামাবার জন্য। কিন্তু কে কার কথা শোনে? এতটুকুও কমল না গাড়ির গতি। ভয় পেয়ে কনেষ্টবলটি একপাশে সরে গেল। তারপর গাড়ির নম্বরটা টুকে নিতে নিতে চালকের উদ্দেশ্যে গালাগালি করতে লাগল।

কিন্তু ওরা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। চলে গেছে অনেক দূরে। শুধু পেছনের আলোটা জ্বলছে মিটমিটি লাল চোখ মেলে। যেন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তার দিকে তাকাচ্ছে।

রসা রোড পেরিয়ে টালিগঞ্জের ব্রীজ ছাড়িয়ে গাড়িখানা ছুটে চলল আরও দক্ষিণের দিকে! কোন্ অনির্দ্দেশের পথে কে জানে?

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ছাড়িয়েও গাড়িখানার যখন গতি বদলো না তখন বোঝা গেল যে সে আরও অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। তার লক্ষ্য আরও দূরের কোনও স্থানে।

আরও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কেটে গেছে। সামনের গাড়ির গতি কমেনি এতটুকুও। পেছনের গাড়িখানা মাত্র হাত পঞ্চাশ-ষাট পেছনে থেকে তাকে অনুসরণ করছে।

গুড়ুম! গুড়ুম! গুম!

রাত্রিকে মথিত করে গর্জে উঠল রিভলভার সামনের গাড়ি থেকে। পেছনের গাড়িটা আকস্মিক বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই অবসরে সামনের গাড়িটা আরও অনেকদূরে এগিয়ে পড়ল।

পেছনের গাড়িখানা এবার শ' দেড়েক হাত পেছন থেকে অনুসরণ করতে সুরু করল।

একটা পথের বাঁকে এসে সামনের গাড়িখানা পেছনের গাড়িখানার চোখের বাইরে অদৃশ্য হল।

বাঁকটা ঘুরে পেছনের গাড়িটা সামনের গাড়ির আর কোনও সন্ধান পেল না।

সামনের গাড়িটা কি তবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ?

পেছনের গাড়ি থেকে একজন লোক নেমে মাটির উপরে কি যেন দেখতে লাগল ভাল করে মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

নরম মাটির উপরে গাড়ির চাকার দাগ। সামনের গাড়িখানা তবে এই পথ ধরে গেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এ পথ দুর্গম। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা পথ। এ পথ ধরে কোথায় যাওয়া যায় কে জানে ?

পেছনের গাড়ির আরোহী ভয় পাবার লোক নয়। মোটরের ড্রাইভারকে কি যেন নির্দেশ দিয়ে সোজা এগিয়ে চলল সরু পথটা দিয়ে ধীর অকম্প পদে। পায়ে হেঁটে। দেখাই যাক, এ রহস্যের শেষ কোথায় ?

বেশি দূরে এগোতে হল না তাকে। আধ মাইল পরেই দেখা গেল একটা জায়গায় বন-জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে। শুধু একটা ছোট বাড়ি। পাকাবাড়ি, মাথায় টিনের চাল। জায়গায় জায়গায় ভাঙা। অন্ধকার যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে গ্রাস করেছে বাড়িখানাকে।

বাড়িখানার চারিদিক সরু তার দিয়ে ঘেরা। সেদিকে চেয়ে লোকটি থমকে দাঁড়াল। তার খাটানোর কায়দা দেখে তার সন্দেহ হলো বোধ হয় এ তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট চলছে। এখন উপায় ? কিভাবে পরীক্ষা করা যায় ? কিম্বা পরীক্ষা না করেও কি উপায়ে অগ্রসর হওয়া যায় ?

অগ্রসর হবার আগেই বাড়িখানাকে চারদিক থেকে বেশ ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল লোকটি।

বাড়িটার পেছন দিকে গোটাকয়েক বড় বড় নারিকেল, জামরুল, পেয়ারা আর জংলা গাছের জটলা।

নিমেষের মধ্যে বুদ্ধি ঠিক করে ফেলতে লোকটির দেরী হল না।

একটা বড় জামরুল গাছে চড়ে সে অনেকটা উপরে উঠে গেল। তারপর

জোরে লাফ দিয়ে একেবারে ইলেকট্রিক তারের বেড়া পার হয়ে ওপারে গিয়ে পড়ল। এই লোকটি আর কেউ নয় দীপকের সহকারী রতনলাল।

রতনের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা। কিন্তু তখন কি আর ও জানত যে, এই বাঘের গুহা থেকে বের হওয়া কত কষ্টসাধ্য ?

—নয়—

—চক্রান্ত ও সংঘর্ষ—

বাইরে থেকে বাড়িখানাকে বনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছোট কুটীর মনে হলেও সেটা যে কতো বড় এবং কতোটা জুড়ে তার অবস্থিতি তা দেখে রতন অবাক হয়ে গেল।

খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে একটা বড়ো পোড়ো জমি। তারপরেই ঝোপে আর জঙ্গল! অনেকগুলি ছোট বড় গাছের জটলা। তারই মাঝ দিয়ে সরু পথ। দু'তিনটি পথ ভাগ হয়ে গেছে। এ যেন একটা গোলক-ধাঁধা। কোন দিক দিয়ে যে রতন এগোবে ঠিক করতে পারল না।

বাঁ-দিকের পথটা ধরে রতন এগিয়ে চলল। একবার মনে মনে ভাবল দীপককে একবার খবর পাঠালে হত। তারপর ভাবল—কি প্রয়োজন ? দীপককে ছাড়া কি সে একা তাদের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারবে না ?

সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল রতন পায়ে পায়ে। সামনে চার-পাঁচখানা ঘর। প্রত্যেকটি ঘর খোলা। কিন্তু কোন জনমানবের

সাড়া নেই, আশ্চর্য! এখানে কিছুক্ষণ আগে যে মোটরখানা এলো, তার আরোহীরা কি তবে বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি?

কিন্তু না। তখন পেছিয়ে পড়তে রাজী নয় সে। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বাঁ-পাশের ছোট ঘরটা অজস্র জিনিসপত্রে বোঝাই। একেবারে ঠাসা। জিনিসপত্রগুলি দেখলে মনে হয়, সেগুলি কোনও একটা ল্যাবরেটারীর সরঞ্জাম-পত্র। কাঁচের শিশি, বোতল, এসিড, বীকার এমনি আরো কত কি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই—সে সব সরঞ্জাম দিয়ে কাজ করবার জন্যে।

ডানদিকে বারান্দা পার হয়ে পর পর তিনখানা ঘর। প্রত্যেকখানা ঘরই বেশ বড়। সবগুলো ঘরের দরজাই খোলা। রতন সামনের বড় ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য! বিরাট ঘরটা নিস্তব্ধ, নিঝুম, কেউ কোথাও নেই। লোকগুলো সব গেল কোথায়?

কাল রায়বাহাদুর মুখার্জীর কাছে চিঠি যাবে আমার। আমার মনে হয় যে তিনি সামান্য এক লাখ টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে আমাদের হাতে দিতে আপত্তি করবেন না। আর যদি তা না করেন তাতে তাঁর যে কতো বড় অমঙ্গল হবে তাও তাঁকে জানিয়ে দেব।

হ্যাঁ, এবার তোমাদের বাকী দুজনের কাজ করবার সময় এসেছে। তোমাদের ত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু আবার বলছি। একজন যাও গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর কাছে। যে কোনও উপায়েই হোক্ না কেন আজ কিংবা কালকের মধ্যে তাঁকে বন্দী করা চাই-ই।

অন্যজনের উপরে যে ব্যাঙ্কের ভার পড়েছে, তা সে জানে। আজ রাতেই তুমি চলে যাও তোমার দলের পাঁচজনকে নিয়ে। যত টাকা আনতে পারবে তার অর্ধেক আমি তোমাদের দেব পারিশ্রমিক বাবদ।

বাজপাখিকে পুলিশবাহিনী চিনতে চেষ্টা করুক। দিকে দিকে আতঙ্কের

বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে আজ বাজপাখি প্রমাণ করবে যে সে অজেয়। সে অনড়। সে দুর্ধর্ষ।

হঠাৎ শোনা গেল একটা ক্ষিপ্ত হুঙ্কার। কে যেন ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল হিংস্র শার্দুলের মত। ঘরে উপস্থিত চারজনের দিকে চেয়ে বীরদর্পে চীৎকার করে উঠল—না, বাজপাখি অজেয় নয়। হাত তোল শয়তানের দল। তোমাদের শাস্তির পালা ঘনিয়ে এসেছে।

ঘরের মধ্যে রিভলভার উদ্যত করে দাঁড়িয়ে রতনলাল। দু'চোখে তার আগুন ঝরে পড়ছে।

—দশ—

—মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি—

সকাল সাতটা।

ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল দীপক।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং···টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলে নিল দীপক।

—হ্যালো, কে?

—ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। লালবাজার।

—কোনও নতুন খবর নাকি?

—হ্যাঁ, দি গ্লোরিয়াস সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটা বড় লরী ভর্তি টাকা, ব্যাঙ্ক নোট ও সোনা চালান যাচ্ছে। আপনার যদি সময় হয় তবে দয়া করে সেটার উপরে একটু নজর রাখবেন। এক লরী পুলিশ

অবশ্য পেছনে পাহারা থাকবে। কিন্তু তাদের উপরে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না।

—কিন্তু আপনাদের এত ভয় পাবার কারণ ?

—কারণ—খুব বেশি কিছু নয়। কিছুদিন থেকে সহরের এবং সহরতলীর উপরে বাজপাখির কি রকম অত্যাচার চলেছে তা ত আপনি জানেন। এখন কথা হচ্ছে এ ধরনের সুযোগগুলি বাজপাখি প্রায়ই নিয়ে থাকে কিনা! রায়বাহাদুর এন্ মুখার্জীর ছেলে নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ আপনি নিশ্চয় পেয়েছেন। এ বিষয়ে বহু তদন্ত করেও আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে পেঁছিুতে পারি নি।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, ওই বিষয়টার পেছনে রতন কাল ছুটে-ছিল বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেও নিখোঁজ। আমি চেষ্টা করছি তার পেছন ধাওয়া করতে। কোনও পথের রেখা এখনও পর্যন্ত নজরে পড়েনি। তবে আশা করছি এবার নিশ্চয়ই কিছুটা এগোতে সক্ষম হব।

—তা হলে আপনি রাজি ?

দীপক বলল—নিশ্চয়ই, আমি আজ ওবেলা থেকে ওদিকে নজর রাখছি—যদি কোনও পথরেখা চোখে পড়ে।

ডেপুটি কমিশনার বললেন—হ্যাঁ, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন ওদিকে! আমাদের পুলিশ বিভাগের যা দুর্নাম রটে গেছে কোথাও কান পাতা যায় না। অনেক চোর ডাকাত দেখেছি, কিন্তু এ রকম—

দীপক বলল—হ্যাঁ, বাজপাখি একজনই আছে। আর তার পরিচয় শুধু এবার নয়, এর আগেও অনেকবার পেয়েছেন। দেখা যাক্ কতদূর কি হয়! তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি ভয় পাই না।

ডেপুটি কমিশনার বললেন—ধন্যবাদ !

—এগার—

—শত্রুর সাথে পাঞ্জা—

আধো অন্ধকার ঘর।

পাশাপাশি বসে চারজন! প্রত্যেকের মুখেই একখানা করে কালো মুখোস।

ঘরের মধ্যে নিঃসীম চুপ্‌চাপ্‌!

চার জোড়া হিংস্র ক্ষুধার্ত চক্ষু একদৃষ্টে রতনের দিকে চেয়ে। যে কোনও মুহূর্তে রতনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ক্রুদ্ধ আক্রোশে।

রতনের দু'হাতে দুটো রিভলভার।

এক পা কেউ নেড়েছ কি আমার রিভলভারের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে যাবে। আমার কাছে আজ আর কোনও ক্ষমা নেই। আমি নির্দয়—আমি নিষ্ঠুর—আমি হিংস্র! কাউকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা করব না যদি সে কোনও ক্রমে পালাবার চেষ্টা করে।

চার জনে মাথার উপরে হাত তুলল।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে উঠল তীক্ষ্ণ অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ। ভেঙে ভেঙে পড়ছে হাসির আবেগ। তারপর কোথা থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর—মূর্খ! মূর্খ! তোমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে শয়তান! তাই এই বাঘের গহ্বরে পা দিয়েছ। এখান থেকে কেউ কখনও বেরোতে পারে না। এখান থেকে বাইরে যাবার পথ রুদ্ধ।

তারপর একটু থেমে বলে উঠল—আমি বাজপাখি। আমি পুলিশের ভীতি-বিহ্বলকারী, ধনীর শত্রু। তোমার মত সামান্য রতনলালের সাধ্য নেই আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে।

রতন বুঝতে পারল, সবার চোখের আড়াল থেকে মাইক্রোফোনে

কে কথা বলছে। কিন্তু কোথায় সে? কোথায় সেই শয়তান দস্যু বাজপাখি?

রতন গর্জে উঠল—যদি সাহস থাকে বেরিয়ে এস শয়তান। চোখের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বক্তৃতা দেওয়া বীরত্বের চিহ্ন নয়।

কিন্তু কে বেরিয়ে আসবে? বাজপাখির নামগন্ধও নেই! রতনের চোখের সামনে ধীরে ধীরে আলোটা নিভে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ল রতন।

গুড়ুম! গুড়ুম!

নৈশ রাত্রির আঁধার যেন কেঁপে কেঁপে উঠল পিস্তলের গুলিতে।

শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ!

কোথা থেকে একটা সজোরে আঘাত এসে পড়ল রতনের মাথার উপরে। রতনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা ভাল করে বোঝবার আগেই রতন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ওধারে তখনও কে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ!

—বারো—

—মৃত্যুচক্রে দীপক চ্যাটার্জী—

ঢং ঢং....

বেলা বারটা বাজল! পেটা ঘড়িটা ঘোষণা করল দ্বিপ্রহর।

ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড় পেরিয়ে একখানা লরী ছুটে চলেছে তীব্রবেগে দক্ষিণ দিকে. তার পেছনে আর একটা লরী সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই। দুটি লরীই চলেছে পরিপূর্ণ বেগে।

এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে এসে দুটি লরী দাঁড়াল। ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলেছে।

হঠাৎ ঘটে গেল একটা মারাত্মক ঘটনা। কোথা থেকে আর একটা মোটরগাড়ী ছুটে এসে পুলিশ বোঝাই লরীটার সাথে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারল।

দুটি গাড়িই দুদিকে ছিট্‌কে পড়ল। দুটি গাড়িরই পেট্রল ট্যাঙ্ক ভেঙে গেছে! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে লেলিহান শিখা মেলে।

হৈ-চৈ···হুল্লোড়···কলরব।

উন্মত্ত তাণ্ডবে যেন বিরাট ধ্বংসলীলা সুরু হয়ে গেল।

একসঙ্গে কয়েকজন লোক এসে সাম্‌নের লরীটা ঘিরে ফেলল। সংখ্যায় তারা দশজনের কম নয়।

প্রত্যেকের হাতে একটি করে রাইফেল। প্রত্যেকের কোমরে রিভলভার।

মুহূর্তের মধ্যে লরীর ড্রাইভার ও অন্য লোক দুটিকে টেনে বের করে লরী বোঝাই কতকগুলি থলি নিয়ে উঠল গিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি মোটরে। মোটরটাও চোখের নিমিষে তাদের নিয়ে অদৃশ্য হল।

কতকগুলি লোক পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। মোটরটা অদৃশ্য হবার আগে হঠাৎ তাদের দিকে লক্ষ্য করে দু তিনবার গুলি বর্ষণ করল।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা ভাল করে জানতে পারার আগেই পুলিশ ও উপস্থিত লোকেরা বুঝতে পারল যে, দস্যুদল পলায়ন করেছে।

অনেক লোক দেখতে দেখতে ঘটনাস্থলে জমে গেল। জমে গেল পুলিশ। আহত লোকগুলি উঠে বসে দস্যুদলের উদ্দেশ্যে গালাগালি করতে লাগল।

শুধু একজন লোক তখন মোটর গাড়িতে চড়ে তীব্রবেগে দস্যুদলের মোটরগাড়িকে অনুসরণ করে চলেছে। সে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী।

—তেরো—

—মৃত্যুর কবলে রতনলাল—

রতন জ্ঞান ফিরে পেল। দেখল সে একটি অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছে। নিচে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটি। দিন না রাত্রি কিছুই বোঝবার উপায় নেই। হাত-পা শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিল রতন। যদিও রতনের পায়ের শব্দ পেয়ে অনেকগুলি বাদুড় চামচিকে ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়তে লাগল। হাতের টর্চটা জ্বেলে খুব সাবধানে চারিদিকে চেয়ে দেখল রতন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। বাইরে মাতাল হাওয়া রতনের দিকে চেয়ে যেন বিদ্রূপ করছে—শো-শো-ও-ও………

দুঃসাহসী রতন। জীবনে ভয় যে কাকে বলে তা সে জানে না কোনও দিন। দুর্বলতাকে জয় করতে শিখেছে সে। সোজা এগিয়ে গিয়ে টর্চটা জ্বেলে ঘরের প্রত্যেকটা দেওয়াল পরীক্ষা করতে লাগল সে—ধীরে ধীরে টোকা দিয়ে।

না, সবটা দেওয়াল ঠিক আছে। কোথাও কোনও ব্যতিক্রম নেই।

হঠাৎ রতনের নজর পড়ল সামনের বিরাট ছবিটার দিকে। বিরাট একটা বুদ্ধ-মূর্তির ছবি যেন আধখানা দালান জুড়ে আছে। রতন এগিয়ে গিয়ে ছবিটা ধরে টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য, ছবিটা নড়ল না এতটুকুও। ওটা কি তবে দালানের সাথে আটকানো আছে ?

ছবির নিচের দিকে একটা ছোট্ট বোতাম। খয়েরি রঙের।

আলো পড়ে একটু যেন চকচক করছে। রতনের কি মনে হল বোতামটা ধরে একটা টিপ দিল বেশ জোরে।

ঘট ঘট ঘটাং........

ছবিখানা একপাশে সরে গেল ধীরে ধীরে। ছবির পেছনে বিরাট একটা গহ্বর। যেন হাঁ করে রতনকে গিলতে আসছে।

রতন অবাক হয়ে গেল। কলকাতা থেকে এতদূরে মোহনপুরের জঙ্গলের কাছে একটা পোড়ো বাড়িতে যারা এসব বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম করতে পেরেছে বুদ্ধি খরচ করে, তারা যে কতো বড় শিক্ষিত ডাকাতের দল তা বুঝতে রতনের বিলম্ব হল না। এত বড় দলের বিরুদ্ধে সে খুব কমই সংগ্রাম করেছে।

তবু ভয়ে পিছিয়ে যাবার ছেলে রতন নয় ওসব দুর্বলতা থাকলে কখনও ডিটেকটিভ দীপক চাটার্জীর সহকারী হয়ে কাজ করতে পারত না সে। ভাল করে চাইল রতন গহ্বরটার দিকে। তারপর টর্চটা জ্বেলে এক ঝলক আলো ফেলল গহ্বরটার মধ্যে।

গহ্বরের খানিকটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। রতন চেয়ে দেখল সুড়ঙ্গ পথের মুখ। এই গোপন কক্ষের বিশাল সুড়ঙ্গটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা কে জানে।

বেশ ভাল করে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল রতন। দেখল কেউ তাকে লক্ষ্য বা অনুসরণ করছে কিনা।

না—সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে এগিয়ে চলল রতন। পায়ে পায়ে। সম্পূর্ণ নির্ভীক দুঃসাহসীর মতো।

সুড়ঙ্গটা চলেছে এঁকেবেঁকে। কোথাও সরু, কোথাও মোটা। কোথাও সোজা চলেছে, কখনও বা বাঁক নিয়েছে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে এল রতনের! থমকে দাঁড়াল সে। চেয়ে দেখল সামনে নিবিড় আঁধার। তার

মধ্য দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাতে বোঝা গেল সামনে একটা বন্ধ দরজা। দরজার ওপারে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত কক্ষ। যেখানে বসে লোকগুলি কথা বলছে।

দরজার গায়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল রতন।

শোনা গেল, কে যেন বলছে—তোমরা যে তোমাদের ঈপ্সিত কাজে সফল হয়েছ এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের। তোমরা দুজন ওখানে বসেই ছেলেটাকে আজকের মত পাহারা দাও!

এত বড়ো বিরাট দলের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে দীপককে যদি সামান্য কিছুও জানাত তবে এত বড় বিপদের মধ্যে কিছু ভরসা থাকত পলায়ন করবার। কিন্তু সে পথ একেবারে রুদ্ধ।

হাত এবং পা দিয়ে আর একবার টানাটানি করল রতন। কিন্তু না, খোলবার কোনও নামগন্ধও দেখা গেল না।

হঠাৎ বাঁ পাশের দরজাটা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এক ঝলক তীব্র আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রতনের।

একজন দীর্ঘকায় লোক ঘরে প্রবেশ করল। সমস্ত দেহ তার একটা কালো রঙের পোশাক দিয়ে আবৃত। মুখে কালো মুখোশ।

রতনের দিকে চেয়ে মূর্তিটি বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলতে সুরু করল—সামান্য এতটুকু শক্তি নিয়ে তোমরা আস বাজপাখির সাথে সংগ্রাম করতে? জান, আজ সমগ্র মহানগরীর প্রতিটি লোকের মুখে কার নাম ভেসে বেড়াচ্ছে? সমস্ত পুলিশ-বাহিনী একত্র চেষ্টা করেও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। আমি তাদের সামনে দিয়ে লরী বোঝাই টাকা এবং সোনা লুঠ করে নিয়ে এসেছি। একবার নয়, বার বার। তোমার এই ক্ষুদ্র ক্ষমতায় আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?

তারপর একটু থেমে মূর্তিটি বলে উঠল—কিন্তু আমাদের ঠিকানা কি করে জানলে তুমি? কে বলল তোমায়? রায় বাহাদুর এন মুখার্জীর

ছেলেকে যে আমি অপহরণ করে কোথায় রেখেছি এটাই বা কি করে জানলে ? নাঃ, তোমাকে ছেড়ে দিলে নিস্তার নাই আমার। আজ রাত্রেই তোমার সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

রতন প্রশ্ন করল---তুমি কি মনে কর আমি একাই তোমাকে অনুসরণ করেছি ?

মূর্তিটি হেসে উঠল—বলল—হ্যাঁ, নিশ্চয়। তা না হলে, আজ লরীর টাকা লুঠ করার পর এবং রায় বাহাদুর এন মুখাজীর ছেলের জন্য একলক্ষ টাকা দাবী করার পরে আমি নিশ্চয় ধরা পড়ে যেতাম। কিন্তু একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউই আমাকে সফলভাবে অনুসরণ করতে পারে নি।

রতন হেসে বলল—কিন্তু তারা হয়ত বাজপাখিকে অনুসরণ করছে, গ্রেপ্তার করছে না ইচ্ছে করেই। সুযোগ মত তারা এগিয়ে আসবে।

মূর্তিটি আবার হেসে বলল—যারা বাজপাখি সম্বন্ধে খবর রাখে তারা জানে যে প্রতিটি আনা চ-কানাচে তার গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে। অনুসরণের ভয় বাজপাখি করে না !

তারপর একটু থেমে বলতে আরম্ভ করল—কিন্তু যারা একবার বাজপাখিকে অনুসরণ করে তাদের সে ক্ষমা করে না। তাদের একমাত্র শাস্তি বাজপাখি যা দেয়, তা হচ্ছে মৃত্যু। তাই তোমার সম্বন্ধেও আমার এই আদেশ শুনিয়ে রাখছি। আর তিন ঘন্টার মধ্যেই ভূগর্ভের এই ঘরটা জলে ভরে উঠবে। আর তিলে তিলে তুমি দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। আচ্ছা আমি চললাম। মনে রেখো, তোমার পরমায়ু আর তিন ঘন্টা মাত্র।

—চোদ্দ—

—দীপকের কারসাজি—

অজস্র অনুসরণের পর ক্লান্ত হয়ে দীপক গাড়ি থামিয়ে দেখল, মোহনপুরের জঙ্গলের কাছে এসে পড়েছে।

লুণ্ঠনকারী মোটরটি ঝোপের পাশে জলার ধারে রাখা হলো। তারপর লুণ্ঠনকারী দস্যুরা বিজয়গর্বে জিনিসপত্রগুলি ধরাধরি করে পায়ে হেঁটে চলল গভীর বনের মধ্যে।

দীপক বুঝল অবস্থা তার প্রতিকূলে।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা মাইক্রোফোনের মত যন্ত্র বের করে তাতে মুখ দিয়ে বলতে সুরু করল—হ্যালো, পুলিস কমিশনার লালবাজার…. তারপর অজস্র সাঙ্কেতিক ভাষায় সে যা বলল, তা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য হবে না।

সন্ধ্যা হতে আর ঘন্টাখানেক দেরী আছে মাত্র। দীপক চারিদিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে মোটরটিকে একটা বটগাছের পাশে লুকিয়ে রাখল। তারপর লুণ্ঠনকারী দস্যুরা যে পথে গেছে সেদিকে এগিয়ে চলল।

একটা বড় গাছের মাথায় উঠে চারিদিকের পরিবেশটা একবার ভাল করে দেখে নিল দীপক। দূরে জঙ্গলের আড়ালে একটি একতলা বাড়ি ছাড়া এধারে আর কোনও বাড়ি নেই।

অতি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এগুলো দীপক।

হঠাৎ পেছনে একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে।

—কে? বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল দীপক। তারপরে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

একটা লোক দীপককে অনুসরণ করছিল। এবার তাকে দেখতে না পেয়ে চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

দীপক দেখল এই সুযোগ। বাঘের মত লোকটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত করল তার মাথায়। লোকটি মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইল।

লোকটার হাত পা বেশ ভাল করে বেঁধে ফেলে দীপক মৃদু হেসে এগিয়ে চলল। যখন সে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল তখন তাকে বাধা দেবার মত কেউ নেই।

—পনের—

—পরিশেষে—

ঝম ঝম ঝম।

জল পড়ছে মুষলধারে। রতনের কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে। আর কয়েক মিনিট—তারপর মৃত্যু! জীবনের সমস্ত স্পন্দন মুহূর্তে অন্তর্হিত হবে। রতনের সারা শরীর যেন হিম হয়ে এল. এমন নিশ্চেষ্টভাবে যে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে একথা সে জীবনে কোনও দিনও মনে স্থান দেয়নি।

গুড়ুম! গুড়ুম! গুম!

হৈ চৈ—কলরব—চীৎকার। সুরু হয়ে গেছে সংগ্রাম! কোথায় কে জানে।

ঘড় ঘড় ঘড়।

মাথার উপরে দরজাটা খুলে গেছে। রতন উপরের দিকে চেয়ে দেখল দরজা খুলে গেছে। এক ঝলক আলো এসে পড়েছে তার শরীরে। চিন্তিতভাবে দীপক প্রশ্ন করছে—তুই কোথায় রে রতন? রতনের সাড়া পেয়ে দীপক ভেংগেভে একটা বিরাট দাড় নামিয়ে দিল।

উপরে উঠে এসে রতন অবাক? সামনেই পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার সাহেব। বাজপাখির দুজন অনুচর বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে। রায়বাহাদুর এন মুখাজীর ছেলেকেও মুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু কোথায় বাজপাখি?

দীপক একটা চিঠি রতনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—এই দ্যাখ, বাজপাখি পালাবার আগে লিখে রেখে গেছে।

রতন পড়ে দেখল তাতে লেখা আছেঃ

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলাল –

আমি যে এভাবে অনুচরদের অপদার্থতার জন্য ব্যর্থ হব তা জানতাম। ওদের দ্বারা আজ পর্যন্ত কোনও কাজ নিখুঁতভাবে হল না। যাক তোমরা এসে আমার দেখা পাবে না। আমি গুপ্ত পথ দিয়ে অনেক আগেই অন্তর্হিত হচ্ছি।

এবারে অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আগামী বারে আবার আসব আরও বেশি প্রস্তুত হয়ে। তোমাদের সাথেও আবার দেখা হবে। যদি সাধ্য থাকে সারা কলকাতার পুলিশবাহিনী নিয়ে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা ক'রো! মোহনপুরের জঙ্গলে গুপ্ত ধন অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল। যাক্, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। আবার দেখা হবে। ইতি—

তোমাদের পুরানো বন্ধু
"বাজপাখি"

চিঠি থেকে মুখ তুলে রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আবার দেখা হবে? কবে কে জানে? দেখা যাক, কে জেতে। বাজপাখি না আমরা।

সমাপ্ত

রক্তথাবা

—শ্রীস্বপনকুমার—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং····

—হ্যালো, কে ? কে আপনি ? কাকে চান ?

—আমি নিজের পরিচয় আপাততঃ গোপন রাখতে চাই। আপনিই কি বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী ?

—না, আমি তাঁর সহকারী এবং সহকর্মী রতনলাল। দীপক নিজের পরিচয় গোপন করে বলল।

—বেশ। আপনি কি দীপকবাবুকে একটা জরুরী সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন ?

—কি সংবাদ বলুন !

—আমি বুঝতে পেরেছি যে, মহানগরী কলকাতার বুকে আমার তিনজন ভয়ানক শত্রু বেঁচে আছে। আমি চাই তাদের তিনজনকেই পৃথিবীর পৃষ্ঠা থেকে একেবারে নির্মূল করতে। বুঝেছেন ?

দীপক অবাক হয়ে বলল—কিন্তু তার জন্য এত ভোরে আমাকে বিরক্ত করছেন কেন, বলতে পারেন ?

লোকটি হেসে উঠল। হা হা করে হাসল এক অদ্ভুত প্রাণখোলা হাসি। তারপর বলল—দেখুন, কল্‌কাতা সহরে আমাকে পেরে উঠতে পারে এমন লোক কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। আপনি গোয়েন্দা মহলে বেশ বুদ্ধিমান বলে খ্যাত। আপনাকে আগেই আমি ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি। আপনার

যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে বাধা দিতে বা গ্রেপ্তার করতে পারেন। কিন্তু তা আপনি পারবেন না দীপকবাবু। যেমন পারলেন না আপনার পরিচয় গোপন করতে। আপনার গলা শুনেই বুঝতে পারলাম যে, আপনি রতনলাল নন। আপনিই বিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং।

লোকটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে দীপক অবাক হয়ে গেল। বলল—সত্যি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে আমি বাধ্য। কিন্তু আপনার পরিচয়....

লোকটি আবার হেসে উঠে বলল—আপনার ফাঁদে আমি মোটেই পা দিচ্ছি না দীপকবাবু। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আমি যখন যে হত্যা করব, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমার হাতের সুস্পষ্ট রক্তমাখা থাবার ছাপ আমি রেখে যাব। তা দেখে যদি আপনি আমাকে ধরতে পারেন তবে স্বীকার করব আপনার প্রতিভা।

লোকটি কি উম্মাদ না শয়তান? অবাক হয়ে দীপক ভাবতে লাগল। কিন্তু তার ভাবনা বেশিক্ষণ টিকল না। একটু পরেই লোকটি বলে উঠল— আচ্ছা, বিদায় বন্ধু। তোমার ক্ষমতা থাকে আমার সাথে আবার দেখা করবে। না হলে এই শেষ কথা। আচ্ছা। গুড বাই।

আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম মিঃ রক্তথাবা। দীপক বলে উঠল। আশা করি আবার দেখা হবে। গুড্ বাই....

*　　*　　*

* *　　* *　　* *

দিন সাতেক পর।

লালবাজার থানায় ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর চ্যাটার্সনের সাথে দীপকের কথা হচ্ছিল।

দীপক বলল—আপনি যে অদ্ভুত খুনের কথা আমাকে বললেন মিঃ চ্যাটার্সন, সে সম্বন্ধে আমি আগে থেকেই কিছু কিছু জানতাম।

চ্যাটার্সন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—তার মানে?

দীপক হেসে বলল—মানে আর কিছুই নয়, দিন সাতেক আগে একজন ভদ্রলোক আমাকে হঠাৎ ফোন করেন। তাঁর পরিচয় তিনি গোপন রেখেছিলেন। আমাকে বললেন যে, আমি ইচ্ছা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বা বাধা দিতে পারি। তিনি পর পর তিনজন লোককে খুন করবেন। তাহলে তার প্রথম শিকার হচ্ছেন ডাঃ বিনায়ক মিত্র। এর পর আরও দু'জন কে কে খুন হবেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

চ্যাটার্সন বললেন—লোকটার অদ্ভুত সাহস। খুন করে দালানের গায়ে আবার রক্তমাখা হাতের ছাপ রেখে গেছে।

দীপক বলল—হ্যাঁ, সে কথাটাও হত্যাকারী আগেই ঘোষণা করেছিল। আমাদের সঙ্গে তিনি বুদ্ধি দিয়ে খেলা করতে চান।

চ্যাটার্সন অবাক হয়ে বললেন—আশ্চর্য! এ আবার কি অদ্ভুত খেলা! মানুষ খুন! আশ্চর্য!

দীপক বলল—না, মানুষ খুনটা ঠিক খেলা নয়। ওটা হচ্ছে প্রতিহিংসা। সেই প্রতিহিংসা নিয়ে রক্তমাখা থাবাটা হচ্ছে ওর বিজয় চিহ্ন।

চ্যাটার্সন বললেন—সে যাই হোক, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মানুষ খুনটা যার কাছে একেবারে অতি সাধারণ ব্যাপার, সে লোকটা সত্যিই কি ভয়াবহ।

দীপক হেসে বলল—কিন্তু কথা শুনে মনে হয়েছিল, খুনী হলেও লোকটা বেশ একটু শিক্ষিত। তাছাড়া, সাধারণতঃ যেখানে সেখানে হরদম খুন করে বেড়াবার মত লোক সে নয়। এক্ষেত্রে খুন করবার কথাটা আগে থেকেই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল।

চ্যাটার্স'ন বললেন—মর্গের রিপোর্ট জানা গেল যে, তীক্ষ্ণধার এক-খানা ছোরা বাঁ দিকের পাঁজরে এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে একটা আঘাতেই আক্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ছোরাটা পেছন থেকে মারা হয়েছিল। আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি ছোরা দিয়ে আঘাত করেছিল সে বাঁ হাতটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে।

দীপক বলল—ভাল কথা, চলুন একবার অকুস্হলটা পরীক্ষা করে দেখে আসা যাক। আমার মনে হয় নিহত ব্যক্তিকে অপসরণ করা হলেও সেখান থেকে কোনও সূত্র-টুত্র মিলতে পারে।

মিঃ চ্যাটার্স'ন বললেন—অকুস্হলটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বউবাজার ষ্ট্রীটের উপরেই ডাঃ বিনায়ক মিত্রের বাড়ি। বড় জোর মিনিট সতের হাঁটতে হবে এখান থেকে।

গল্প করতে করতে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

বউবাজার ষ্ট্রীট ধরে দুজনে কিছুটা এগিয়েছে এমন সময় একজন সাইকেল আরোহী ছোকরার সাথে দীপকের হঠাৎ ধাক্কা লাগল।

দীপক বিরক্ত হয়ে বলল—পথ চলতে শেখোনি হে ছোক্‌রা? এভাবে কেন সাইকেল চড়ো? কবে যে অ্যাক্সিডেণ্ট করে বসবে!

ছেলেটি বলল—না, মানে হঠাৎ লেগে গেছে স্যার। বলেই ছেলেটি সাইকেলে চড়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্হান করল।

হঠাৎ দীপকের চোখ পড়ল পথের উপরেই একখানা সাদা কাগজের উপরে। একি, এটা এখানে কোথেকে এলো? বোধ হয় ছেলেটার পকেট থেকে অসাবধানে পড়ে গেছে। দীপক কাগজটা তুলে নিলো। কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই দীপক একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

—কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী? চ্যাটার্স'ন প্রশ্ন করলেন।

দীপক বলল—কিছু না, একখানা চিঠি।

—কই দেখি?

ছোট্ট চিঠিটা!

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

কাজে নেমে গেছো দেখে খুসী হলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তোমার ক্ষমতা নেই আমাকে ধরতে পার। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করবে না আশা করি। দেখা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। পত্রবাহক মারফৎ চিঠি পাঠালাম। হ্যাঁ, আর একটা কথা। একটু সাবধানে চলাফেরা ক'রো। আমার অনুচরদের হাতে পড়লে তারা কিন্তু ক্ষমা করবে না। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি—

তোমার বন্ধু

রক্তথাবা!

দীপক হেসে বলল—লোকটা কি চালাক দেখেছেন? গোটা চিঠিটাই টাইপ করা যাতে হাতের লেখা দেখে আমরা কিছু আন্দাজ করতে বা বুঝতে না পারি। কিন্তু কতদিন ও চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারে দেখা যাক।

চ্যাটার্সন বললেন—আর যাই হোক, লোকটার ক্ষিপ্রকারিতা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না দীপকবাবু। আপনার প্রতিটি কাজের উপরেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

* * *

* * * * * *

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠতে দীপকের একটু দেরী হলো। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত সে তার নিজস্ব ল্যাবরেটারীতে কাটিয়েছে। রতন তাকে আর বিরক্ত করেনি। কারণ দীপকের এ

ধরনের মনোযোগের পেছনে যে কোনও কারণ নিশ্চয়ই আছে রতন তা জানে।

ঘুম থেকে উঠে কতকগুলো কাজকর্ম নিয়ে দীপক একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বাইরে পরিচিত পদশব্দ শুনতে পেলো। একটু পরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন ইন্‌স্পেক্টর চ্যাটার্জন।

—গুড্ মর্নিং দীপকবাবু।

—মর্নিং মিঃ চ্যাটার্জন। কি খবর নিয়ে আবার এত ভোরে? ও, বুঝতে পেরেছি, আবার নিশ্চয় নতুন কোনও এক খুন।

—হ্যাঁ দীপকবাবু। আমি বড্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছি। পর পর সহরে দুটো খুন এবং তা একই লোকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তার উপরে এ দুটি ক্ষেত্রেই রক্তমাখা থাবার ছাপ। অথচ খুনীর পাত্তা নেই। আর এ ক্ষেত্রেও বাঁ দিকে আঘাত করা হয়েছে।

—কিন্তু আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করছি না। কাল রাতে আমি রক্তথাবার প্লাষ্টিকের ব্লকও তৈরী করে রেখেছি। কিন্তু তাতেই বা কি সুবিধে হবে! এটা ত প্রমাণ হয়েছে যে, লোকটি পুরানো দাগী আসামী নয়। তাই হাতের ছাপের সাথে মিলিয়েই বা ধরবেন কি করে?

—আপনি কি একপাও এগোতে পারেননি দীপকবাবু?

দীপক হেসে বলল—কিছুটা যে পারিনি তা নয়। কিন্তু তা অতি সামান্য, যেমন আমি বুঝতে পেরেছি খুনীর স্বাস্থ্য খুব ভাল। যে লোক একটি ছোরার আঘাতে একটি মানুষকে খুন করতে পারে, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের প্রশ্নই আসে না।

—তারপর?

—তারপর দ্বিতীয় কথা—দু ক্ষেত্রেই খুনী পেছন দিক থেকে বাঁ দিকে

আঘাত হেনেছে। তা থেকে মনে হয় খুনী ডান হাতের থেকে বাঁ হাতই বেশি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত।

—বেশ, চমৎকার ডিডাক্‌সন। তারপর ?

দীপক বলল—তারপর আন্দাজ করতে পেরেছি খুনী প্রায় ছ'ফুট লম্বা। কারণ সেবার দেখেছিলাম মেঝে থেকে প্রায় সাড়ে ছ'ফুট ওপরে রক্তথাবার খাপ তাতে কি এটাই মনে হয় না ? মনে হয় এবারও অতটা উপরেই ছাপ দেখতে পাবেন।

চ্যাটার্সন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন নাইস। সিম্পলি চারমিং। বেশ ধরেছেন ত! আপনি ত প্রায় সন্ধান করেই ফেলেছেন দেখতে পাচ্ছি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, খুনী একজন শিক্ষিত, ছ ফুট লম্বা, স্বাস্থ্যবান লোক, সে বাঁ হাতটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। সলিউশনের কাছা-কাছি ত প্রায় পেঁছেই গেছেন।

দীপক বলল—হ্যাঁ, আরও একটা পয়েন্ট আছে। খুনী দুজন নিহত ব্যক্তিরই অতি পরিচিত লোক, এবং কোন্ সময় এসে জখম করে নির্বিঘ্নে পলায়ন করা যেতে পারে তা সে ভাল রকমই জানে। এমন কি কেউ তাকে দেখতে পায় নি, অথচ ঠিক সময়ে খুন করে গা-ঢাকা দিয়েছে।

—বাঃ! আর কোনও পয়েন্ট ?

দীপক বলল—আপাততঃ প্রয়োজন নেই। আপনি একটু চেষ্টা করলেই রক্তথাবাকে গ্রেপ্তার করে তৃতীয় ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন।

চ্যাটার্সন বললেন—কেমন করে ?

দীপক বলল—আপনি দুজন নিহত ব্যক্তিরই পরিচিত, অর্ধপরিচিত যে সব লোক আছে এবং যারা ছ ফুট লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান তাদের নামের একটা তালিকা তৈরী করুন। তাদের বাড়ীতে খোঁজ নিলেই জানতে

পারবেন। তারপর দুজনের সাথেই পরিচিত এমন ধরনের যে যে লোক আছে তাদের কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আনুন। তার ভেতর থেকে আমি ঠিকই খুনী কে তা খুঁজে বের করতে পারব।

চ্যাটার্সন বলল— তোমার যা মর্জি! আমার মনে হয় যে, তুমি সফল হবেই। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে খুনী সে তো গা ঢাকা দিতে পারে।

দীপক বলল—না, লোকটার একটু অহমিকা এবং দম্ভ আছে। তাই সে তার ছদ্মবেশে ঠিকই এসে উপস্থিত হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাদের মধ্যে কে খুনী তা খুঁজে বের করা। সে কাজ আমি ঠিকই করতে পারব বলে আশা রাখি।

* * *

* * * * * *

সন্ধ্যা হবার তখন খুব বেশী দেরি নাই।

ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার মিঃ চ্যাটার্সন পাঁচজন লোককে সঙ্গে নিয়ে দীপক চ্যাটার্জীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

বাইরের ঘরে ভদ্রলোকদের বসিয়ে রেখে মিঃ চ্যাটার্সন ভেতরে প্রবেশ করলেন।

দীপক তখন ল্যাবরেটারীতে নিবিষ্ট মনে দুটি ছবি রেখে দুটি মোমের মূর্তি তৈরী করতে ব্যস্ত।

মিঃ চ্যাটার্সন ঘরে ঢুকেই বললেন—এসব কী করছ তুমি দীপক? এতে তোমার কী লাভ হবে বলো ত! মিথ্যা.......

দীপক হেসে প্রশ্ন করল—আচ্ছা 'রক্তথাবা'র হাতে নিহত দুজন লোকের চেহারা আমি ঠিক হুবহু করতে পেরেছি ত মিঃ চ্যাটার্সন?

চ্যাটার্সন বললেন—হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে। কিন্তু ওদিয়ে কি যে হবে তা আমি মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

দীপক বলল—আমি বড় হলঘরটাতে থাকছি। আপনি যে যে লোককে আপনার সঙ্গে এনেছেন তাদের প্রত্যেককে একে একে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন আমার সাথে দেখা করবার জন্যে। আপনি যান, আমি একটু পরেই হলঘরে বসছি।

*   *   *

হলঘরের মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছে। হালকা রঙের পাতলা ফিকে নীল আলো।

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি রাখা হয়েছে দুটি নিহত ব্যক্তির মোমের তৈরী মূর্তি! দুজনেরই বাঁদিকের পাঁজরে ছোরা বেঁধান। দুজনেরই চোখ মুখ আতঙ্কে বীভৎস। হালকা আলোয় মনে হচ্ছিল যেন দুটি জীবন্ত মূর্তি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপক পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রথমেই একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে মূর্তি দুটো দেখল। তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল দীপকের খোঁজে। দীপক পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে—আপনি এই পথ দিয়ে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

এমনি করে দ্বিতীয় লোকটি এসে চলে গেল।

কিন্তু তৃতীয় লোকের বেলায় ব্যাপারটা ঘটল একটু অন্যরকম।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করেই হঠাৎ মূর্তি দুটির দিকে চেয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। দীপক পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দেখে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

*   *   *

* *   * *   * *

লোকটির চীৎকার শুনে মিঃ চ্যাটার্সন ছুটে এলেন।

তার দিকে চেয়ে দীপক বলল—দেখুন মিঃ চ্যাটার্সন, এই হচ্ছে আপনার আসামী। এই হচ্ছে রক্তথাবা।

চ্যাটার্সন অবাক হয়ে বললেন—কেন ? কি করে বুঝলেন তা ?

দীপক বলল—অন্যান্য যারা ঘরের মধ্যে এসেছিলো, তারা কেউ ওই মোমের মূর্তি দেখে কোন ভয় পায় নি। কিন্তু যে হত্যাকারী তার অবচেতন মনে সব সময়েই ওই মূর্তি দুটোর কথা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাই মৃদু নীল আলোয় যখন সামনেই দেখতে পেল জীবন্ত মানুষের মত ওই মূর্তি দুটো, তখনই মনের দুর্বলতার জন্যে তার মনে হলো যে, মৃত মানুষ দুটোই বোধ হয় আবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আমি প্রকৃত খুনীকে চিনতে পেরেছি ।

চ্যাটার্সন বললেন—কিন্তু প্রমাণ ?

দীপক হেসে বলল—এত বড়ো একটা মানসিক আঘাতের পর ও নিশ্চয়ই ওর অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে ! আর এ ধরনের লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠতে চাইবে না ওর মন ।

চ্যাটার্সন বললেন—সো ষ্ট্রেঞ্জ এ ফেলো ইউ আর দীপক। সত্যিই তুমি একটি আশ্চর্য প্রতিভা !

দীপক বলল—গুণগানটা পরে করলেও চলবে। আপাততঃ অপরাধী সম্বন্ধে যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। রক্তখাবার লীলাখেলা এইখানেই শেষ হল বলে আনন্দ পাচ্ছি।

চ্যাটার্সন বললেন—তা হলো সত্যিই; কিন্তু 'বাজপাখি'কে ধরতে তুমি আজ অবধি পারলে না দীপক। বাজপাখিই তোমার জীবনের একটি মস্তবড়ো চ্যালেঞ্জ।

দীপক হেসে বলল—দেখা যাক্, পরবর্তী অভিযানে কতদূর কি করতে পারি। আমার মনে হয় যে, ওর সঙ্গে সংগ্রামটা যেন আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চ্যাটার্সন হেসে বললেন—তোমার নেশা সার্থক হোক দীপক, এই আশাই করছি ! আচ্ছা চলি। গুড নাইট।

—শেষ—

এর পরবর্তী ঘটনা জানতে হলে 'বাজপাখির প্রতিহিংসা' পড়ুন।

মহেশ পাবলিকেশন

৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৬

• আমাদের অন্যান্য প্রকাশিত বই •

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—মূল্য ৫·০০, **পঞ্চগীতা**—মূল্য ৪·০০, বাঁধান ৫·০০, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত **গীতারত্নামৃত** মূল্য—৫·০০, **প্রভাস খণ্ড**—মূল্য ১০·০০, **স্তবকবচমালা**—মূল্য ৭·০০, **নিত্যকর্ম পদ্ধতি**—মূল্য ২·৫০, ঐ বৃহৎ ৬·০০, **মেয়েদের ব্রতকথা**— মূল্য ৬·০০, ঐ ছোট ৩·০০, রামকৃষ্ণ উপদেশ মূল্য ৬·০০, আরতি-মালা মূল্য ২·০০, **লক্ষ্মীচরিত্র** ৬·০০, ছোট ৩·০০, বারোমাসের লক্ষ্মীর ব্রতকথা মূল্য ২·০০, **আরব্য উপন্যাস** মূল্য ২০·০০, **পারস্য উপন্যাস** মূল্য ১২·০০, **ঠাকুরমার ঝুলি** মূল্য ৮·০০, **গোপাল ভাঁড়ের গল্প** বড়ো মূল্য ৬·০০, ছোট ২·০০, **লতাপাতার গুণ** মূল্য ২·০০, টোটকা চিকিৎসা মূল্য ২·০০, পশু চিকিৎসা মূল্য ২·০০, **খনার বচন** মূল্য ২·০০, **হনুমান চরিত্র** মূল্য ২·০০, চাণক্য শ্লোক মূল্য ২·০০, **রামপ্রসাদী সঙ্গীত** বড় ৬·০০, (স্বরলিপি সহ) ঐ ছোট মূল্য ২·০০, **শ্যামা সঙ্গীত** মূল্য ২·০০, **বাউল সঙ্গীত** মূল্য ২·০০, প্রেমময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মূল্য ৭·০০, **শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা** মূল্য ৬·০০, **সন্তোষী মাতার ব্রতকথা ও পূজাবিধি** মূল্য ২·০০, **অদ্ভুত বশীকরণ তন্ত্রসার** মূল্য ৬·০০ আদি ও আসল **কশ্যপ তন্ত্রসার** মূল্য ৬·০০, **অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিদ্যা** মূল্য ৮·০০ কামাখ্যা তন্ত্রসার মূল্য ৬·০০।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংকলিত বিভিন্ন দেব দেবীর বর্বাক্ত বিহীন পূজা পদ্ধতি

দুর্গাপূজা পদ্ধতি :—(দেবী, কালিকা ও নন্দীকেশ্বর পুরাণোক্ত—প্রতিখানির মূল্য ৮·০০ টাকা) **কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি** মূল্য ৪·০০, **কালীপূজা** পদ্ধতি মূল্য ৫·০০, **সরস্বতী পূজা পদ্ধতি** মূল্য ৩·০০, **শীতলা পূজা পদ্ধতি** মূল্য ৪·০০, **মনসা পূজা পদ্ধতি** মূল্য ৪·০০, **সত্যনারায়ণ ও সুবচনী পূজা** পদ্ধতি মূল্য ৪·০০, **জগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি** মূল্য ৪·০০ **বিশ্বকর্মা পূজা** পদ্ধতি মূল্য ৩·০০, **অন্নপূর্ণা পূজা পদ্ধতি** মূল্য ৪·০০ টাকা।

আর্যানুষ্ঠান বিধি (১ম খণ্ড), **সামবেদীয় বিবাহ**, (২য় খণ্ড), সামবেদীয় **অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ ইত্যাদি**, (৩য় খণ্ড) যজুর্বেদীয় বিবাহ, (৪র্থ খণ্ড), **যজুর্বেদীয় অন্নপ্রাশন, নামকরণ** চূড়াকরণ **ইত্যাদি প্রতিটি খণ্ডের** মূল্য—৫·০০ টাকা।

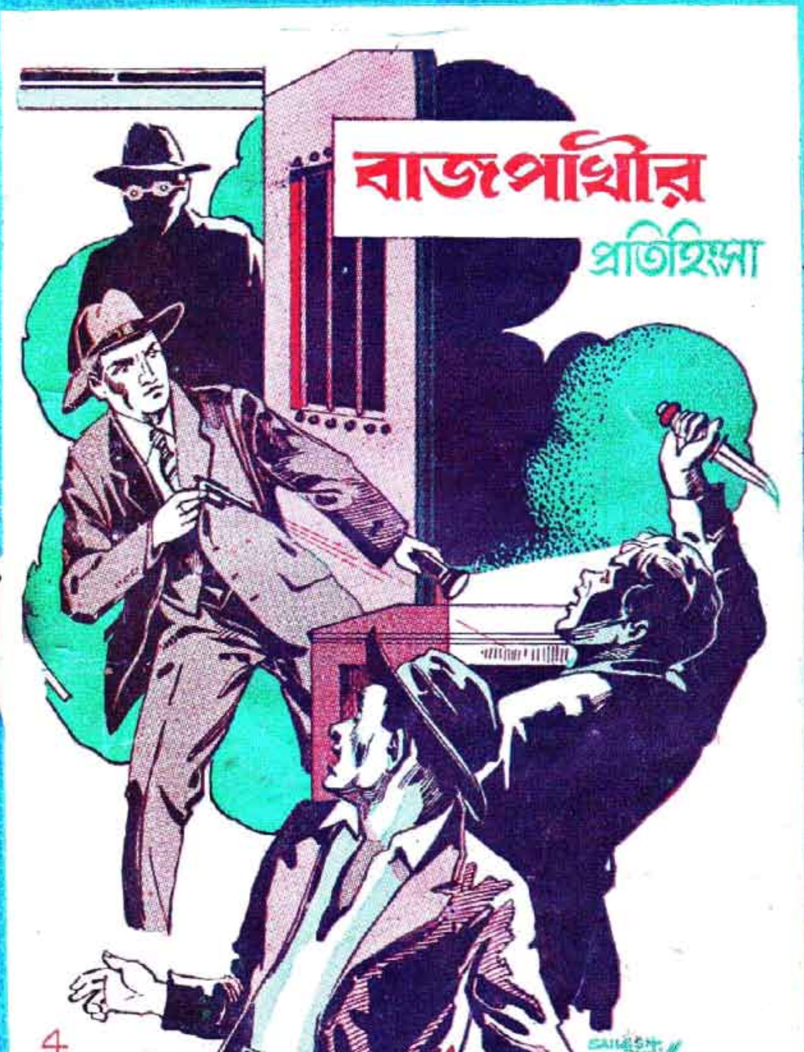
বাজপাখীর
প্রতিহিংসা
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—৪নং

বাজপাখির প্রতিহিংসা

শ্রীস্বপনকুমার

জেনারেল লাইব্রেরী অ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬
(১১৫এ, আপার চিৎপুর রোড)

মূল্য : ১ টাকা ২৫ পয়সা

প্রকাশক :
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
'জেনারেল লাইব্রেরী অ্যাণ্ড প্রিন্টার্স'
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬
(১১৫ এ, আপার চিৎপুর রোড)

মুদ্রক :
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পুনর্মুদ্রণ : ১৩৮৫

এ বছরের সবচেয়ে সেরা

ডিটেকটিভ সিরিজ

অনবদ্য রচনা নৈপুণ্যে, প্রচ্ছদের তিনরঙা ছবিতে আর
সবচেয়ে অল্পদামে, যা যে-কোনও পাঠকের
মনোহরণ করতে সক্ষম।

ডিটেকটিভ সাহিত্যের যাতুকর

শ্রীস্বপনকুমারের লেখা

"—বাজপাখি সিরিজ—"

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি
২। বাজপাখির পুনরাভিযান
৩। বাজপাখির রক্তলীলা
৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার
৬। হত্যাকারী বাজপাখি
৭। বাজপাখির রহস্যজাল
৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র
১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

প্রত্যেকখানির দাম ১·২৫ টাকা মাত্র

॥ এক ॥

—রহস্যময় হত্যাকাহিনী

—আপনি তাহলে একথা স্বীকার করছেন ?

—হ্যাঁ।

—এটা দুর্ঘটনা নয় ?

—না। তা হতে পারে না।

—কি করে আপনি সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হলেন ?

—দেখুন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র।

—কতদূর পড়েছিলেন ?

—ন' বছর আগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বি-এস্‌সি উপাধি দিয়েছিল।

—তাতেই কি প্রমাণ হয় যে···

—না, আমি আমার কথাকেই সবচেয়ে বড়ো বলছি না। তাঁর দেহের উপরে যে ধরনের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে ইলেকট্রিক শকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

—যদি বলি বজ্রপাতে···

—না, তাও নয়। তিনি জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন বোধ হয় জানালাটা বন্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

—বেশ।

—আমার মনে হয় না যে কোন বজ্র আকাশ থেকে বাঁকা হয়ে পড়ে তাঁর গায়ে এসেই ধাক্কা মারবে।

—মানলাম।

—তাহলে বুঝতে পারছেন আমার সন্দেহ কেন ?

—কি আপনার সন্দেহ ?

—আমার মনে হচ্ছে যে তিনি জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন আকাশে মেঘ দেখে জানালা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে। সেখানেই কোনও রকমে তাঁর শরীরে ইলেকট্রিক শক দিয়ে···

—উপায়টা কি হতে পারে ?

—সেটা ভেবে দেখিনি।

—আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র···

—জানালার গরাদে কোনও ভাবে ইলেক্ট্রিক চার্জ করা যেতে পারে।

—কথাটা অমূলক নয়।

—আর পেছন থেকেও কোনও ভাবে···

—কিন্তু সকাল পর্যন্ত জানালা বন্ধ ছিল সেকথা আশা করি এখনও ভুলে যাননি।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য···

—আচ্ছা আপনারা ত ওই বাড়িরই নিচের তলায় থাকতেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেদিন রাত্তে বাজ পড়লে···

—হ্যাঁ, শব্দটা নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।

—বাড়িতে ক'জন লোক ?

—দশ জনের কম নয়।

—তাহলে বজ্র সম্বন্ধে সন্দেহ করা অমূলক বৈকি !

—ঠিকই ধরেছেন।

—কিন্তু কি সন্দেহ আপনি করেছেন ? খুন ?

—তা ত আগেই বললাম।

—কাকে সন্দেহ হয় আপনার ?

—সন্দেহ কাউকে করি না। অনেকটা স্থির জেনেই বলছি।

—কাকে ?

—আপনাকে সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছি বটে। আমার কাকাবাবুর মৃতদেহের পাশে একখানা কার্ড পাওয়া গিয়েছিল।

—বেশ।

—তাতে ছিল দুটি কথা লেখা।

—সেটা আছে কি ?

—হ্যাঁ, সেটাও আনতে ভুলিনি।

—দেখি।

—এই দেখুন এতে লাল কালি দিয়ে লেখা দুটি কথা। প্রতিহিংসা আর বাজপাখি। আর কোণে রয়েছে বাজপাখির এই ছবিটা।

—হ্যাঁ, এটা বাজপাখির চিহ্ন বটে।

—আর এই দেখুন চিহ্নটা আঁকা রয়েছে নীল কালি দিয়ে।

—এ ছবি আমার পূর্বপরিচিত।

—এখন আপনার কি মনে হয় দীপকবাবু ?

—মনে হতে পারে অনেক কিছুই···

—কেন ?

—সে কথা থাক্। বাজপাখির হঠাৎ আপনার কাকাবাবুর প্রতি এই ধরনের আক্রোশের কারণ ?

—কারণ অবশ্যই আছে।

—অর্থাৎ ?

—আপনি বোধ হয় জানেন দীপকবাবু যে, আমার কাকার একটা বিশেষ ধরণের খামখেয়াল ছিল ?

—কিছু কিছু শুনেছি বটে।

—মানুষকে তিনি কখনও বিশ্বাস করতেন না।

—কারণ ?

—জীবনে বহু আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে।

—কবে থেকে ?

—জন্মাবধি কাকা ছিলেন বড়ো গরীব।

—কথাটা নতুন শুনছি।

—হ্যাঁ, আর তাঁর সারা জীবনের অজস্র পরিশ্রমে দীর্ঘদিন বিদেশে অতিবাহিত করে, তিল তিল করে সঞ্চিত করেছিলেন এই সমস্ত অর্থ।

—আশ্চর্য ত।

—তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, উদার, সত্যনিষ্ঠ।

—ভাল কথা।

—কিন্তু কখনও কাউকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে এ শিক্ষা দিয়েছিল।

—কোত্থেকে আপনি তা জানতে পারলেন ?

—তাঁর জীবনের পুরোনো ইতিহাস তিনি কাউকে বল্‌তেন না বটে, আভাসে ইঙ্গিতে এটুকু আমরা বুঝেছিলাম।

—তারপর ?

—মানুষকে বিশ্বাস করতেন না বলেই তাঁর ঘরের ঠিক পাশেই তৈরি করেছিলেন একটি বিরাট লৌহকক্ষ।

— শুনেছি বটে।

—সেই কক্ষে প্রবেশ করবার কৌশল একমাত্র কাকা ছাড়া আর কেউ জানতেন না।

—আপনারা কোনও দিন তার ভেতরে ঢুকেছেন ?

—হাঁা, জীবনে মাত্র একবার।

—একা ?

—না, কাকাই সঙ্গে করে নিয়ে আমাকে দেখিয়েছিলেন। আগেই বলেছি আমাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

—কি দেখেছিলেন তার ভেতরে ?

—তার ভেতরে ছিল বড় বড় সব লোহসিন্দুক। প্রত্যেকটার সম্মুখভাগ কাঁচের আবরণে আবৃত। বাইরে থেকে দেখা যেত ঘরে সাজান রয়েছে সব সোনার মোহর, ব্যাঙ্কনোট, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি।

—বেশ।

—আর সামনের সেই কাঁচের আবরণ ছিল এত শক্ত যে তা বুলেট, দ্বারাও ভাঙ্গা যেত না এতো দুর্ভেদ্য।

—চিত্তাকর্ষক বটে।

—কাকা দিনের মধ্যে তিন-চার ঘণ্টা সেই কক্ষে একা একা বসে থাকতেন। সম্পূর্ণ একা থাকতেই তিনি ভালবাসতেন।

—সেখানে কি করতেন তিনি ?

—তা আমরা ঠিক জানি না, কারণ ......

—যাক, কিন্তু তার সঙ্গে এই হত্যার কি সম্বন্ধ ?

—হাঁা, সম্বন্ধ আছে। কাকার লোহকক্ষে সিন্দুক ছিল মোট ন'টি। প্রত্যেকটি সিন্দুকের ভেতরের জিনিসগুলি তিনি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দেখতে ভালবাসতেন।

—আপনি কি করে বুঝলেন ?

—কাকা মাঝে মাঝে এগুলি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন। যেমন ধরুন, মোহরের বাজারদর কত, পান্না কি দামে বিক্রী হচ্ছে, একটা নীলা বিক্রী করে মোহর কিনলে কেমন হয়, ইত্যাদি।

—বুঝলাম।

—সেদিন সকালে লৌহকক্ষে প্রবেশ করবার সময়ের আধঘণ্টা আগে আমি একটা দরকারে কাকার কাছে যাই। কিন্তু গিয়েই যা দেখি, তাতে কেমন যেন চম্‌কে উঠ্‌লাম।

—কি দেখলেন আপনি?

—দেখলাম কাকা পাংশু-মুখে বসে আছেন। হাত পা থরথর করে কাঁপ্‌ছে। হাতে ধরা রয়েছে একখানা চিঠি।

—কোথায় সেখানা?

—সেটা কাকা রেগে তক্ষুণি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

—কি লেখা ছিল তাতে?

—কাগজের কোণে আঁকা ছিল ঠিক এম্‌নি একটা বাজপাখির ছবি। নিচে লেখা ছিল কতকগুলি কথা। যতদূর মনে আছে, তাতে লেখা ছিল—

প্রিয় বিনয়েন্দ্রকুমার—

দশ বছর আগে তোমার কাছে আমার পাওনা ছিল তেইশ হাজার টাকা। আশা করি, সেকথা আজও ভোলনি তুমি। বর্তমানে তুমি ধনী। আশা করি তোমার চার নম্বর সিন্দুকের ভেতরে যা আছে, সেগুলি পেলেই আমার উপরোক্ত টাকা পাওয়া হবে। আগামী তিন দিনের মধ্যে যদি সেই টাকা আমার হস্তগত না হয়, আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব। এবং আশা করি আমি বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি, তা তোমার অজানা নয়। এর কয়েকটি উদাহরণ তুমি নিজের চোখে দেখেছ। যা

হোক্, সত্বর ব্যবস্থা ক'রো। অন্যথায় তোমার ভাগ্য কল্পনা করতেও শিউরে উঠ্‌ছি। ইতি—

তোমার বহু পুরোনো বন্ধু,
বাজপাখি।

—আচ্ছা অমলবাবু, আপনার কাকা কি ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

—না, ঠিক তা নয়। প্রথমটা তিনি খুব বেশি চিন্তিত হলেও পরে তিনি তা নিয়ে আর কোন হৈ-চৈ করেন নি। যাক সে কথা; কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি কি করে বুঝলেন যে আমার নাম অমল?

—সেটা আর এমন কিছু কঠিন নয়। আপনি কি দেখেন নি আপনার হাতের ঐ আংটিতে লেখা আপনার নামটা……

—ও তাইত! সত্যি, আপনার কাজের উপরে আমার বিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেল দীপকবাবু।

—হ্যাঁ, কথা হচ্ছিল আপনার কাকার বিষয়ে। পুলিশ সম্বন্ধে তিনি এত বেশি উদাসীন কেন?

—উদাসীন ঠিক নয়, পুলিশ কিংবা গোয়েন্দার কথা উঠলেই তিনি কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়তেন।

—আশ্চর্য নয়। মানুষের মনোবিজ্ঞান ত আর সব সময় এক পথে চলে না।

—কাকার মন যে কখন কোন পথে চল্‌বে তা আমরা কেউ বুঝতাম না।

—কেন, আপনারা কি কাকার সাথে খুব বেশি মিশতেন না?

—না, কাকা বেশ একটু রাশভারী গোছের লোক ছিলেন। তাই……

—বুঝলাম। আচ্ছা, শুধু আর একটা প্রশ্ন অমলবাবু।

—বলুন।

—কতদিন আগে আপনার কাকা বিদেশ থেকে ফিরে এসে বাড়িখানা তৈরী করেন ?

—তা প্রায় বছর নয় দশ মতো হবে।

—ভুল বলছেন অমলবাবু, ওটা হলো ঠিক আট বছর।

—সেকি ! আপনি কি করে জানলেন ? আমার অবশ্য ঠিক মনে নেই। তবু………

—হ্যাঁ, ওই সময়েই বাজপাখি দীর্ঘদিন ভারতের বাইরে অবস্থান করেছিল এবং পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র সেই সময় বাজপাখির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল।

—অতটা অবশ্য জানি না। তবে আপনি কি সত্যই মনে করে যে আমার মৃত কাকার সাথে বাজপাখির কিছু সম্পর্ক ছিল ?

—থাক, সেটা আমার অনুমান। তদন্ত না করে কিছুই অবশ্য বলা যায় না। আচ্ছা তাহলে আজকের মতো আমার আর কিছু জানবার নেই। আপনার কাকার হত্যা সম্পর্কে তদন্ত ভার আমিই গ্রহণ করলাম। নমস্কার।

॥ দুই ॥

—গুপ্ত সভাগৃহ

—আমাদের কাজের পদ্ধতি এবার কিভাবে পরিবর্তিত হতে চলেছে সে সম্বন্ধে সব কিছুই তোমাদের জানিয়েছি। এটা বিংশ শতাব্দী, বিজ্ঞানের যুগ। প্রতিপদে চলেছে বিজ্ঞানের প্রাধান্য, তাই আমরা পুরোনো ধরনের প্রাচীন পদ্ধতিকে ত্যাগ করে নতুন বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগিয়ে চলবো।

—আপনার আদেশ অনুসারেই আমরা চিরদিন কাজ করতে সম্মত।

—বিশ্বাসঘাতকতা করবার সময় এ কথাটা নিশ্চয়ই ভুলবে না যে, বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করবার উপযুক্ত এক ধরনের যন্ত্র আমি আবিষ্কার করেছি। তাতে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতককে আমার চিনে বের করতে মুহূর্তও দেরি হয় না। এবং তার শাস্তিও আমি কি দিয়ে থাকি তা তোমাদের অজানা নয়।

—আজ্ঞে, আমরা তা জানি।

—হ্যাঁ, ভগবানপ্রসাদের কথা বোধ হয় তোমরা এখনও ভোলনি?

—না কর্তা, সে এখন অন্ধ হয়ে খিদিরপুরের পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

—যাক্ সে কথা, আমার কাছে কথার চেয়ে কাজ বড়। শোন বিজয়রাম, তোমার উপরে আমি দক্ষিণ কোলকাতার ভার দিলাম। যে যে বাড়িতে তোমায় হানা দিতে হবে তার তালিকা আমি তোমাকে দিচ্ছি।

—পারিশ্রমিক……

—নিশ্চয়ই পাবে। আজ পর্যন্ত আমার কাজ করে পারিশ্রমিক পায়নি, এমন লোক সারা পৃথিবীতে একজনও নেই।

—আর সাহায্য……

—হ্যাঁ, তোমার যা যা সাহায্য প্রয়োজন তা অবশ্যই পাবে। তুমি সেগুলি তেরো নং কুঠি থেকে নিয়ে যেয়ো। তোমার সংকেত থাকবে লাল গোলাপ। তারপর সাম্‌সুল, তোমার কি খবর?

নতুন খবর আর কিছু নেই কর্তা। শুধু সংবাদ গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী নাকি বড্ড বিরক্ত শুরু করেছে। বিনয়েন্দ্রকুমারের তদন্ত নাকি ও নিজের হাতে গ্রহণ করেছে।

—জানি।

—কিন্তু পুলিশের তীক্ষ্ণ তদন্ত শুরু হলে আবার আমাদের নানা অসুবিধার সামনে পড়তে হবে।

—ভুল করছ সাম্‌সুল, এবার পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করবার মতো উপযুক্ত শক্তি নিয়েই শুরু হবে বাজপখির সংগ্রাম। এবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আশীর্বাদে আমি সবার সামনে দিয়ে নিঃসঙ্কোচে কাজ করে যাব, অথচ আমার ধরা ছোঁওয়া পর্যন্ত কেউ পাবে না।

—দীপক চ্যাটার্জী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কর্তা?

—সে সম্বন্ধে তোমাদের বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমরা যথাসময়েই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

—তার সম্বন্ধে বর্তমানে······

—হ্যাঁ, বর্তমানে দুজন অনুচরকে নিযুক্ত রাখা হবে তার প্রতিটি কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

–কিন্তু যদি সে দেখতে পায় যে, কোনও সময়ে আমাদের দলের মারাত্মক বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে?

–সে ধরনের কিছু ঘটনা ঘটামাত্রই তার সম্পূর্ণ খবর আমি জানতে চাই। আর আমাদের অনুচরদের চেষ্টা করতে হবে সব সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকবার। যদি কোনও ক্ষেত্রে মুখোমুখী এসে পড়ে ······ ···

—ও, বুঝলাম। কিন্তু আমাদের কার কার উপরে আপনি পরবর্তী কি কি কাজের ভার দিচ্ছেন তা……

—হ্যাঁ, সেগুলি সব বল্‌ছি। শুধু একটা বড়ো কথা। বিনয়েন্দ্রকুমার নিহত হয়েছে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য টাকা এখনও আদায় হয়নি; তোমার উপরে সেই বিরাট কাজের ভার আমি অর্পণ করছি সাম্‌সুল। তুমি যে ভাবে পার কাল ভোরে অবশ্য বিনয়েন্দ্রবাবুর লৌহকক্ষে প্রবেশ করবে।

—কিন্তু দুর্ভেদ্য লৌহকক্ষে কি উপায়ে প্রবেশ করা যায় কর্তা ?

—সেটা খুব বেশি কঠিন নয়। বিনয়েন্দ্রবাবুর বাড়িতে আমার দুজন অনুচর আছে। তারা আমাকে লৌহকক্ষে প্রবেশ করার মোটামুটি সংকেত জানিয়েছে। আমি তোমাকে লৌহকক্ষের একটা নক্সা দেবো। তা থেকেই তুমি বুঝতে পারবে কতো সহজে ওখানে প্রবেশ করা যায়।

—তাহলে অবশ্য খুব সুবিধেই হয়।

—হ্যাঁ, আর আমাদের লক্ষ্য ছিল তের নম্বর সিন্দুকের উপরে। কেননা ওই সিন্দুকটার পেছন দিকটা অন্যান্যগুলি অপেক্ষা হালকা। কিন্তু দিনকয়েক আগে আমি আমার অনুচরদের হাত দিয়ে পেয়েছি ওই সিন্দুকটার একটা নকল চাবি। যাক্ সে কথা। আমাদের সিন্দুকের ভেতরকার সব কিছু জিনিসেরই প্রয়োজন নেই, তা তুমি বুঝতেই পারছ। সিন্দুকের তৃতীয় থাকে সাজান আছে যে মোহরগুলি এবং যে কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তর তার দামই প্রায় হাজার পনর কুড়ির কম নয়। আমার আপাততঃ ওতেই চলবে। তোমরা এ কাজের জন্যে তুমি পুরস্কার পাবে দু'হাজার টাকা।

—আজ্ঞে আপাততঃ তার বেশি আমার প্রয়োজন নেই।

—বেশ, এই নাও তবে মানচিত্র ও চাবি। হ্যাঁ, এইবার তোমাদের অন্য সকলের প্রতি আমি যে যে কাজের ভার দিচ্ছি, তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে

শোন। তোমরা মনে রেখো তোমাদের নিজেদের কাজই তোমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে সব দিক দিয়ে সাহায্য করবে।

— আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো কর্তা…

—বেশ, তোমরা…

॥ তিন ॥

—আকস্মিক আবির্ভাব

চ্যাটার্জী গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের বিরাট মূলধনের কথা জানে না দক্ষিণ কোলকাতায় এমন লোক আছে খুব কম বল্‌লেই হয়।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ গুপ্তকে বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ মনে করবে একজন দয়ালু, সদাশয় এবং নির্বিরোধী লোক। তিনি রোজ ঠিক দশটায় স্নান-আহ্নিক সেরে যখন নিজের ছোট মরিস্ মাইনর গাড়িটাতে চড়ে অফিসের সামনে এসে নামেন তখন অফিসের কর্মীদের থেকে শুরু করে সকলের মনেই এই ভাবটা প্রবল হয় যে, এমন একজন লোক যখন এই কোম্পানীর মধ্যে আছেন তখন কোম্পানীর ব্যবসায়ে কখনও কোনও লোকসান হতে পারে না। কোম্পানীর পাওনাদারেরা পর্যন্ত স্বীকার করে মিঃ গুপ্ত এ কোম্পানীতে যতদিন আছেন ততদিন তাদের একটি পয়সাও গোলমাল হবার ভয় নেই।

কথায় কথায় মিঃ গুপ্ত এমনভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শ্রীভগবানের করুণার কথা গদগদকণ্ঠে প্রচার করেন যে, লোকে স্বীকার করতে বাধ্য হয় তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ লোকের জন্যেই কোম্পানীর এতটা উন্নতি। এতটা শ্রী।

মিঃ চ্যাটার্জীর যদিও কোম্পানীর মধ্যে শেয়ার ছিল প্রায় চার আনা মত, তবু তিনি অন্যান্য আরও নানা কাজে বড়ো বেশি ব্যাপৃত থাকতেন বলে কোম্পানীর ছোটখাট ব্যাপারের মধ্যে হাত দিতে পারতেন না। তিনি ছিলেন একটু নির্বিরোধী ভালমানুষ গোছের লোক। তাছাড়া বিভিন্ন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। যক্ষ্মা হাসপাতাল, নারীরক্ষা সমিতি থেকে শুরু করে অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যাপারে নিজেকে খুব বেশি ব্যাপৃত রাখতেন বলে কোম্পানীর বিষয়ে তিনি ছিলেন কিছুটা উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে তিনি এসে কোম্পানীর হিসাবপত্র বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সহি করে দিতেন।

অন্যান্য কাজের সাথে এদের আর একটা কাজ ছিল বিভিন্ন লোককে শেয়ার মার্কেটের কেনাবেচায় সাহায্য করা। আর মাঝ থেকে দু'পক্ষের কাছ থেকেই কমিশন নিয়ে দিনে দিনে কোম্পানীর ভিত্তি দৃঢ়তর করা।

এই ব্যবসায়ে এঁরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেতেন ম্যানেজিং ক্লার্ক হরপ্রসন্ন চৌধুরীর কাছে; সত্যি কথা বলতে গেলে হরপ্রসন্নবাবুই কোম্পানীর নানা কলকব্জা নিয়ে নিখুঁতভাবে নাড়াচাড়া করে থাকেন। মিঃ গুপ্ত ও মিঃ চ্যাটার্জী শুধুমাত্র বাইরে থেকে কোম্পানীকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মাত্র।

প্রথমে দু'জনে মাত্র হাজার পনর টাকা নিয়ে কোম্পানীর কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেয়ার বিক্রী করে এবং লাভের অঙ্কে আজকে কোম্পানীর মূলধন গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকায়। লোকে এই কোম্পানীর উপরে সত্যই আস্থাবান।

কিন্তু প্রত্যেক বড়ো কোম্পানীরই বাইরে কিছু কিছু দুর্নাম থাকে এবং বিরুদ্ধ কোম্পানীরা তাঁদের নামে অনেক কিছু রটনা করে থাকেন। এই কোম্পানার ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। দিনের পর দিন বাইরে সত্যি কিছু কিছু দুর্নাম ছাড়িয়ে পড়ছিল। লোকে বলতে শুরু করেছিল, কোম্পানী ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে উঠ্‌ছে। যত টাকা গিয়ে জমা হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ গুপ্ত ও মিঃ চ্যাটার্জীর নিজের য়্যাকাউণ্টে।

এ ধরনের দুর্নামে কোম্পানীর যদিও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না, তবুও দু'একজন শেয়ারহোল্ডার একটু বিগ্‌ড়ে যায়।

সেদিন এই কোম্পানীর দু'একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এঁদের একজন বড় শেয়ারহোল্ডার মিঃ অনিল সেনগুপ্ত এসে নামলেন তাঁর বিরাট 'পন্টিয়াক' গাড়িটাতে চড়ে। 'ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান অটো মোবাইলস্' এবং 'বিদ্যাধর কটন মিলের' তিনি ডিরেক্টার এবং তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বর্তমানে যে লাখ দশেকের কম নয়, এ কথা সর্বজনবিদিত।

মিঃ চ্যাটার্জী অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও উপস্থিত ছিলেন না। মিঃ গুপ্তই তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন মিঃ সেনগুপ্ত। সো লাকি টু মিট্ ইউ! কী সৌভাগ্য আমার! ভগবানের ইচ্ছা যে আজ আপনার সাথে দেখা করিয়ে দিলেন। আপনাকে দু'একটা বিষয়ে প্রয়োজনও ছিল।

মিঃ সেনগুপ্ত একটু বিরক্তভাবে বললেন -প্রয়োজন থাকলে ত আপনি আমাকে ফোন করতেই পারতেন। গত সপ্তাহ তিনেকে মধ্যে আমি ত এদিকের কোনও সংবাদ পর্যন্ত পাইনি।

—তাতে হয়েছে কি? নিশ্চয়ই পাবেন।

—ইজ্‌ ইট সো? আপনার কোম্পানীর বড়ো দুর্নাম হচ্ছে বাজারে। অথচ আপনি তার প্রতিবাদও করছেন না। এমনি ভাবে চললে কোম্পানী

নিশ্চয়ই যে একটা জটিল অবস্থার সম্মুখীন হবে এ সম্বন্ধে আমি স্থির-নিশ্চয়।

—ওসব ভিত্তিহীন অমূলক দুর্নাম অনেকেরই থাকে···

—প্রমাণ ?

—শ্রীভগবানের কৃপায় কাগজপত্র···

—বাজারের অবস্থা খারাপ হ'লে শ্রীভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন না, একথা ভুলে যাচ্ছেন মিঃ গুপ্ত।

—না না, আপনি রাগছেন কেন মিঃ সেনগুপ্ত ? দেখুন শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন —

—এটা পাঠশালা নয় মিঃ গুপ্ত। এটা বিজ্‌নেস্ প্রেস্। একটা বিজনেস্ ট্রাডিসন আপনি নিশ্চয়ই মানবেন।

—নিশ্চয়। তাই মেনেছি বলেই ত আজ শ্রীভগবানের কৃপায় কোম্পানীর মূলধন···

—দেখুন, কোম্পানীর মূলধন শ্রীভগবান বাড়িয়েছেন না ভগবানদাস আগরওয়ালা বাড়িয়েছেন সে খবরে আমার প্রয়োজন নেই। আমি কোনও কারণেই ভিত্তিহীন কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না, বা তা নিয়ে বিশেষ খোঁজখবর করি না। কিন্তু···

—কিন্তু কি মিঃ সেনগুপ্ত ? কোন্ ভিত্তির সন্ধান আপনি হঠাৎ পেলেন বলুন ত ?

—দেখুন আপনি নিশ্চয়ই ভুঁইফোড় নন মিঃ গুপ্ত। কিংবা হঠাৎ রাতারাতি আপনি গজিয়ে ওঠেননি। আপনার পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান আমি পেয়েছি। এবং তার উপরে ভিত্তি করেই···

—হোয়াট ডু ইউ মিন্ মিঃ অনিল সেনগুপ্ত ? আপনি কোম্পানীর বড়ো শেয়ার হোল্ডার হ'তে পারেন—কিন্তু এ ধরনের পার্সোন্যাল আক্রমণ আমি

কোনও দিনই সহ্য করব না। আই উইল্ নট্ টলারেট শ্রীভগবানের অভিসম্পাতে আপনি···

—দেখুন, এটা রাস্তার কোনও একটা তাসের আড্ডা নয় যে, যা তা বাজে বক্‌লেই হল। আপনি কি অস্বীকার করেন যে আপনি এর আগে দক্ষিণ ভারতে ম্যাঙ্গানিজের কারবার করতেন একজন ধনী মাড়োয়ারীর সঙ্গে শেয়ারের টাকায়···

—আচ্ছা, বলে যান···

—একদিন মধ্য রাত্রে সেই মাড়োয়ারী হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা যান প্রায় লাখ তিনেক টাকা রেখে···

—তা লোকে কি হার্টফেল ক'রে মরতেও পারে না? শ্রীভগবান···

—না, তা নয়। আপনারাই এক-একটি মূর্তিমান শ্রীভগবান কি না এই আমাদের সন্দেহ।

—অর্থাৎ?

—মানে, লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি আপনিই কোনও প্রকারে তাঁর হার্টের এমন একটি অবস্থা ক'রেছিলেন যে—

—কোত্থেকে এ পাগলামী আপনার মাথায় দানা বেঁধেছে?

—পাগলামী নয় মিঃ গুপ্ত। সেই মাড়োয়ারীর একমাত্র কন্যা মিস্ স্বামীনাথম্ এখন দক্ষিণ ভারতের এক স্কুলে মাষ্টারী ক'রে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করে। এটাও কি আপনি মিথ্যা বলতে চান?

—আপনি কি বলতে চান যে আমিই কোনও রকমে সেই ব্যক্তির মৃত্যুকে আসন্ন করে তুলে তার সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছি?

—একজ্যাক্টলি!

—কিন্তু বাজারে আমাদের কোম্পানীর নামে যা দেনা ছিল তা দিয়েই ত আমাদের সম্পূর্ণ মূলধনের বারো আনা খরচ হ'য়ে যায়। বাকী টাকার ঠিক

অর্ধেক মানে চার হাজার টাকা আমি মিস্ স্বামীনাথমের হাতে দিয়ে আসি, এ কথাটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

—হাঁ, দেড় লাখ টাকার মধ্যে চার হাজার টাকা দিয়ে আপনি যে সত্যিই মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমি অস্বীকার করি না।

—এ সব পুরোনো কথার বাজে অজুহাত দেখিয়ে আপনি কি বল্তে চান অনিলবাবু?

বল্তে আমি কিছুই চাই না।

একটা ক্ষোভের চিহ্ন অনিল সেনগুপ্তর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ বেঁকিয়ে নাকটা সিটকে তিনি বললেন —আমি বলতে চাই না বিশেষ কিছুই। আপনার ব্যবসার পেছনে বর্তমানে কোনও অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে কি না শুধু জানতে চাই সেটুকুই। আপনি এলাহাবাদে যে ব্যবসা ধরেছিলেন তাতে সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছিল। আপনি একটি ধনী সুন্দরী বিধবার সর্বনাশ করেছিলেন। তাকে বিয়ে করে তিন মাস পরেই তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করান। আর তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস ক'রে এসেছেন নতুন উদ্যমে কলকাতার বুকে এই ব্যবসার সূত্র ধ'রে।

—আত্মহত্যাটাও কি আমার দোষে?

—লোকে বলে এর মধ্যেও আপনার হাত ছিল।

—লোকের দুর্নাম রটিয়ে যে স্বার্থ আছে।

—তাদের স্বার্থ আবার কি থাকতে পারে?

—এই আপনার মত লোকদের মিথ্যা উত্তেজিত করা।

—হয়তো তাই। কিন্তু বর্তমানে মুখের কথায় ভুলে আপনার কোম্পানীতে আর টাকা ফেলে রাখতে পারছি না। আমি আমার অংশের টাকাটা ফেরত নিতে চাই। অন্য কোন ব্যবসায়ে খাটাতে পারলে বোধ হয় এর চেয়েও বেশি লাভ হ'তে পারে।

— কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জীর সাথেও একবার কথা বলা দরকার ত। যাক্, কত টাকা আছে আপনার কোম্পানীর মধ্যে ?

—তা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

—কিন্তু বর্তমানে ত এত টাকা অল্প সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয় কোম্পানীর পক্ষে। কিছুটা সময় পেলে অবশ্য…

—আপনি কি ঘোর প্যাঁচের মধ্যে ফেলে এভাবে জটিলতার সৃষ্টি করতেই চান মিঃ গুপ্ত ? তবে স্পষ্ট ক'রেই সে কথা বলুন না কেন, আমি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হই।

—আহা, রাগ করছেন কেন মিঃ সেনগুপ্ত ? দিনকয়েক দেরি হ'তে পারে, এই হচ্ছে কথা। এতে শুধু শুধু যদি আপনি মাথা গরম করেন…

লজ্জিত কণ্ঠে মিঃ সেনগুপ্ত বললেন—বেশ, তবে কবে দিচ্ছেন আমার শেয়ারের টাকাটা, বলুন।

—এই ধরুন, দিন দশেকের মধ্যেই…

টিং টিং টিং-টিং…

সজোরে দু'বার কলিং বেল্‌টা সশব্দে বেজে উঠল।

দামী উর্দিপরা বয় ছুটে এসে বলল—কেয়া হুকুম সাব্ ?

—দুটো লেমনেড্। জল্‌দি।

পূর্ব ব্যবহারের জন্য অনিলবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন—দেখুন, সাময়িকভাবে ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাইছি মিঃ গুপ্ত।

—মিঃ গুপ্ত বললেন—সে ত বটেই। যাক্, আপনার রাগ যে দূর হ'য়েছে এটাই শ্রীভগবানের পরম আশীর্বাদ। মানে…

কথার মাঝে মিঃ গুপ্ত কোন ফাঁকে যে অনিলবাবুর লেমনেডের গ্লাসে কি একটা বড়ি ফেলে দিলেন তা টের পেলেন না তিনি।

অনিলবাবু কথা বলতে বলতে যেই চুমুক দিতে যাবেন এমন সময় পেছন থেকে কে হেঁকে উঠল থামুন অনিলবাবু! এক ঢোক খেলেই আপনার মৃত্যু নিশ্চিত। আপনার দশা হবে ওর পূর্ব পার্টনার এবং ওঁর পূর্ব স্ত্রীর মতোই···

দুজনে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখেন পেছনে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ এক মূর্তি। সারা দেহটা তার কালো বস্ত্রের আড়ালে কৌশলে ঢাকা র'য়েছে। মুখে কুচ্‌কুচে কালো একখানা মুখোশ। তার ফাঁক দিয়ে চক্‌চকে চোখ দুটো যেন ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতই দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলছে।

মিঃ গুপ্ত হেঁকে উঠলেন –কে তুমি? কি প্রয়োজন তোমার এখানে? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এক্ষুণি গেট্‌ আউট্‌।

কালো মূর্তিটা হেসে উঠল বিচিত্র একটা অট্টহাসি। তারপর বলতে শুরু করল—যার ভয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আপনাদের মত বিপথগামী ধনীরা ত্রাসে সময় অতিবাহিত করে, আমি সেই দস্যু বাজপাখি। বহুদিন ধরে আপনারা সারা ভারতব্যাপী অসৎ কাজের যে জাল বুনে চলেছেন, তা আমি লক্ষ্য করেছি। প্রচুর দেখেছি, কিন্তু আর নয়। আপনি যদি বাঁচতে চান তবে আগামী তিন দিনের মধ্যে বিশ হাজার টাকা আ‍মার হাতে দেবেন এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। অন্যথায় আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব।

মিঃ গুপ্তের মুখ পাণ্ডুর, নিষ্প্রভ, মলিন।

বাজপাখি বলে চলল –দেখুন অনিলবাবু, আপনি যদি আপনার টাকা ফেরত পেতে চান তবে এই মুহূর্তে এর কবল থেকে দূরে গিয়ে আইনের সাহায্য অবলম্বন করুন। এর মত ঘুঘু লোক যে কোনও মুহূর্তে আপনার আসন্ন সময় ঘনিয়ে তুলতে পারে। আর শোন মিঃ গুপ্ত, তুমি যদি টাকা দিতে সম্মত কর আজ বিকেলের দিকে, যে কোনও সময় পর পর দুবার ঘরের আলো জ্বালবে আর নেভাবে। তোমার সঙ্কেত পেলে আমি বুঝব যে তুমি টাকা দিতে

প্রস্তুত। তোমাদের মত লোকের প্রতি আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য খোলা আছে। কিন্তু যদি আমার কথা অনুসারে না-চল, তবে তোমার ভবিষ্যৎ ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি। পৃথিবীর সমস্ত লোকের শরীর আতঙ্কে কেঁপে উঠবে সে কথা শুনলে।

ঘরের মধ্যে নিঃসীম স্তব্ধতা।

দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাজপাখি বলল - আচ্ছা অনিলবাবু, আমার সঙ্গে চলে আসুন। গুড্ বাই মিঃ গুপ্ত। আশা করি তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে।

রিভলভারটা বাগিয়ে ঘরে এক পা এক পা করে বাজপাখি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মিঃ গুপ্তের শরীরে তখন বোধ হয় জীবনের শেষ বিন্দুটুকু অবশিষ্ট নেই।

॥ চার ॥

—নৈশরাতের পথচারী

ঢং ঢং ঢং ঢং…

এগারোটা বাজল।

স্তব্ধ, নিথর কালো রাতের ভয়াল বীভৎসতা।

শোঁ-শোঁ…শন্ শন্……

ব'য়ে চ'লেছে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। কোন একটা অভিশপ্ত অশরীরীর করুণ দীর্ঘশ্বাসের মতই।

পথ জনমানবহীন। দূরে কোথায় যেন একটা কুকুরের আর্তনাদ বাতাসের তরঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

তার উত্তরে উল্‌টো দিক থেকেও তেমনি ভেসে এলো আর একটা কেঁউ-কেঁউ শব্দ। শব্দে শব্দে বাতাসের তুহিনতা যেন আরও ভয়াবহ হ'য়ে উঠল।

মিনিট তিনেক পর।

কুকুরের ডাক সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। শুধু দেখা গেল দু'জন লোক নৈশ আঁধারের গাঢ়তায় গা ভাসিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। তাদের কালো পোশাক রাত্রির নিকষ কালো আঁধারের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তারা আর সহজে কারো' নজরে পড়ে না।

আপন মনে লোক দুটি এগিয়ে চলেছে। কখনও ধীরে, কখনও জোরে। কখনও সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পর বিরাট একখানা বড়ো বাড়ির পেছনদিকে তারা এসে দাঁড়াল।

মার্জারের নিঃশব্দ গতি তাদের এগিয়ে চলার ভঙ্গির মধ্যে স্থিরভাবে ফুটে

উঠেছে। প্রত্যেককে দেখে বাইরে থেকে নিরস্ত্র মনে হ'লেও আসলে তারা নিরস্ত্র নয়। কেননা তাদের পোশাকের অন্তরালে লুকানো ছিল একটি করে দামী এবং শক্তিশালী অটোমেটিক রিভলভার।

কতক্ষণ যে অপেক্ষা করেছিল তা তারা জানে না। তাদের যখন খেয়াল হল যে এক্ষুণি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করা প্রয়োজন, তখন আর তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। তারা তখন নিজেদের গোপন রাখতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

বিনয়েন্দ্রবাবুর বাড়ির মধ্যে দেখা গেল দুটি আলো। ঠিক যে ঘরটায় বিনয়েন্দ্রবাবু নিহত হয়েছিল তার পাশে।

হঠাৎ নিভে গেল আলোটা।

ঠিক লৌহকক্ষের পাশে এসেই নিভে গেল। এতক্ষণ ধরে যে মূর্তিদুটি এগিয়ে আসছিল বাড়ির পিছনদিকে, তারা এ দৃশ্য দেখে অবাক হ'য়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারা কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না। একজন লোককে দেখা গেল দড়ি বেয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে সর্ সর্ করে নেমে আসতে।

ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত যে এ লোকটিই বাজপাখির দলের সামসুল, আর অন্য যে লোক দুটি নীচে আঁধারের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বসেছিল তারাই গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতনলাল।

—কে? ধীর প্রশ্ন।

দড়ি ধরে যে লোকটি নামছিল সে শব্দটা শুনে চমকে ওঠে। তারপর ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটির উপরে।

ঝটাপটি মারামারি· হৈ-চৈ - হট্টগোল—

দূরে শোনা যায় কতকগুলি লোকের ভয়ার্ত চীৎকার।

গুড়ুম! গুড়ুম!

গর্জে ওঠে পিস্তল কোন একটা ক্ষুধার্ত শার্দুলের হিংস্র গর্জনকেও ছাপিয়ে।

মানুষ কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ —আঃ...

মিনিট পনরো পর ছুটে আসে দ্রুত পদক্ষেপে কতকগুলি লোক।

দূরে শোনা যায় পুলিশের হুইসেল্।

তার উত্তরে আরও দূর থেকে ভেসে আসে অজস্র ভীত পুলিশের হুইসেলের মিলিত প্রতিধ্বনি।

দীপক চ্যাটার্জী চীৎকার ক'রে ওঠে—ক্যাচ হিম্ রতন······ডোণ্ট এলাউ হিম টু রান্ অ্যা-য়ে।

কিন্তু আহত রতনের তখন ওঠবার সামান্যতম ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে।

একটা ছায়ামূর্তি ছুটতে ছুটতে দূরে থেকে আরও দূরে মিলিয়ে যায়। হাল্কা আলোয় তার মূর্তিটাকে মনে হয় অদ্ভুত রহস্যময়। কুয়াশার আড়ালে মিশে যায় সে। আর তাকে দেখা যায় না।

দলে দলে পুলিশ ছুটে আসে।

বিনয়েন্দ্রকুমারের বাড়ির লোকজন এসে ভিড় করে। কিন্তু তখন আর বাজপাখির অনুচর শামসুল সর্দারের কোনও চিহ্নই নেই সেখানে।

দীপক হতাশভাবে বলে—পালিয়েছে! আমাদের সমস্ত বেড়াজাল ভেদ করে সিন্দুক লুট করে গা ঢাকা দিয়েছে। ওকে ধরার আর কোনও উপায়ই নেই!

॥ পাঁচ ॥

— থার্মিট

মিঃ গুপ্ত ফোন তুললেন—হ্যালো, মিঃ চ্যাটার্জী!

—কি খবর মিঃ গুপ্ত?

—এদিকে অবস্থা খুব খারাপ। এক্ষুণি চলে এসো।

—খুলে বলো না।

—ভরসা হচ্ছে না। দস্যুসর্দার বাজপখি যেভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে তাতে নিস্তার নেই কোনও মতেই।

—কেন?

—তার দাবি বিশ হাজার টাকা। আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি আমি সে টাকা মিটিয়ে দিতে রাজী না হই তবে আমাকে জটিল অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে।

—ঘটনা খুলে বলো না।

—অনিল সেনগুপ্তের বিষয় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে তাঁকে আনা হ'য়েছিল একথা তুমি জান?

—হ্যাঁ, সে ত আগেই বলেছিলে।

—কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করব ব'লে স্থির করেছিলাম, সেই সময় চমকে উঠলাম একটা ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দে।

—আশ্চর্য ত!

—হ্যাঁ, চেয়ে দেখি বাজপাখি তার চিরপরিচিত পোশাকে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সে অনিলবাবুকে আমাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আজ বিকেলের মধ্যেই সে কুড়ি হাজার টাকার দাবি জানিয়েছে। সেটা না করলে তার হাতে আমাদের নিস্তার নেই, একথা সে জানিয়ে দিয়ে গেছে বেশ স্পষ্ট ভাষায়।

—এখন কি করবে ঠিক করেছ ?

—কিছু এখনও ঠিক করিনি। তুমি এক্ষুণি চ'লে এসো; তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হোক্ কিছু করা যাবে।

—আমাদের চণ্ডুলাল ও চিমনলাল এই দুই গুণ্ডাকে খবর দিলে হয় না ?

—মাথা খারাপ! বাজপাখির কাছে তারা ত ব্রেক্ নস্য। আর পুলিশে জানানো ত অসম্ভব।

—বুঝতে পারছি সবই। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে দাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

• • •

—দেখ গুপ্ত, আর যাই হোক্, সামান্য কথায় আর ধম্‌কানিতে এতগুলি টাকা দেবার কথা আমি কল্পনা করতেও পারি না।

—কেন বলো ত ?

—দেখ, তুমি এটা ডেফিনিট্ জান যে বাজপাখিও একটা মানুষ···

—ভুল মিঃ চ্যাটার্জী, সম্পূর্ণ ভুল তোমার কথা। বাজপাখি একটা মায়াবী দস্যু। যার সন্ধানে আজ দু'বছর ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জিও হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তার কাছে আমরা ত অতি সামান্য।

—বুঝলাম ত সবই। কিন্তু এখন কিং কর্তব্যং ?

—এক কাজ করা যায়। আমাদের দলে আরও কিছু গুণ্ডা অ্যাপয়েণ্ট করা হোক। আর ব্যবস্থা করা হোক তারা দিনরাত এই অফিসঘরটিকে পাহারা দেবে।

—কারণ ?

—কারণ একথা তুমি জান যে, পাছে পুলিশ আমাদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট টের পায়, এজন্যে ব্যাঙ্কে খুব অল্প টাকা রাখবার ব্যবস্থা আমি করেছি।

—হ্যাঁ, তা ত জানি।

—বাকী প্রায় চার লাখ টাকা ও কোণের দিকে ছোট সেফটার মধ্যে আছে। প্রত্যেকটি থলিতে আছে পঁচিশ হাজার ক'রে টাকা।

—কিন্তু এতটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত হবে?

—নয় কেন শুনি? কিছু না—আমাদের চাই শুধু আরও তিনজন গুণ্ডা। তাদের দলবল সমেত তারা এই বাড়িকে পাহারা দেবে।

—সেটা ত ভাবনার কথা।

—ভাবনার কথা নয় মিঃ চ্যাটার্জী।

—হাঃ হাঃ হাঃ—

মিঃ চ্যাটার্জী আর মিঃ গুপ্ত সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে পুলিশের পোশাক পরা চারজন লোক। প্রত্যেকের হাতে একটি করে অটোমেটিক রিভলভার।

—তোমরা কে? মিঃ গুপ্ত অসহায়ভাবে প্রশ্ন করলেন।

—সেকথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? পাছে আপনি পুলিশে জানান তাই আমাদের আসতে হ'ল পুলিশের ছদ্মবেশে। যে বেশেই আমরা আসি না কেন, আমিই হচ্ছি সেই মূর্তিমান বাজপাখি আর এরা আমার খাদি ও অকৃত্রিম সহচরেরা।

—কি চাও তোমরা?

—তোমার ওই সিন্দুকে যে যক্ষের ধন আছে তা জানতাম না মিঃ গুপ্ত। আজ জানলাম। তাই এরা রইলো তোমাদের পাহারায়। আমি একটা থলি হস্তগত করছি। স্বেচ্ছায় দিলে না, তাই নিচ্ছি কিছু বেশী। মানে বিশের জায়গায় পুরো পঁচিশ হাজার।

দু'জনে বিস্মিত! হতভম্ব! নিশ্চুপ!

বাজপাখি সিন্দুকটার ওপর একটা সাদা রঙের গুঁড়ো ছিটিয়ে আগুন

জ্বালিয়ে দিল। দেখতে দেখতে সিন্দুকটার খানিকটা জায়গা গলে গেল। বাজপাখি হেসে বলল—এটার নাম হচ্ছে থার্মিট্। বুঝলে বোকারা?

বাজপাখি পুড়ে যাওয়া ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে সামনের থলিটা তুলে নিয়ে হেসে বলল—গুড্ বাই মিঃ গুপ্ত এণ্ড মিঃ চ্যাটার্জী।

মিঃ গুপ্ত আর মিঃ চ্যাটার্জীর মুখে তখন বিশ্বের বিস্ময় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

॥ ছয় ॥

—উর্ণনাভ

পরদিন বেলা আটটা।

খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে ছিল দীপক। আপন মনেই কি যেন ভাবছিল। ঘরে প্রবেশ করল রতনলাল।

কি রে, এত মনোযোগ দিয়ে কি ভাবছিস বল দেখি?

দীপক হেসে বলল—ভাবছি বাজপাখির ওই সাকরেদটার কথাই। এই এই দেখনা খবরের কাগজে কি লিখেছে।

দীপক কাগজটা এগিয়ে দিল রতনের দিকে। রতন পড়তে শুরু করল। তাতে লেখা আছে:

বিনয়েন্দ্রকুমারের বাড়িতে আবার বাজপাখির হানা।

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সাথে সংগ্রাম।।

রতনলালকে আহত করিয়া বাজপাখির অনুচরের পলায়ন !!

প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত !!

গত রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় বাজপাখি নামে বিখ্যাত দস্যু-দলপতির একজন অনুচর বিনয়েন্দ্রকুমারের লৌহকক্ষে হানা দিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের মাল অপহরণ করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্বে পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ আছে যে, পাঁচদিন পূর্বে এই দলের হাতেই বিনয়েন্দ্রকুমার নিহত হন। প্রথমতঃ এটাকে অ্যাক্সিডেন্ট বলিয়া মনে করিলেও, পরে জানা যায় যে, সেটা মোটেই অ্যাক্সিডেন্ট নয়। বিনয়েন্দ্রকুমারের শরীরে আকস্মিক ইলেকট্রিক শক দিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

উপরোক্ত রাত্রিতে প্রখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী পূর্বাহ্নেই বাজপাখির এক অনুচরের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া বাড়ির নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। বাজপাখির অনুচর যখন পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন তাহার সহিত সংগ্রাম হয়। তাহার ফলে দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল সামান্য আহত হয় ও বাজপাখির অনুচর পলায়ন করে।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন বাজপাখি সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রতিবিধান অবলম্বন করুন এবং এই দুর্দান্ত দস্যু-দলপতিকে গ্রেপ্তার করুন। অন্যথায় দিনের পর দিন যেভাবে নাগরিকদিগের জীবন বিপন্ন হইতেছে তাহাতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িতেছে ও পড়িবে। সারা ভারতের বুকে যে দস্যু-সর্দার ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কি কোনও উপায় নাই ?

লাইনগুলো পড়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলল রতনলাল। তারপর বলল —যত সব বাজে। কেবল বড় বড় বক্তৃতা দিতে ওস্তাদ। এদিকে বাজপাখির সাথে পাল্লা দিতে দিতে আমাদের যে কি নাকানি-চোবানি খেতে হ'চ্ছে তা যদি জানতো···

দীপক হেসে বলল—তুই যে ওদের উপরে বড্ড রেগে আছিস্ দেখতে পাচ্ছি!

—না-রেগে কি করি বল। শুধু আমাদের ব্যর্থতার কাহিনী আর শুনতে ভাল লাগছে না।

—কিন্তু তাতে যতদূর এগোনো সম্ভব তার চেয়ে কি বেশি এগোতে পারবি ব'লে মনে করছিস?

—না, তা অবশ্য নয়।

—তাহ'লে চোখ কান বুজে কাজ করতে শিক্ষা কর।

এমন সময় ডাক-পিওন কতকগুলি চিঠি দিয়ে গেল।

দীপক উপরের চিঠিটা টেনে নিয়েই নীলাভ খামটির দিকে চেয়ে চমকে উঠল।

খামটি খুলে পড়তে শুরু করল:

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সত্যই প্রশংসা করছি। ছদ্মবেশ ধরতে তুমি অদ্বিতীয়। আর তোমার সহকারীটিকেও কম বলা যায় না।

কাল রাতে তুমি যেভাবে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে আমার অনুচরের চোখে ধুলো দিয়েছিলে তাতে আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি। কিন্তু বন্ধু, আমার উপরে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। আর আমার অনুচর সামসুল যে পরিমাণ তীক্ষ্ণধী ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন তাতে……

যাক্, একটা কথা। তোমার মত তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দার জীবন নাশ করতে আমি চাই না। কিন্তু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি আর যাই কর না কেন, ভারতের বৃহত্তম দস্যু-সর্দার বাজপাখির পেছনে অযথা তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রো না। এতে ক্ষতি তোমার এবং আমার দু'জনেরই।

অন্যথায় তোমার মত বুদ্ধিমান এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার জীবন নাশ আমাকে করতে হবে।

আমাকে ছোট ভেবো না। তোমার পেছনে চব্বিশ ঘণ্টাই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা তোমার গতিবিধির উপরে আমার নজর আছে। অতএব পশ্চাদপদ হও বন্ধু।

ইতি—

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু,

বাজপাখি

চিঠিটা পড়েই দীপক বলল—অসহ্য। অসহ্য।

কথাটা শেষ ক'রেই দীপক চিঠিটা এগিয়ে দিল রতনের দিকে। রতন সেটা পড়ছিল অন্যমনস্কভাবে।

হঠাৎ দীপক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

—হ্যাণ্ড্স আপ।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে জানালার দিকে নির্দেশ করে গর্জে উঠল দীপক।

একটা ছায়ামূর্তি যেন সরে গেল শাঁ ক'রে একধারে।

লোকটা ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। দীপক তাড়াতাড়ি ছুটে গেল জানালার ধারে। জানালা থেকে রিভলবটার বাইরের দিকে লক্ষ্য করে লোকটির দিকে নজর রেখে বলল—এই, দাঁড়াও। নাহ'লে গুলি করব।

লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দীপকের দিকে তাকাতে লাগল।

রতন বের হয়ে লোকটাকে ধরে ফেলল। তারপর টানতে টানতে তাকে নিয়ে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে।

—এই, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে তা আমি জানতে চাই।

লোকটা ভয়ে ভয়ে বলল—আমি কিছু জানিনা বাবু, গরীব মানুষ।

—গরীব মানুষ ত অন্যের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিলে কেন?

—আমি ভিক্ষা চাচ্ছিলাম বাবু।

দীপক ক্ষেপে গেল। বললে—তুমি সত্যি কথা না বললে তোমাকে এক্ষুণি পুলিশে দেব। এসো আমার সঙ্গে।

লোকটি ইতস্ততঃ করছিল।

দীপক বলল—রতন, ওধার থেকে প্লাগটা ফিট্ কর ত। আমি ওর গায়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট লাগাতে থাকি। দেখি বাছাধন মুখ খোলে কিনা।

লোকটা এবার ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—দাঁড়ান, থামুন একটু। আমি এক্ষুণি সব কিছু বলছি।

দীপক বলল—কিন্তু এক ফোঁটা মিথ্যা কথা ব'লেছ কি সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা বন্ধ ক'রে দেবার ব্যবস্থা আমি করব।

—না না, বাবু। আমি ওসব প্যাঁচের মধ্যে নেই। একজন লম্বামত লোক আমাকে এসে বলল যে ঘরের মধ্যে কি কি কথাবার্তা হচ্ছে তা দেখতে। আমি যদি সব কথা খুলে বলি তবে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দেবে বলে স্বীকার করেছে। তার মধ্যে আমাকে দশ টাকা অগ্রিম দিয়েছে। এই দেখুন বাবু। আমি গরীব মানুষ···

দীপক বলল—সত্যি কথা বলছ ত? যদি জানতে পারি যে তোমার একটি কথাও মিথ্যা তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা···

লোকটা বাধা দিল—না না হুজুর! আমি কোনও কথাই মিথ্যা বলিনি। মিথ্যা কথা ব'লে মিছামিছি কি লাভ বলুন?

দীপক বলল—আচ্ছা যাও, এবারের মতো মুক্তি পেলে বটে। তবে যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন তেমন কিছু দেখি···

লোকটি বলল —না না, হুজুর ···এই নাকে কানে খত দিচ্ছি। আর কখনও আমি তেমন কিছু করব না।

লোকটিকে মুক্তি দিতেই সে পথে বেরিয়ে ছুট দিল। দীপক সেদিকে চেয়ে রতনকে বলল—এই, ওকে ফলো কর্। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।

রতন ঘাড় নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

॥ সাত ॥

—অনুসরণ

ঢং ঢং করে দূরের পেটা ঘড়িতে ছ'টা বাজল।

সারাদিন অজস্র ঘোরাঘুরি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল রতনলাল। একটা লোক যে কোনও মানুষকে এতটা ঘোরাতে পারে তা ছিল তার ধারণার বাইরে। লোকটা দেখতে বেশ খানিকটা নিরীহ গোছের সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মনে মনে যে এতটা ঘোর-প্যাচের বুদ্ধি খেলতে পারে, তা ছিল রতনের ধারণার বাইরে। বিভিন্ন ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ক'রে সে অজস্র ঘুরল। তারপর মাঝে মাঝে নানা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার ঘন্টাখানেকের মধ্যে বের হ'য়ে জোরে চলতে শুরু ক'রে দেয়। এ ধরনের ঘোরাঘুরি যে কোনও লোকের পক্ষে আশ্চর্যজনক তাতে সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যার দিকে টালিগঞ্জগামী একটা ট্রামে উঠে বসল লোকটা। রতনও পেছনের গাড়িতে উঠে চুপ্‌চাপ্ বসে রইল।

ট্রাম ডিপোয় নেমে লোকটা আর একটা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঢুকল একটা রেস্টুরেন্টে। সেখানে তার সঙ্গে জুটল দাঁত-উঁচু আর একটা লোক। সেই লোকটার চেহারা পূর্বের লোকটির চেয়ে আরও বেশি সন্দেহ-জনক ও মারাত্মক। তাছাড়া ওরা যেভাবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলছিল এবং মাঝে মাঝে চারিদিকে সন্দেহপূর্ণ চোখে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছিল তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হওয়া স্বাভাবিক।

রতনের চেহারা তখন আমূল পরিবর্তিত। তাকে দেখলে একটা অতি সাধারণ কারখানা-মজুর ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তাছাড়া তার চাউনিটা দেখে তাকে একজন বোকা লোক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল। দু'জনে চুপচাপ ব'সে রইল। কিন্তু কেউই খেয়াল করল না যে তাদের পকেট থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ ঠিকরে পড়ল মেঝের ওপর। কিছুক্ষণ পরে দু'জনে ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রতনের লুব্ধ চোখ কাগজটার উপরে আছড়ে পড়ল। সে এগিয়ে গিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিল। তাতে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—

১৩নং,

আজ রাত ন'টায় বেহালায় নিউ ভ্যালী হোটেলের পেছনে ৬৮নং কুঠিতে বৈঠক বসবে। তোমাদের পারিশ্রমিক সেখানেই পাবে। ইতি—

বাজপাখি।

চিঠিটা পড়েই রতনের মুখটা যেন আলোকোদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। হোটেল থেকে বেরিয়ে লোক দুটির খোঁজে তাকিয়ে দেখে যে তারা দু'জনে মিলে একটা বাদামী রঙের গাড়িতে উঠে বসল এবং গাড়িটাও তাদের দু'জনকে তুলে নিয়েই শিকারী ঈগলের মত তীব্রবেগে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

রতন মিনিট দশেক চুপ্‌চাপ ব'সে আর এক কাপ চা নিঃশেষ করল। তারপর বিলটা মিটিয়ে দিয়ে হোটেলের বাইরে এসে একটা পাব্‌লিক টেলিফোনে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে বলল —হ্যালো, সাউথ···

তারপর দীপকের সঙ্গে তার অনেকক্ষণ ধরে সাঙ্কেতিক ভাষায় যে সমস্ত কথাবার্তা হল তা বাইরের কেউই বুঝতে পারল না। কথা শেষ করে টেলিফোনটা রেখে আবার রতন পথে পা দিল। রাত তখন সাড়ে আটটা।

॥ আট ॥

– সংঘাত

দশটা বেজে গেল।

গাঢ় রাত্রির অখণ্ড কালিমার সঙ্গে নিটোল স্তব্ধতার আবরণ মিশে গিয়ে বাতাসকে থম্‌থমে ক'রে তুলেছে। এর মধ্যে হরেন মল্লিক রোড দিয়ে যে লোকটি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে তাকে দেখলে নেহাত মাতাল বা ভবঘুরে ধরনের লোক ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

পথের দু'পাশে যেভাবে ঘন ঘন চাইতে চাইতে সে চলেছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোনও কিছুর অন্বেষণেই সে পথ দিয়ে চলেছে। কিন্তু কি যে তার অভীষ্ট বস্তু তা সে ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

কুয়াশার জাল পৃথিবীর উপরে ছড়িয়ে পড়েছে একটা অস্পষ্ট সাদা আবরণের মতো। তার মাঝ দিয়ে কোনও কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। লোকটার বেশভূষা অতি সামান্য। একটা পাজামা, একটা সার্ট, পায়ে একটা অল্প দামী স্লীপার। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মুখে বেশী মদের গন্ধ। চলনের মধ্যে কেমন একটা ঢুলু ঢুলু ভাব। এত ঠাণ্ডায় যে তার চলতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল, তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় তাকে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে দেখে।

তবু কাঁপতে কাঁপতেই সে এগিয়ে চলেছে। আপন মনে বিড় বিড় করে কি যে বলছে তা বাইরের যে কোনো লোকের বোঝা দুঃসাধ্য। যেন আপনভোলা গোছের।

কিছুটা এগিয়েই লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কোথায় যেন একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল। লোকটা বলল—উঃ, যত সব বাজে জ্বালাতন!

মোড়ের মাথায় আসতেই তাকে মাতাল বলে বুঝতে পেরে একজন কনস্টেবল চিৎকার ক'রে উঠল—এই, এত্‌না রাত্‌মে কাঁহাপর যায়েগা তুম্?

লোকটি টলতে টলতে এগিয়ে এসে বলল—লেকিন্ দোস্ত, উ বড়া রাস্তামে তো কস্‌বীকো মোকাম্ হায় না, একঠো খাপসুরত্ ছবি রহতি থি···

আর কিছু না ব'লে কনস্টেবলটির হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে লোকটা আবার এগিয়ে চলল।

কনস্টেবলটিও এই ক্ষণিকের নৈশ-অতিথির কাছ থেকে আচমকা টাকাটা পেয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য না ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি দু'একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে আবার চলার পথ ধরল।

ধীরে ধীরে সে মোড়টা অতিক্রম ক'রে একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে চলল। পথে একটিও জনমানবের সাড়া নেই। ধীরে ধীরে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত লোকটি চলেছে যেন অত্যন্ত কষ্টে। চলতে চলতে হঠাৎ যেন সে থমকে দাঁড়াল।

অদূরে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় গ্যাসপোস্টের পাশে।

লোকটি আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখে নিল। ভদ্রলোকটির পরনে কালো রঙের কোট আর প্যান্ট। তার উপার ওভারকোট। মাথায় নাইট ক্যাপ্। সে ধীরে ধীরে গ্যাসপোস্টটি পাশে গিয়ে ভদ্রলোকটির সামনে হাত পেতে দাঁড়াল—হুজুর, দু'টো পয়সা···

অকস্মাৎ যেন দেখা দিল অদ্ভুত একটা পরিবর্তন।

ভদ্রলোকটি চক্ষের নিমিষে হাত তুল্‌ল ভবঘুরে লোকটিকে লক্ষ্য করে। তার হাতে বিরাট ধারালো ছোরা চক্‌চক্ ক'রে উঠল।

ছোরাটা লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে তোলবার সময় তার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ ফুটে উঠল আর দেখা গেল কোথা থেকে আরও দু'জন লোক ছোরা হাতে লোকটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'জনে ভবঘুরে লোকটিকে আক্রমণ করল আর একজন একটা টর্চ জেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখ নেড়ে কাকে যেন কি একটা সংকেত জানাল।

কিন্তু এদিকে দেখা গেল এক অচিন্তানীয় দৃশ্য। ভবঘুরে লোকটি এক লাফে পিছনে সরে দাঁড়াল। তারপর দেখা গেল তার হাতের চক্‌চকে রিভলভারটা শত্রুদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

আততায়ী তিনজনই আচমকা পিছনে লাফিয়ে প'ড়ে নিজেদের বেশ একটু দূরে রাখল। একজন একটা ছোরা ছুঁড়ে মারল ভবঘুরে লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে। সেও হঠাৎ ব'সে পড়ল ছোরাটা এড়াবার জন্যে। তারপর একজন লোকের হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

গুড়ুম্! গুড়ুম্···

নৈশ প্রহর কেঁপে উঠল তীক্ষ্ণ শব্দের প্রখরতায়।

আততায়ী তিনজন বিপর্যয় দেখে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু এমন

সময় দেখা গেল কালো একখানা মোটর গাড়ি। তিনজনেই মোটর গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল এবং নক্ষত্রবেগে মোটরটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ভবঘুরে লোকটি ছুটে কিছুদূরে এগিয়ে একখানা ট্যাক্সির খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও কোনও ট্যাক্সিই দেখতে পেল না।

ভবঘুরে লোকের বেশে ছদ্মবেশী রতন প্রাণপণে ছুটল গাড়িটার পেছনে। তারপর কিছুদূর এগিয়ে একটা গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে হেঁকে বলল—এই, জলদি চালাও।

ড্রাইভার বেচারা ঘুম থেকে উঠে সামনে রতনকে দেখে চমকে উঠেছিল। রতন একটা চাকতি বের করে তাকে দেখিয়ে বলল—এই, জলদি হাঁকাও, উল্লুক কাঁহাকা…

ড্রাইভার যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল তখন এগারোটা বেজে গেছে।

॥ নয় ॥

—মুখোমুখি

কলকাতার জনকোলাহল থেকে বহুদূরে বেহালার একটি নির্জন অংশ। শীতের রাতে সন্ধ্যার পরেই নেমে আসে কুয়াশার সাদা যবনিকা। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। ব্যাঙেরা তোলে ঐক্যতান। সরু সরু পথ। মাঝে মাঝে ছোট বদ্ধ খানা, ডোবা আর পুকুর।

হোটেলটার নাম 'নিউ ভ্যালি' হ'লেও বিশ্রী এবং কদাকার। প্রথম দর্শনেই মনের মধ্যে একটি ঘৃণার ভাব পাকিয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

রাত দশটা বেজে গেলেও হোটেলের মাঝে কোলাহল এখনও থামেনি। দু'চারজন লোক ঢুলু ঢুলু চোখে এখানে ওখানে বসে। দালানে কুশ্রীপূর্ণ কয়েকটি নারীমূর্তির ছবি।

সাড়ে দশটার সময় ঢ্যাঙা মতন একজন লোক হোটেলের কোণ থেকে উঠে বকতে বকতে রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর চারিদিকে একবার ভাল ক'রে চেয়ে নিয়ে হোটেলের ভেতরে একটা গলির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। তার সন্তর্পিত গতিভঙ্গী দেখে মনে হয় যে পৃথিবীর কাউকেই সে নিজের গতির সম্বন্ধে জানাতে ইচ্ছুক নয়।

তার এ গতিবিধির সাক্ষী রইলো না কেউ। একমাত্র পথের একটা ল্যাম্প পোস্টের নীচে বসে-থাকা পাগলটা কতকগুলি ময়লা ন্যাকড়া আর ছেঁড়া কাগজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মৃদু হাসল।

গলির মধ্যে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই একটা বড়ো বাগানবাড়ি। ঢ্যাঙা লোকটি বাগানবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দু'বার পর পর একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল।

আরো তিনজন লোককে দেখা গেল ধীরে ধীরে বাগানবাড়ির মধ্যে পায়ে পায়ে প্রবেশ করতে।

ঢ্যাঙা লোকটি অন্য তিনটি লোককে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে বাড়ির গহ্বরে আত্মগোপন করবার পর পাগলটিকে দেখা গেল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে। বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে সে ধীর পায়ে অগ্রসর হ'ল বাড়িটার দিকে।

বাড়ির মধ্যে ঠিক দশ পা এগিয়ে একটা জায়গায় এসে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে একটা গাছের উপর উঠে উপরে গাছের সঙ্গে একটা সরু তার ফিট্ করে ট্রান্সমিটারে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে বিড় বিড় করে কি সব নির্দেশ দিতে লাগল।

বাড়ির একখানা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে থাকা পূর্বদৃষ্ট চারজন লোককে দেখা গেল এই নির্দেশগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে।

লোকটি ব'লে চলেছিল—বন্ধুগণ, এবারের প্রত্যেকটি কাজেই তোমরা দেখেছ সাফল্যের মুখ। জয়ের মালা এবার তোমাদের গলায়। তোমরা বিনয়েন্দ্র-কুমারকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছ। তার লৌহকক্ষের বেড়াজাল ভেদ করে প্রাপ্য টাকাও ছিনিয়ে এনেছ। আমার প্রতিহিংসা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সমর্থ হ'য়েছি। এজন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তোমাদের প্রত্যেককে।

তোমরা আমাকে দিয়েছ নূতন পথের নির্দেশ। দেখিয়েছ সার্থকতার অমোঘ সোপান। তাই তোমাদের প্রত্যেককে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করবো আমি। তোমাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত টাকা তোমরা পাবে। আজকে তোমাদের পরবর্তী নির্দেশের আগে সে কথাটা তোমাদের বলবো আমি। তোমাদের ঘরের দক্ষিণ দিকের কোণে দেখতে পাবে বিশ হাজার টাকা একটি ছোট গর্তের মধ্যে সিন্দুকে রাখা আছে। তোমরা প্রত্যেকে তা থেকে পাঁচ হাজার করে পাবে পারিশ্রমিক হিসেবে।

এবার শোন, তোমাদের আমি দিচ্ছি বাকী কাজগুলির নির্দেশ। আমার আদেশ দীপক চ্যাটার্জীর মনঃপূত হয়নি। সে প্রাণের বিনিময়েও গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। এজন্যে উপযুক্ত

শাস্তি তাকে পেতে হবে। আমি দেখাবো যে বাজপাখি এ বিষয়ে তার প্রতিহিংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সমর্থ হবে।

রহমত খাঁর উপরে আমি দিচ্ছি এ কাজের ভার। শোন রহমত খাঁ, আগামী তিনদিনের মধ্যে যে কোন উপায়ে হোক্ গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর জীবনের অবসান তোমাকে ঘটাতে হবে। শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে বাজপাখি কাজে এক পাও অগ্রসর হয় না।

অতঃপর রূপনগরের রাজ-ভাণ্ডার লুণ্ঠন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার গতিকে আমরা প্রসারিত করছি। শোন...

॥ দশ ॥

— সংঘর্ষ

বেহালার রেস্ট রেন্টের ঠিকানায় পৌঁছে দীপক অবাক হ'য়ে গেল। ছোট একখানা কদর্য চা-খানা। আর তার পেছনে একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপরে ছোট ছোট অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েকটি বাড়ি।

এই বাড়িরই কোন্ গোপন কক্ষে যে চক্রান্তের বিষবাষ্প উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছে তা বাইরে থেকে বোঝা সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য।

বড় একটা বাগানবাড়ি। বাইরের প্রাচীরটি স্থানে স্থানে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। দীপক অত্যন্ত লঘুপায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

বাড়ির সামনে বিরাট একটি বাগান। নানা দেশী-বিদেশী গাছের একত্র সমাবেশ চারধারে। তারপরেই বিরাট বড়ো একখানা বাড়ি দাঁড়িয়ে।

এতক্ষণে দীপকের মনে হ'লো, এবার বোধ হয় সে উপযুক্ত স্থানে পৌঁছেছে।

বাড়ির বিরাট খিলানটার স্থানে স্থানে ভেঙে পড়ছে। চুনবালি অধিকাংশ জায়গাতেই ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে ইটগুলো দাঁত বের করে রয়েছে। পাড়ার মধ্যে ভুতুড়ে বাড়ি নামে খ্যাত। সেটা যে মিথ্যা নয় সেটা দীপক বাড়িটার দিকে চেয়েই বুঝতে পারল। এইসব বাড়িই ভুতুড়ে বাড়ি নামে খ্যাত হবার যোগ্য।

বাড়ির মধ্যে বিরাট বাঁধানো উঠান। তাকে ঘিরে অজস্র ঘর। প্রত্যেক ঘরের মধ্যেই পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধার জমে র'য়েছে।

দীপক বিভিন্ন ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। উন্মুক্ত ঘরগুলির প্রত্যেকটি দেখেও কোনও জনমানবের সাড়া পাওয়া গেল না।

হঠাৎ একটা বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দীপক চমকে উঠল। ভেতরে অস্পষ্ট মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

দরজা খোলার উপায় বাইরে থেকে দেখা গেল না। কি করবে তাই চিন্তা করছে। এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল দরজার উপরেই একটা বড়ো 'নব্'এর উপর।

সেটা ধরে টিপ্তেই সম্পূর্ণ দরজাটা খুলে গেল।

দীপক রিভলভারটা সামনের দিকে তুলে হাঁকল—হ্যাণ্ডস্ আপ! এক পা নড়ছে কি মাথার খুলি উড়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত চারজন লোকই সম্পূর্ণ বিমূঢ় হ'য়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

দীপকের চোখে-মুখে জয়ের উল্লাস ফুটে উঠেছে।

বাঁ হাতে টর্চের বোতামটা টিপে দিয়ে ডানহাতে বজ্রমুষ্টিতে রিভলভারটা চেপে ধরেছিল দীপক।

ওরা চারজনইই চুপ ক'রে দেখ্‌ছিল রিভলভারটার কুচকুচে কালো নলটার দিকে।

ওদের মধ্যে একজন পা টিপে টিপে ঘরের কোণে সরে গিয়েছিল, সে একখানা ছোরা বের করে দীপকের দিকে ছুঁড়ে মারবার উদ্যোগ করতেই দীপক ট্রিগারটা টিপে দিল।

গুড়ুম!

একটা তীক্ষ্ণ আর্ত-চিৎকার! লোকটার ডান হাতে গুলিটা বিদ্ধ হ'য়েছিল। সে তক্ষুণি মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হ'লো একট তুমূল হট্টগোল।

দীপকের পেছন দিক থেকে গম্ভীর-কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—অনেকদূর এগিয়ে এসেছো দীপক চ্যাটার্জী! কিন্তু আর নয়। এক্ষুণি মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও। রিভলভারটা হাত থেকে ফেলে দাও!

দীপক চেয়ে দেখল তার পেছনে দাঁড়িয়ে কালো পোশাকপরা একটি মূর্তি। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

দীপকের হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ল।

।। এগার ।।

— অবরুদ্ধ

রুদ্ধ আক্রোশে দীপক যেন ফুলতে লাগল।

অবরুদ্ধ দীপক চ্যাটার্জীর দিকে চেয়ে কালো পোশাকধারী মূর্তিটি বলে উঠল—কি খবর? দীপক চ্যাটার্জী যে! কি কারণে গোয়েন্দাপ্রবরের আগমন?

দীপক হেসে বলল—তোমারই খোঁজে মিঃ বাজপাখি।

—কিন্তু পাখিকে ফাঁদে ফেল্‌তে এসে নিজেই ফাঁদে পড়লে যে।

—কেন?

—এই তো তোমার মুখে দেখছি কথা সরছে না।

—বাজপাখি, মনে রেখো, জীবনে ভয় কাকে বলে দীপক চ্যাটার্জী তা জানে না। ও চেষ্টা করে বিশেষ কিছু লাভ হবে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ তা ত দেখতেই পাচ্ছ। আর ভয় পেয়ে যারা পিছু হটে তাদের আমি ঘৃণা করি। ভয় পেলে তোমার পেছনে পেছনে এতদূর ছুটে আসতাম না।

হ্যাঁ, সে জন্যে আমার আদালতে তোমার বিচার শেষ হ'য়ে গেছে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আমি তোমার মৃত্যুদণ্ড বিধান করলাম।

—কারণ?

—কারণ আমার আদেশ মেনে চল্‌তে তুমি রাজী হওনি, তাই…

—ওঃ, কিন্তু জনসাধারণের আদালতে তোমার কি শাস্তি হবে তা কি তুমি জান? সেখানে সকলের সামনে বিচারক যে তোমার ফাঁসীর হুকুম দেবেন, এটাও আশা করি ভুলে যাওনি।

— জানি, কিন্তু কে সেই লোক যে বাজপাখির মুখের ওপর বিরুদ্ধ কথা বলতে সাহস পাবে ?

—আমি এখনও বেঁচে আছি বাজপাখি।

—কিন্তু তোমার আয়ু আর অল্পক্ষণ।

—সে সম্বন্ধে তুমি কি স্থিরনিশ্চয় ?

—নিশ্চয়। তোমাকে···

বাজপাখির কথা শেষ হলো না।

পেছন থেকে কে যেন বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল—ভুল, বাজপাখি, এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের থাবা সর্বক্ষণই উদ্যত রয়েছে।

বাজপাখি অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রতনলাল, ডেপুটি কমিশনার মরিসন্ এবং আট-দশজন সশস্ত্র পুলিশ। প্রত্যেকের হাতে একটি করে পিস্তল উদ্যত হ'য়ে রয়েছে।

—এই মুহূর্তেই আত্মসমর্পণ কর বাজপাখি, নইলে আমাদের বিরাট বাহিনীর সামনে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে।

নিষ্ফল আক্রোশে বাজপাখি বলল—ঠিক আছে। কিন্তু এও বলে রাখছি, বাজপাখিকে তোমরা কখনই বেশীদিন বন্দী ক'রে রাখতে পারবে না। কিছু-তেই না। কোনও দিনই না।

দলবলসহ বাজপাখিকে বন্দী করে পুলিশ-লরিতে তোলা হ'ল।

॥ বারো ॥

—পলায়ন

পরদিন সকালে।

ডেপুটি কমিশনার মরিসনের খাস-কামরায় বসে আছেন ইন্স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু, দীপক চ্যাটার্জী, রতনলাল এবং আরও একজন।

ছুট্তে ছুট্তে একজন কনস্টেবল প্রবেশ করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আসামী ভাগ গিয়া হুজুর!

—কি ব্যাপার রে? কোন্ আসামী ভেগেছে?

—বাজপাখি ভাগ্ গিয়া।

—কি ক'রে পালাল?

—কাল যে গারদে বাজপাখিকে আট্কে রাখা হ'য়েছিল আজ সকালে দেখা গেল সে ঘরে বাজপাখি নেই, তার বদলে একজন বুড়ো আদমি ঘরের কোণে বসে বসে কাঁদছে।

—তোরা কি করলি?

—আমরা জিজ্ঞাসা করলে বুড়ো আদমি বলল যে, বাজপাখির বদলে আমরা নাকি ভুল ক'রে তাকেই গ্রেপ্তার করেছি। আমরা তখন তাজ্জব বনে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।

—দূর বোকা, হতভাগা! আরে এ সেই বাজপাখিই ছদ্মবেশ ধরেছিল। ছি ছি, তোরা কি ভুল করলি, আমাদের জিজ্ঞাসা না ক'রেই তাকে ছেড়ে দিলি কেন? আর কি ওকে কখনও ধরা যাবে?

দীপক বলল—সত্যি মেক্-আপ নেবার ক্ষমতা ওর অদ্ভুত, কি বলেন মিঃ মরিসন?

কনস্টেবলটি বলল - বুড়া আদ্‌মিটি চলে যাবার আগে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। সেটা ইংরাজীতে লেখা। তাই আমরা কেউ পড়তে পারিনি।

দীপক পড়ে দেখল।

তাতে লেখা :

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

চল্‌লাম বন্ধু! আবার হয়তো দেখা হবে ভবিষ্যতে।

ইতি—

তোমার চিরদিনের বন্ধু ও শত্রু

বাজপাখি।

দীপক চিঠিটা পড়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

সমাপ্ত

* এর পরবর্তী ঘটনা জানতে হ'লে 'বাজপাখির রণহুঙ্কার' পড়ুন।

জেনারেল লাইব্রেরী

১১৫এ, আপার চিৎপুর (রবীন্দ্র সরণী) কলিকাতা-৬

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

—পৌরাণিক নাটকাবলী সিরিজ—

অভিমন্যু বধ, কর্ণবধ, কমলে কামিনী দর্শন, চণ্ডীদাস, জয়দেব, গুরুনীলের বধ, জনা, ত্রিপুর-স্বর্গলাভ, দক্ষ-যজ্ঞ, দাতাকর্ণ, ধ্রুবচরিত্র, নল-দময়ন্তি, নিমাই-সন্ন্যাস, প্রহ্লাদ-চরিত্র, বিজয়-বসন্ত, বেহুলা-লখিন্দর, মেঘনাদ বধ, রাবণ বধ, রাম বনবাস, শকুন্তলা, সাবিত্রী-সত্যবান, পরশুরামের মাতৃহত্যা, সীতা হরণ, সীতার বনবাস, সুরথ-উদ্ধার, শ্রীবৎস-চিন্তা, হরিশ্চন্দ্র ও কংসবধ

—ঐতিহাসিক নাটকাবলী সিরিজ—

সিরাজদ্দৌলা, চাঁদরায়, কালাপাহাড় আলি, চন্দ্রগুপ্ত, পৃথ্বীরাজ, বাজীরাও, রাণী পদ্মা, রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, রাণী ভবানী, সুলতানা রিজিয়া, সীতারাম, নন্দকুমার, শিবাজী, পদ্মিনী আলমগীর টিপুসুলতান, সাজাহান ঔরংজেব, নারী-বসন্ত ও শিরী-ফরহাদ।

—রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী "**রহস্যের মায়াজাল**" সিরিজ—

যে কোন পুস্তকের একটি পাতা পড়িলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।

১। চক্রান্তের বেড়াজাল ২। পদ্মার বিভীষিকা ৩। রক্তের পিপাসা
৪। জীবন প্রতিশোধ ৫। শয়তানের ছুবলন ৬। রাতের অভিযান
১। কুচক্রে বাজপাখি ২। বাজপাখির পুনরাভিযান ৩। বাজপাখির রক্তলীলা ৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা ৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার ৬। রহস্যময়ী বাজপাখি ৭। বাজপাখির রহস্যজাল ৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র ১০। বাজপাখির মরণ-মহোৎসব।

রূপকথা সিরিজ—প্রতি গল্প পড়িলেই বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

১। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ২। ভূতের পাঁ ৩। শাকচুন্নির কেরামতি ৪। ভূতপেত্নী
৫। ব্রহ্মদৈত্যির গল্প ৬। ঠাকুরমার ঝোলা ৭। ঠানদি'র গল্প
৮। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর গল্প ৯। সোনার কাঠি রূপার কাঠি ১০। রাক্ষস পুরী
১১। রাক্ষস জামাই ১২। রাক্ষসীর দলে ১৩। রাক্ষসের দেশ।

বাজপাখির রণহুঙ্কার
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—৫নং

বাজপাখির রণহুঙ্কার

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক :—
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
২ হংশ পাবলিকেশন্
৩৯২।ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :—
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

এবছরের সবচেয়ে সেরা
ডিটেকটিভ সিরিজ
শ্রীস্বপনকুমারের লেখা
"—বাজপাখি সিরিজ—"
১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি, ২। বাজপাখির পুনরভিযান,
৩। বাজপাখির রক্তলীলা, ৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা,
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার, ৬। হত্যাকারী বাজপাখি,
৭। বাজপাখির রহস্যজাল, ৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি,
৯। বাজপাখির কূটচক্র, ১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব।

মূল্য : ২.৫০ টাকা
মুদ্রাকর—শ্রীবিশ্বনাথ রায়
নিউ শক্তি প্রেস
১এ, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাজপাখির রণহুঙ্কার

—এক—

—নতুন খবর—

খবরের কাগজের বুকে কোনও একটি কোণে ছোট্ট একটা খবর বের হয়েছিল। সেদিকে কারও দৃষ্টি বড়ো একটা আকৃষ্ট হয়নি। সাধারণ লোক এসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে মাথাও ঘামায় না বিশেষ কিছু।

খবরটা ছোট্ট। ছাপাও হয়েছিল ছোট ছোট অক্ষরে :

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অদ্ভুত আলো। পর পর দু'জন লোক অদ্ভুতভাবে নিখোঁজ।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি অবহেলিত অনাদৃত দ্বীপ কিউফু। এই দ্বীপটিতে লোকের বাস একেবারে নেই বললেই হয়। যা আছে তা অসভ্য বন্য জাতীয় আদিম অধিবাসীরা। আর ক্ষুদ্র এই দ্বীপটিতে রাজ্য বিস্তার করে কোনও লাভ নেই বলে কোনও সভ্য গভর্ণমেণ্টও সেদিকে বিশেষ নজর দেয় না।

মাসকয়েক আগে শীতের এক রাত্রিতে একখানি ডাচ্ যাত্রীবাহী জাহাজ এই দ্বীপটির কাছ দিয়ে চলেছিল। তারা হঠাৎ এই দ্বীপটির বুকে এক তীব্র আলোকরেখা দেখতে পায়। কুয়াশায় চারিদিক এত গভীরভাবে আচ্ছন্ন ছিল যে, দূরবীণ দিয়েও বোঝা যায়নি এই আলোকের উৎস কোথায়।

এই ধরনের তীব্র ঈষৎ নীল আলো যে কোনও সভ্য মানুষের দ্বারা কোনও যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন এ সম্বন্ধে সকলে স্থির নিশ্চয় ছিল। গভীর রাতে জাহাজের কোনও লোকই এই দ্বীপটির বুকে নামতে সাহস করেনি। তাই ব্যাপারটা এখানেই চাপা পড়ে যায়।

মাসখানেক পরে একখানি বৃটিশ জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া থেকে ভারতের দিকে আসার পথেও দেখতে পায় এই দ্বীপটিতে এক ঝলক তীব্র আলো জ্বলে উঠল। তারপর একটি বিরাট হাউয়ের মতো যন্ত্রকে আকাশের দিকে উঠে যেতে দেখা যায়।

এটা দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং দ্রুত জাহাজ চালিয়ে দ্বীপটির সীমানার বাইরে চলে যায়।

জনমানবশূন্য, নিভৃত এই দ্বীপে সভ্য পৃথিবীর বাইরে এ ধরনের রহস্যজনক ব্যাপারে দুটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকরাই অবাক হয়ে যায় এবং দেশে গিয়ে এ সম্বন্ধে গল্প করে। দেশের লোক ব্যাপারটা শুনে অনেকেই হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু দু'জন বৈজ্ঞানিক বিষয়টা শুনে কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়ে বিষয়টা অনুসন্ধান করতে মনস্থ করে। সেই বৈজ্ঞানিক দুজনের নাম জ্যাকসন এবং এণ্ডারসন। কিন্তু তাঁরা গত এপ্রিল মাসের পনেরোই তারিখে সেই যে একখানা বড় মোটর লঞ্চ নিয়ে দ্বীপটির দিকে যাত্রা করেন তারপর আর তাঁরা ফিরে আসেননি। এর পিছনে কি গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে তা আমরা জানি না। তবে এ ধরনের ঘটনা যে কোনও সভ্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

বার দুয়েক খবরটির উপর চোখ বুলিয়ে মুখ তুলল প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী।

দিনকয়েক কোনও কাজ হাতে না থাকায় রতনের মন বেশ একটু হাল্‌কা ছিল। একখানা বিলিতি ডিটেক্‌টিভ নভেল শেষ করে গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সে ঘরে প্রবেশ করল।

দীপক হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে জোরে বলে উঠল—ওয়াণ্ডারফুল! সত্যিই আশ্চর্য!

রতন অবাক হয়ে বলল—সেকি? আমার বেশভূষার মধ্যে তুই আশ্চর্য হবার কি পেলি?

—তোর বেশভূষা নয়।

—তবে কি গান?

—ও ত বহু পুরানো একটা সিনেমার বাজে বিরহের ন্যাকা কান্না। যতো সব!

—তবে কি?

—এই খবরের কাগজটা।

—তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি দীপক?

—তার মানে? আমার মতো মাথা বাংলায় কটা আছে?

—তবে তুই খবরের কাগজটাকে বলছিস ওয়াণ্ডারফুল!

—তুই কি এটা পড়েছিস্।

—না।

—তবে আমার কথা মিথ্যা বল্‌ছিস্ কি করে?

—তোর মত সাত সকালে উঠে খবরের কাগজের থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় পড়ে লাভ কি? অমুক নেতার বক্তৃতা থেকে আরম্ভ করে অমুকের সেঞ্চুরী, মোহনবাগানের জয়লাভ আর মধুবালা কিংবা অশোককুমারের আধুনিক কোনও একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন এসব রাবিশ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সকালে ত আর এই সুন্দর ব্রেনখানায় ঘুণ ধরাতে পারি না!

—তা না হয় নাই করলি। এই যে কোণে সমস্ত বড় বড় খবর আর বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদের আড়ালে ছোট্ট একটা খবর বের হয়েছে সেটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নে ত!

—বেশ, আজ থেকে তোর নাম দিলাম নিউজ পেপার ডাইজেষ্ট!

—অর্থাৎ?

—খবরের কাগজের সব লম্বাই চওড়াই বুলিগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে আসলে দু'চারটে খবর তুই পরিবেশন করবি।

—সত্যি, উপাধিটা আমার বেশ মনের মতন হয়েছে। এই সেল্‌ফ-প্রোপাগাণ্ডার যুগে এরকম দু'চারটে উপাধি পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা বলতে চাস্?

—যাক্, উপাধি বর্ষণ পালা সাঙ্গ হবার পর এবার খবরের পালায় আসা যাক্।

—গভীর মনোযোগের সঙ্গে রতন খবরটা পড়ল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল—আশ্চর্য!

—হাঁ, আশ্চর্য ত বটেই। এখন দেখতে হবে কি আশ্চর্য, কেন আশ্চর্য, কোথায় আশ্চর্য। সেই সঙ্গে যোগসূত্র আছে এমনি কোনও ঘটনার সংবাদ পেলে তাও নোট্ করতে হবে।

—ভেরী গুড্!

—তার মানে?

—খবরটি দেখেই যে একেবারে তদন্ত করবার মতো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ সুরু করে দিলি!

—করব না?

—নিশ্চয়ই না।

—কেন?

—আগে বড়ো বড়ো দু'চারটে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ঘায়েল হোক্। আমাদের কল্ আসুক। তারপর না হয় দয়া করে…

হো হো করে হেসে উঠল দীপক। তারপর বলল—তুইও যে সেল্‌ফ-প্রোপাগাণ্ডা সুরু করছিস্…

—তা তোর যখন শাকরেদ, তখন…

—তার মানে আমি খুব সেল্‌ফ-প্রোপাগাণ্ডা করি ?

—তা এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান কি কেউ বিনা উদ্দেশ্যে করতে চায় ? এ ত সুনাম অর্জ্জনের জন্যেই।

—তা হতে পারে। তবে আমরা খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কেস্ সল্‌ভ করে তারপর সুনাম পাই। বড়ো বড়ো নেতাদের মতো বুলি কপ্‌চে ত আর নয়। আর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনও সিনেমা পত্রিকার সম্পাদকের মতো ফাইন্ আদ্দির পাঞ্জাবি আর চোখে দামী চশমা লাগিয়ে দু'চারটে মিটিংএ সভাপতিত্ব করেও নয়।

—যাক্ সে কথা। এখন এ খবরটা নিয়ে কি করা যেতে পারে ? কেনই বা এর পেছনে 'ওয়াইল্ড বাফেলো' তাড়াতে আমাদের মস্তিস্কে ঘর্ষ বর্যণ ?

—কারণ আছে।

—এটা কি গাঁজাখুরী বিলিতি ডিটেক্‌টিভ বইয়ের মতো মঙ্গল গ্রহের কোনও আগন্তুকের কর্ম বলে মনে হয় তোর ?

—না।

—কোনও গভর্ণমেন্টের গুপ্ত গবেষণাগার ?

—তাও না।

—কোনও পাগলা বৈজ্ঞানিকের খামখেয়াল ?

—হতে পারে।

—অথবা ?

—অনেক কিছুই। এমন কি যদি শুনতে পাই যে বাজপাখি এর সঙ্গে জড়িত তাও অবাক হব না।

—তুই কি সব সময় বাজপাখির স্বপ্ন দেখছিস ?

—না স্বপ্ন নয়। আমি ত বললাম হতে পারে। না হতেও যে পারে না, তা নয়।

—কারণ ?

—বাজপাখি যে ভারতে বর্তমান নেই, এটা ত তুই মানিস্ ?

—আপাততঃ থাকার কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না।

—বাজপাখি কখনও নীরবে থাকে না। যেখানেই তার অবস্থান হোক না কেন, আমরা তার কর্ম-পদ্ধতি দেখলেই টের পেয়ে যেতাম।

—হয়তো সে ভারতের কোথাও চুপ করে বসে আছে। তোর কাছ থেকে তাড়া খেয়েই তার পলায়ন।

—পালিয়েছে সত্যি। তবে তার পলায়ন কলঙ্কিত আত্মগোপন নয়। নতুন এক সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি।

—কি করে বুঝলি তা ?

—বাজপাখির এইটাই চিরাচরিত রীতি।

—বুঝলাম।

—তবে এটার সঙ্গে যে সে আছে তা আমি জোর গলায় বলছি না। এটাও আমার একটা কল্পনা। সে কথা থাক্। আমার এখন প্রশ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপের ব্যাপারটায় কোনও গভর্ণমেন্ট গুরুত্ব না দিলেও এই দুজন বৈজ্ঞানিকের টনক নড়ল কেন ?

—অতটা বুঝে উঠতে পারছি না।

—জ্যাক্‌সন ও এণ্ডারসন্ এই দুজনেরই বিজ্ঞানজগতে কিছুটা নাম আছে !

—স্বীকার করি।

—এদের প্রতিভাও নেহাৎ কম নয়।

—হুঁ।

—এখন দেখ, গভর্ণমেন্ট ওই ছোট্ট ব্যাপারটায় মাথা ঘামাচ্ছে না

কেন? যেহেতু দ্বীপের মধ্যে আলোই জ্বলুক আর হাউই বাজীর ভেলকীই খেলুক কোনও সভ্য নাগরিকের তা ক্ষতির কারণ হয়নি।

—সে ত বটেই।

—আর অসভ্যরা ওটাকে হয়ত দেবতার কোপ বা ঐ ধরনের একটা কিছু মনে করে নিয়েছে।

—হতে পারে!

—তা হলে বুঝতে পারছিস্ কোনও গভর্ণমেণ্ট এই নির্জন দ্বীপের আলো আর হাউইবাজী নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তাছাড়া দ্বীপটা ছোট এবং লোকবসতির অনুপযোগী। কোনও খনিজ সম্পদ বা এ ধরনের কিছুও এর নেই।

—বেশ।

—কিন্তু বৈজ্ঞানিক দুজনের টনক নড়ল কেন? তাঁরাই বা হঠাৎ একটি লক্ষ্য নিয়ে দ্বীপটি পরিদর্শন করতে যাত্রা করলেন কেন?

—এটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিক দুজন ঐ নীলাভ রঙের আলো আর আলোর হাউইবাজীর মধ্যে দেখেছিলেন কোনও বৈজ্ঞানিক অগ্রভের ইংগিত। কিংবা হয়তো কোনও নতুন আবিষ্কারের গন্ধ তাঁরা পেয়েছিলেন। তাই কৌতূহলী হয়ে তাঁরা দুজন এই দ্বীপের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

—অসম্ভব নয়।

—তারপর চিন্তা করো তাঁরা নিখোঁজ হলেন কেন? আর যাই হোক্ দ্বীপের এই আলোর সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে অথবা কোনও কারণে মতভেদ না হলে তাঁরা নিখোঁজ হতেন না।

—সে ত বটেই!

—তাহলে বুঝে দেখ, দ্বীপের যারাই এই তীব্র নীলাভ আলোর

সৃষ্টিকর্তা হোক্ অথবা হাউই নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করুক না কেন, তারা কখনই বৈজ্ঞানিক দুজনকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেনি। আর তাই তাদের সঙ্গে ওদের সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তার ফলেই তারা হয়েছে নিখোঁজ।

—এটা অবশ্য সঠিক বলা যায় না।

—আরও একটা জিনিস হতে পারে। হয়ত ঐ বৈজ্ঞানিক দুজন আড়াল থেকে ওদের কোনও আবিষ্কারের গোপন তথ্য জানতে পেরেছিল। তাই ওদের দুজনকে তারা আটকে রেখেছে যাতে এই গবেষণার বিষয়টা সভ্য জগতের মাঝে প্রচারিত না হয়।

—এটা অবশ্য আরও বেশি সম্ভব।

—সে যাই হোক্ না কেন, লেট্ আস্ ইন্‌ভেষ্টিগেট দিস্ ম্যাটার সিক্রেটলি। আমরা সেই দ্বীপে যাব না বটে, তবে ঘটনাপরম্পরায় ব্যাপারটা কি ঘটে সেটা লক্ষ্য করে যাব।

—তাতে লাভ?

—লাভ ভবিষ্যতে হতে পারে। আর আমরা কাউকে জানাব না যে বিষয়টা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমার মনে হয় দুজন বৈজ্ঞানিক যখন এভাবে নিখোঁজ হয়েছেন তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এবার সভ্য জগতের মন আকর্ষণ করবে।

—দেখা যাক্।

—দুই—

—রহস্যময় মোটরগাড়ী—

গভীর রাতে একবার নিজের এলাকার সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে ফিরে দেখা সাব-ইন্‌স্পেক্টর বসুর বহুদিনের অভ্যাস। মোড়ে মোড়ে যে বীটের পুলিশ দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় তাদের প্রত্যেককে তিনি মাঝে মাঝে এভাবে সজাগ করে দিয়ে থাকেন।

কোল্‌কাতা শহরের অন্তর্ভূক্ত না হলেও বরাহনগর অঞ্চলটাকে বরবরর কোল্‌কাতার মধ্যে ধরা যেতে পারে। বাজার, দোকান, হোটেল কোনটারই প্রাচুর্যের অভাব নেই। গোটা বরাহনগর অঞ্চলটাই ইনস্পেক্টর বসুর এলাকাভূক্ত। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও তিনি তাই গোটা অঞ্চলটা পায়ে হেঁটে ঘোরবার ইচ্ছা নিয়ে বের হয়েছিলেন।

রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। সিনেমা হলগুলোর শেষ শো বহুক্ষণ আগে ভেঙে গেছে। জনহীন পথ। মাঝে মাঝে দু'একটা পথের কুকুর শুধু ঘেউ ঘেউ শব্দ করে তাঁর চলার পথে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি করে মাত্র।

হঠাৎ একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে সাব্-ইন্‌স্পেক্টর বসু আচম্‌কা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনতলার কোণের একটা ঘরের বারান্দায় যেন একটা ছোট্ট আলো নড়ছে। খানিকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, সেটা একটা টর্চ। কেউ বারান্দা থেকে হাত বের করে একটা টর্চ জ্বেলে ধীরে ধীরে হাত নাড়ছে।

—সো ষ্ট্রেঞ্জ! আপন মনেই তিনি বললেন। তিনি বুঝতে পারলেন হাত নেড়ে আলোর সাহায্যে কেউ অপরকে সংকেতে আহ্বান করছে। কিন্তু এই নিশুতি রাতে তিনতলার বারান্দায় এই ধরনের সংকেতের উদ্দেশ্য?

সাব্-ইন্স্পেক্টর বসুর মনে পড়ল এই তিনতলা বাড়িখানি একটি হোটেল। এই হোটেলটাতে নানা ধরনের অনেক লোক থাকে এটাও তাঁর অবিদিত নয়। কিন্তু পুলিশ কোর্টে আলোর সাহায্যে সংকেতে নির্জন রাতে কাউকে আহ্বান করার মধ্যে আর যাই হোক্ না কেন কোনও সাধু উদ্দেশ্য যে লুকিয়ে নেই এ সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চয়।

—হিস্ হিস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্···

মোটরের ইঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ।

পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকের একটা বাড়ির দালান ঘেঁষে সোজা হয়ে চুপ করে করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

মোটরটা এগিয়ে এল। ছোট একটা প্রাইভেট মোটর। নম্বরটা অনেক খেয়াল করে তিনি নোট করে নিলেন। মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, নম্বর নিয়ে কোনও লাভ হবে না, কেননা এ ধরনের কাজে যারা এগিয়ে আসতে সাহস করে তারা আর যাই হোক্ নেহাৎ নির্বুদ্ধির মত কাজ করে না। নম্বরটি নিশ্চয়ই পাল্টে দেওয়া আছে।

মোটরটি হোটেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। হোটেলের তিনতলায় যে আলোর সিগন্যাল দিচ্ছিল সে একটু আগেই টর্চ নিবিয়ে ফেলেছিল। এবার দেখা গেল পাইপ বেয়ে একজন লোক হোটেলের তিনতলা থেকে একতলায় নেমে এলো। তারপর একলাফে মোটরটায় উঠে বসল।

হুস্ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে মোটরটি আবার চল্‌তে আরম্ভ করল্।

দূরে কোথায় একটা নৈশ কুকুরের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে এলো—ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

সাব্-ইন্স্পেক্টর বসু বুঝতে পারলেন, কোন দুষ্কার্য করে নিশ্চয়ই

দুষ্কৃতকারী এই মোটরে করে পলায়ন করল। আর ওই আলোর সিগ্‌ন্যাল দিতেছিল সেই লোকটাই।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল সোঁ-ও-ও···

সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর বসু জোরে পা চালিয়ে মোড়ে এসে বীটের কনস্টেবল্‌কে বললেন—শত্রুঘ্ন সিং। থোড়া সাবধান মে খাড়া রহো।

খট্‌ করে স্যালুট করে শত্রুঘ্ন সিং বলল—কেয়া হুয়া সাব্‌।

—একটু আগে এখান দিয়ে একটা মোটরগাড়ি গেল তা দেখেছ ?

—জী হুজৌর !

—ওই গাড়ীতে একদল বদ্‌মাস্‌ ভাগ্‌লো। তুমি দাঁড়াও আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওদের অনুসরণ করি।

কিন্তু ট্যাক্সি নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেও তিনি সেই রহস্যময় মোটরগাড়ির আর কোনও সন্ধানই পেলেন না।

—তিন—

—বৈজ্ঞানিক হোয়াংসী—

পরদিন বিকেলে অনেকগুলি সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামা দিয়ে যে অ্যাড্‌ভান্স টেলিগ্রাম বের হলো তা পড়ে কোল্‌কাতা শহরের অনেক লোকই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

বিখ্যাত চীনা বৈজ্ঞানিক হোয়াংসী নিহত !

বরাহনগরের হোটেলে দুষ্কৃতকারীর হানা !!

সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর বসুর সম্মুখ দিয়া মোটরযোগে আততায়ীর পলায়ন !!!

গতকাল রাত্রি প্রায় বারটার সময় বরাহনগর থানার সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর বসু যখন তাঁর প্রাত্যহিক ডিউটি থেকে ফিরছিলেন তখন তিনি সেখানকার 'শান্তি আবাস' বোর্ডিং হোটেলের তিনতলায় কোনও একজন লোককে টর্চের সাহায্যে সংকেত প্রেরণ করতে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তারপরেই তিনি দেখেন সেখানে একটি মোটর এসে দাঁড়ায় এবং একজন লোক তিনতলা থেকে পাইপ বেয়ে নেমে এসে মোটরে চড়ে বসে। তারপর মোটরটি দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়। সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর বসু প্রচুর খোঁজ করেও মোটরটির কোনও সন্ধান পান নি।

তারপর আজ সকালে উক্ত হোটেলের ম্যানেজার হোটেলের তিন-তলার সতেরো নম্বর ঘরে যান তাঁর প্রাপ্য টাকা আদায় করতে। বেলা তখন প্রায় ন'টা। অত বেলাতেও ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তিনি অবাক হন। তিনি তখন ঘরের মেম্বারকে জাগিয়ে দেবার জন্য বারবার কড়া ধরে নাড়তে থাকেন। কিন্তু তবুও কোন সাড়া পান না।

তখন তিনি আরও লোকজন ডেকে দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন উক্ত বোর্ডার ঘরের মেঝেয় পড়ে আছেন আর তাঁর বুকে

আমূল বিদ্ধ রয়েছে একখানা সুদীর্ঘ ছোরা আর মৃতদেহের পাশে পড়েছিল চীনা ভাষায় লেখা একখানা কার্ড।

হোটেলের ম্যানেজার পুলিশে খবর দেন। পুলিশ প্রথমে নিহত ব্যক্তিকে সাধারণ একজন চীনাম্যান বলে মনে করেছিল। কিন্তু সাব্-ইন্স্পেক্টর বসু একজন চীনাম্যানকে এনে কার্ডটি পাঠ করিয়ে বুঝতে পারেন যে, উক্ত নিহত ব্যক্তি একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক। তার নাম হোয়াংলী।

চীনা ভাষায় কার্ডে লেখা ছিল—

বৈজ্ঞানিক হোয়াংলী,

তুমি প্রতিভাবান হয়েও আমার আদেশ অমান্য করেছ। তাই তোমাকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল। প্রার্থনা করি স্বর্গে গিয়ে তোমার আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। ইতি—

তোমার একান্ত বন্ধু।

কার্ডের নিচে কোন লোকের নাম ছিল না। এ ধরনের কাজকে আমরা এর আগে হয়ত বাজপাখির কাজ বলে সন্দেহ করতে পারতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে বাজপাখির কোনও নাম কার্ডের নীচে লেখা ছিল না। আর বাজপাখি কখনও কোন কাজ করেই নিজের নাম প্রচার না করে ক্ষান্ত হয় না। তাই আমরা মনে করছি, এটা অন্য কোনও চক্রান্তকারীর কাজ। তাই আমরা এ ব্যাপারে আশু তদন্ত কামনা করি।

আর একখানা পত্রিকায় আরও লিখেছে :

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হোয়াংলী যে কেন এভাবে আত্মগোপন করে বরাহনগরের একটি সামান্য হোটেলে বাস করছিলেন তা আমরা জানি না। তবে আমরা চাই, যে কারণেই হোক, তাঁর মত একজন প্রতিভাবান লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে যারা খুন করেছে তাদের অবিলম্বে শাস্তি প্রদান করা

—চার—

—গোপন ডায়েরী—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

টেলিফোনের আহ্বান।

রিসিভারটা তুলে নিল দীপক।

—হ্যালো, কোত্থেকে কথা বলছেন?

—ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্।

—ও, আপনিই নর্থ সেক্‌সনের···

—ইয়েস্, মিঃ চ্যাটার্জী।

—বেশ। আপনি আমাকে যে নিশ্চয়ই ডাকছেন বৈজ্ঞানিক হোয়ংলীর ব্যাপারে তা আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারি।

—আশ্চর্য ত! কি করে বুঝলেন আপনি?

এটুকু বোঝা এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। শুধু একটু কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করা। আজকের খবরের কাগজের খবরটা আমার চোখে পড়েছে। তারপরেই আপনার এই টেলিফোনিক আহ্বান।

—এটা আবার আপনার কি ধরনের কথা হল মিঃ চ্যাটার্জী?

—ব্যাকরণের ভুল হলেও আপনার বুঝতে যখন অসুবিধে হচ্ছে না তখন মেনে নিন নির্বিবাদে।

—বেশ মেনে নিলাম। এখন বলুন কখন আসছেন।

—কদ্দূর এগিয়েছেন?

—যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

···সূত্রটুত্র?

—হু' একটা আছে। আর সে সম্বন্ধে আলোচনা করতেই আপনাকে ডাকছি কিনা। এ সব ব্যাপারে আপনার বুদ্ধি যে আবার আমার চেয়ে একটু বেশি খেলে।

—তা না হয় হল। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আপনি থাকছেন ত?

—হাঁা, আমি এখন আপনার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল। ঝট্ করে এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক অক্কা পেয়ে আমাদের কি বিপদেই যে ফেললেন তা আপনাকে কি বলবো? এখন চাকরী রাখতে প্রাণান্ত।

—কিন্তু হোয়াংলী পৃথিবীর এত জায়গা থাকতে বরাহনগরের ঐ ছোট একটা নির্জন জায়গায় অত ছোট একটা হোটেলে থাকতে এলেন কেন?

—তার কারণ একটা খুঁজে পেয়েছি, আপনি এলে সাক্ষাতেই সব বলব।

—ধন্যবাদ। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আসছি। ঠিক সন্ধ্যা আটটায় পৌঁছে যাব।

—ধন্যবাদ।

* * *

* * * * * *

সন্ধ্যার পর।

ইন্স্পেক্টর মরিসনের গোপন কক্ষে বসে আলোচনা চলছিল প্রাইভেট ডিটেক্টিভ দীপক আর মরিসনের মধ্যে। আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিই এ কক্ষে প্রবেশাধিকার পায়নি।

মরিসন্ একটু হেসে সুরু করল—সত্যি কথা বলতে কি মিঃ চ্যাটার্জী আমি যতটা এগিয়েছি তার চেয়ে যেন আরও অনেকটা পেছিয়ে পড়েছি।

—তার মানে?

বৈজ্ঞানিক হোয়াংলীর কক্ষ অনুসন্ধান করে আমি যে একটা কার্ড

পেয়েছি ত, ত আপনি জানেন। আর পেয়েছি একখানা ডায়েরী। তার মাথামুণ্ডু যে কি তা বুঝতে পারছি না, সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

—অর্থাৎ?

—ডায়েরীটা লেখা চীনা ভাষায়। প্রফেসার হোয়াংলীর লেখা বলেই মনে হলো আমার। সেটার ইংরাজী তর্জমাও করিয়েছি। কিন্তু দেখুন ত এ থেকে কি বুঝবেন আপনি?

—আপনারা কি এ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেছিলেন?

—না, আমি আর সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর বসু ছাড়া কেউ জানে না এটার খোঁজ।

—বেশ দেখি, এটা যদি সম্ভব হয় ত পাঠোদ্ধার করে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ ডায়েরীটা এগিয়ে দিলেন।

ডায়েরীর প্রথম পাতায় শুধু বৈজ্ঞানিক হোয়াংলীর নাম আর তার সাথে গোটাকয়েক বন্ধুর নাম লেখা। প্রত্যেকের ঠিকানাও লেখা আছে।

সেদিকে চেয়ে দেখে দীপক প্রশ্ন করল—এদের কাছে কি মিঃ লী সম্বন্ধে খোঁজ করেছিলেন?

—তা করেছি মিঃ চাটার্জী। তাদের কাছে শুধু শুনলাম হোয়াংলী একজন শিক্ষিত, উদারমনা বৈজ্ঞানিক। আর দেশভ্রমণের নেশা আছে প্রচুর। এছাড়া আর কিছু নয়।

হুঁ। চুপ করে রইল দীপক। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পাতাটা উল্‌টে সেদিকে মন দিল।

দ্বিতীয় পাতায় লেখা:

১৩ই মে—হোটেল পিকাডেলী, পুরী।
১৪ই মে—সী ভিউ হোটেল, পুরী।
১৫ই মে—মে ফ্লাওয়ার, রাঁচী।

১৬ই মে—মনোহর নিবাস, রাঁচী।

১৭ই মে—বিলাস হোটেল, হাজারীবাগ।

১৮ই মে—নিউ চম্পা লজ্, হাজারীবাগ।

১৯শে মে—ওল্ড স্টেশন হোটেল, জামসেদপুর।

২০শে মে—হোটেল রয়্যাল, টাটানগর।

২১শে মে—চায়না লজ্, কোল্‌কাতা।

২২শে মে—আর্য হোটেল, কোল্‌কাতা।

২৩শে মে—হোটেল কন্টিনেণ্টাল, কোল্‌কাতা।

২৪শে মে—শান্তি আবাস, বরাহনগর।

২৫শে মে—নিউ ভোলানাথ হোটেল, দক্ষিণেশ্বর।

২৬শে মে—পম্পা হোটেল, বালী।

২৭শে মে—নব নিকেতন, ব্যাণ্ডেল।

২৮শে মে—আবাসিকী, বর্ধমান।

২৯শে মে—রতন হোটেল, বর্ধমান।

৩০শে মে—নতুন পুরী, আসানসোল।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই বিরাট তালিকাটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্।

দীপক হেসে বলল—কি স্যার, এটার অর্থ কি আপনার বোধগম্য হচ্ছে না?

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না ত এটা কি উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।

দীপক হেসে বলল—অর্থ অবশ্যই আছে।

—কি সে অর্থ?

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে গত ২৪শে মে তারিখে প্রফেসর হোয়াংলী নিহত হন।

—সে ত বটেই।

—এবার চেয়ে দেখুন ২৪শে মে'র পাশে লেখা আছে শান্তি আবাস, বরাহনগর। তার মানে মাত্র এই একদিন থাকার জন্য বৈজ্ঞানিক লী এই হোটেলের একটি ঘর ভাড়া নেন।

—বেশ।

—তার আগে যে যে দিনের পাশে যে যে জায়গা ও হোটেলের নাম লেখা আছে তিনি সেই সেই জায়গা ও হোটেলে সেই সেই দিন কাটিয়েছেন।

—হুঁ, কথাটা চিন্তা করবার মতো।

—তারপর দেখুন ২৪শে মে'র পরেও যে যে স্থান ও হোটেলের নাম লেখা আছে যেখানে যেখানে থাকবার জন্য তিনি পূর্ব থেকেই সিট্ রিজার্ভ করে রেখেছিলেন।

—কিন্তু এভাবে এক একদিন এক এক জায়গায় থাকবার অর্থ ?

—অবশ্যই আছে মিঃ মরিসন্। তিনি হয়ত তাঁর এ ধরনের বিপদ সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই জানতে পেরেছিলেন। তাই এক একদিন তিনি এক একটি হোটেলে থাকতেন এবং পরদিনই অন্যত্র অপর এক হোটেলে চলে যেতেন যাতে শত্রুপক্ষের কেউ টের না পায়।

—আশ্চর্য ত !

—কিন্তু তবুও তিনি শত্রুপক্ষের নজর এড়াতে পারলেন না। যে কোন কারণেই হোক, শত্রুপক্ষ জেনে ফেলেছিল যে, তিনি ২৪শে মে তারিখে বরাহনগরের শান্তি আবাস হোটেলে থাকবেন। তাই এখানেই তাঁর মূল্যবান জীবনের পরিসমাপ্তি হল।

কথা শেষ করে দীপক আবার ডায়েরীর পাতায় মনঃসংযোগ করল !

পর পর কতকগুলি পাতার দৈনন্দিন হিসাব-পত্তরে রাখা হয়েছে

দৈনিক কার্য তালিকা। তারপর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্রের নাম।

তারপর এক জায়গায় এসে দীপক থমকে দাঁড়াল। একটা পাতায় লেখা আছে :

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট দ্বীপ। উঃ, সে রাতের কথা ভুলতে পারব না। হ্যাঁ, লোকটা পাগ্‌লা হলেও বুদ্ধিমান! প্রতিভাবান! কিন্তু ওর প্রতিভার অপচয় হচ্ছে। তার কারণ এই বাজপাখি তাকে চালনা করছে। ওই আলো পৃথিবীর মহা সর্বনাশ করতে পারে। আর এই যন্ত্রদানবকে যদি ওরা মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাগায় তবে সমস্ত পৃথিবী শয়তানের কবলস্থ হবে। পৃথিবী ধ্বংসের পথে চলেছে। হ্যাঁ, ধ্বংস। মূর্তিমান ধ্বংস আসছে পৃথিবীকে গ্রাস করতে। আমাকে বাধা দিতে হবে।

তারপর দু'তিন পাতা পরে লেখা :

আজ বার্মায় পৌঁছলাম। বার্মা-গভর্ণমেণ্ট আমায় পাগল বলে উপহাস করল। ওরা জানে না, কখন সবার অলক্ষ্যে ধ্বংস এসে পেছন থেকে ওদের জড়িয়ে ধরবে। বাজপাখি লোকটা অত মারাত্মক নয়। কিন্তু পাগ্‌লা বৈজ্ঞানিকের সেই পাঁচজন অনুচর তাকেও ধ্বংস করতে উদ্যত হবে। ওদের উদ্দেশ্য নেহাৎ ভাল নয়। এর মধ্যেই ওরা আমার পেছনে লোক লাগিয়েছে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে, আমি জানি ওদের সব কিছু। আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া সভ্য জগতে আর কেউ জানে না ওদের কথা। উঃ! জ্যাক্‌সন্ আর ওগুারসন্‌কে কি কদর্যভাবে ওরা আটকে রেখেছে। ওরা মানুষ না পশু? জ্যাক্‌সনকে কেটে তার মাথা আর ফুসফুস যন্ত্রদানবের সাথে যোগ করে ওরা কি ভাবে তাকে দিয়ে কাজ চালাচ্ছে! একথা শুনলে লোকে বলবে আমি পাগল। আমাকে সকলে করবে ঠাট্টা আর উপহাস।

তার পরের পাতায় লেখা :

আজ ভারতে এলাম। যে কারণেই হোক ভারত-গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে। কিন্তু আমার পেছনে ওদের গুপ্তচর যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও ভাবে আমার মৃত্যু হতে পারে।

দু'পাতা পরে লেখা :

কিছুতেই কিছু হল না। আমার জীবনও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। ভগবান, তোমার সৃষ্ট পৃথিবীতে কি তবে শয়তানেরই রাজত্ব চলবে ?

—পাঁচ—

—ছদ্মবেশী পুলিশ—

ডায়েরীর পাতার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল দীপক ও মরিসন্। চমক ভাঙল একসংগে কয়েকটি পদশব্দে।

দুজনে চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তিনজন সাধারণ পুলিশ কনেস্টবল। অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে ইন্স্পেক্টর মরিসন্ বলল—তোমাদের ত এখানে এখন ডাকা হয়নি। এভাবে হঠাৎ এখানে এসেছ কেন ?

তিনজন একসংগে মরিসন্ ও দীপকের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল। ওরা দুজনে হতভম্ব হয়ে মুক চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ইন্স্পেক্টর মরিসন্ হাঁকল—দরওয়ান !

কোনও উত্তর নাই। দরজার বাইরের পাহারারত পুলিশটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

আগন্তুক পুলিশ তিনজনের একজন বলল—ওদের আটকে রেখে পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করেই আমরা এসেছি স্যার।

—কিন্তু তোমরা কি চাও ?

—বিশেষ কিছুই না, ওই ডায়েরীখানা।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি টেবিলের উপর থেকে ডায়েরীখানা তুলে নিল। তারপর দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রশস্ত রাজপথের ধারে পুলিশের ছদ্মবেশে থানার ভেতরে প্রবেশ

করে তাঁর প্রাইভেট্ চেম্বার থেকে যে কেউ ডায়েরীখানা নিয়ে পালাতে পারে এ ধারণা মিঃ মরিসনের ছিল না। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওদের গমন পথের দিকে।

কিন্তু দীপক এক লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওদের পেছনে পেছনে। ওরা তিনজনে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে এলো। থানার ঠিক বাইরেই একখানা প্রাইভেট্ কার অপেক্ষা করছিল। সেদিকে ছুটে গিয়ে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গাড়িখানাও খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে তীব্রবেগে এগিয়ে চলল প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্‌ও দীপকের পেছনে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শুধু বললেন—আশ্চর্য। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হতেই তিনি অপস্রিয়মান গাড়িখানার নম্বরটা লিখে নিতে যাচ্ছিলেন। দীপক তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, কোনও লাভ নেই মিঃ মরিসন্। ওটা যে জাল নম্বর সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

গাড়ি চলে গেলে ওরা দুজন থানার দিকে চেয়ে দেখেন সেখানে একজন পুলিশ কনেস্টবলেরও নামগন্ধ নেই। অবাক হয়ে মিঃ মরিসন্ বললেন—ওরা সব গেল কোথায় মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক বলল—আশে-পাশেই হয়ত আছে স্যার। আসুন একটু খোঁজ করা যাক।

খানিকটা খোঁজ করতেই থানার পেছনে একটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল তিনজন কনেস্টবলের দেহ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তারা। কারোর দেহেই পুলিশের পোশাক নেই।

অতি কষ্টে তাদের জ্ঞান-সঞ্চার করা হল। জ্ঞান ফিরে এলে তারা বলল-যে, ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ চ্যাটার্জী সাহেবকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবার পর তারা চারজনে থানার সামনে বসে গল্পগুজব করছিল।

সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর বসু ত বিকেলেই একটা তদন্তে বেরিয়ে গেছেন। মিনিট কুড়ির পর থানার সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় এবং তার মধ্য থেকে একজন লোক নেমে আসে। সে বলে যে, সে নাকি জরুরী কারণে মিঃ মরিসনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। মিঃ মরিসনের সঙ্গে দেখা পাওয়া আপাততঃ সম্ভব নয় একথা তাকে জানান হলে সে বলে যে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে সে প্রস্তুত।

এদিকে ওরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এমন সময় লোকটি আচমকা পিস্তলের মত একটা জিনিস ওদের দিকে উঁচিয়ে ধরে ট্রিগারটা টিপে দেয়। কিন্তু গুলীর পরিবর্তে তার মধ্য থেকে বের হলো শুধু খানিকটা ধোঁয়া। ধোঁয়াটা নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর কখন যে তাদের পোশাক ওরা পরিধান করে ছদ্মবেশে মিঃ মরিসনের ঘরে হানা দিয়েছে তা ওরা জানে না।

দীপক সব শুনে হেসে বলল—মিঃ মরিসন্‌, আর যাই হোক, এটা থেকে অন্ততঃ প্রমাণ হলো যে, ডায়েরীতে যা লেখা আছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

—আপনার এই অনুমানের কারণ?

—তা না হলে কি ওরা এতটা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এভাবে ডায়েরীটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠত?

—এখন আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি কি?

—ভবিষ্যৎ আমাদের নিহিত আছে সেই কিউফু দ্বীপে। আপনি সম্পূর্ণ বিষয়টা এবং ডায়েরীর যে ইংরাজী তর্জমা আছে সেটা উপরে জানাতে পারেন। তারপর গভর্ণমেণ্ট যদি এই কথা মেনে নিয়ে সেই

দ্বীপের ব্যাপারে মাথা ঘামায় তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে।

—কিন্তু এ তদন্তের ব্যাপারে আমরা কি করব?

—সেটাও জানিয়ে দিন যে এ ব্যাপারে জড়িত একজন লোক নয়। একটি বৃহৎ দল, এবং আমাদের অভিযান করতে হবে সেই দলের বিরুদ্ধেই।

—ছয়—

—কিউস্কু দ্বীপের যন্ত্রদানব—

দিগন্ত বিস্তীর্ণ সাগর যেন দু'হাত মেলে ক্ষুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। সামনে সুনীল জলরাশি। সেদিকে চেয়ে দীপক বলল—সত্যি রতন, আমরা সফল হই বা না হই তাতে ততটা যায় আসে না। সাগরের বুকে আমাদের এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা এটাও কম নয়! আর চলেছিও এক নিরুদ্দেশের পথে। সফল হবো না নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব তাও জানি না।

রতন বলল—তোর এ ধরনের সন্দেহের কারণ? আমরা দলে আছি প্রায় কুড়িজন। তা ছাড়া আমরা সশস্ত্র। সুতরাং আমাদের পরাজিত হবার কোনও কারণই নেই।

দীপক বলল—ব্যাপারটা তা নয়। লোকসংখ্যা এক্ষেত্রে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করবে না। বৈজ্ঞানিক হোয়াংলীর ডায়েরী থেকে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে ওরা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। আর যারা বিজ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখে তারা আর যাই হোক নেহাৎ দুর্বল নয়।

—তবে আমরা কিভাবে অগ্রসর হব?

—আমরা পাশে অন্য কোন দ্বীপে অবতরণ করবো। সেখান থেকে আমরা তিনজন আসব পেছন থেকে চুপি চুপি ওদের কার্যপ্রণালী দেখে ওদের গ্রেপ্তার করবার সুযোগ খুঁজতে। একসঙ্গে এতগুলো লোক ওখানে হাজির হলে ওরা অনেকটা সাবধান হয়ে যাবার সুযোগ পাবে। আমরা যে ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যেই যাত্রা করেছি তা ওদের জানান চলবে না।

—হাঁ, তা ত বটেই।

—আর তাছাড়া আমরা এটাও জেনেছি যে, এই ব্যাপারের সঙ্গেও বাজপাখি জড়িয়ে আছে। তবে সে যে বৈজ্ঞানিক হোয়াংলীকে খুন করেনি তা ঠিক। হোয়াংলীর পেছনে লেগেছিল সেই বৈজ্ঞানিকের গুপ্তচর।

—কিন্তু বাজপাখি ওর মধ্যে প্রবেশ করল কিভাবে?

—হয়ত লোকবল বৃদ্ধির জন্যেই বাজপাখিকে বৈজ্ঞানিক সঙ্গে নিয়েছে। সে যাই হোক এবার আমাদের বাঁ দিকে লঞ্চ বাঁধতে হবে ঠিক লাগা সিকোকু দ্বীপে।

ইন্স্পেক্টর মরিসন্ ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে দীপক বলল—আপনিও কিন্তু আমাদের এই ত্রিমুখী অভিযানের মধ্যে থাকবেন।

—তার মানে?

—মানে আমরা যে চারজন সিকোকু দ্বীপ থেকে কিউফু দ্বীপের দিকে যাত্রা করব আপনি থাকবেন তার মধ্যে একজন। আমরা সেখান থেকে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বার্তা পাঠালে তবে আমাদের দলের বাকী সকলে লঞ্চ নিয়ে কিউফু দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসবে।

ইন্স্পেক্টর মরিসন্ বললেন—বেশ, আমিও থাকব আপনাদের সঙ্গে।

একটু পরেই সিকোকু দ্বীপের সামনে এসে দুটি লঞ্চ বাঁধা হল। ইন্স্পেক্টর মরিসন্ বললেন—আমরা তিনজনে একটি লঞ্চ নিয়ে কিউফু দ্বীপের দিকে যাত্রা করলাম। তোমরা আমাদের কাছ থেকে ওয়্যারলেসে খবর পেলে তবে দ্বীপ আক্রমণ করবে।

*   *   *

রাত্রির নিবিড় কালিমা প্রশান্ত মহাসাগরের এই অখ্যাত, অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র কিউফু দ্বীপটিকে যেন বিরাট একটা অক্টোপাসের মতো তার দৃঢ় বাহুবন্ধনে আটকে রেখেছিল।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় পৃথিবীর যা কিছু আলো, আনন্দ, সুখ, ঐশ্বর্য সব যেন জলরাশি ঘেরা এই ছোট্ট ভূমিখণ্ডের কিনারায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বাইনোকুলার দিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে দ্বীপটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। চারধারে কাছিমের পিঠের মত সব খাড়াই পাহাড়ে ঘেরা দ্বীপটি। কোথায় লঞ্চটাকে ভিড়ানো যায় তা নিয়ে ওদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একপাশে দেখা গেল খাড়াই পাহাড় বিশেষ নেই। সেখানেই লঞ্চটাকে রেখে ওরা তিনজন নিঃশব্দে দ্বীপে অবতরণ করল। দীপক, রতন আর ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্‌। লঞ্চের ড্রাইভারকে বলা হল যাতে সব সময় সেটি প্রস্তুত থাকে। যে কোন মুহূর্তে তারা ছুটে এসে লঞ্চে উঠে বসলেই লঞ্চ যেন চল্‌তে আরম্ভ করে।

দ্বীপে উঠে তারা দেখল একটা সরু পথরেখা পাহাড়ের এই ঢালু অংশটা থেকে দ্বীপের ভিতরের দিকে চলেছে। ওরা বুঝল, এইটাই এই দ্বীপের জাহাজ বা লঞ্চ ভিড়াবার জায়গা।

তিনজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। প্রতিপদে প্রচুর ধৈর্য ও অধ্যবসায় বজায় রেখে এগোলো তারা। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও বিপদ এসে গ্রাস করতে পারে তাদের। কিন্তু জনমানবের কোনও সাড়াই পেলো না তারা।

এক জায়গায় এসে পথটা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারা তিনজনে চিন্তা করতে লাগল কোন্‌দিকে এগোনো যায় এবার। দীপক বলল—রতন, তুই গাছের উপরে উঠে দেখ কোনও দিকে আলো বা মানুষের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্‌ বললেন—না না, রাতে আবার গাছে যদি সাপ খোপ থাকে? সে প্রয়োজন নেই। এই দেখুন বাঁ দিকের পথটা বেশ

স্পষ্ট। তার মানে এধারেই লোক চলাচল হয় বেশি। ডানদিকে পথ থাকলেও সেটা ততটা স্পষ্ট নয়। অতএব ডানদিকে না গিয়ে বাঁ দিকেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

ঝম্ ঝম্ ঝম্···ঝমাঝম্···ঝমাঝম্···ঝমাঝম্।

ইন্স্পেক্টর মরিসনের কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল একটা অদ্ভুত শব্দ। যেন প্রচুর লৌহ দিয়ে তৈরী তিন চারটি যন্ত্র একসঙ্গে শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল ওরা।

ঝম্ ঝম্ ঝম্···আরও কাছে শব্দ। পাহাড় পর্বত পেরিয়ে বন জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন মৃত ফসিলের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। বর্তমান পৃথিবীর সভ্য জগৎ যেন এক হাজার বৎসর আগের ইতিহাসের কোনও মৃত পাতার কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

বিরাট কালো চারিটি মূর্তি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। যেন আঁধারেরই জমাট বাঁধা কায়ারূপী ভয়াল বীভৎসতা।

—ওরা কে? কে ওরা? হু আর দে? চীৎকার করে উঠলেন ইন্স্পেক্টর মরিসন্।

তার উত্তরে বেজে চলল ঝম্ ঝম্ ঝম্। যেন কোনও বিরাট এক দানব তার লৌহশৃঙ্খলের বাঁধন মোচনের জন্যে মাথা কুটে কুটে মরছে।

তিনজনে একসঙ্গে পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল সেই অস্পষ্ট মূর্তিগুলিকে লক্ষ্য করে।

গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুম্ গুম্ গুম্······

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ছোট্ট দ্বীপের সমস্ত বায়ুতরঙ্গ সেই প্রচণ্ড শব্দে।

নৈশ অন্ধকার যেন ভেঙে-চুরে নিঃশেষে চূর্ণ হয়ে গেল আগুনের ফুলকিগুলোর মুহূর্তস্থায়ী আলোকপাতে।

কিন্তু তবু ওরা অটল, অনশ্বর। এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে ওদের দিকে। আরও কাছে। ঝম্ ঝম্ ঝম্।

পায়ে পায়ে পিছনে হটতে থাকে ওরা। আরও পেছনে। ওরা তবুও এগিয়ে আসে। শঙ্কিত পরিবেশ বহন করে চলে ওদের আগমনবার্তা।

—আঃ···চীৎকার করে ওঠে তিনজন একসঙ্গে।

বিরাট এক লৌহযন্ত্রের চাপে যেন নিষ্পিষ্ট হয়ে যায় ওরা। লৌহযন্ত্র তিনটি একে একে ওদের তিনজনকে তুলে নেয় শূন্যে। শীতল একটা অদ্ভুত স্পর্শ। জ্ঞান হারিয়ে যায় ওদের।

ওদের তিনজনকে নিয়ে লৌহযন্ত্র এগিয়ে চলে ঝম্ ঝম্ ঝম্। অনন্তকালের ইতিহাসের কোন্ শৃঙ্খলিত পাতা যেন মুহূর্তে জেগে ওঠে সেই বীভৎস শব্দ শুনে।

—সাত—

—পাগলা বৈজ্ঞানিক—

ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের কিউফু দ্বীপের একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে বন্দী অবস্থায় ওরা তিনজন যখন জ্ঞান ফিরে পেল রাত শেষ হতে তখন অল্পই বাকী আছে।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল ওরা। প্রত্যেকের হাতই শৃঙ্খলাবদ্ধ। দ্বার উন্মুক্ত। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঠিক মানুষের মত চেহারার বিরাট একটি লৌহযন্ত্র। ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রটি। যেন যুগযুগান্তের নীরব প্রহরী।

—হাঃ হাঃ হাঃ···তীক্ষ্ণ হাসির শব্দে চমক ভাঙল ওদের। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল প্রৌঢ় একজন লোক। পরনে স্যুট। মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি গোঁফ। চোখে মোটা লেন্সের চশমা। মুখে দুর্বোধ্য এক ধরনের বিদ্রূপাত্মক হাসি।

—এই যে ঘুম ভাঙল তোমাদের? নমস্কার। তারপর শারীরিক অবস্থা ভাল ত?

—আমাদের এভাবে অসহায় অবস্থায় পেয়ে এ ধরনের বিদ্রূপ করা নিশ্চয়ই উচিত নয় আপনার। তীব্রকণ্ঠে রতনলাল লোকটির কথার প্রতিবাদ জানায়।

—সভ্য জগৎ থেকে দূরে আমি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছি তার মধ্যে তোমাদের নাক গলানোটাও উচিত হয়নি নিশ্চয়ই।

—ও, আপনিই তবে এই লৌহযন্ত্রের আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক।

—হ্যাঁ হাঁা, যে লৌহযন্ত্রের কবলে পড়লে তোমাদের মত শত সহস্র মানুষের হাজার অযুত বন্দুক, রিভলভার, মেসিনগান অকেজো প্রমাণিত

হয়ে যায়। আর শুধু এই একটাই নয়। আরো অনেক কিছু আবিষ্কারই আমি এর মধ্যে করতে সক্ষম হয়েছি।

—ওই আলো…

—হ্যাঁ, ওটাও আমারই আবিষ্কার। ওই সামান্য আলোকপাতে পাঁচ মাইল কিংবা আরো বেশি কোনও দূরত্বে অবস্থিত যে কোনও জাহাজ অথবা এরোপ্লেন পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

—এতদূর ক্ষমতা এই আলোর ?

—হাঁ, তোমাদের সভ্য গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকেরা আজও যে সব জিনিস কল্পনা করতে পারে না সে সবের আবিষ্কারক আমি। আর এতেই শেষ নয় বন্ধু। মনে আছে আমার প্রেরিত লোক তোমাদের চারজনকে অজ্ঞান করে ডায়েরী কেড়ে এনেছিল, সে গ্যাসও আমার আবিষ্কৃত।

—কিন্তু আপনি এসব আবিষ্কার সভ্য জগতে জানাচ্ছেন না কেন ? আর সভ্য জগতের লোক জ্যাকসন এবং এণ্ডারসনকে আটকেই বা রেখেছেন কেন ?

—কারণ অবশ্যই আছে।

—বলতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

—না, আপত্তি আর কি ? শোন। সবার আগে বলো ত সভ্য জগৎ বলতে তোমরা কি বোঝ ?

—বর্তমান পৃথিবীর যে অঞ্চলের মানুষ শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে সভ্যতা অর্জন করতে পেরেছে।

—সভ্যতা ? হাঃ হাঃ হাঃ……সভ্যতা ? ধাপ্পা। ওটা একটা বিরাট্ ধাপ্পা। সভ্যতার নামে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ চলেছে বিরাট একটা হিংসা-যজ্ঞের প্রস্তুতি ! সমস্ত পৃথিবীর এক দল সুবিধাবাদী মানুষ বাকি লোকের বুকের উপর বসে নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে চায় তাদের

বিজয় রথ। আর যারা তাতে বাধা দেবে তারাই প্রমাণিত হবে অসভ্য বর্বর, আইন-অমান্যকারী। হাঃ হাঃ হাঃ! কোথায় আইন? কার জন্যে আইন? আইনের সৃষ্টি করেছে কে? আমি এইটুকুই বুঝেছি যে, পৃথিবী জুড়ে চলেছে আজ শক্তিমানের রাজত্ব। আর আজকের সে শক্তি দৈহিক শক্তি নয়, যান্ত্রিক শক্তি। বৈজ্ঞানিক শক্তি মানসিক শক্তি।

মিনিট কয়েক থামলেন তিনি। তারপরে আবার বলতে স্বরু করলেন—ওই যে তোমাদের সভ্যজগতের লোক এসেছিল দুজন। দেখলাম তাদের। তারাও বৈজ্ঞানিক। তারা আমার সঙ্গে একযোগে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের সে প্রতিশ্রুতি দুদিন বাদেই ধূলিসাৎ করে দিয়ে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেষ্টা করল। ওরা জানে না যে, ওদের সামান্য জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে আমার জ্ঞান। তাই ওদের বন্দী করেছি। আটকে রেখেছি আমার লৌহ পিঞ্জরে। ওদের দুজনের মাথা যন্ত্রদানবের দেহের সঙ্গে যোগ করে অনেক বড়ো বড়ো কাজ করাতে সক্ষম হচ্ছি আমি। তাই ওদের প্রয়োজন আমার সত্যিই ছিল।

নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে দীপক প্রশ্ন করল—কিন্তু কাদের সাহায্যে আপনি কাজ চালাবেন?

—কাজ চালাব নয় কাজ চালিয়েছি। আমি চেয়েছিলাম এক সহস্র লৌহ দানব তৈরী করতে। সে কাজ আমার প্রায় শেষ হতে চলেছে। এবার তারাই আমার সৈন্যদল। আমি যেভাবে চালাবো সেই ভাবেই চলবে এই যান্ত্রিক মানুষেরা।

—কিন্তু তাতে কি লাভ?

—লাভ? হাঃ হাঃ হাঃ! আবার বিকট হাসিতে ভেঙে পড়ল পাগলা বৈজ্ঞানিক, তারপর আরম্ভ করল—এমন একদিন ছিল যখন

লাভের হিসেব-নিকেশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক ইউরোপ্ কাজ করে নি। তখন কাজ করেছে শুধু কাজের নেশায়। যন্ত্রের আবিষ্কারের আনন্দে। অদমিত উৎসাহ নিয়ে চলেছে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে।

—কিন্তু আজ?

—আজ লাভের নেশাটাই আমার কাছে বড়ো। আমার সামনে বিরাট পাওয়ার আনন্দ। সমস্ত পৃথিবীটাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে আমার মনের মতো করে তাকে চালনা করবো। তখন তোমরা দেখবে কাকে বলে সভ্যতা। কাকে বলে নিয়মানুবর্তিতা। নতুন দিনে আর দলাদলি থাকবে না। থাকবে না দুপক্ষের সংগ্রাম। দুই পক্ষই নতজানু হয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

—কিন্তু কাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার অভিযান সুরু হবে?

—আজকের সংগ্রাম আরম্ভের মুহূর্তে আমি পেয়েছি দস্যুসর্দার বাজপাখির সাহায্য। সে এবং তার দলের প্রধান নয়জন এখন এই দ্বীপে। আমার অভিযান চালনা করবে তারা দশজন আর আমার নিজস্ব পাঁচজন বৈজ্ঞানিক। তোমরা ভাবছ, যেখানে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ সৈন্য আমাদের বিপক্ষে, সেখানে আমরা পনের জন অত্যন্ত তুচ্ছ। কিন্তু তা নয় বন্ধু। আমার পক্ষের সৈন্য হচ্ছে ঐ এক সহস্র যন্ত্রদানব, যাদের মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই। যারা অজর, অমর, অক্ষয়। মেসিনগানের গুলী তাদের বিদ্ধ করতে পারবে না, এরোপ্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা তাদের পারবে না ধ্বংস করতে। আর সে যুদ্ধে আমার অস্ত্র হবে বন্দুক নয়, কামান নয়, মেসিনগান নয়, শুধু সেই মারণ-রশ্মি।

—শুধু আলো দিয়ে কি যুদ্ধ হয়?

—হাঃ হাঃ হাঃ। মারণ-রশ্মি নিয়ে আমার যন্ত্রদানবেরা যখন যাত্রা করবে তখন পাঁচ মাইলের মধ্যে যত কিছু সৈন্য-সামন্ত, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেনই থাকুক না কেন তারা বিধ্বস্ত হয়ে যাকে। পৃথিবী

কাঁপিয়ে দিক থেকে দিগন্তরে ধেয়ে চলবে আমার সেই মৃত্যুহীন সৈন্যদল। যতো কিছু বিপদ তুচ্ছ করে সমস্ত পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে, বন জঙ্গল ভেঙে। আমি দেখতে পাচ্ছি সে দিন আর দূরে নয়। হাঃ হাঃ হাঃ···

—কিন্তু বৈজ্ঞানিক হোয়াংলীকে আপনার লোক হত্যা করল কেন?

—হ্যাঁ, ওই লোকটির জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়। আমার অনেক কিছু আবিস্কারেই সাহায্য ও করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যখন জানতে পারল আমাব আবিস্কারেব বীভৎসতা ও কার্যকারিতা তখন ও বলল এ কাজ বন্ধ রাখতে। কিন্তু তা আমি পারি না, কিছুতেই না। আমার সংকল্প শুনে ও পালিয়ে গেল কোনও সভ্য গভর্ণমেণ্টকে খবর দিয়ে আমার কাজ বন্ধ করতে। কিন্তু তা হবে না। পৃথিবীর সভ্য মানুষ ওকে পাগল বলে উপহাস করবে। তবুও ওকে জীবিত রাখলে কোনও দিন হয়ত আমার কাজের ব্যাঘাত ও ঘটাত। তাই আমার পথ থেকে সে কাঁটা সরিয়ে দিলাম।

—আপনার আবিষ্কৃত সেই সহস্র যন্ত্রদানবেরা এখন কোথায়?

—তাদের প্রয়োজন ত এখন নেই। তাদের বিভিন্ন অংশ খুলে আমি ওই কোণের ঘরে বন্ধ করে রেখেছি। মাত্র তাদের চারজনকে আমি জুড়ে এখন ব্যবহার করছি। প্রয়োজনের সময়ই তাদের জুড়ে আমি আমার অভিযান সুরু করব।

—আপনার সে অভিযান আরম্ভ হতে আর কতদিন দেরী আছে?

—প্রায় সাড়ে আট শ যন্ত্র তৈরী শেষ হয়েছে। বাকি আছে মাত্র দেড় শো। সেটুকু শেষ হলেই আমার অভিযান সুরু হবে।

—তার জন্য আপনার কতদিন প্রয়োজন?

—ও, সেজন্যে আমার দিন কুড়ির বেশি প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের মত যে দু'চারজন তোমাদের ওই তথাকথিত সভ্য জগৎ থেকে ছিটকে এসে আমার কাজে মাঝে মাঝে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ সেজন্যেই

আমার যেটুকু দেরী হচ্ছে। আমার বিপুল শক্তির তুলনায় তোমাদের তথাকথিত সভ্য জগতের লোকদের ক্ষমতা যে কতো তুচ্ছ তা যদি তোমরা জানতে তবে আর মিথ্যা এই বাধার সৃষ্টি করতে তোমরা সাহস পেতে না। যাক্, তোমরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো। আমার তৈরী নতুন পৃথিবীর তোমরাই হবে এক একটি সত্যিকারের সভ্য নাগরিক।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল একটি ঝম্ ঝম্ শব্দ। একটি যন্ত্রদানব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনটি থালা ভর্তি খাবার সামনে রেখে আবার ঝম্ ঝম্ শব্দ করতে করতে বের হয়ে গেল।

মৃদু হেসে বৈজ্ঞানিক বলল—আচ্ছা চলি। পাশের দ্বীপে তোমাদের যে অপর একটি লক্ষ কুড়িজন লোক নিয়ে অপেক্ষা করছে সে খবরও পেয়েছি আমি। তাদেরও বন্দী করে তোমাদের এখানে এনে তোমাদের দলভুক্ত করে দিচ্ছি। আচ্ছা চলি। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিচিত্র এক ঝলক হাসির দোলায় ঘরখানাকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যায় প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক ইউশোপু।

সেদিকে চেয়ে একটু পরে দীপক ধীরে ধীরে বলে—অত বড়ো একটা প্রতিভার অপব্যবহার সত্যি বোধ হয় এই প্রথম।

—আট—

—চক্রান্তজালে বাজপাখি—

ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্……ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—…

একটানা যান্ত্রিক শব্দ। বাতাসের তরঙ্গে যেন ছুটে যাচ্ছে সে শব্দের অস্ফুট কাঁপন। দিক থেকে দিগন্তে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আগামী কোন্ এক আশু ধ্বংসের অশুভ ইংগিত।

চুপচাপ বসে ওরা তেইশটি বন্দী। আধুনিক উন্নততর বিজ্ঞানের কাছে পরাভূত অতীত দিনের সাথীর মতো ওরা চুপচাপ বসে বসে ভাবনার অতলে তলিয়ে সময় ক্ষেপণ করে চলেছিল।

সময় কেটে যাচ্ছে। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা। দিনের শেষে আসছে রাত্রি। তারপর নতুন আর একদিনের ইংগিত।

প্রতিটি মুহূর্তে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন যন্ত্রদানবদের এক একটি অংশ। প্রতিটি দিনে পৃথিবী একদিন করে আসন্ন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নীরব, নিশ্চল হয়ে ধ্বংসের প্রত্যাশায় প্রহর গুণছে বন্দী তেইশটি প্রাণী। প্রত্যেকের মুখমণ্ডলই যেন মুক্তির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল! সভ্য জগতের কাছে এই বিরাট অমঙ্গলসূচক বার্তা পরিবেশন করবার বিপুল ইচ্ছা প্রত্যেকের মনকেই তুমুলভাবে আলোড়িত করছে। কিন্তু এই অনড় ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায়ই তাদের নাই।

ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট পদশব্দে চমক ভাঙে ওদের।

—কে? কে তুমি? প্রশ্ন করে রতনলাল।

কালো মুখোসে মুখ ঢাকা দীর্ঘকায় আগন্তুক বলে—এখনও কি আমাকে চিনতে পারছ না বন্ধু? আমি—তোমাদের দীর্ঘদিনের অপরিসীম বন্ধু ও চিরশত্রু বাজপাখি। কিন্তু আজ আর সেই আইন-

অমান্যকারী দস্যু বাজপাখি নয়। আগামী পৃথিবীর স্রষ্টা ও সম্রাট বাজপাখি। আর আমি পৃথিবীর কোনও অন্ধ কোণে লুকিয়ে গোপনে আমার কূটচক্রের জাল বিস্তার করব না। এবার সমস্ত সভ্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে আমার ঘোষিত রণহুঙ্কার। রাশিয়া থেকে আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া এই বিরাট পৃথিবীখণ্ডের আগামী দিনের অধীশ্বর এই বাজপাখি।

কথার শেষে বাজপাখি একটু থামল বিশ্রাম নেবার জন্যে।

দীপক প্রশ্ন করল—কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইউশোপুই ত হবে এই যন্ত্র-বাহিনীর পরিচালক। তুমি ত তার সামান্য একজন আজ্ঞাবাহক মাত্র বাজপাখি ?

বাজপাখি বলল—ভুল বন্ধু, ভুল! এই যে ওধার থেকে যে যন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে তার থেকে প্রতিটি মুহূর্তে তৈরী হচ্ছে যন্ত্রদানব, তারা বাজপাখির আগামী জয়লাভের এক একটি সোপান। বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর নয়।

—তবে তিনি এত পরিশ্রম করে ওগুলো তৈরী করছেন কেন ?

—তিনি করছেন যে আশা নিয়ে তা হয়ত পূর্ণ হবে। পৃথিবী থেকে সমস্ত অত্যাচার, অনাচার, ক্লৈব্য, পাপ, অন্যায় বিদূরিত হবে। কিন্তু সেই নতুন পৃথিবীর ধারক হবে বৈজ্ঞানিক ইউশোপু নয়—বাজপাখি। তোমাদের চিরপরিচিত বাজপাখি।

—কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব ?

—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর বৈজ্ঞানিক ইউশোপু ও তার দলের পাঁচজনকে কিভাবে পথ থেকে সরাতে হয় তা আমার বেশ ভাল করেই জানা আছে। আমার জীবনের সুদীর্ঘ সাধনায় তিল তিল করে যে অর্থ আমি সঞ্চিত করেছি তা দিয়েই চলেছে এই বিরাট গবেষণা। কিন্তু আমার বুকের রক্ত জল করে উপার্জিত এই প্রচুর

অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে যে কাজে তার ফলভোগ করবে বাজপাখি একা। অন্য কাউকে এর ভাগ দিতে সে প্রস্তুত নয় মোটেই।

—আশ্চর্য বন্ধু! কিন্তু এ সম্বন্ধে ত তাঁকে কিছুই জানাও নি বাজপাখি!

—হাঃ হাঃ হাঃ! আমাকে না জানালেও আমি তা জানতে পেরেছি বাজপাখি। তোমার মনের কোন কথাই জানতে আমার বাকী নেই।

পেছন থেকে কথাগুলো বলে উঠল বৈজ্ঞানিক ইউশোপু!

বাজপাখি ফিরে তাকিয়ে দেখে বৈজ্ঞানিক ইউশোপু ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে। তাঁর একখানি হাতে উদ্যত পিস্তল।

—মিথ্যা তোমার চেষ্টা বাজপাখি। তোমার দলের দশজন যে আমার যন্ত্রদানবের কাছে কতো তুচ্ছ তা তুমি বেশ ভাল করেই জান বাজপাখি। তাই এই মুহূর্তেই আত্মসমর্পণ কর।

—তোমার হুমকীতে আর যেই ভয় পাক না কেন প্রফেসর ইউশোপু, বাজপাখি ভয় পায় না। বাজপাখি জানে তোমার এই যন্ত্রদানবের দুর্বলতা কোথায়। তাই তোমার যন্ত্রদানবকে এক মুহূর্তে অচল করে দেবার শক্তি আমার আছে।

কথা শেষ হতে না হতেই বাজপাখি আচমকা লাফিয়ে পড়ে প্রফেসর ইউশোপুর দেহের উপর। প্রফেসরের হাত থেকে রিভলভারটি ছিটকে পড়ে। বাজপাখি ঘরের কোণে ছুটে যায় সেটা তুলে নিতে।

এদিকে প্রফেসর ছুটে গিয়ে ঘরের কোণে দণ্ডায়মান যন্ত্রদানবটির একটি কলের উপর ঈষৎ চাপ দেয়। ঝম্ ঝম্ শব্দ করতে করতে যন্ত্রদানব এগিয়ে যায় বাজপাখির দিকে।

বাজপাখি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রিভলভারের নলটি যন্ত্রদানবের চোখ লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দেয়।

বাজপাখির লক্ষ্য অব্যর্থ। মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রদানব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

বাজপাখি হেসে ওঠে, বিকট এক অট্টহাসি। তারপরে বলে—আমি জানি বৈজ্ঞানিক ইউশোপু, যে তোমার যন্ত্রদানবের প্রধান স্প্রীংটি আছে ঠিক চোখের সোজা। তাই তোমার এই যন্ত্রদানব বিরাট মেসিনগান কিংবা কামানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলেও সামান্য একটা রিভলভারের গুলীতেই তাকে নিশ্চল করে দিতে আমি পারি। আশা করি এবার আর একপাও নড়বে না তুমি। এতটুকু নড়লে আমার রিভলভারের নিক্ষিপ্ত গুলী তোমার ঐ যন্ত্রদানবের মতো তোমাকে নিশ্চল করে দেবে। বাজপাখি আবার তীব্র হাসির আবেগে ভেঙে পড়ল।

বাজপাখি একটু অন্যমনস্ক হতেই বৈজ্ঞানিক ইউশোপু কোমরের একখানা ধারালো ছোরা বাজপাখিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

কিন্তু বাজপাখি চোখের নিমিষে একপাশে সরে দাঁড়াতেই ছোরাটা গিয়ে দালানের গায়ে বিদ্ধ হলো। বাজপাখি ছুটে গিয়ে ছোরাটা তুলে নিতে গেল। কিন্তু সেই অবসরে বৈজ্ঞানিক ইউশোপু এক লাফে ছুটে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ল।

ছোরাটা না তুলে বাজপাখি সবেগে বৈজ্ঞানিককে অনুসরণ করে চললো। দুজনের ধাবমান মূর্তির দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে ওরা।

—সংঘর্ষ—

গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুম্ গুম্ গুম্!···

অশান্ত কোলাহল। দাপাদাপি। হট্টগোল। বিরাট এক সংঘর্ষের ইংগিত!

ঘরের মধ্যে বসে তারা বাইরের শব্দ কান পেতে শুনতে লাগল। কিন্তু তাতে বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই ছিল না ওদের।

দালানে বিদ্ধ ছুরিটা তুলে নিয়ে দীপক প্রাণপণে হাতের বাঁধন কাটবার চেষ্টা করতে লাগল। ঘরের মধ্যে বন্দী তেইশটি প্রাণী এই বিরাট হত্যালীলার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো প্রহর গুনতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এই সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলব আমি। আই উইল ডেসট্রয় অল্ দিজ। আমার নিজের সৃষ্টি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গুড়ুম্ গুড়ুম্!

আবার গুলীর শব্দ! পিস্তল গর্জন। আহতের আর্ত চীৎকার। আঃ—আ—আ—আ······

—হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর বিকট অট্টহাসি।

—আগুন, আগুন! মিলিত কণ্ঠস্বর।

ঘরের মধ্যে একটিমাত্র ছোরা দিয়ে এরা নিজ নিজ বাঁধন কাটতে সচেষ্ট। তেইশটি মানুষের মুক্তিদান করবার জন্যে সামান্য একটি ছোরা অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে। আজকের সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যে ওই সামান্য তেইশটি লোকের হাতে।

অশান্ত ছোরা তাই একটির পর একটি লোকের বাঁধন কেটে চলেছে বিপুল উৎসাহে।

—আঃ···

বাইরে আবার শব্দ শোনা গেল।

—আই উইল নট্ ডাই। আমি মরবো না। আমি বাঁচতে চাই। আমি বৈজ্ঞানিক ইউশোপু···

—গুড়ুম্!

আবার গর্জে উঠল পিস্তল।

—উঃ···

বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর অন্তিম ক্রন্দন।

—পরিশেষ—

বাঁধন কেটে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো তেইশটি প্রাণী।

কিন্তু বাইরে এসেই চমকে উঠল ওরা। বাইরে তখন সুরু হয়েছে অগ্নিদেবের বীভৎস ধ্বংসলীলা। একসংগে চারটি ঘরে আগুন ধরে গেছে।

পাশাপাশি পড়ে আছে চৌদ্দটি লোকের আহত রক্তাক্ত দেহ। প্রত্যেকেই আসন্ন মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

এককোণে পড়ে ছিল বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর আহত দেহটা। সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা।

আসন্ন মৃত্যুর ছায়া বৈজ্ঞানিকের সারা মুখে পরিব্যাপ্ত।

—এত করেও রক্ষা করতে পারলাম না। কিছুতেই হলো না। কিন্তু তাই বলে আমার সৃষ্টি আমি ওই শয়তানের হাতে তুলে দিতে পারি না। তাই নিজের হাতে সব ধ্বংস করে ফেললাম। আই হ্যাভ্ ডেস্ট্রয়েড্ এভ্রিথিং। সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এত সাধনা করেও আমার নাম রয়ে যাবে অখ্যাত, অজ্ঞাত। এইটুকুই আমার দুঃখ। শুধুমাত্র এইটুকুই!

—কিন্তু আপনার এ অবস্থায় জন্য দায়ী কে? বৈজ্ঞানিকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল দীপক।

—ওই শয়তান বাজপাখি। আমাদের দলের পাঁচজনকে হত্যা করে শয়তান পালিয়েছে। উঃ! তবে ওর দলের সব ক'জনকেও আমরা শেষ করেছি। শুধু পারলাম না ওকে মারতে। চোখের সামনে দিয়ে ও পালিয়ে গেল! সবার সামনে দিয়ে। আপনারা ছুটে যান ওধারে। যেখানে আপনাদের লঞ্চ দুটো রাখা আছে। দেখুন যদি ওকে ধরতে পারেন।

আর একবার বৈজ্ঞানিকের দেহটা নড়ে উঠেই নিশ্চল হয়ে যায়।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসনকে নিয়ে দীপক ছুটে যায় সমুদ্রের তীরের দিকে।

* * *

* * * * * *

ঘস্ ঘস্ ঘস্……

ছোট মোটর লঞ্চটি সমুদ্রের কূল থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন বলল—ওই লঞ্চটাতে করে বাজপাখি পালিয়ে গেল। চলুন আমরা যাই। আমরা ওকে অনুসরণ করি।

দীপক হেসে বলল—কোনও লাভ নেই ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্। মিথ্যা হবে সে চেষ্টা।

—কেন?

—আপনার কি মনে নেই যে, আমাদের এই বড় লঞ্চখানার চেয়ে ওই ছোট লঞ্চখানার স্পীড্ অনেক বেশি। মিথ্যা কিছুদূর ছোটাছুটি করাই সার হবে।

তাই বলে চোখের সামনে দিয়ে ও পালিয়ে গেলেও আমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখব ?

—উপায় কি মিঃ মরিসন্? আমরা এখন নিরুপায়। যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন মুখোমুখি ওর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন না হয় দেখা যাবে। চলুন আমরা ফিরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর শেষ-কৃত্য করে আসি।

—কিন্তু ওর মত একজন দুষ্টের জন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি মিঃ চ্যাটার্জী।

—লাভ অবশ্য নেই মিঃ মরিসন্। তবুও প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখান আমাদের কর্তব্য। হাজার হলেও বর্তমান পৃথিবীর ওই ছিল শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তবে ওর প্রতিভা দুষ্কর্মের পেছনে ব্যয়িত হয়েছিল, এই যা দুঃখ।

—চলুন যাওয়া যাক্।

বৈজ্ঞানিক ইউশোপুর দেহকে কবরস্থ করে তার উপরে একটা ছোট পাথরের ফলকে দীপক লিখে রাখল :

কিন্তু প্রতিভার অপচয়ের জন্য।

বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ইউশোপু।

বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম যন্ত্রের আবিষ্কারক।

নিজের আবিষ্কার তাকে নিজ হাতেই ধ্বংস করতে হয়েছে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপক বললে—চলুন মিঃ মরিসন্। আমাদের কাজ শেষ।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে ঢেউয়ের দোলায় কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল বিরাট লঞ্চটি ওদের তেইশ জনকে বুকে নিয়ে।

দূরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে অন্তিম কিরণরাশি ছড়িয়ে।

সেদিকে চেয়ে দীপক শুধু বলল—ওই কিরণ যে ঢেউয়ের মাথায়

মাথায় খেলা করছে তারাই রইল এত বড় আবিষ্কারের নীরব সাক্ষী। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে সমস্ত কথ শুনেও হয়ত সভ্য জগৎ বিশ্বাস করবে না এই বিরাট আবিষ্কারের কথা।

রতন বলল—কিন্তু আমি ভাবছি ওই বাজপাখির কথা! আমাদের হাতের একেবারে মুঠোর মধ্যে এসেও ওর চিরাচরিত পদ্ধতি নিয়ে ও পালিয়ে গেল। আবার কি নবরূপে ওর দেখা হবে তা কে জানে!

* এর পরের ঘটনা জানতে হলে "হত্যাকারী বাজপাখি" পড়ুন।

আমাদের অন্যান্য প্রকাশিত বই

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—মূল্য ৫'০০, পদ্মগীতা—মূল্য ৪'০০, বাঁধান ৫'০০, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত গীতারত্নামৃত মূল্য—৫'০০, প্রভাস খণ্ড—মূল্য ১০'০০, স্তবকবচমালা—মূল্য ৮'০০, নিত্যকর্ম পদ্ধতি—মূল্য ২'৫০, ঐ বৃহৎ ৬'০০, মেয়েদের ব্রতকথা—মূল্য ৬'০০, ঐ ছোট ৩'০০, রামকৃষ্ণ উপদেশ মূল্য ৬'০০, আরতি-মালা মূল্য ২'০০, লক্ষ্মীচরিত্র ৬'০০, ছোট ৩'০০, বারোমাসের লক্ষ্মীর ব্রতকথা মূল্য ২'০০, আরবা উপন্যাস মূল্য ২০'০০, পারস্য উপন্যাস মূল্য ১২'০০, ঠাকুরমার ঝুলি মূল্য ৮'০০, গোপাল ভাঁড়ের গল্প, বড়ো মূল্য ৬'০০, ছোট ২'০০, লতাপাতার গুণ মূল্য ২'০০, টোটকা চিকিৎসা মূল্য ২'০০, পশু চিকিৎসা মূল্য ২'০০, খনার বচন মূল্য ২'০০, হনুমান চরিত্র মূল্য ২'০০, চাণক্য শ্লোক মূল্য ২'০০ রামপ্রাসাদী সঙ্গীত বড় (স্বরলিপি সহ) ৬'০০, ঐ ছোট মূল্য ২'০০, শ্যামা সঙ্গীত মূল্য ২'০০, বাউল সঙ্গীত মূল্য ২'০০, প্রেমময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মূল্য ৮'০০, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা মূল্য ৬'০০, সন্তোষী মাতার ব্রত ও পূজাবিধি মূল্য ২'০০, অদ্ভুত বশীকরণ তন্ত্রসার মূল্য ৬'০০, আদি ও আসল কাশ্যপ তন্ত্রসার মূল্য ৬'০০, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিদ্যা ৮'০০, কামাখ্যা তন্ত্রসার—মূল্য ৬'৫০।

● পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংকলিত ●

আর্যানুষ্ঠান বিধি (১ম খণ্ড) সামবেদীয় বিবাহ, (২য় খণ্ড) সামবেদীয় অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ ইত্যাদি, (৩য় খণ্ড) যজুর্বেদীয় বিবাহ, (৪র্থ খণ্ড), যজুর্বেদীয় অন্নপ্রাশন, নামকরণ চূড়াকরণ ইত্যাদি প্রতিটি খণ্ডের মূল্য—৫'০০ টাকা।

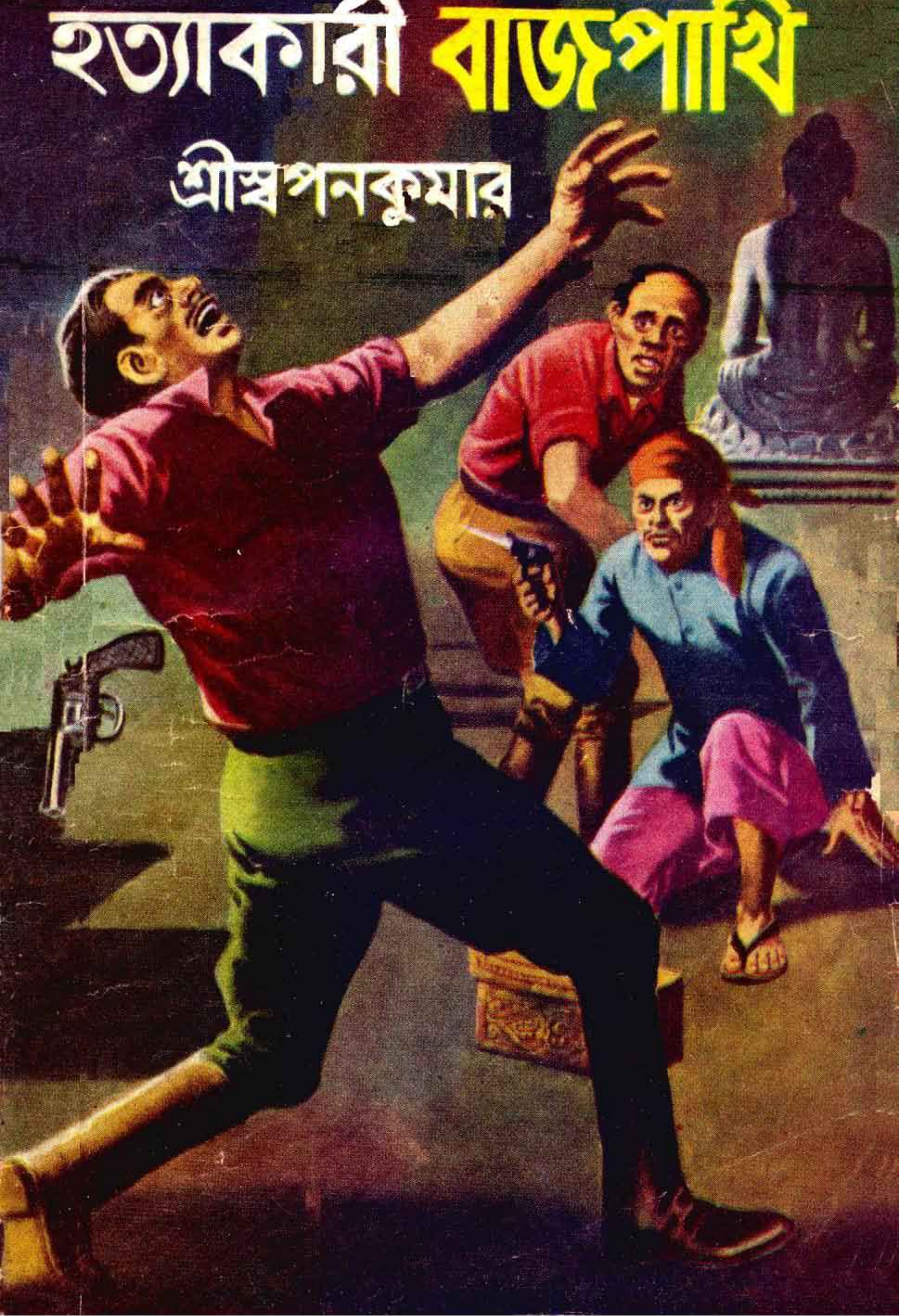
হত্যাকারী বাজপাখি
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—৬নং

হত্যাকারী বাজপাখি

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক :
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য :—২'৫০

মুদ্রক :
এস, জে, প্রিণ্ট সার্ভিস
৪/১ই বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত]

হত্যাকারী বাজপাখি

এক —

—তিন লক্ষ টাকার চেক—

চেকের উপরে এত বড়ো একটা অঙ্ক বসানো বোধ হয় মিষ্টার তালুকদারের জীবনে এই প্রথম।

একথা অবশ্য সত্যি যে, তিনি জীবনে উপায় করেছেন প্রচুর অর্থ। তবে বিগত মহাযুদ্ধের কল্যাণে বর্তমানে তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স একেবারে পাঁচ লাখের কাছাকাছি। এতদিন তিল তিল করে যে অর্থ তিনি সঞ্চয় করেছেন তারা অর্ধেকেরও বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে এক কথায়। হ্যাঁ, তিন লক্ষ টাকার এই চেকটা এক কথায় তিনি সই করে দিলেন।

একটা সই করে তাঁর পছন্দ হল না। এত বড়ো একটা চেক যদি ব্যাঙ্কে সইটা হঠাৎ না মেলে। তিনি পর পর তিনটি সই করে সন্তুষ্ট হলেন। ওর একটা অন্ততঃ মিলবেই।

তবে মিঃ তালুকদারের সান্ত্বনা আছে। এত বড়ো একটা ব্যাপারে তিনি একাই জড়িয়ে পড়েননি। ওর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে লভ্যাংশের অংশীদার হয়েছেন তাঁর বন্ধু মিঃ বাজপেয়ী। তিনি মিঃ তালুকদারের নামে টাকাটা আগেই জমা দিয়েছিলেন।

তবুও চেকটা দেবার সময়ে মিঃ বাজপেয়ী বসেছিলেন তাঁর পাশে। মিঃ তালুকদার যখন চেকটা কেটে বার্মিজ রাজা থিবোর বংশধর লোকটার হাতে তুলে দিলেন, তখন মিঃ বাজপেয়ীর বুকটা একবার যেন একটু কেঁপে উঠেছিল। তবে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করেছিলেন তিনি।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার যা ঘটল তা হচ্ছে বার্মিজটির ব্যবহার। তার দিকে চেয়ে মিঃ তালুকদার কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। লোকটার সারা মুখে যেন একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা লেপটে

আছে। চোখ দুটি যেন পাথরের মত স্থির, অবিচল। বোঝা যায় না যে চেকটা পেয়ে তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তনও ঘটেছে। আলগোছে চেকটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলল সে। যেন ওটার দাম কয়েকশ' টাকার বেশি নয়। তারপর ধীরকণ্ঠে বলল—আচ্ছা উঠি তাহলে মিঃ তালুকদার।

মিঃ তালুকদার বললেন—হ্যাঁ, আমরা তাহলে কালকেই যাত্রা করছি।

—অবশ্যই।

—ওখানে গিয়ে হীরেগুলো নিয়ে ফিরে আসতে ক'দিন লাগবে?

—তিন লক্ষ টাকা দিয়ে সাত লক্ষ টাকার জহরত পেতে হলে একটু কষ্ট করতে হয় বৈকি!

—হ্যাঁ, তা আমি জানি লিউসিন। তবে ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যত সত্বর টাকাটা ফিরে পাওয়া যায়....

—সেকথা আমারও মনে আছে।

—সেজন্যেই এই প্রশ্নটা।

বার্মিজ রাজা লিউসিন হেসে বলল—সেজন্যেই যে প্রশ্নটা তা আমারও অজানা নয় মিঃ তালুকদার। কিন্তু ব্যাপারটা ত বুঝতেই পারছেন। যদি কিছু সময় আমি হাতে পেতাম তবে কি আর তিন লাখ টাকায় ওই দামী হীরেগুলো সব বিক্রি করতাম? আমার টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। অথচ বর্মায় গিয়ে ওগুলো এনে বিক্রী করতে গেলে কম্‌সে কম প্রায় একমাস সময় লাগবে।

—একমাস পুরো নাও লাগতে পারে।

—আমি প্রায় একমাস বল্‌ছি। ঠিক নির্দিষ্ট সময় ত আমি বলছি না। তবে আমার কথাটা মনে আছে ত?

—কোন কথা?

—আমি যে বলেছি কবচটা আমার চাই। ওটা বাদ দিয়ে আমি বিক্রী করছি।

—হাঁা, তা অবশ্যই মনে আছে।

—হীরেগুলো ত সামান্য। কিন্তু ওই খ্রচটার বিনিময়ে···

বার্মিজটার চোখদুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

অস্বস্তিপূর্ণ কণ্ঠে মিঃ তালুকদার বললেন—যাক্ সে কথা। আপনি তাহলে এক্ষুণি ব্যাঙ্কে চলে যান। আজই যাতে চেকটা ক্যাশ হয় সে ব্যবস্থা করে ফেলুন। তাহলে আমরা রওনা হব কালকেই।

বার্মিজটা বাক্যব্যয় না করে উঠে দাঁড়াল।

মিঃ তালুকদার মিঃ বাজপেয়ীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমিও ওঁর সঙ্গে যাও মিঃ বাজপেয়ী। যদি চেকের ব্যাপারে অসুবিধা হয়।

—কোনও অসুবিধা হবে না মিঃ তালুকদার। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেল্‌ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি যে বর্মার একজন রাজা এ পরিচয় যেন কাউকে দেবেন না।

—অবশ্যই নয়।

—বেশ তাহলে সব ঠিক করে প্যাসেজ বুক্ করে ফেল্‌ছি। আগামী পরশু এস্ এস্ বর্মূডাস্ জাহাজে আমরা যাত্রা করব।

—ঠিক আছে।

—এর পরে আমরা মিলিত হব জাহাজ ঘাটে, এখন চলি।

কোনও কথা না বলে নির্বিবাদে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরগতিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় লিউসিন।

তার অপসৃয়মান দেহটার দিকে চেয়ে মিঃ বাজপেয়ী প্রশ্ন করেন—এক কথায় এতগুলো টাকা রিস্ক করলে মিঃ তালুকদার ?

মিঃ তালুকদার হেসে বললেন—নো রিস্ক, নো গেন !

—কিন্তু লোকটা যদি এর পরেই অদৃশ্য হয় ?

—ভুলে যেও না ম্যাপটা আমার কাছে।

—কিন্তু এই ম্যাপটারই বা দাম কি?

—ম্যাপের দাম যে আছে সে প্রমাণ আমরা আগেই পেয়েছি। তাছাড়া ওটা যে গুপ্তধনের মানচিত্র তা আমি আমার এক বার্মিজ বন্ধুকে একবার দেখিয়েই জানতে পেরেছি।

—কিন্তু ম্যাপে মন্দিরের ঠিকানা থাকলেও মন্দিরের কোন্ জায়গায় যে জিনিসগুলো আছে তার ঠিক কি?

—সে ত এই বার্মিজ রাজা জানেই।

—কিন্তু এই লিউসিন যদি সেখানে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

—এটা ভুলো না, ওর কাছে সাত লাখ টাকা দামের হীরের চেয়েও ওই কবচটার দাম অনেক বেশি।

—কিন্তু কেন?

—সেটা এখনও জানি না। আর জানবার দরকারই বা কি?

—তা বটে। আমাদের মণি পেলেই আমরা সন্তুষ্ট।

—তবে আর চিন্তা কি বলো? একথা ত মানো যে, ম্যাপটা ছাড়া ও একেবারে পঙ্গু। আর আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে আর ম্যাপটা নিয়ে যদি ও সেই মন্দিরে যায়, তবে দুজনের দুটি রিভলভারের সামনে ওর ছোরাটার কোনও মূল্যই নেই।

—কিন্তু ওর যদি কোনও গুপ্ত রিভলভার···

—উঃ, তুমি বড্ড ভীতু। আগাগোড়া তুমি থাকবে পেছনে আর আমি আগে। অবশ্য এখন নয়—সেখানে পৌঁছে। আর ও ফাঁকি দিয়ে পালাতো অন্ততঃ চেষ্টা করবে না, তাহলে ওর সেই অমূল্য কবচটি হতেও বঞ্চিত হবে

—তা বটে। যাক্, যা ভাল বোঝ কর। তবে আমাকে যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছ, তাতে যে কোনও লোক হলেই ঘাবড়ে যেত। এখন দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে মিঃ তালুকদার বললেন—ভয় এদিক থেকে নেই। যদি অন্য কিছু আপদ-বিপদ না ঘটে, তবে নিশ্চয়ই আমরা সাত লাখ টাকার মালিক হব। আর হীরে নিয়ে একবার ভারতের বুকে পা দিলে ভয় কি ?

—সেটাও অবশ্য অনস্বীকার্য। তবে ওই রাজা ছাড়া এই গুপ্তধনের সন্ধান ও এর মানচিত্র আর কারও কাছে নেই ?

—আছে মাত্র দু'জন। এক প্রধান পুরোহিত। সে মৃত। আর দ্বিতীয় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী—সে যুদ্ধের শেষের দিকে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়ে প্রাণ হারায়।

—কিন্তু পুরোহিতকে মারলে কে ?

—ওই বার্মিজ রাজাই বোধ হয়। সে একা সবটা ভোগ করবার লোভে ওই কাণ্ডটা করেছে।

—তাহলে রাজা খুব সৎ অন্ততঃ নয় ?

—সৎ না হলেও, ফাঁদ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তবে প্রতি পদে সাবধানে আমাদের থাকতে হবেই।

—দুই

—রত্নমন্দিরের গুপ্তপথে—

সেদিন রাতে শত চেষ্টা করেও মিঃ বাজপেয়ী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর কেমন যেন একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, ও বার্মিজ লোকটা টাকা নিয়ে সেই যে চলে গেল আর কোনদিনই ফিরে আসবে না।

নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে যখন মিঃ তালুকদারের সঙ্গে মিঃ বাজপেয়ী গিয়ে জাহাজে উঠলেন তখন পর্যন্ত ওই ধারণাই তাঁর মনে

বদ্ধমূল ছিল। জাহাজে উঠে আশেপাশে খুঁজে তিনি বার্মিজ রাজার কোনও সন্ধানই না পেয়ে চিন্তিত ভাব মুখে ফুটিয়ে মিঃ তালুকদারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—কই, সেই বার্মিজটা গেল কোথায়? আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম যে সে এ রকম করবে।

মিঃ তালুকদার বললেন—মিথ্যাই তুমি এতটা ভাবছ মিঃ বাজপেয়ী। আমি তাকে আজ প্রায় তিনমাস থেকে যতদূর দেখেছি ও জেনেছি, তার মত লোক বড় একটা সহজে মেলে না। তার যেমন কথা, তেমনি কাজ।

—কিন্তু এখানেই ত তার থাকবার কথা ছিল?

—একটু বোঝবার মত বুদ্ধিও তোমার শেষ পর্যন্ত লোপ পেল মিঃ বাজপেয়ী? সে অবশ্যই ছদ্মবেশে আসবে। তাকে অন্ততঃ এই জাহাজের দশ পনের জন লোক চিনে ফেলতে পারে। গোপনে না গেলে সেই ধনাগার থেকে হীরা এনে তোমার হাতে তুলে দেওয়া ত মুখের কথা নয়!

—তা ত বটেই। কিন্তু…

কথা শেষ হল না। একজন লোক এসে লম্বা সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে বলল—কিছু ভিখ্ মিলে বাবুজী…

তার দিকে চেয়ে মিঃ তালুকদার বললেন—সত্যি, তোমার এ ছদ্মবেশের প্রশংসা করছি লিউসিন। প্রথমটা আমি পর্যন্ত তোমাকে চিন্‌তে পারিনি? চিনলাম তোমার কথা শুনে। হাজার হলেও তোমার গলার স্বর ত আর আমার অচেনা নয়।

লিউসিন হেসে বলল—চলুন, এবার আর প্রকাশ্যে কোনও কথা নয়। আপনাদের কেবিনের টিকিট থাকলেও আমি চলেছি ডেকের যাত্রী হিসেবে। কেবিন নিলে আবার কেউ চিনে ফেলতে পারে।

—তা ত বটেই। যাক্, এবার আমাদের কেবিনে এসো। কথাবার্তা যা কিছু বলবার সেখানে গিয়ে বলাই ভাল।

—হ্যাঁ, বাবু। আমিও সেটাকে ভাল মনে করি।

তিনজনে জাহাজের একটি কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন আলোচনায় ব্যাপৃত হল। তাদের সেই গোপন কথাবার্তা বাইরের সকলের কাছেই অজ্ঞাত রইল।

* *

রেঙ্গুন ছেড়ে ট্রেণে চেপে তিন ঘণ্টার পথ পাড়ি দেবার পর সঙ্গের সমস্ত লোককে বিদায় দিয়ে ওরা তিনজন রওনা হল একটি মোটরে চেপে। অবশেষে এমন একটা দুর্গম বনের সামনে তারা এসে মোটর থেকে নামল, যার মধ্যে মোটর প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

মোটর থেকে নেমে গহন বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিঃ বাজপেয়ী প্রশ্ন করলেন—এভাবে কতটা পথ যেতে হবে?

লিউসিন বলল—মাত্র সাড়ে ছ'মাইল বাবু!

—সাড়ে ছ' মাইল তোমার কাছে মাত্র হল লিউসিন? আর এই দুর্গম বন আর পর্বত শ্রেণীর উঁচুনিচু রুক্ষ পথ!

লিউসিন গম্ভীরভাবে বলল—পথ কমাবার কোন মন্ত্র ত আমার জানা নেই বাবু।

মিঃ বাজপেয়ী চুপ করলেন। তাছাড়া বলবারই বা কি আছে তাঁর পক্ষে? প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে করে এগোতে লাগলেন। বন্য জন্তু আর দুরাচারী মানুষের ভয়ে তিনি যেন সর্বদাই সন্ত্রস্ত বলে মনে হল।

প্রতিটি পদক্ষেপে মিঃ বাজপেয়ী আপনমনে কি যেন বকতে বকতে চললেন। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এখন হীরা পেয়ে অর্থলাভ করা ত দূরের কথা, টাকা ফেরত পেলেই এখন তিনি ঘরে ফিরে যেতে রাজী।

সাড়ে ছ'মাইল পথ তিনঘণ্টায় অতিক্রম করে যখন একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের দ্বারে গিয়ে পৌঁছুলেন তখন সন্ধ্যা নেমে আসতে খুব অল্পই বিলম্ব আছে।

বাইরের থেকে মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ। সেদিকে চেয়ে মিঃ বাজপেয়ী বললেন—তোমার কাছে মন্দিরের চাবি আছে ত হে লিউসিন ?

লিউসিন বিরক্তভাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মিঃ তালুকদার বললেন, এখানকার নিয়ম-কানুন দেখছি কিছুই তোমার জানা নেই। এক্ষুণি দেখতে পাবে।

মন্দিরের পেছন দিকের একটি সরু পথ ধরে তারা যখন এগিয়ে চলল তখন মিঃ বাজপেয়ী অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে এসব অঞ্চলের বৌদ্ধর-মন্দিরের পেছন দিকেও অপর একটি প্রবেশদ্বার থাকে।

মন্দিরের ভিতরে নিঃসীম আঁধার।

মিঃ বাজপেয়ী বিরক্ত হয়ে বললেন—উঃ, কোথায় আবার সাপ-খোপের কবলে পড়ে জীবনটা যাবে দেখছি!

বার্মিজ রাজা লিউসিন কোন উত্তর না দিয়ে কতকগুলো শুকনো বুনো লতায় আগুন ধরিয়ে দিল।

সারা মন্দিরের পেছন দিকটা আলোকিত হয়ে উঠলো সে আলোয়। একটা অতি উজ্জ্বল মশালের মতই প্রখর সে আলো।

আলোয় পথ দেখে দেখে ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চললো ওরা তিনজনে। সবার আগে বার্মিজ লিউসিন, আর তার পেছনে পিস্তলের ট্রিগারে হাত দিয়ে মিঃ তালুকদার ও মিঃ বাজপেয়ী।

মিঃ বাজপেয়ীর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল লিউসিন। বেশ খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে তারপর বিশাল একটা বুদ্ধমূর্তির পেছনের দিকে একটা বেদীর মতো স্থানে বসে পড়ল সে। কিছুক্ষণ ধরে সে জায়গাটি ভাল করে দেখে মিঃ তালুকদারের দিকে চেয়ে

বলল—এই জায়গাটার কোণের মাটিগুলো সব সরিয়ে ফেলে দাও ত—মিঃ তালুকদার।

—তুমিই দাও না! বলল মিঃ বাজপেয়ী।

—না-না, আমিই করছি। মিঃ তালুকদার বাধা দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, একটা বার্মিজের প্রাচীন সংস্কার তাকে এভাবে এই পবিত্র স্থান থেকে অর্থ গ্রহণ করতে বাধা দেবে।

কোমরের লম্বা ধারাল ছুরিটা দিয়ে অবিরাম মাটি খুঁড়ে চললেন মিঃ তালুকদার। কতক্ষণ যে এভাবে তিনি মাটি খুঁড়েছিলেন তা তাঁর খেয়াল নেই। আর তাঁর ঠিক পাশেই রুদ্ধ আগ্রহে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক। একজন লিউসিন এবং অপরজন মিঃ বাজপেয়ী। লিউসিনের দৃষ্টি মাটি খোঁড়ার দিকে নিবদ্ধ, আর বাজপেয়ী পিস্তলের ট্রিগারে হাত দিয়ে শিকারী বিড়ালের মত দৃষ্টি নিয়ে লিউসিনের দিকে চেয়ে।

ঠং ঠং······

ধাতব একটা শব্দ।

কি একটা পদার্থের সঙ্গে ছুরীর অগ্রভাগ আঘাত পেয়েছে বলে এই অস্পষ্ট শব্দটা উঠল।

—ওটাকে ওপরে তোল মিঃ বাজপেয়ী। ওর মধ্যেই পাবে যা কিছু সঞ্চয়। হীরা আর কবচ! একসঙ্গে এতগুলো কথা ফুটে উঠল লিউসিনের ঠোঁটে।

অনেক কষ্টে সেটাকে ওপরে তুলে দেখা গেল সেটা একটা বিরাট পিতলের তৈরী বাক্স। আর বাইরে একটা বড় তালা। কিন্তু সেটা ভাঙা। বাক্সটা উন্মুক্ত হয়ে গেল তালাটা খুলতেই।

—একি, বাক্সের তালা ভাঙলো কে? বিস্ময়ের স্বর ফুটে উঠলো লিউসিনের ঠোঁটে।—নিশ্চয়ই আমাদের আগে অপর কেউ এখানে আসতে সক্ষম হয়েছিল। এ তারই কাজ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু···

কথা শেষ হল না। বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেল সেটি শূন্যগর্ভ। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বাজপেয়ী ঝাঁপিয়ে পড়লেন লিউসিনের ওপরে। গর্জে উঠলেন তিনি—ঠগ, শয়তান, জোচ্চোর! আগেই হীরা সরিয়ে পরে টাকা নেবার মতলব!

লিউসিন একপাশে সরে গিয়ে হাতের কি একটা অস্ত্র তুলে ধরল।

এক ঝলক আলো ও শব্দ।

মুহূর্তের মধ্যে মিঃ বাজপেয়ী লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

—বাজপাখির বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগের শাস্তি সে এমনিভাবেই দিয়ে থাকে। বলে উঠল লিউসিন।

—বাজপাখি! অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মিঃ তালুকদার।

—হ্যাঁ, বার্মিজ রাজা লিউসিন আর কেউ নয় মিঃ তালুকদার। সেই হচ্ছে ছদ্মবেশী বাজপাখি। যাক্, এবার নিশ্চয়ই মিথ্যা ভয় দেখাবেন না আমাকে। তবে ভয় নেই, হীরেচোরকে খুঁজে বের করবই আমরা দুজনে চেষ্টা করলে পৃথিবীর কোনও প্রান্তে গিয়েই সে নিস্তার পাবে না।

—তুমি ঠিক বলছ বাজপাখি?

—হ্যাঁ, মিঃ তালুকদার। আজ থেকে আমরা দুজনে বন্ধু। যে ছিল শয়তান, তার মৃতদেহ ত ইতিমধ্যেই ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। মনে রাখবেন আপনার কাছে হীরার দাম যেমন, আমার কাছে কবচের দাম তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি। এটা হচ্ছে কনফুসিয়রের পূত হস্তের পরশ পাওয়া কবচ। যে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে ওর দাম দশ লক্ষ টাকারও বেশি। তাছাড়া ওটাকে সাধারণভাবে বিক্রী করলেও অন্ততঃ সাত লক্ষ টাকা আমি পাবই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি দ্বারা মণ্ডিত চলুন, আমরা এখনই অনুসন্ধান সুরু করি।

মিঃ বাজপেয়ীর মৃতদেহটা মন্দিরের পেছন দিকে ঝোপ জঙ্গলের জ টলার আড়ালে একটা বিরাট গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পুঁতে ফেলা হল। তার সেই কবরটার দিকে চেয়ে বাজপাখি বলে উঠল—হয় ওকে না হয় আমাকে মরতে হতোই। যা হোক সে জন্যে আশা করি দুঃখিত হবেন না মিঃ তালুকদার !

মিঃ তালুকদারের ঠোঁটে স্বর ফুটল না।

তিনি আনমনে একবার কবরটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—বর্মার মাটিতেই যে ওর অন্তিমশয্যা রচনা হবে তা বোধ হয় ও আগে থেকেই জানতে পেরেছিল !

মিঃ বাজপেয়ীকে প্রোথিত করে ফিরে এসে বাজপাখি বলতে সুরু করল—শুনুন মিঃ তালুকদার। ওই কবচ আর গুপ্তধনের লোভে দীর্ঘদিন আমাকে বার্মিজ রাজার ছদ্মবেশে এদেশে কাটাতে হয়েছে। আমার সেই অফুরন্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। পৃথিবীর সব আলো না নিভে যাওয়া পর্যন্ত সেই কবচের আশা আমি কোনমতেই পরিত্যাগ করতে পারব না।

তালুকদার বাজপাখির সঙ্গে আবার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

হঠাৎ মেঝের এক জায়গায় কি একটা জিনিসের দিকে বাজপাখি মিঃ তালুকদারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। বাজপাখি বলল—ঠিক ওই জায়গায় এই যে পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছেন ওটা কি বলতে পারেন মিঃ তালুকদার ?

এক জায়গায় খানিকটা নরম মাটির উপরে পাশাপাশি দুটো জুতোর ছাপ। একটা পুরুষের জুতো, অপরটি হাই হিল অর্থাৎ মেয়েদের জুতো। এই বিজন বনের গোপন মন্দিরের সুরক্ষিত স্থানের সন্ধান এই দুই পুরুষ ও নারী পেল কোত্থেকে !

বাজপাখি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল—পেয়েছি মিঃ তালুকদার।

—কি ব্যাপার ?

—কল্‌কাতার প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ গুহ।

—কিন্তু তিনি ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তার একমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউ ত বেঁচে নেই শুনেছি।

—এ নিশ্চয় সেই প্রত্নতাত্ত্বিক গুহ ও তাঁর একমাত্র মেয়ে শ্যামলীর পায়ের ছাপ। এত বড়ো মুল্যবান সম্পদ তারা এত সহজে হাতছাড়া করতে পারেনি।

—কিন্তু অতঃপর কি করা কর্তব্য ?

—আমরা তাদের অনুসরণ করব। যে করেই হোক সেই কবচ আমার চাই।

—বেশ, আমিও নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার সাথী হব বাজপাখি।

—তাহলে আমরা আজই যাত্রা করব কলকাতার দিকে। যদি জাহাজে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে প্লেনে।

—কিন্তু রেঙ্গুন পৌছতেই ত অন্ততঃ দুদিন লেগে যাবে।

—না, আমরা এখুনি হাঁটতে সুরু করব। গহন বন বাজপাখিকে বাধা দিতে পারে না। রাত প্রায় দশটার মধ্যেই আমরা এই বনে শেষে যে হোটেলটা আছে সেটাতে পৌছে যাব। তারপর ভোরের ট্রেনে রেঙ্গুনের দিকে যাত্রা করব।

বাজপাখির অবিচল সংকল্প দেখে মিঃ তালুকদার আর তাকে বাধা দিতে সক্ষম হলেন না।

—চার—

—প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ গুহ—

রেঙ্গুন সহর থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে বর্মার একটা সুদূর কোণে অবস্থিত রিজওয়ে হোটেলের বুকে সেদিন রাত্রে দেখা গেল তুজন নবাগত আগন্তককে। ম্যানেজারের ঘরে তুজনে প্রবেশ করে একটি রাত্রির জন্য আশ্রয় ও খাদ্য প্রার্থনা করল। তারা স্পষ্টই বলল যে, এজন্যে তারা যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত।

বেঁটে-খাটো ম্যানেজার যখন মিঃ তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাদের আশ্রয়স্থানটি দেখাবার উদ্দেশ্যে সেই ফাঁকে বাজপাখি হোটেলের পুরোনো ও বর্তমান মেম্বারদের তালিকার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে চলল।

মিনিট তুয়েকের মধ্যেই একস্থানে পর পর তুটি নাম দেখে সে যেন চমকে উঠল!

সুস্পষ্ট অক্ষরে খাতার বুকে তুটি নাম লেখা—প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ এন গুহ। তার নিচে অপর একটি নাম, শ্যামলী গুহ।

বাজপাখির ঠোঁটের কোণে ক্রূর একটা হাসি খেলে গেল। নামের পাশে চেয়ে দেখল তারা ঠিক আগের দিন সকালে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।

বাজপাখি কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে মিঃ তালুকদার ও ম্যানেজার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

মিঃ তালুকদার ঘরের কোণে বিছানাটা পাততে ব্যস্ত ছিলেন। বাজপাখী ম্যানেজারকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—গোটা পঁচিশেক টাকা যদি আপনাকে অতিরিক্ত দেওয়া হয়, তবে আপনি কি তা নিতে অস্বীকার করবেন?

বিগলিত হাসি হেসে ম্যানেজার বলল—আপনাদের মত মহানুভব লোকেরা যখন আমার অতিথি, তখন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ?

—হ্যাঁ, সামান্য একটা কাজ করলেই এই পরিমাণ অর্থটা পেতে পারেন আপনি।

—কি কাজ ?

—গোটাদুয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে। কিন্তু সেটা আপাততঃ গোপন রাখতে হবে।

—বেশ বলুন কি খবর জানতে চান ?

—প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ এন্ গুহ ও তাঁর কন্যা শ্যামলী কি এই হোটেলে এসে কয়েকদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, তাঁরা দুদিন আমার হোটেলে ছিলেন। গতকাল ভোরে তাঁরা কলকাতার দিকে যাত্রা করেছেন।

—আচ্ছা, তাঁরা কোথায় যাবেন এ সম্বন্ধে কোনও কথা শুনতে পেয়েছিলেন কি ?

—সব কথাই আপনাকে বলব। কিন্তু···

—কোনও ভয় নেই আপনার। এসব কথা আমরা ছাড়া আর কোনও লোকের কানেই উঠবে না।

—তাঁরা কলকাতায় পৌঁছনোর পরই মিঃ গুহ গোপনে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করবেন। সেখানে কোনও একটি গোপন, অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা হবে।

—সেই প্রয়োজনীয় জিনিসটা কি আপনি দেখেছেন ?

—না। একটা মস্ত বড় বাক্সে কতকগুলি জিনিসপত্র থাকত, সেটার উপরে তাঁরা দুজনে পর্যায়ক্রমে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন দেখেছি। এমন কি কখনও তাঁরা দুজনে একসঙ্গে ঘরের বাইরে পর্যন্ত যেতেন না। পাছে কেউ তাঁদের জিনিসটি তালা ভেঙ্গে চুরি করে।

মৃদু হেসে বাজপাখি বলল—বুঝেছি। আর কিছুই বলতে হবে না। আমার যেটুকু জানবার তা এ থেকেই সবকিছু জেনে ফেলেছি। যাক্, এই নিন আপনার পঁচিশটি টাকা।

বাজপাখির এই অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক হয়ে ম্যানেজার চেয়ে রইল তার মুখের দিকে!

* * *

* * *

তক্ষুণি বাজপাখি ঘরে এসে তালুকদারের দিকে চেয়ে বলল—আর কোনও সংশয় নেই মিঃ তালুকদার। এখন আমাদের সামনে ওই একটি কাজ—অনুসরণ করা। কে জানে এ অনুসরণের শেষ কোথায়? কলকাতা না ইংল্যাণ্ড।

মিঃ তালুকদার বললেন—সে যত দূরত্বই হোক না কেন, তাতে চিন্তার কিছু আছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

হেসে বাজপাখি বলল—আছে বন্ধু, আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গুহকে অনুসরণ করা যত সহজ গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর হাত থেকে দূরে থাকা ঠিক তত কঠিন।

—গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে মিঃ তালুকদার বাজপাখির দিকে চেয়ে।

—সে পরিচয় হয়ত শীগ্‌গিরই পাবে বন্ধু। আজকের নিদ্রাই হয়ত তোমার জীবনের শেষ সুখনিদ্রা। এর পর প্রতি পদে আমাদের দুরন্ত বাধা আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

—পাঁচ—

—মিস্ শ্যামলী গুহ—

শোভাবাজার ষ্ট্রীট ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলে রাস্তার ডানদিকে প্রত্ন-তাত্ত্বিক মিঃ গুহের বিরাট বাড়িটা।

বেলা দশটা।

মিঃ গুহের বাড়ীর সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। তা থেকে নামলেন মিঃ তালুকদার। তিনি সোজা উঠে গিয়ে কলিং বেলটাকে মৃদু চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—কাকে চাই? একটি ভৃত্য বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

—মিঃ গুহ আছেন?

—না, তিনি বাইরে গেছেন সম্প্রতি।

—ও, অপর কেউ? সামান্য দু এক মিনিটের জন্য কথা বলতে চাই শুধু।

—ওঁর মেয়ে শ্যামলী দেবী আছেন।

—তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করা সম্ভব কি?

—অবশ্যই। কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন এবং কি প্রয়োজনে দেখা করতে চান বলুন। যদি তাঁর কোনও আপত্তি না থাকে, তবেই···

—আমি সম্প্রতি বর্মার দিকে বেড়াতে যাব বলে স্থির করেছি। তাই কিছু জানতে চাই সে দেশ সম্বন্ধে। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্যামলীদেবীরও যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলে শুনেছি···

—আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে।

ভেতরে ড্রইংরুমে সাক্ষাৎ হল শ্যামলী গুহর সঙ্গে। এত সুন্দর এবং কমনীয় চেহারার কোনও নারীর যে এতটা গাম্ভীর্য থাকতে পারে তা এই প্রথম লক্ষ্য করলেন মিঃ তালুকদার।

—আপনার প্রয়োজনটা জানাতে পারেন।

—আমি বর্মা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাবার জন্য মিঃ গুহর খোঁজ করতে এসেছিলাম। আমি সম্প্রতি সে দেশের দিকে একটু বেড়াতে যাব বলে স্থির করেছি।

—বাবা ত বর্তমানে কলকাতায় অনুপস্থিত।

—শুনেছি। যদিও অপ্রয়োজনে, তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—বলুন।

—তিনি কোথায় গেছেন, সেটা আপনার জানা আছে কি?

—পশ্চিমের দিকে গেছেন বলে জানি। তবে কোথায় তা ঠিক বলতে পারব না।

—কেন?

—তিনি ঠিক কখন্ কোথায় থাকেন তার ত স্থিরতা নেই। তবে রাজপুতানার দিকে কোনও এক স্থানে···

—আচ্ছা, আপনারা বর্মায় শেষ কতদিন আগে গেছেন?

—তা প্রায় মাস ছয়েক ত বটেই।

—তার পরে আর সেখানে যাননি?

—না।

—আপনার বাবাও আর সেখানে যাননি?

—বললুম ত, আমরা কেউই আর যায়নি তারপর।

—কিন্তু যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে, দিন সাতেক আগেও আপনি বর্মায় ছিলেন?

—আপনার কথাটা ঠিক ভদ্রতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাচ্ছে নাকি মিঃ তালুকদার?

—না, আপনাকে দুঃখ দিতে আমি চাই না।—বর্মার কোনও এক কোণে রিজওয়ে হোটেলে আপনি যে সাতদিন আগেও ছিলেন সে কথা জানা আছে আমার।

—বিশ্বাস করি না।

—সেখানে ম্যানেজারের খাতায় আপনার ও আপনার বাবার নাম সই করা দেখেছি।

—মিথ্যা কথা। হয়ত অন্য কেউ নাম ভাঁড়িয়ে কোন উদ্দেশ্যে আমাদের নাম নিয়ে ওই হোটেলে উঠেছিল।

—বেশ, সত্যি কথা আপনি যে বলবেন না তা জানি। তবে আমি আবার শীঘ্রই দেখা করব। আমার এই কার্ডটা রেখে দিন। আশা করি ভবিষ্যতে আরও একটু ভাল ব্যবহার আপনার কাছ থেকে পাব।

বিস্মিতা শ্যামলী গুহের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে হন্ হন্ করে মিঃ তালুকদার বেরিয়ে গেলেন পথের উদ্দেশ্যে।

* * *

* * *

সেদিনই সন্ধ্যার সময় প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ গুহর বাড়ীর সামনে একজন বার্মিজবেশী লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল।

সেদিন দু'তিনজন বন্ধুর সাথে কি একটা আলোচনার জন্য মিস্ শ্যামলী গুহ ব্যস্ত ছিল।

তাঁর খাস খানসামা কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য একটা ট্রেতে বোঝাই করে ধীরে ধীরে তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে চলছিল।

হঠাৎ তার পেছনের একঠা আইভি-লতার ঝোপ যেন ঈষৎ নড়ে উঠল।

খাসবেয়ারা রামদীন এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ঈষৎ চম্‌কে উঠে পেছনদিকে ফিরে চাইল।

কিন্তু তার বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে দিয়ে বার্মিজটি একটি রিভলবার তার ঠিক বুকের উপরে ছুঁইয়ে রেখে বলল—এতটুকু নড়বার চেষ্টা করলেই প্রাণটা দেহের মায়া কাটিয়ে প্রস্থান করবে।

—কে তুমি?

—আপাততঃ পরিচয় থাক! কয়েকটি সত্যি কথা আশা করি তোমার মুখ থেকে শুনতে পাব। সত্যি উত্তর দিলে তোমার কোনও ভয় নেই।

—কি কথা?

—তোমার মনিব মিঃ গুহ কোথায় গেছেন?

—পশ্চিমে, রাজপুতানার দিকে···

—বাজে কথা!

—আমি সে কথাই ত শুনেছি।

—না, আমি ভেতরের খবরটাই জানতে চাই। সত্যি কথা না বলার ফল জানার দুর্ভাগ্য আশা করি তোমার হবে না। এই শেষ বারের মতো সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি, এ কথা মনে রেখো।

—দিদিমণির কাছে শুনেছি তিনি ইংল্যাণ্ডের দিকে গেছেন।

—এতক্ষণে সত্যি কথা শুনতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। তার সঙ্গে কি কি জিনিস ছিল বলতে পার কি?

—একটা মূল্যবান বাক্স ছিল অন্যান্য জিনিসগুলোর সঙ্গে।

—তিনি রওনা হয়েছেন প্লেনে না জাহাজে?

—জাহাজে।

—আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পার।

খাসবেয়ারা রামদীন ধীরে ধীরে দু'পা এগিয়ে যেতেই আচম্‌কা একটা ছোরা এসে সজোরে তার পিঠে বিদ্ধ হলো।

আঃ—অস্ফুট শব্দ।

ছদ্মবেশী বাজপাখির ঠোঁটে ফুটে উঠল অদ্ভুত এক হাসি। আপন মনেই বিড় বিড় করে সে বলল—এর বেশি আর তোমার কাছ থেকে জানা যাবে না, তা জানি। কিন্তু তুমি যে একথা প্রকাশ করবে সে সুযোগ আর তোমাকে দিলাম না।

আঁধার নিবিড় কালিমার আড়ালে বাজপাখির দেহটা যখন নিঃশেষে মিলিয়ে যায় তখন সারা বাড়ি জুড়ে বাজপাখির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তুমুল হট্টগোল সুরু হয়েছে।

—ছয়—

—তদন্তচক্রে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী—

পর পর দুবার যখন বর্মার মন্দির থেকে তাদের পবিত্র কন্‌ফুসিয়ারের কবচ ও মন্দিরের অর্থাদি অপহরণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য অনুরোধপত্র এসে উপস্থিত হ'ল, তখন কলকাতার পুলিশবিভাগ বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চঞ্চল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুহর খাসচাকর রামদীনের মৃত্যুর সংবাদ সহরের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

সেদিন বিকেলে এ বিষয়ের তদন্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য ডেপুটি কমিশনার সাহেব দীপককে অনুরোধ জানালেন। দীপক তাঁর ফোনের উত্তরে জানাল—যতদূর মনে হচ্ছে ওই প্রত্নতাত্ত্বিক গুহর বাড়িতে তাঁর খাস খানসামা রামদীনের মৃত্যুর সঙ্গে এই ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে।

—আপনার এ কথা মনে হচ্ছে কেন? প্রশ্ন করলেন ডেপুটি কমিশনার।

—কারণ অবশ্যই আছে। আপনার মনে আছে কি যে পলায়নরত হত্যাকারীকে সকলে বার্মিজ মনে করেছিল?

—হ্যাঁ, সেটা অবশ্য……

—আর সেদিন সকালে মিঃ তালুকদার নামে জনৈক লোক বর্মা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে শ্যামলী গুহর সঙ্গে দেখা করেছিল।

—এটা আপনি কি করে জানলেন ?

—আপনাদের এই কেসের ডায়েরীটা আমি একটু কৌতূহলী হয়ে দেখেছিলাম, এই আর কি !

—অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু আপনার কথা শুনে যেন মনে হচ্ছে যে, প্রত্নতাত্ত্বিক গুহই বর্মার মন্দির থেকে ওই সব ধনসম্পদ অপহরণ করেছেন।

—না, ব্যাপারটা আরও জটিল। তবে আমার মনে হয়, একদল লোক তাঁকেই সন্দেহ করে তাঁর পেছনে দিনের পর দিন অনুসরণ করে চলছে।

—তবে আসল চোর কে ?

—সেটা এখনও জানতে পারিনি। আচ্ছা মিঃ গুহর মিউজিয়াম থেকে আর কোনও জিনিস চুরি গেছে কি ?

—শ্যামলীদেবী জানিয়েছেন, কেবলমাত্র একটা বুদ্ধমূর্তি তাঁর এই মিউজিয়াম থেকে খোয়া গেছে।

—শুভ সংবাদ। এতে আমার তদন্তের সুবিধাই হল। যথাসময়েই আমি প্রকৃত চোরকে ধরবার ব্যবস্থা করব স্যার।

—কিন্তু যত শীঘ্র ব্যবস্থা করতে পারেন মিঃ চ্যাটার্জী। আমি আশা করি যে এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি এই ব্যাপারটার কিনারা করতে সক্ষম হবেন।

—হ্যাঁ, এটুকু আশা অন্ততঃ আমি রাখি।

* * *

সেদিনই সন্ধ্যার মুখে দীপক গিয়ে দেখা করল মিস্ শ্যামলী গুহর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই তার মনে হল যেন অনেক কিছু গোপনীয় কথা সে লুকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করছে।

নিজের পরিচয় দিতেই শ্যামলীদেবী মৃদু হেসে বলল—

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলুম মিঃ চ্যাটার্জী। এতদিন শুধু আপনার নাম লোকের মুখে-মুখেই শুনে এসেছি। আজ চোখের সামনে দেখতে পেয়ে…

—আমি এমন কিছু মহৎ ব্যক্তি নই মিস্ গুহ, যে এতটা…

—না, না। প্রথম দর্শনের আনন্দটা প্রকাশ করছিলাম মাত্র।

—সে যাক। আমি আপনাদের বাড়ির এই খানসামাটির মৃত্যু ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছিলাম।

—ওঃ। তা হঠাৎ আপনার মত লোকের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কারণ ?

—কারণ, আমার মনে হচ্ছে যে, সম্প্রতি বর্মায় কোনও একটি ধর্মমন্দির থেকে যে সাত লক্ষ টাকা মূল্যের হীরা ও অমূল্য কন্‌ফুসিয়ারের কবচ চুরি গেছে তার সঙ্গে এই ব্যাপারটির সম্পর্ক আছে।

—সেকি ! অবাক হয়ে প্রশ্ন করে শ্যামলী।

—আচ্ছা, সেটা পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন বলুন ত আপনার পিতা হঠাৎ ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করলেন কেন ?

—সে কি ? আপনি কি করে জানলেন ? এই সংবাদটা ত তিনি অত্যন্ত গোপনে রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

—কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে খবর নিয়েই এটা জানতে সক্ষম হয়েছি আমি।

—সত্যি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি মিঃ চ্যাটার্জী।

—কিন্তু কি সে কারণ যা হঠাৎ মিঃ গুহকে সুদূর ইংল্যাণ্ডের দিকে টেনে নিয়ে চলল ?

—আপনার কাছে সত্যি কথা প্রকাশ করতে কোনও ভয় নেই মিঃ চ্যাটার্জী। সবকিছু কথা আমি খুলেই বলছি। কিন্তু আশা করি, এটা অন্ততঃ গোপনীয় থাকবে।

—অবশ্যই। এই তদন্ত ব্যাপারে সাহায্যের জন্য সর্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি শ্যামলীদেবী।

—ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, এটা আমার কর্তব্য। যাক্, শুনুন। আমার বাবার প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় রিসার্চের' জন্য যে অজস্র লোকের সংগে মিশতে হ'ত তা বোধ হয় আপনি জানেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—অস্বীকার করি না।

—তার মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছে যারা বহুমূল্য নানাবিধ জিনিসপত্র সংগ্রহ করে দেয়। চীনদেশীয় তেমন একজন লোকের নাম চিয়াংকাই। ইতিপূর্বে সে অনেকবার নানাবিধ জিনিসপত্র বাবার কাছে বহু মূল্যে বিক্রী করেছে।

—আচ্ছা, সে এগুলি কোত্থেকে কি উপায়ে সংগ্রহ করেছে তা কি আপনার জানা আছে মিস্ গুহ ?

—অবশ্যই নয়। ওসব খবরে ত আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা জিনিসের দাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তারপর সেগুলো কিনে থাকি। যাক্ সে কথা, দিন চার পাঁচ আগে সেই চিয়াংকাই আবার একদিন হঠাৎ বাবার কাছে এসে বললে যে, হাজার দুয়েক বছর আগেকার কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ও অতি মূল্যবান পুঁথি সে সংগ্রহ করে এনেছে। ওই পুঁথি একটি কৌটায় বায়ু চলাচল বন্ধ অবস্থায় আটকে রাখা ছিল। তার উপরে যে সব কথা লেখা ছিল তা দেখেই বাবা ও-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয়ে পড়লেন। তবে কথা থাকল যে চিয়াংকাইকে টাকা দেবেন না। এই পুঁথিটা যদি সত্যিই সেই পুঁথি হয়, তবে বাবা অন্ততঃ কম্‌সে কম হাজার পঞ্চাশ টাকা দিয়েও ওটা কিনতে রাজী ছিলেন। তাঁর ধারণা ওটি সভ্যজগতের বুকে নতুন আলোড়ন তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে না গেলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ওই পুঁথির কৌটা খোলা সম্ভব ছিল না।

—কিন্তু আপনি আপনার বাবার ইংল্যাণ্ড যাবার কথা এভাবে গোপন রেখেছিলেন কেন?

—কারণ অবশ্যই ছিল। চিয়াংকাই বলেছিল যে, তাঁর এই যাত্রা গোপনে না হলে চলবে না। বর্মার একজন পুরোহিত এই পুঁথিটা চিয়াংকাইয়ের কাছ থেকে নেবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করছে। এই ধর্মান্ধ পুরোহিতের দল যদি বুঝতে পারে যে বাবা এগুলি নিয়ে ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করেছেন তবে তাঁর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বে।

একটু থেমে দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনার বাবার সঙ্গে সেদিন যে লোকটি সকালে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁকে আপনার কেমন মনে হয়েছিল?

শ্যামলী বলল—তাকে দেখলাম বর্মা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কৌতূহলী। এমন কি এজন্য সে আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

—তাঁর নাম?

—মিঃ তালুকদার।

—তাঁর এই অভদ্র ব্যবহার হঠাৎ কি কারণে আত্মপ্রকাশ করেছিল?

—সেইটাই একটা মজার ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী। সে বারবার বলছিল যে আমরা নাকি অল্পদিন আগে—মানে এক সপ্তাহ আগে বর্মা থেকে ঘুরে এসেছি। আমি বললাম, ওকথা সত্যি নয়। এতেই সে যেন ক্ষেপে উঠল। বলল, আমি নাকি মিথ্যাবাদী।

—এতটা বলতে সে সাহস পেল কি করে?

—বর্মার কোন এক হোটেল রিজওয়ের মেম্বারদের নামের তালিকায় সে নাকি আমার এবং বাবার নাম সই দেখে এসেছে।

—এটা কি করে সম্ভব?

—সেটা সত্যিই এখনও বুঝতে পারিনি মিঃ চ্যাটার্জী। কেউ

হয়ত মিথ্যা কোনও ব্যাপারে আমাদের জড়াবার জন্যে এ ধরনের কাজ করেছে।

—ব্যাপারটা ক্রমশঃই যেন জড়িয়ে যাচ্ছে শ্যামলীদেবী। আমার মনে হয় এ বিষয় ইংলণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। আচ্ছা আপনার বাবা যে জাহাজে গেছেন সেটা ত বোম্বাই হয়ে তারপর এডেন যাবে, এবং সেখান থেকে···

—একজ্যাক্টলী মিঃ চ্যাটার্জী।

—তবে আমি কিছুটা সিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে পৌছতে সক্ষম হয়েছি বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় আপনার সেই তালুকদার আর আপনাদের খাস খানসামার হত্যাকারী সেদিনই সেই জাহাজের উদ্দেশ্যে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছে।

—আপনার এ ধারণার কারণ ?

—এখন তা বলা সম্ভব নয় মিস্ গুহ। তবে বর্মা থেকে যে বিরাট ধনরত্ন ও পবিত্র কবচ চুরি গেছে সেটা মিঃ গুহের কাজ বলে এই লোক-গুলির বোধ হয় ধারণা।

—সর্বনাশ!

—তারা বোধ হয় ওই পুঁথির বদলে ওই বাক্সে দামী ধনরত্ন আছে বলে মনে করছে। কিন্তু এর মূলে দেখছি সেই চিয়াংকাই। আচ্ছা, চিয়াংকাইয়ের ঠিকানা জানেন কি ?

—সে ত পরদিনের প্লেনেই কি একটা জরুরী প্রয়োজনে দিল্লী যাত্রা করেছে।

—আচ্ছা, সেই যে বুদ্ধমূর্তিটি চুরি গিয়েছিল আপনাদের মিউজিয়ম থেকে সেটার ভিতরটা কি ফাঁপা বলে আপনার ধারণা ?

—হ্যাঁ, সেটাও চিয়াংকাই আমাদের কাছে বছর তিনেক আগে বিক্রী করেছিল। তার ভেতরটা সত্যিই ফাঁপা এবং কৌশলে খোলা যায়।

—ধন্যবাদ। আশা করি, শীঘ্রই এ রহস্যের কিনারা করতে সক্ষম হব, শ্যামলীদেবী। তবে আপনার বাবার লণ্ডনস্থ এজেণ্টের ঠিকানাটা দয়া করে দিতে পারেন কি মিস্ গুহ ?

—অবশ্যই। তাঁর ঠিকানা লেখা আছে আমার ডায়েরীতে। এই দেখুন—

দীপক পড়ে দেখল।

এন্ ষ্টিভেন্সন ১৪ নং, পিকাডিলি স্কোয়ার,
লণ্ডন।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে দীপক পথে বেরিয়ে পড়ল

—সাত—

—বর্মার অভিশাপ—

বোম্বাই।

'গেটওয়ে অব্ ইণ্ডিয়া'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বহুদূরের 'তাজ' হোটেলের নিয়ন আলোর দিকে চেয়ে একজন লোক আর একজনকে বলছিল—তাহলে এল্ এস্ নাভানার বুকে বর্মার অভিশাপ ছড়িয়ে পড়বে মিঃ তালুকদার ?

—তার মানে ?

—আমরা জানতে পেরেছি যে মিঃ গুহের কাছে সযত্নে রক্ষিত একটি একটি বড় বাক্স আছে। সেটি তিনি নিজের বিছানার সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, তা সত্যি।

—আর এতে কি আছে তাও আমাদের অজানা নয়। ভগবানের কৃপায় আমরা প্লেনে ঠিক উপযুক্ত সময়েই কলকাতা থেকে বোম্বাইতে

আসতে পেরেছি। এখন আমরা এই জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করব। কিন্তু বেশি দূর নয়। আমাদের গন্তব্যের শেষ স্থান এডেন।

—এডেনেই শেষ কেন ?

—ইতিমধ্যেই আমরা রটিয়ে দেব যে বর্মা থেকে এমন একটা জিনিস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার জন্যে দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে ওই জাহাজের উপরে। আমাদের কার্যাবলী সেই কথাই প্রমাণ করবে।

—কিন্তু তাতে কি লাভ ?

—এর পর যদি কোনও লোকের কক্ষ থেকে এ রকম একটা জিনিস সত্যিই চুরি যায় তবে সেটাকে সকলে বর্মার অভিশাপের পর্যায়েই ফেল্‌বে।

—সে ত অবশ্যই।

—তারপর মিঃ গুহর আশ্রয় হবে নীল সমুদ্র। আর এডেন থেকে বাজপাখি উড়বে তার প্রার্থিত জিনিস নিয়ে।

—তোমার বুদ্ধির সত্যিই প্রশংসা করি মিঃ লিউসিন।

—এখন আর ওসব নয় মিঃ তালুকদার। এখন আমাদের দুজনেই জাহাজের দুজন মাদ্রাজী যাত্রী। এ কথাটা যেন মুহূর্তের জন্যও ভুলো না বন্ধু !

—হ্যাঁ, সেটা বেশ ভালভাবেই মনে আছে।

* *

* * *

পরদিন সকালে খবরের কাগজের বুকে যে একটা খবর বের হলো তা সত্যিই মিস শ্যামলী গুহকে চিন্তিত ও শোকার্ত করে তুলল।

খবরের কাগজের বুকে লেখা :

জাহাজের বুকে বর্মার অভিশাপ !

এস্ এস্ নাভানার মধ্য থেকে বহুমূল্য জিনিসপত্রাদি অপহৃত। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ গুহ অদ্ভুতভাবে নিখোঁজ !

কল্‌কাতা থেকে এস্‌ এস্‌ নাভানা নামে যে জাহাজটি দিনকয়েক আগে বর্মার দিকে যাত্রা করেছিল, তার বুকে পর পর অদ্ভুত কতকগুলি ঘটনা ঘটতে স্বরু করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য অফিসারেরা অজস্র অনুসন্ধান করেও তার কোনও কারণ নির্ণয় করতে পারেননি।

সম্প্রতি জানা গেল, এই জাহাজে চড়ে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ গুহ কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে রিসার্চ করবার জন্য ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু বিগত ২৪শে মে রাত্রির পরে তাঁর আর কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। একদল লোক তাঁর কক্ষে কি সব জিনিসপত্রাদি অনুসন্ধান করেছিল। কিন্তু সামান্য একটি বাক্সে কতকগুলি মূল্যবান পুঁথি ছাড়া আর কিছুই অপহৃত হয়নি।

মিঃ গুহর এই আকস্মিক নিখোঁজে আমরা সত্যিই মর্মাহত হলাম। জাহাজের মধ্যে প্রবল গুজব রটতে স্বরু করেছে যে, নিশ্চয়ই বর্মার অভিশাপ এই জাহাজের উপরে প'ড়েছে। বর্মার কতকগুলি মূল্যবান ধর্মসম্বন্ধীয় কাগজপত্রাদি এই জাহাজে করে নাকি ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে শ্যামলী গুহ ফোনটা তুলে বললেন —হ্যালো···

—কাকে চান ?

—গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

—দুঃখিত, আমি তার সহকারী রতনলাল কথা বলছি। তিনি গতকাল বিকেলে স্পেশ্যাল চার্টার্ড প্লেনে কতকগুলি জরুরী বিষয়ে তদন্তের জন্য এডেনের দিকে যাত্রা করেছেন।

মিস্‌ শ্যামলী গুহ ফোনটা রেখে দিয়ে চেয়ারের বুকে এলিয়ে পড়ল।

—আট—

—এডেনের উষর ক্ষেত্রে—

বেলা দশটা।

এস্ এস্ নাভানা এসে এডেন বন্দরে নোঙ্গর ফেলেছে।

প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী ও ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্‌কে দেখা গেল এডেনের যাত্রীদের ওঠানামার দিকে নজর দিয়ে জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। সঙ্গে তাঁদের কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ ও ইন্‌স্পেক্টর।

দীপক চ্যাটার্জী মিঃ মরিসন্‌কে বলল—যদি ভুল না হয়, তবে আমি একথা, জোর করে বলতে পারি যে মিঃ গুহর খানসামার হত্যাকারী এবং মিঃ গুহর আকস্মিক অন্তর্ধানকারী লোকটি আজই এডেন বন্দরে নামবে।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ বললেন—কেন ?

—কারণ অবশ্যই আছে স্যার। ওদের ধারণা ছিল যে বর্মার সেই বিখ্যাত রত্নরাজি লুঠ করে নিয়েছে স্বয়ং মিঃ গুহ। তাই ওরা তাঁকে অনুসরণ করবার জন্যই বর্মা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে বোম্বাই এবং অবশেষে এস্ এস্ নাভানার বুকে অনুসরণ করে চলেছিল।

—এতটা চিন্তা সত্যিই কষ্টকল্পিত মিঃ চ্যাটার্জী।

—কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর গড়িয়েছে এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অবশেষে তারা মিঃ গুহকে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে অথবা আট্‌কে রেখেছে। সে যাই হোক্, একথাও আমি জোর করে বলতে পারি যে, তারা ব্যর্থ হয়েছে।

—কেন ?

—মিঃ গুহ ওগুলি চুরি করেননি। যে চুরি করেছে সে ওগুলো ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে পাচার করে ফেলেছে। ওই বাক্স ভেঙ্গে ওরা দেখবে

শুধু ফাঁকা। দু'চারটে ছেঁড়া কাগজ বা ইটের টুকরো শুধু ওর মধ্যে থাকতে পারে।

—কিন্তু ওরা তবে এডেনে নামবে কেন? আর সেই ধনরত্নই বা গেল কোথায়?

—চিয়াংকাই নামে লোকটা বহুমূল্য পুঁথি ইংলণ্ডে পাঠাবার নাম করে মিঃ গুহের সাহায্য নেয়। সেই সব রত্ন পুঁথির ছদ্মনামে ফাঁপা বুদ্ধমূর্তির মধ্য দিয়ে এতক্ষণ ইংলণ্ডে মিঃ গুহর এজেণ্টের ঠিকানায় বোধ হয় পৌঁছে গেছে।

—সেকি!

—হ্যাঁ, আর মিঃ গুহ ফাঁকা বাক্সটা নিয়ে চলেছিলেন শুধু পুরোহিতদের ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে।

—এত জটিল ব্যাপার এর মধ্যে লুকিয়ে আছে?

—তাই মনে হয় আমার। ব্যর্থ হয়ে ওরা নিশ্চয়ই এডেনে নেমে প্লেনে করে ইংলণ্ডে যাবার চেষ্টা করবে।

—কিন্তু চিয়াংকাই নামে সেই লোকটি কে এবং কোথায়?

—সেই ত সব চুরির মূলে। সে এবং তার মেয়ে সঙ্গিনী নিশ্চয় ওটি চুরি করে বর্মার হোটেলে উঠেছিল এবং সেখানে নিজেদের প্রত্নতাত্ত্বিক গুহ ও শ্যামলী বলে পরিচয় দিয়েছিল গোলমাল আর জটিলতা বৃদ্ধির জন্যে। সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই অন্য জাহাজে অথবা প্লেনে ইংলণ্ডের পথে যাত্রা করেছে।

—আচ্ছা, ওরা যদি সত্যিই এডেনে নামে তবে আপনার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে মিঃ চ্যাটার্জী।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে গিয়েছিল। সূর্যের প্রখর তাপে বিপর্যস্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে ওঁরা স্থিরভাবে জেটিতে দাঁড়িয়ে। প্রতিটি মুহূর্তে ওঁরা একজন লোকের নামার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

কিন্তু একজন যাত্রীকেও এডেনে নামতে দেখা গেল না। শুধু কুলীরা বড় বড় বাক্স আর নানাপ্রকার থলিপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে আসছিল।

বেলা বারটা বেজে গেল।

অধৈর্য হয়ে মিঃ মরিসন্ বললেন—না, মিথ্যাই আমাদের এই বিপুল পরিশ্রম মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক বলল—এখনও আমি হাল ছাড়িনি মিঃ মরিসন্। যে কোনও মুহূর্তে ফাঁক পেলেই ওরা নেমে আসবে।

হঠাৎ শোনা গেল একটা হট্টগোল।

জাহাজের কয়েকজন খালাসী আর দুজন কুলীর মধ্যে তুমুল বচসা চলেছে।

দীপক বলল—চলুন ত স্যার, দেখা যাক ব্যাপারটা কি ঘটল। ওরা সকলে পায়ে পায়ে জাহাজের বুকে উঠে এলো।

মিঃ মরিসন্ তাদের কাছে প্রশ্ন করতেই একজন খালাসী বলল—দেখুন স্যার আতাদের কি দোষ? কিভাবে একটা বাক্সের সব মাল সমুদ্রে পড়ে গেছে তা আমরা জানি না। ওরা খালি বাক্স নিয়ে যাবার সময় টের পায়নি, এখন এসে বলছে একটা বাক্স খালি গেছে।

—কই, চল ত দেখে আসি।

সকলে জাহাজ থেকে নেমে নিকটবর্তী মালগুদামে গিয়ে দেখল মালবোঝাই একটি বড় বাক্স একেবারে খালি। তার মধ্যে কোনও মালের চিহ্নমাত্রও নেই।

—একি ব্যপার মিঃ চ্যাটার্জী? মিঃ মরিসন্ প্রশ্ন করলেন।

—কন্‌গ্রাচুলেশন! আনন্দে চীৎকার করে উঠল দীপক। সত্যিই তোমাকে কন্‌গ্রাচুলেশন জানাচ্ছি অদৃশ্য হত্যাকারী!

—কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী?

—এই বাক্সের মালপত্র ফেলে দিয়ে এটি আগে থেকেই ফাঁকা করা ছিল। জাহাজ নোঙ্গর ফেলতেই অদৃশ্য হত্যাকারী এর মধ্যে বসে নিশ্চিন্ত মনে কুলীদের মাথায় চড়ে জাহাজ থেকে নেমে মাল-গুদামে এসে হাজির হন। তারপর........

—তারপর?

—চলুন, এরোড্রামে।

—কেন?

—এরোপ্লেন ছাড়া দ্রুত এডেন থেকে ইংলণ্ডে যাবার আর কোনও উপায় নেই মিঃ মরিসন্।

—বেশ, চলুন। কিন্তু কোত্থেকে এরোপ্লেন আনবে?

—হয়ত কোনও প্রাইভেট্ প্লেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ওখানে গেলেই টের পাওয়া যাবে।

এরোড্রামে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ওরা জানতে পারল, সেদিনই একখানা প্রাইভেট্ প্লেন বেলা এগারোটার সময় কতকগুলি লোককে নিয়ে এডেন এরোড্রাম ছেড়ে শূন্যে পাড়ি দিয়েছে।

দীপক প্রশ্ন করল—তাঁরা কোনদিকে গেছেন বলতে পারেন কি স্যার?

—হ্যাঁ, উত্তর পশ্চিমে······

—বুঝেছি। এখন আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন মিঃ মরিসন্, যে ওদের এই যাত্রা কোন্ দিকে এবং কি উদ্দেশ্যে এ সম্বন্ধে আমার কল্পনাটি ঠিক পারফেক্ট ছিল!

মিঃ মরিসন্ হেসে বলল—সত্যি আমি আপনার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা স্বীকার করছি। কিন্তু এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য কি?

—শীঘ্রই কোন প্লেনের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

—সে চেষ্টা হতে পারে।

—বেশ, তাই করে ফেলুন। এক্ষুণি আমাদের উড়তে হবে ইংলণ্ডের দিকে।

—কিন্তু সেখানে পৌঁছেও ত কিছু লাভ নেই। কোন্ ঠিকানায় গিয়ে আমরা খোঁজ করব ?

—মিঃ গুহের লণ্ডনস্থ এজেণ্টের ঠিকানা আমার কাছে আছে মিঃ মরসিন্। ঠিক সেখানেই আমরা গিয়ে পৌছব।

এই বলে দীপক শ্যামলী গুহ প্রদত্ত ঠিকানা তুলে ধরল মিঃ মরিসনের চোখের সামনে।

মিঃ মরিসন্ শুধু বললেন—ওয়াণ্ডায়ফুল ইজ্ ইওর ব্রেন, মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক হেসে বলল—এ কথাগুলো পরে বল্‌লেও চলবে স্যার।

—নয়—

—লণ্ডনের অন্ধকোণে—

লণ্ডন সহর থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে সহরতলীর প্রান্তে বিখ্যাত স্থান পিকাডিলি স্কোয়ার।

সেদিন ঠিক সন্ধ্যার সময়ে দেখা গেল বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী ও ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্‌কে এই অঞ্চলের সাম্‌নে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে। দীর্ঘক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে তারা যখন চৌদ্দ নম্বর বাড়িটি খুঁজে বের করল তখন প্রায়, সাড়ে আটটা বাজে।

পাশাপাশি অনেকগুলি দোকানে বহুমূল্য জিনিসপত্রাদি এবং নানা-প্রকার প্রাগৈতিহাসিক মূল্যবান মূর্তি বিক্রয় হচ্ছে। ঠিক নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছে দীপক দেখল দোকানটি সবেমাত্র বন্ধ হতে চলেছে।

দীপক এগিয়ে এসে সামনে দণ্ডায়মান যুবকটিকে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, এখানে মিঃ ষ্টিভেনসন বলে কেউ থাকেন কি ?

—হ্যাঁ, তিনিই ত এ দোকানের মালিক।

—আমাদের কয়েকটি জরুরী প্রয়োজনে তাঁকে দরকার।

—আচ্ছা, আমি দেখছি। আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?

দীপক নিজেদের পরিচয় দিতেই যুবকটি সসম্ভ্রমে তাদের দোতলার একটি কক্ষে নিয়ে চলল। কক্ষটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যুবকটি এসে দরজায় করাঘাত করে বলল—দরজা খুলুন স্যার !

কোনও উত্তর নাই।

পর পর কয়েকবার দ্বারে আঘাত করেও দ্বার খুলল না। তখন বাধ্য হয়ে দীপক বলল—দরজা ভেঙে ফেলবার ব্যবস্থা করুন।

প্রাণপণে ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলা হল। সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেল ঠিক সামনেই একজন বৃদ্ধ ইংরাজ পড়ে আছে। তার বুকে একটি দীর্ঘ ছুরি আমূল বিদ্ধ রয়েছে। রক্তে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

—একি ! এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড কি করে এভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে ? অবাক হয়ে যুবকটি বলল।

মিঃ মরিসন্ বলে উঠলেন—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ ! ওয়ান মার্ডার আফ্‌টার এনাদার ! একটার পর একটা হত্যা ! কে ওই অদৃশ্য হত্যাকারী ?

দীপক বলল—নিশ্চয়ই ক'দিন আগে ওই বুদ্ধমূর্তিটা এখানে এসেছিল আর তার মধ্য থেকে আসল জিনিসগুলি সরাবার জন্যেই এই হত্যাকাণ্ড।

ঘরের কোণে একটি প্যাকিং বাক্স পড়েছিল। তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ওরা দেখতে পেল—একটা বড় বুদ্ধমূর্তি তার মধ্যে শোয়ান রয়েছে। সেটি ঠিক মাঝখান থেকে লম্বালম্বি চেরা। সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ।

তার সাথে একটি চিঠি :
প্রিয় মিঃ মরিসন্ ও দীপক চ্যাটার্জী :

জাহাজ থেকে তোমাদের দেখতে পেয়েছিলাম। তাই বাধ্য হয়ে বাক্সে করে পালিয়ে প্লেনে এতদূর এসেছিলাম। যাক্ এতদিনে সফল হয়েছি। হীরা ও কবচ আমার হাতে এসেছে। মিঃ তালুকদার হীরাগুলোর মালিক। তিনি এখনও নাভেনা জাহাজে। তাঁর পৌঁছুতে

বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমি এগুলো ফিরে নিয়ে চললাম। হীরা-চোর মিঃ গুহ নয়, চিয়াংকাই। তা এতদিনে বুঝেছি। যাক্, চোরের ওপর বাটপাড়ি করবার জন্য নিশ্চয় তুমি দুঃখিত হবে না। মিঃ গুহকে হত্যা করিনি। তাঁকে তের নম্বর হাইড পার্কের একটি বাড়িতে গেলেই পাবে। তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। অনেক কষ্টে তিনি একটি জেলে ডিঙ্গিতে উঠে রক্ষা পেয়ে ইংলণ্ডে এসেছিলেন বলে জানি।

আর একটা কথা। চিয়াংকাই শীগ্‌গির আসবে। তাকে ইচ্ছা করলে ধরতে পার। আর এই অদৃশ্য হত্যাকারী বার্মিজ যে আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী বাজপাখি তা এতদিনে বুঝে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবে।

ইতি—

তোমার বহুদিনের বন্ধু

বাজপাখি

—বাজপাখি! বলে উঠল দীপক।

—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! বললেন মরিসন।

দোকানের যুবক কর্মচারীটি কিছু বুঝতে না পেরে শুধু দু'জনের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

এমন সময় কে যেন বাইরের কড়াটা সজোরে নাড়ল! যুবক কর্মচারীটি ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করল—কে?

আগন্তুক বলল— আমার নাম চিয়াংকাই। জরুরী প্রয়োজনে আপনার মনিব মিঃ ষ্টিভেনসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—দশ—

—মিঃ চিয়াংকাইয়ের কারসাজি—

মিঃ মরিসন্ এগিয়ে এসে বললেন—আপনার প্রয়োজন কি, তা জানাতে পারেন মিঃ চিয়াংকাই।

—আপনিই কি মিঃ ষ্টিভেনসন?

—হ্যাঁ।

—আমি মিঃ গুহর চিঠি নিয়ে এসেছি। আপনি তার এজেন্ট, তাই না?

—হ্যাঁ, কই দেখি তার তাঁর চিঠি।

চিয়াংকাই একটা চিঠি তুলে দিল মিঃ মরিসনের হাতে। তাতে লেখা:

প্রিয় মিঃ ষ্টিভেনসন,

আপনি আমার প্রেরিত বুদ্ধমূর্তিটি পত্রবাহকের হাতে দিলে আমি আনন্দিত হব। তিনি এর প্রকৃত মালিক। আমি এটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করেছি।

ভবদীয়—

মিঃ গুহ।

মিঃ মরিসন্ বললেন—সেটি দিতে পারি, কিন্তু কাল সন্ধ্যার কিছু আগে সেটি খুলেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে মূর্তিটি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে।

—তার মানে?

—মানে আমি যে অবস্থায় পেয়েছি……

—মিথ্যা কথা! চিয়াংকাই গর্জে উঠল।

—আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ?

—ওর মধ্যে যে হীরা ছিল তা তুমি লুকিয়ে রেখেছ। ওর গহ্বরে যে হীরা ছিল তার দাম সাত লক্ষ টাকা। মিথ্যা কথ্যা বললে তোমায় টুঁটি টিপে মেরে ফেলব শয়তান।

চিয়াংকাই মি৷ মরিসনের উপরে লাফিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে রিভলভারটা তুলে ধরে দীপক চ্যাটার্জী বলল—মিথ্যা চেষ্টা চিয়াংকাই। চুপ করে দাঁড়াও। বর্মার হীরাচুরির অপরাধে আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

—কে তুমি ?

—আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর ইনি কলকাতার ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্।

ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে চিয়াংকাই বলল—কিন্তু সে বুদ্ধিমূর্তি আর তার মধ্যেকার হীরা কোথায় গেল ?

—ধীরে বন্ধু, ধীরে। কাল বাজপাখি স্বয়ং এসে মিঃ ষ্টিভেনসনকে হত্যা করে বুদ্ধিমূর্তির মধ্য থেকে হীরা নিয়ে উধাও হয়েছে। আর তার চেয়েও মূল্যবান কন্‌ফুসিয়ারের কবচও সে হস্তগত করেছে। তাই এবারের দাবাখেলায় তোমার পরাজয় আর বাজপাখির জয়লাভ।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন মিঃ গুহ ও মিঃ তালুকদার। ওদের পরিচয় পেয়ে দীপক সমস্ত কথা তাঁদের সাম্‌নে খুলে বলল। তারপর মিঃ গুহকে বলল—আপনাকে ওই শয়তান চিয়াংকাই নিশ্চয়ই পুঁথি বলে বুদ্ধমূর্তিটার মধ্যে হীরা আর কবচ চালান দিয়েছিল।

—তাই নাকি ? হাউ ষ্ট্রেঞ্জ !

—তারপর আপনার খবর কি মিঃ তালুকদার ?

—আমি ত নাভানা জাহাজে আজই সন্ধ্যায় পৌঁছেচি।

—কিন্তু আপনার বন্ধু ছদ্মবেশী বাজপাখি সব নিয়ে উধাও।

—সে কি ?

—হ্যাঁ, এই দেখুন চিঠি।

—কিন্তু আমার তিন লাখ টাকা…

—সে কি কথা ?

—হ্যাঁ, হীরাগুলো ও আমার কাছে ওই দামে বিক্রী করেছিল।

—কিন্তু আপনিও শুধু খালি হাতেই ফিরবেন। হীরাচোর ওই চিয়াংকাইয়ের অত প্ল্যান ব্যর্থ করে হত্যাকারী বাজপাখী সব কিছু হীরা ও কবচ নিয়ে পালিয়েছে।

মিঃ গুহ বললেন, উঃ, কি ধোঁকাই না আমাকে দিয়েছিল। আমি অমূল্য পুঁথি মনে করে তা রক্ষার জন্য এত চেষ্টা করলাম, আর মাঝখানে থেকে আমাকেই বিপদে ফেলে চিয়াংকাই হীরাগুলো নির্ব্বিঘ্নে হাত করবার চেষ্টা করল।

দীপক হেসে বলল—কিন্তু বাজপাখির একচালে চিয়াংকাই কুপোকাৎ আর সব কিছু ওর দখলে।

মিঃ মরিসন্ বললেন—চোরের উপর বাটপাড়ি একেই বলে!

মিঃ গুহ বললেন—সত্যিই বুদ্ধি আছে লোকটার।

চিয়াংকাই শুধু দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে বলল—স্কাউণ্ড্রেল।

* * *

* * *

আদালতের বিচারে হীরাচুরির অপরাধে চিয়াংকাইয়ের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

এর পর মাস দুই কেটে গেছে।

একদিন বিকেলে একটা ব্যাঙ্কের চিঠি এসে পৌঁছল মিঃ তালুকদারের নামে। কোনও ব্যাঙ্ক চিঠি লিখেছে যে তাঁর নামে নাকি তিনলাখ টাকা একজন লোক জমা দিয়ে গেছে।

তার পর দিন একটা চিঠি পেলেন তিনি।

তাতে লেখা :

প্রিয় মিঃ তালুকদার,

আপনার তিনলাখ টাকা নিয়েই আমি অজস্র অর্থের অধীশ্বর হতে পেরেছি। কিন্তু একথা ঠিক যে, মুলে ছিল আপনার অর্থ। আর আপনি যখন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি, তখন আপনাকে ফাঁকি দিতে চাই না আমি। তাই হীরাটা বিক্রী করে তার মধ্য থেকে তিনলাখ টাকা আপনার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিলাম।

আর একটা কথা। এই খবরটা বন্ধু ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে জানিয়ে বলবেন যে, তার সঙ্গে আমার সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। বহুবার তার কাছে আমি সাময়িকভাবে হেরে গেছি,-সত্য, তবে শেষ পর্যন্ত আমার জয়ই ঘোষিত হয়েছে। পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে তার কাছে আমি আহ্বানলিপি প্রেরণ করলাম।

শুধু দুঃখ রইল একজনেয় জন্যে। বেচারা মিঃ বাজপেয়ী আর ওই খানসামাটা। কিন্তু ওদের হত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। আর মিঃ ষ্টিভেনসনকে হত্যা আমি বাধ্য হয়েই করেছিলাম আমার জীবন বাঁচাতে। আমি জোর করে মূর্তিটা নিতে চাই শুনে ও রিভলভার বের ক'রে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ওর সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং আমার ছোরার আঘাতেই ওকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তবু হত্যাকারী নামে বাজপাখির যে কলঙ্ক আরোপিত হল আমি তা মুছে ফেলবার চেষ্টা করব ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি—

আপনার চিরবন্ধু

বাজপাখী

চিঠি থেকে মুখ তুলে অবাক বিস্ময়ে মিঃ তালুকদার আপনমনে শুধু বললেন—আশ্চর্য লোক! আজ পর্যন্ত ওকে ঠিক চিনতে পারলাম না আমি।

—শেষ—

* এর পরবর্তী ঘটনা জানতে হ'লে 'বাজপাখির রহস্যজাল' পড়ুন।

নীল কাঁচের রহস্য

ঠিক ভোরে ঘুম থেকে ওঠা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর বহুদিনের অভ্যাস। তার ধারণা—ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিরিবিলিতে বসে কোনও জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে অনেক সহজেই সমাধানের কাছাকাছি পৌছান যায়।

রোজকার মত সেদিনও সে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ল্যাবরেটরীতে বসে কি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে।

—কে? রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করে দীপক।

—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমার নাম হৃদয়নাথ। আমি একজন জহুরী। দীর্ঘদিন আমি লাহোরে ব্যবসা চালিয়েছিলাম। তবে পাঞ্জাবের খানিকটা অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পর আমি কলকাতায় চলে আসি।

—বুঝলাম। কিন্তু এত ভোরে হঠাৎ আমাকে আহ্বান···

—কারণ অবশ্যই আছে বাবুজী! আমি একটা জরুরী বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই। আপনি আমার নাম না শুনলেও আমি আপনার সুখ্যাতি এর আগেই শুনেছি।

—বেশ, কি ধরনের সাহায্য চাও বল।

—দেখুন বাবুজী, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের দামী জহরত নিয়ে আমাদের ব্যবসা করতে হয়। তাই আমাদের থাকতে হয় খুব সাবধানে। কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও সম্প্রতি একটি বহুমূল্য চুণী আমার সিন্দুক থেকে খোয়া গেছে। এটি এক বিখ্যাত মহারাজা আমার কাছে বিক্রীর জন্য আমানত রেখেছিলেন।

—জহরতটির দাম আনুমানিক কত?

—আমি দীর্ঘদিন জহুরীর কাজ করছি বাবুজী, কিন্তু এত ভাল এবং এত মূল্যবান চুণী এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমার ধারণা ওটা আমি অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী করতে পারব। তার কিছু বেশী হবে, কম হবে না।

—বুঝলাম। তা সেটি খোয়া যায় কি করে?

—রোজ সকালে আমি সবচেয়ে দামী জহরতগুলো বাইরের শো-কেসে সাজিয়ে রাখি। যদি কোনও খদ্দের কোনও একটি দেখতে চায় তবে তা থেকে নির্দিষ্ট জিনিসটি দেখাই। আমার শো-কেস খুব শক্ত আন্‌ব্রেকেবল্ কাঁচে তৈরী। গুলি ছাড়া এটি ভাঙবার উপায় নাই। সকালে এটি যেমন রাখা হয় তেমনি সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করবার সময় সব ক'টি জহরত লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দোকান বন্ধ করে আমরা চলে যাই।

—আচ্ছা, সিন্দুক থেকেই এটি চুরি গেছে কি করে বুঝলেন?

—সকালে সিন্দুক খুলে আমরা চুণীটা দেখতে পাইনি। তার বদলে সেখানে একটা গোলাপী রঙের কাঁচ রাখা আছে। তার চেহারা এবং সবকিছু অবিকল আসল চুণীর মত। কিন্তু সেই দামী চুণী থেকে গোলাপী রঙের সাথে যে আর একটি তীক্ষ্ণ আভা বের হতো নকল কাঁচে তা নেই। তবে খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখলে এটি ধরা যায় না।

—সিন্দুক থেকে আর কিছু খোয়া গেছে?

—না বাবুজী।

—আচ্ছা, আপনি কি সারাদিন দোকানে থাকেন?

—ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা থাকা সম্ভব হয় না। মাঝে মাঝে আমি বাইরে গেলে আমার একজন বিশ্বাসী কর্মচারী দোকানের জিম্মায় থাকে।

—জিনিসপত্রও কি সে-ই দেখায়?

—হ্যাঁ বাবুজী।

—আচ্ছা, আপনি কি সিন্দুকে তুলে রাখবার সময় প্রত্যেকটি জহরত খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন ?

—না, রাখবার সময় তাড়াতাড়ি রেখে দেওয়া হয়। হিসাব মিলিয়ে রাখা হয়, এইমাত্র। তবে সকালে সাজাবার সময় সব ক'টি বেশ ভাল করে সাজিয়ে রাখা হয়।

—আচ্ছা, আপনি কি এর আগে থানায় জানিয়েছেন ?

—হ্যাঁ বাবুজী। তবে তারা পারবে বলে ভরসা না হওয়ায় আপনাকে জানালাম।

—বেশ, আমি বিকেলে আপনার ওখানে গিয়ে বেশ ভালভাবে তদন্ত করব। আমি আপনার কেসটা গ্রহণ করলাম।

সেদিন সন্ধ্যার ঠিক পরেই দীপক জহুরী হৃদয়নাথের দোকানে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল।

কথায় কথায় হৃদয়নাথ বলল—চুণীটার বিরাট এক ইতিহাস আছে বাবুজী। এই চুণীটা মহারাজার ঠাকুরর্দা একটা বিশেষ উপলক্ষে ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু সেই চুণীটার অভিশাপই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়।

—তার মানে ?

—চুণীটা তার হাতের সোনার কবচে লাগান থাকত এবং রাজবাড়ির একজন কর্মচারী এই চুণীটার লোভেই তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন।

—আশ্চর্য ! তারপর ?

—তারপর পুলিশের হাতে সেই কর্মচারী ধরা পড়েন এবং চুণী রাজবাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু আবার রাজবাড়ির বর্তমান মহারাজার ছোটভাই চুণীটা নেবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু যে লোককে তিনি ওটি হাত করবার জন্যে নিযুক্ত করেন, চুণীটা চুরি করার পরদিনই সে অদ্ভুতভাবে মৃত্যুকে বরণ করে। বর্তমান মহারাজা অতঃপর চুণীটা ফিরে

পেয়ে আমাকে দেন ওটা বিক্রী করবার জন্যে। তাঁর মতে এ ধরনের অসাধারণ চুণীটির পিছনে নিশ্চয়ই কোনও অভিশাপ জড়িয়ে আছে।

—বুঝলাম সবই, কিন্তু এদিকের তদন্তে যা পাচ্ছি, তাতে আমি স্থিরনিশ্চয় যে সিন্দুক থেকে আপনার চুণী চুরি যায়নি।

—তবে কি করে চুরি গেল? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে জহুরী হৃদয়নাথ।

—ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ। কাল অথবা তার আগের দিন কে কে আপনার হীরাটা কিনবার জন্যে ওটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেছিল তা আপনার মনে আছে কি?

—আমি যদিও দোকানে ছিলাম না, তবুও মনে হচ্ছে, এ দুদিনে মাত্র তিনজন ওই চুণীটা দেখতে চেয়েছিল। প্রথম দুজন হাতে নেয়নি। তৃতীয় জন অবশ্য হাতে নিয়ে বহুক্ষণ এটি ঘুরিয়ে দেখেছিল।

—এই তৃতীয় জনটি কে?

—রাজবাড়ির একজন প্রাক্তন কর্মচারী। দীর্ঘক্ষণ সে হীরাটা হাতে নিয়ে বলে যে, বহুদিন থেকেই তার নাকি এটি কেনবার সাধ। হাজার চল্লিশের মধ্যে দিলে সে কিনতে পারে।

—আপনি কত চেয়েছিলেন?

—ষাট হাজার।

—কিন্তু ষাট হাজার কেন, ষাট পয়সাও খরচ না করে সে নির্বিবাদে প্রস্থান করেছে। হীরার অনুরূপ একটি গোলাপী কাঁচ সে নিয়ে এসে হাতের কৌশলে সেটি আপনাদের হাতে গছিয়ে দিয়ে সেটি নিয়ে নিশ্চিন্তে প্রস্থান করেছে।

—কিন্তু এখন কি উপায়। এই টাকাটা যদি আমার নিজের পকেট থেকে দিতে হয় তবে আমার ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে।

আপনার চুণীটা যাতে উদ্ধার হয় তার চেষ্টা আমি করব।

—কিন্তু এতক্ষণ সে নিশ্চয়ই ওটা বিক্রী…

—না, অতটা নির্বোধ বলে আমি তাকে ভাবি না। এতবড়ো বিখ্যাত চুণী এত শীঘ্র বিক্রী করা আর তার নিজের ধরা পড়ার পথ পরিষ্কার করা একই কথা।

—তবে ?

—আপাততঃ ওটি সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গোপনে কোনও সুরক্ষিত স্থানে রেখেছে। পরে সুবিধামত বিক্রী করবার সাধু ইচ্ছা বোধ হয় আছে তার।

—তার বাড়ি সার্চ করলে কি ওটা পাওয়া যাবার আশা আছে ?

—আমার মনে হয় এমন স্থানে ওটা সে রেখেছে যে, সাধারণ মানুষের তা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তবুও চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ? ভদ্রলোকের বাড়িটা কোথায় ?

—এণ্টালী অঞ্চলে।

—বেশ, পুলিশকে বলে তার নামে একটা সার্চ ওয়ারেণ্ট বের করবার ব্যবস্থা করছি। আর নির্দিষ্ট দিনে আমিও যাব পুলিশের সঙ্গে। আপনিও উপস্থিত থাকতে পারেন।

—উঃ, কি সাংঘাতিক লোক মশাই। এভাবে সকলের চোখের সাম্নে স্রেফ চুণীটা গুম্ করে দিল ! আর আমরা অন্ধের মত ভাবছি সিন্দূক থেকে কি করে চুরি গেল ! এইবার দেখা যাক্…

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ বাহিনী এবং দীপক সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে রাজ-বাড়ির প্রাক্তন কর্মচারীর বাড়িতে হানা দিল।

ভদ্রলোকের নাম বিশ্বনাথ রাও। মোটা বেঁটে চেহারা। একটা চোখ কোনও দুর্ঘটনায় বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে। সেই জায়গায় একটা নীল কাঁচের নকল চোখ বসানো। ডান চোখটা বুদ্ধির প্রখরতায় যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে দেখতে পেয়েও ভদ্রলোক এতটুকুও

অপ্রতিভ হলেন না। ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার মশাই? সকালে উঠেই সদলে আমার বাড়িতে হানা?

দীপক বলল—হৃদয়নাথ জহুরীর দোকান থেকে বহুমূল্য চুণী অপহরণের অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে। আপনি গত বৃহস্পতিবার তাঁর দোকান থেকে কৌশলে চুণীটা নিয়ে তার পরিবর্তে ঠিক সেই রকম দেখতে একটি কাঁচ রেখে এসেছেন।

—প্রমাণ?

—আমরা সন্দেহক্রমে আপনার বাড়ী সার্চ করে দেখতে চাই।

বিচিত্র ভঙ্গিতে ক্রূর হাসি হেসে তিনি বললেন—বেশ, সার্চ করুন। কিন্তু চুণীটা আমি যে অপহরণ করিনি তার প্রমাণ আপনারা পাবেন। আমার বাড়ীর প্রতিটি ইঞ্চি স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনি ওটার সাক্ষাৎ পাবেন না।

—বেশ, দেখা যাক্ আপনার কথাটা সত্যি কি না।

সমস্ত বাড়ির উপর দিয়ে যেন বিরাট একটা আলোড়ন বয়ে গেল। অত্যন্ত স্থিরভাবে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু চুণীটা পাওয়া ত দূরের কথা, কোনও সূত্রও মিলল না।

সার্চ শেষ করে বের হবার সময় বিশ্বনাথ রাও খস্‌খসে গলায় বলল—কি হল ইন্‌স্পেক্টর সাহেব? তারপর দীপকের দিকে চেয়ে বলল—কি হল টিকটিকি মশাই?

দীপক বলল—আমি ব্যর্থ হইনি বিশ্বনাথবাবু।

—তার মানে? আপনি কি এর মধ্যেই চুণীটা খুঁজে বের করে ফেলেছেন নাকি?

—বের করতে না পারলেও সন্ধান পেয়েছি।

—বাঃ, চমৎকার। সত্যিই আপনার মাথা উর্বর টিকটিকি সাহেব দরাজ গলায় বললেন বিশ্বনাথ রাও—তা সেটি কোথায় আছে শুনি?

—দেখুন, বিশ্বনাথবাবু, এটা আমি জানি যে নিখুঁতভাবে চুণীর বদলে একটা লাল কাঁচ দিয়ে আপনি হৃদয়নাথের মত পাকা জহুরীকে সাময়িক ধোঁকা দিয়েছিলেন। তাই কাঁচ সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান অসাধারণ।

—তার অর্থ? আমি এসব কি জানি?

—সবই জানেন। আর ওটা লুকোবার মত জায়গা বাড়ির কোথাও না পেয়ে এমন একস্থানে রেখেছেন, যেটা আপনার মতে সবচেয়ে সুরক্ষিত। সত্যি কথা, কারোও সামান্যমত সন্দেহও এতে জাগবে না। কিন্তু আপনার কাঁচের জ্ঞান নিখুঁত হলেও এটা বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, এই চুণীটার গুণ হচ্ছে এই যে, এর থেকে একটা দ্যুতি বের হয়। সেই তীক্ষ্ণ দ্যুতির একটুখানি আমি পেয়েছি। কিন্তু সাধারণ কারও নজরে ওটা আসেনি। আর আপনার নকল চোখের ওই নীল কাঁচটা ভেদ করেও চুণীর দ্যুতি···

কথা শেষ হল না। বিশ্বনাথ রাও উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। দীপক বাধা দিয়ে তাঁর নকল চোখের নীল কাঁচটা এক টানে খুলে ফেলতেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল জ্বলজ্বলে গোলাপী সুন্দর আভাযুক্ত চুণীটা।

—এই আপনার আসামী ইন্‌স্পেক্টর বাবু। বুদ্ধির যুদ্ধে এতদিনে জিতলাম বটে, তবে নকল চোখের নীল কাঁচের আড়ালে উনি এতদিন আরও কি কি জিনিস যে লুকিয়েছিলেন তা উনিই জানেন। এতদিনে নীল কাঁচের রহস্যভেদ সম্ভব হল। আর হৃদয়নাথবাবু, আপনার চুণীটাও আপনি ফেরত পেলেন।

হৃদয়নাথ বিনীত ভঙ্গিতে বলল—আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব স্যার, তা আমার ভাষায় কুলোচ্ছে না!

সমাপ্ত

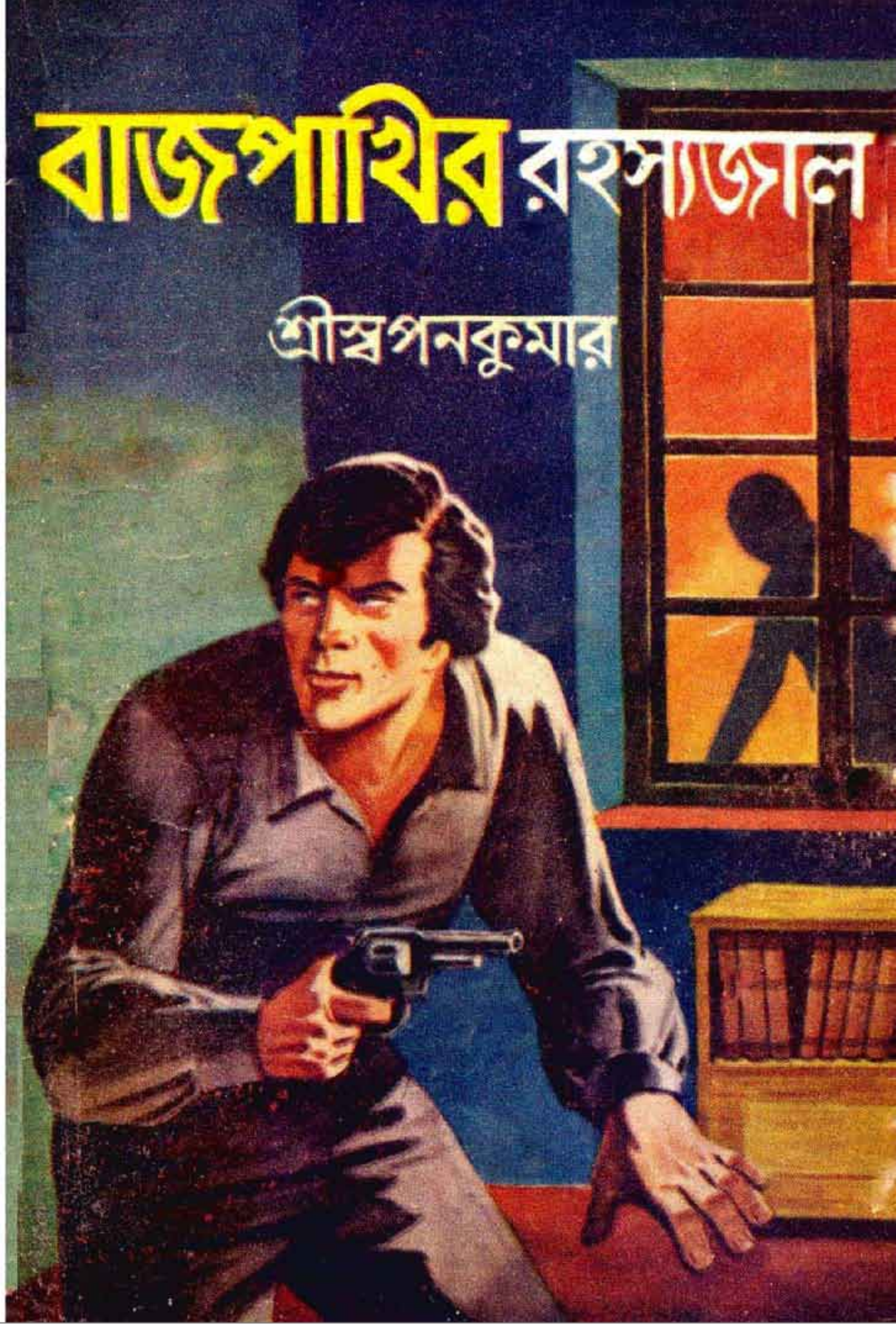
বাজপাখির রহস্যজাল
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—৭নং

বাজপাখির রহস্যজাল

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক :—
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন্
৩৯.ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :—
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯:ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

এবছরের সবচেয়ে সেরা
ডিটেকটিভ সিরিজ
শ্রীস্বপনকুমারের লেখা
"-বাজপাখি সিরিজ—"

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি, ২। বাজপাখির পুনরাভিযান,
৩। বাজপাখির রক্তলীলা, ৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা,
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার, ৬। হত্যাকারী বাজপাখি,
৭। বাজপাখির রহস্যজাল, ৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি,
৯। বাজপাখির কূটচক্র, ১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

মূল্য ঃ ২·৫০ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশিবব্রত ভট্টাচার্য্য
জোনাকি প্রেস
৭৯/এ বেচু চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

এক

—কম্বুলীটোলার হরিপদ পোদ্দার

হরিপদ পোদ্দার লোকটাকে বাইরে থেকে সাধারণ বলে মনে হলেও, আসলে তার প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তার গো-বেচারা নিরীহ ভাবভঙ্গি দেখলে সে যে গ্রাম্য লোক এবং অল্পদিন হল কলকাতায় এসেছে এরূপ কথাই মনে জাগা স্বাভাবিক।

তার এই গুণটির জন্যে সে পুলিশ বিভাগে ইন্‌ফর্মারের কাজ পেয়েছিল। দীর্ঘদিন সে যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজে বহাল ছিল। কিন্তু হরিপদর মনে ধীরে ধীরে অন্য চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যদি ইন্‌ফর্মারের কাজই করতে হয়, তবে পুলিশ বিভাগে কেন? তার চেয়ে বিভিন্ন বড় লোকের গোপন খবরাদি জেনে যদি তাকে ব্লাকমেলিং করা যায় তবে উপার্জন হতে পারে আরও বেশি।

ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় হরিপদ পোদ্দারের মনের ভাব আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। একদিন হরিপদ পোদ্দার হঠাৎ এক গুণ্ডাদলের লোকের দ্বারা আক্রান্ত হল। অনেক কষ্টে সে এ যাত্রা রক্ষা পেল বটে, তবে মনে মনে স্থির করল, ইন্‌ফর্মারের চাকরিতে আর একদিনও নয়। কথায় কথায় প্রাণ-যাবার ভয়, অর্থপ্রাপ্তি অনেক কম, তার উপরে লোকের অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ান। অবশেষে সে একদিন পুলিশের কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্য ব্যাপারে মনোযোগ অর্পণ করল। কিন্তু এই অন্য ব্যাপারটি যে কি তা সাধারণ লোকের ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল।

পূর্বঘটনা জানতে হলে **হত্যাকারী বাজপাখি** পড়ুন।

কম্বুলীটোলার মোহনবাগান বস্তির এক কানা গলির মধ্যে ছিল হরিপদ পোদ্দারের বাড়িটা। এই পাড়ার বাসিন্দা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। তবে মাঝে মাঝে দোতলা বাড়িও দু'একটা আছে। কিন্তু বাড়ির দিক থেকে মর্যাদা বেশি হলেও পেশা এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে সকলেই প্রায় সমান। এই বস্তির সাতাশের বারোর এ নম্বর বাড়িটা দোতলা হলেও একটু ভিতর দিকে। এই বাড়ির সামনে দিন কয়েক থেকে একখানা বড়ো মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে। ঘটনাটা হরিপদ পোদ্দারের নজর এড়ায়নি। আর এ ধরনের ঘটনা তার মত সুচতুর ও ধূর্ত লোককে কৌতূহলী করে তুলল।

এই বাড়িখানার মালিকের নাম নরেশনারায়ণ বিশ্বাস। নরেশ চিরদিনই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কি একটা এটর্নী অফিসে কেরানীগিরির কাজ করে। মাসে গোটা আশী টাকা মাইনে পায় সে। তার পক্ষে গাড়ি কেনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাছাড়া তার নিকটতম আত্মীয়ও এমন কেউ নেই যে মোটরে চড়ে আসতে পারে। তাই নরেশের বাড়ির সামনে ঘন ঘন এই ধরনের মোটর এসে দাঁড়ান সুচতুর হরিপদর মনোযোগ আকর্ষণ করল। তাছাড়া আজকাল যেন নরেশ সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। পরনের ময়লা ধুতিটা বিদায় নিয়েছে। আজকাল দামী তাঁতের ধুতি পরে, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, পায়ে লপেটা জুতো এঁটে সে যখন পথে বের হয় তখন যে কোনও লোক দেখলে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে যে লোকটির হঠাৎ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে।

ব্যাপারটা সাধারণ নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রহস্যজনক ব্যাপার লুক্কায়িত আছে। বিগত দিনের পুলিশ ইন্‌ফর্মার হরিপদ ভাবল, এবার যেদিন রাত্রে মোটর এসে দাঁড়াবে সেদিন তাকে গোপনে দেখতে হবে ভেতরের ব্যাপারটা কি। একবার এরকম একটা দাঁও কাজে

লাগাতে পারলে হাতে যে মোটা কিছু টাকা এসে পড়বে এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত।

ভাবনার সঙ্গে কাজে খুব বেশি তফাৎ হরিপদর মত লোকদের দেখা যায় না। তাই দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল হরিপদকে ধীরপদে নরেশের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে। লক্ষ্য করলে দেখা যেত নরেশের বাড়ির ঠিক সামনে যথানিয়মে গাড়িখানা এসে দাঁড়িয়েছে।

নরেশের বাড়ির পেছনে একটা প্রাচীর। নরেশের বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে প্রাচীরটা পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে পড়ল। তার গতিভঙ্গী দেখলে বোঝা যায়, এধরনের কাজে সে খুব বেশি অভ্যস্ত। দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই নরেশ মোটরারোহী আগন্তুককে ওই ঘরে বসিয়েই কথাবার্তা বলছে। হরিপদ দোতলায় উঠল।

দোতলার জানালা দিয়ে হরিপদ উঁকি মারল। হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে মাত্র দু'জন। একজন নরেশ। অন্যজনকে পেছন থেকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে হরিপদ তাদের প্রতিটি কথা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল।

শুনতে শুনতে হরিপদর সারা দেহে রোমাঞ্চের রেখা দেখা দিল। শিউরে উঠল সারা শরীর।

কয়েকজন নিরীহের বিরুদ্ধে ঘোরতর চক্রান্ত। কয়েকজন লোককে নিয়ে গঠিত হয়েছে বিরাট একটা জটিল রহস্যজাল। কিন্তু কে তার নায়ক ?

হঠাৎ আগন্তুক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—আচ্ছা চলি নরেশ। কিন্তু প্রতিটি কথা যেন মনে থাকে।

নরেশ বলল—আজ্ঞে হুজুর।

কিন্তু একি ! আগন্তুকের মুখটা কালো মুখোসে আবৃত।

হরিপদর সারা দেহের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এ নিশ্চয়ই সেই দুর্দান্ত দস্যু বাজপাখি।

কিন্তু বাজপাখির সঙ্গে নরেশ ? অসম্ভব ! অদ্ভুত যোগাযোগ। হরিপদ ব্যাপারটা দেখে যতটা অবাক হল আনন্দিত হল তার চেয়ে কম নয়। যাক, এবার একটা মোটা ফাঁদ পেতে বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে হবে !

কিন্তু···

হরিপদর মনে চকিত দ্বিধা···

ওদের ধরিয়ে দিলে কেমন হয় ? কিন্তু, পুলিশ আর ক'টাকাই বা দেবে ? তার চেয়ে···

হরিপদ সংকল্প স্থির করে পথে পা দিল। উত্তেজনায় তার মাথা তখন গরম হয়ে উঠেছে।

দুই

—মিঃ পিল্লাই

মিশন রো'তে মিঃ রামমনোহর পিল্লাইয়ের বিরাট অ্যাটর্নী অফিস। মিশন রো'র একখানি পাঁচতলা বাড়ির একতলা জুড়ে তাঁর অফিসটা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। অফিসের সাজসজ্জা আধুনিক রুচিসম্মত। দামী মেহগিনি কাঠের সব চেয়ার টেবিল। মাথার উপরে ফ্যান্ ঘুরছে। লিফ্‌টে নামা-উঠা করছে লোক। অফিসের দুজন কেরানী আর একজন মেয়ে টাইপিষ্ট দিবারাত্র কাজে ব্যস্ত।

কেরানী দুটিকে মোটামুটি বিশ্বাস না করলে চলে না বলেই তাদের হাতে শুধুমাত্র ছোট ছোট কাজের ভার দেন মিঃ পিল্লাই। কিন্তু বড় বড়

সব কিছু কাজের হিসাব নিকাশ রাখতে হয় লেডি টাইপিষ্ট অনিমাকে। সেও অবশ্য কোনওদিন ওসব কাজে গাফিলতি দেখায় না। বেশ চালাক চতুর মেয়ে সে। সামান্য একটু ইঙ্গিত পেলেই কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তা সে ভালভাবে বুঝতে পারে।

কিন্তু এত বড় অ্যাটর্নী ফার্মের মালিক হয়েও মিঃ পিল্লাইয়ের মনে কোন সুখ নেই। নেই কাজের প্রতি আকর্ষণ অথবা উৎসাহ। সব সময় তিনি যেন কি একটা ব্যাপারে চিন্তান্বিত। বিষয়টা আর কিছুই নয়, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন মক্কেলের কাছ থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন, এখন যদি সকলে তার সম্পূর্ণ হিসাব চেয়ে বসে তবে প্রায় একলক্ষ টাকার কাছাকাছি ঘাটতি দেখা যাবে। তিল তিল করে যে টাকা তিনি খরচ করেছেন তাই আজ একত্রে পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে। সে সব চিন্তায় রাত্রে মিঃ পিল্লাইয়ের ঘুম হয় না। কিন্তু কোত্থেকেই বা তিনি এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে এই ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হবেন? এই ধরনের নানা দুর্ভাবনায় মিঃ পিল্লাইয়ের বিনিদ্র রাত কাটে।

উপায় যে তিনি একটা স্থির করেননি তা নয়। তবে সে উপায়ে কতটা সফলতা অর্জন করতে তিনি পারবেন তা তিনি আজও স্থির করে উঠতে পারেননি। তাই আজ দিন তিনেক থেকে দেখা যাচ্ছে যে ঠিক বেলা চারটায় তিনি কেরানী দুজন ও মেয়ে টাইপিষ্ট অনিমাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক সন্ধ্যার মুখে মুখে একজন মক্কেল আসে বলে তিনি অফিসে বসে থাকেন। কিন্তু যারা আসে মক্কেল তারা কোনও দিনই নয়।

অন্যদিনের মত সেদিনও দেখা গেল রাত আটটায় একজন লোককে ধীরে ধীরে মিঃ পিল্লাইয়ের অফিসে প্রবেশ করতে। পরনে তার কাল স্যুট, মুখে একটা গগ লস-এর মত কালো আবরণ।

আগন্তুককে দেখেই মিঃ পিল্লাই উঠে দাঁড়ালেন সসম্মানে।

আগন্তুক প্রশ্ন করল—তাহলে এধারের কতদূর ?

মিঃ পিল্লাই বললেন—অনিমার কাছে একটি ছেলে আসে মাঝে মাঝে। নীতিশ না কি যেন নাম। গরীব আর গোবেচারা গোছের। টাকার লোভ দেখিয়ে ওকেই রাজী করানো যাবে।

—খুব ভাল।

—আমার কিন্তু ওই পরিমাণ টাকাই চাই।

—আমি জানি মিঃ পিল্লাই। আপনি মক্কেলদের যে পরিমাণ টাকা খেয়ে বসে আছেন সেটা পূরণ করতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—

—বেশি কথা বলবার প্রয়োজন নেই। সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে পারলে এক লাখ আপনি পাবেন।

—আর একটু বেশি

—বেশি লোভ ভাল নয় মিঃ পিল্লাই। অবিনাশ নিয়োগীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ পঞ্চাশ লাখের বেশি নয়। তার মধ্যে তাঁর উইলে অন্যেরা প্রায় লাখ পাঁচেক পাচ্ছে। বাকী পঁয়তাল্লিশের মধ্যেও—

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। তাহলে ওদিকের কথাবার্তা—

কথাবার্তা চলল।

প্রতিটি কথার মধ্যে কি সুগভীর চক্রান্ত! কি কূট রহস্যের জাল বিস্তার করে দুটি নিরীহ তরুণ আর তরুণীকে যে তার মধ্যে জড়ানো হলো তা সংক্ষেপে বর্ণনা সম্ভব নয়। তারই প্রতিক্রিয়া চলল পরবর্তী অজস্র ঘটনাগুলির মধ্যে।

বিদায় নেবার সময় মিঃ পিল্লাইয়ের পিঠে একটা চাপড় মেরে আগন্তুক বলল—আমি তাহলে মোহনবাগান বস্তির নরেশকে ওকাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন আপনার দিক থেকে যেন সব ঠিক থাকে।

ধূর্ত হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে মিঃ পিল্লাই বললেন—আপনার কোনও দুশ্চিন্তা নেই মিঃ বাজপাখি। অবিনাশ নিয়োগীর বাগানবাড়িতে আবার আমাদের দেখা হবে।

তিন

—চক্রান্তজালে নীতিশ

মাঝে মাঝে নীতিশ ভাবে স্বর্গ-নরক, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-দুর্নীতি এসব কথাগুলো শুধু মানুষের সৃষ্ট কাল্পনিক কতকগুলি ব্যাপার। সারা জীবন সৎপথে কাটিয়েও মানুষ একটা পয়সাও উপার্জন করতে সক্ষম হয় না—অথচ সামান্য এতটুকু নীতিভ্রষ্ট হয়েই বহু লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে।

তার এসব কথা ভাববার উপযুক্ত কারণ ছিল। আজীবন সে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েও প্রচুর বিদ্যা অর্জন করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে উপযুক্ত কোনও কাজের সন্ধান পেল না। তা ছাড়া সম্প্রতি অনিমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে এবং দুজনে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও তারা বিবাহ করতে পারছে না কেবলমাত্র অর্থের অভাবের জন্য। এই চিন্তাটাও নীতিশকে অহরহ দগ্ধ করছে। যদি সৎপথে সারা জীবন কাটিয়েও সে প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটাবার মত সামান্য অর্থও উপার্জন করতে না পারল কি প্রয়োজন তার নীতি-দুর্নীতির বড় বড় সব বাঁধা বুলির? মেসে টাকা বাকি পড়েছে। জামা কাপড় ধোপার বাড়িতে আটকে আছে। অথচ কোনও দিক থেকে একটি পয়সা আসার পথ তার সামনে খোলা নেই।

দেশবন্ধু পার্কের একটি নিরালা কোণে একখানা বেঞ্চির উপরে

বসে বসে সে এইসব ভাবছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হল না তার এ দুর্ভাবনা। ভগবানের প্রেরিত দূতের মত কে একজন যেন বলে উঠল—টাকা রোজগার করবেন? টাকা?

—টাকা? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে নীতিশ।

—হ্যাঁ, পাঁচশো টাকা।

—পাঁচশো টাকা! নীতিশ চোখ দুটো বড় বড় করে বলে।

—অগ্রিম আড়াইশো, আর বাকী আড়াইশো কাজ শেষ হলে।

—কিন্তু কি কাজ করতে হবে আমাকে?

—বেশি কিছু নয়। শুধু একটা চিঠি পৌঁছে দেওয়া।

—কিন্তু আপনি কে?

—আমি একটা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ ফার্মের লোক। আমি নিজে কোনও কারণে যেতে পারছি না বলেই আপনাকে পাঠাচ্ছি। আজ রাত নয়টায় এই চিঠিখানা দক্ষিণেশ্বরের জমিদার অবিনাশ নিয়োগীর বাগানবাড়িতে তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি সেই সময় এই চিঠিখানার জন্যে বাইরের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করবেন।

—কিন্তু যে কোনও ছোকরাই ত এ কাজ করতে পারে?

—না, সকলকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশ্বাস করা চলে না।

—তা বটে।

—আর তাছাড়া এই চিঠিখানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী। কে কোথায় ফেলে দিয়ে হয়ত বলবে দিয়ে এসেছি। তাছাড়া কৌতূহলের বশে কেউ এটা খুলে দেখে, তাও আমরা চাই না।

—বুঝেছি।

—আপনি তাহলে সম্মত?

—হ্যাঁ, কই চিঠিটা দিন।

—এই নিন চিঠি। আর এই তাড়ায় পঁচিশখানা দশটাকার নোট

আছে। আড়াইশো। কাজ শেষ হলে কাল সকালে আপনি এই পার্কে আমার কাছ থেকে আরও আড়াইশো পাবেন।

নীতিশের মনে চকিতে দ্বিধা। কোনও অভিসন্ধি এর পেছনে লুকানো নেই ত? কিন্তু তার মত একজন সাধারণ লোককে অভিসন্ধির মধ্যে জড়িয়ে কার কি লাভ হবে?

নীতিশ সম্মত হলো। টাকাটা গুণে পকেটে রেখে চিঠিটা বুক পকেটে রাখল।

নমস্কার জানিয়ে লোকটা চলে যায়।

নীতিশ ভাবতে থাকে, তার সুদিন বোধ হয় এবার ফিরে আসবে। সর্বপ্রথম সে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে নেয়। তারপর চিন্তিত মনে নূতন কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

কিন্তু তখন কি সে জানত যে পরবর্তী ঘটনাচক্র তার বিরুদ্ধে যে চক্রান্তের জাল রচনা করে কি ভাবে তাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে?

চার

—অদৃশ্য আততায়ী

অমাবস্যার নিশুতি রাত।

রাত আটটার পর থেকে ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

দিক্‌চক্রবাল আঁধারের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিঃশব্দে প্রহর গুণছে। মেঘে মেঘে সূচিত হচ্ছে কোন একটা বিষাক্ত চক্রান্তের ঘন কালো ছায়া। তারই ভয়ে যেন আজ সারা পৃথিবী তন্দ্রাতুর।

বহুদূরে একটা বড় গাছের মাথায় কড় কড় শব্দে বাজ পড়ল।

কিন্তু এই দুর্যোগ উপেক্ষা করে দেখা গেল একজন লোককে একটি বাস থেকে দক্ষিণেশ্বরের মোড়ে নেমে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে সজোরে এগিয়ে যেতে।

তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, পৃথিবীর বুকে যত বড় দুর্ঘটনাই ঘটে যাক না কেন, সে তার কর্তব্য পালন করবেই। এই লোকটাই যে উপরোক্ত নীতিশ তা না বুঝিয়ে বললেও চলবে।

একটা বিরাট বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে চিন্তা করতে লাগল কি উপায়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। বৃষ্টি তখনও কমে আসেনি। লোকটার জামা কাপড় ভিজে একশা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে সে সদর দরজাটা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। অবাক হয়ে গেল লোকটা। কই, চাকর দ্বারোয়ান কারো টিকির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তো!

বাগান পেরিয়ে বাইরে বৈঠকখানা ঘর। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। পেছনের জানালা দিয়ে লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে হাতে নিয়ে দেখল জমিদার অবিনাশ নিয়োগী একটা চেয়ারের ওপরে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। মিনিট খানেক চিন্তা করল লোকটা। তারপর ডাকল—শুনছেন স্যার? আপনার চিঠি।

কোনও উত্তর নেই।

কি করবে তা ঠিক করতে না পেরে নীতিশ এগিয়ে লোকটির গায়ে হাত দিল।

একি! তার দেহ যে বরফের মত ঠাণ্ডা! জমিদার অবিনাশ নিয়োগী তবে মারা গেছে! কিন্তু কে তাকে মারল? আর এ ত সাধারণ মৃত্যু নয়। একখানা রক্তমাখা ছোরা পাশে পড়ে আছে। কে তবে ওকে হত্যা করল?

নীতিশ কি করবে ঠিক করতে পারল না। ঘর থেকে চলে যাওয়াই এখন সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কিন্তু···

চলে যাওয়ার অবসর নীতিশের মিলল না।

মাথার উপর প্রচণ্ড আঘাত।

সজোরে একটা লোক ডাণ্ডা দিয়ে যেন পেছন থেকে নীতিশের মাথায় আঘাত করেছে।

নীতিশের চোখের সামনে নিকষ অন্ধকার।

অস্ফুট শব্দ করে নীতিশ অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

* * * *

তুমুল কলরবের শব্দে জ্ঞান ফিরে এলো নীতিশের। সহস্র রজনীর নিদ্রাশেষে জেগে উঠল যেন। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম্ করছে। কি করে কি ঘটল তা ভাল করে বোঝবার আগেই সে দেখতে পেল একদল লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল সশব্দে।

অনেকগুলি কণ্ঠের মিলিত কলরব কানে গেল তার। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সে।

সবচেয়ে সম্মুখে যে লোকটি প্রবেশ করছিল সে প্রশ্ন করল—কি নাম হে তোমার? তোমাকে ত দাগী আসামী বলে মনে হচ্ছে না।

উত্তরে আর একজন বলল—আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম ও ঠিক জমিদারবাবুর পাশে ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে। ভয় পেয়ে আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন করলাম।

অন্য লোকগুলো একসঙ্গে বলল—আচ্ছা বদমাশ ত! কিন্তু ও ব্যাটা জখম হল কি করে?

প্রথম যে লোকটি প্রবেশ করেছিল তার দিকে চেয়ে নীতিশ বুঝতে পারল যে সে পুলিশের লোক। সে বলল—সত্যি ও জখম হল কি করে মিঃ তরফদার?

মিঃ তরফদার জমিদার অবিনাশবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনি বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমি পুলিশে ফোন করে এসে

দেখি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পালাতে গিয়ে বোধ হয় আছাড় খেয়ে পড়ে জখম হয়েছে আর কি।

—তা হতে পারে।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওই টেবিলের কোণে মাথা ঠুকে·········

তাঁর কথা শেষ হল না। নীতিশ চিৎকার করে উঠল—না-না, ওসব মিথ্যে কথা দারোগাবাবু। আমার মাথায় পেছন থেকে আঘাত করে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়।

—কে মাথায় আঘাত করল ?

—পেছন থেকে আঘাত করেছে, দেখতে পাইনি।

—কিন্তু তুমি এ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে কেন ?

—একটা প্রাইভেট্ গোয়েন্দা ফার্ম থেকে একটা চিঠি তাঁকে দিতে এসেছিলাম গোপনে।

—কোথায় সে চিঠি ?

পকেটে হাত দিয়ে নীতিশ দেখল চিঠি নেই। কিন্তু সেটা ছিল তার হাতে। হাত থেকে তবে সেটা গেল কোথায় ?

—আজ্ঞে, সেটা ত দেখতে পাচ্ছি না এখন। নিশ্চয় যে আঘাত করেছিল সেই ওটা সরিয়েছে।

—মিথ্যা কথা। বললে অবিনাশবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ তরফদার। —চিঠির কথাটাও যেমন মিথ্যা, পেছন থেকে আঘাতও ঠিক তেমনি। ধরা পড়ে ও রকম গাঁজা চালিও না হে বাপু, বুঝলে ?

—সত্যি মশাই, এ লোকটার সবই কেমন যেন অদ্ভুত। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এসে অবিনাশবাবুকে খুন করে নিজেও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এখন বলছে আবার কি একটা চিঠির কথা। দারোগাসাহেব গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন। চল হে এখন কিছুদিন হাজত ঘরটা দেখে আসবে।

নীতিশের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এ ত

তা নয়। এ নির্মম রূঢ় বাস্তব। কঠোর সত্য। জমিদারবাবুর মৃত দেহের পাশে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাছাড়া সে সত্যিই ছোরা তুলে একবার দেখেছিল। সবদিক থেকেই তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। এদিকে তার চিঠির কোনও অস্তিত্ব নেই। কে তার কথা বিশ্বাস করবে? নীতিশের মাথার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে শুধু বলল—বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, আমি নির্দোষ। আমি ওসবের কিছুই জানি না। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

দারোগাবাবু নিষ্ঠুর হাসি হেসে শুধু বললেন—ধরা পড়লে সকলেই একথা বলে হে, বুঝলে? দুদিন ঠাণ্ডা গারদে রাখলেই সবকিছু ঠিক বলে ফেলে।

নীতিশ বুঝতে পারল সব চেষ্টা নিষ্ফল। তার উদ্ধারের কোনও আশা নেই। তার হাতে হাতকড়া পরানো হল। দুজন পুলিশ বন্দুক উচিয়ে তার সামনে আর পেছনে এসে দাঁড়াল। তারপর তাকে নিয়ে দারোগাবাবু যাত্রা করলেন থানার উদ্দেশ্যে।

দরজার কাছে পৌঁছতেই একটি মেয়ে হঠাৎ বিপুল বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তন্বী যুবতী। দু'চোখে তার জল টলমল করছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল—বাবাকে যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তির জন্য আমি সবকিছু অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু মিঃ তরফদারের দিকে চাইলে তিনি বললেন—ইনি হচ্ছেন মৃত জমিদার অবিনাশবাবুর একমাত্র কন্যা বেলা। পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন ইনি। অবশ্য তাঁর উইলের কথা আমরা জানি না। তবে এছাড়া আর কি হতে পারে?

দারোগাবাবু শোকাচ্ছন্না বেলার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি অত অধীর হবেন না বেলাদেবী। এর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো।

নীতিশের মনে হল সারা রাত্রিটা যেন কেটে গেছে কোন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। পত্রবাহক, চিঠি, জমিদার বাড়ি, ঘুম, আর এই গারদ সবই সেই বিরাট দুঃস্বপ্নের একটি অংশ।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলো এসে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। নীতিশ উঠে বসে ভাবতে লাগল, তার দুঃখের সময় নিশ্চয়ই কেটে গেছে। এবার বোধ হয় প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়বে।

বেলা প্রায় নয়টা।

একজন পুলিশ অফিসার তালা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর হুকুম দিতেই নীতিশের হাতের হাতকড়িটা খুলে ফেলা হল।

নীতিশ বলল—উঃ, বাঁচালেন মশাই! হাতটা যেন খসে পড়ছিল।

অফিসার নীতিশের হাতের একটা ছাপ নিলেন। তারপর ছোরার উপরে যে ছাপ ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর মুখে বললেন—না, আপনাকে বাঁচাবার কোন উপায় দেখছি না আমি।

—কেন?

—ছোরার উপরে আপনার হাতের ছাপ।

—তা হতে পারে। ছোরা মেরে হত্যাকারী সেটা মেঝের উপরে ফেলে রেখেছিল। আমি সেটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে তুলে ধরে দেখেছিলাম যে ওটা দিয়েই জমিদারবাবুকে খুন করা হয়েছে কি না।

—কিন্তু হত্যাকারী বা পৃথক কারো হাতের ছাপ ত এতে নেই।

—বুঝতে পারছি ঘটনাচক্র আমার বিপক্ষে। আচ্ছা এখানকার প্রধান অফিসারের সঙ্গে দেখা হতে পারে?

—কেন?

—একটা ফোন করব।

—আচ্ছা চলুন, দারোগাবাবুর কাছে নিয়ে যাই আপনাকে।

—বেশ চলুন। তিনি অনুমতি দিলেন…

সে অনুমতি নীতিশ সহজেই পেল। নীতিশ তখন ফোন করল অনিমার কাছে। সবকিছু ঘটনা জানিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল।

কিন্তু এই টেলিফোনই কিভাবে ঘটনাচক্রকে আরও জটিলতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দিল, সে সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা চলবে।

—পাঁচ—

—আঙ্গুলের ছাপ—

বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সুনাম এবং তার আধুনিক উপায়ে উন্নত শ্রেণীর কার্যপদ্ধতির কথা অনিমা জানত।

নীতিশের টেলিফোন পেয়ে সে সেইদিনই সকালে দীপকের সঙ্গে দেখা করে তার সাহায্য প্রার্থনা করল।

দীপক সব কিছু শুনে বলল—দেখুন অনিমা দেবী, আপনার কেসটা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। আমার মনে হয়, এর মধ্যে কোনও জটিল রহস্য লুকানো রয়েছে। তবে একটা কথা। যদি আপনার বন্ধুই সত্যি-কারের অপরাধী বলে আমি তদন্তের ফলে জানতে পারি তবে তাঁকে ও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।

অনিমা হেসে বলল—দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী, আমি যতদূর তাকে দেখেছি এবং চিনেছি, তাতে খুন ত দূরের কথা সামান্যতম কোনও দুর্নীতিপূর্ণ কাজ করাও ওঁর দ্বারা অসম্ভব।

—অবশ্য সেটা তদন্ত সাপেক্ষ।

—তা ত' বটেই।

—আমি প্রথমেই থানায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তবে তিনি যদি সত্যই নির্দোষ হন, আমি স্থিরনিশ্চয় যে তাঁকে মুক্ত করতে সক্ষম হব।

—আপনার উপর সে বিশ্বাস আমার আছে মিঃ চ্যাটার্জী। আমি জানি নীতিশবাবু একমাত্র আপনার সাহায্যেই মুক্তি পেতে পারেন। যাক্‌, আপনি আপনার কাজের জন্যে এই অগ্রিম টাকাটা······

—ধন্যবাদ। কাজ শেষ না করে আমি কখনও অগ্রিম টাকা গ্রহণ করি না অনিমা দেবী।

—ও, আচ্ছা। আমি তাহলে আজকের মত উঠি। আশা করি সাধ্যমত আমার সাহায্য আপনি করবেন।

নমস্কার জানিয়ে অনিমা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

* * * *

* * *

দীপক প্রথমেই গিয়ে দেখা করল দক্ষিণেশ্বর থানার দারোগার সঙ্গে। সেই রাত্রে যে দারোগা তদন্তে বের হয়েছিলেন তাঁর নাম মিঃ প্রামাণিক।

দীপকের নাম শুনেই মিঃ প্রামাণিক তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন—আপনি আসামীকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেও ঘটনা পরম্পরা যে সব কিছু প্রমাণিত হচ্ছে তাতে কিছুতেই নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

—পৃথিবীর অনেক অসম্ভব জিনিষই পরে সম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিঃ প্রামাণিক।

—অবশ্য আপনার তদন্তের পদ্ধতি আলাদা।

—সে যাই হোক, আসামী কি ধরণের কথা বলেছিল তা কি আপনার মনে আছে?

—সে নাকি কার একখানা চিঠি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায় অবিনাশবাবু মৃত অবস্থায় পড়েছিল। আর পাশে পড়েছিল রক্তমাখা একখানা ছোরা। সে ছোরাখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে, এমন সময় তার মাথায় পেছন থেকে কে যেন আঘাত করে। তার ফলেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

—আচ্ছা এখন তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে কি ?

—অবশ্যই।

—বেশ, তাহলে তাকে এখানে আসতে বলুন।

মিঃ প্রামাণিকের আদেশে তখনি দুজন পুলিশ কনেষ্টবল নীতিশকে এনে উপস্থিত করল।

তার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দীপক প্রশ্ন করল—আপনি যে চিঠিটা নিয়ে এসেছিলেন সেটা আপনাকে কে দিয়েছিল ?

—দেশবন্ধুপার্কে একজন অচেনা লোক আমার সঙ্গে দেখা করে বলে যে চিঠিটা পৌঁছে দিলেই সে আমাকে পাঁচশ' টাকা দেবে। আড়াইশো টাকা সে আমাকে অগ্রিম দিয়েছিল।

—আপনি ঘরে ঢুকেই কি অবিনাশবাবুকে আহত দেখতে পান ?

—আহত নয় মৃত।

—সে রাতে খুব দুর্যোগ ছিল ?

—হ্যাঁ, ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুক্ষণ আগেই।

—বুঝেছি। আচ্ছা, অনিমা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় কত দিনের ?

—মাস তিনেক ত বটেই।

—হুঁ, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

নীতিশ চলে গেলে দীপক মিঃ প্রামাণিকের দিকে চেয়ে বলল—চলুন, এবার ঘটনাস্থলের দিকে গিয়ে ব্যাপারটার মোটামুটি আরও কিছু

তদন্ত করা যাক। মিঃ প্রামাণিকের সঙ্গে দীপক যাত্রা করে দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

*　　*　　*

* *　　* *　　* *

ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

সেই বৃষ্টি আর আব্ছা আঁধার ভেদ করে দীপকের মোটর ছুটে চলল সোজা দক্ষিণেশ্বরের দিকে। জমিদার অবিনাশ নিয়োগীর বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে মোটর এসে থামল। তার সঙ্গে ছিল দারোগা মিঃ প্রামাণিক আর সহকারী রতনলাল।

দারোগা মিঃ প্রামাণিককে দেখে দ্বারোয়ান ভরত সিং একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল - আবার এলেন যে দারোগাবাবু?

দারোগা মিঃ প্রামাণিক বললেন—কিছু তদন্ত বাকী ছিল, তাই শেষ করতে এলাম ভরত সিং! বাবুর ঘরটা একবার খুলে দাও ত।

কথা শেষ হবার আগেই ভেতর থেকে মিষ্টকণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করল—কে এলো ভরত সিং?

দীপক কিছু বলবার আগেই মিঃ প্রামাণিক বললেন—নমস্কার মিস্ নিয়োগী। ইনি বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী। এই কেসটার বিষয়ে কিছুটা কৌতূহল আছে।

দীপক চ্যাটার্জী! নাম শুনেছি বটে। কিন্তু বাবার হত্যাকারী ত' ধরা পড়েই গেছে।

—কিন্তু দীপকবাবুর ধারণা ওই কেসে আরও কিছু নিগূঢ় রহস্য লুকানো আছে। তাই তিনি কৌতূহলী হয়ে……

মিস্ নিয়োগী বললেন—তাই নাকি? আশ্চর্য ত!

না আশ্চর্যের কিছু নয় মিস্ নিয়োগী। ওটা আমার অনুমান। অবশ্য সত্য না হতেও পারে।

- বেশ বেশ। আমি শুনে সত্যিই সুখী হলাম মিঃ চ্যাটার্জী। আমি চাই বাবার হত্যাকারী ধরা পড়ে শাস্তি পাক। কিন্তু যে লোক ধরা পড়েছে সে অপরাধী নয়, আপনার ওরূপ ধারণার কারণ কি মিঃ চ্যাটার্জী।

অবশ্য আমি স্থিরনিশ্চয় নই। আচ্ছা আপনাকে এখন আর বিরক্ত করব না। আপনি আপনার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ তরফদারকে পাঠিয়ে দিন বরং। আমি এদিকে সব দেখছি।

—বেশ বেশ। সে ত' ভাল কথা।

মিস্ বেলা নিয়োগী আর কথা না বাড়িয়ে ধীরগতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিকে চেয়ে দীপক বলে—চলুন মিঃ প্রামাণিক। এবার যে ঘরে ঘটনটা‌টা ঘটেছিল সেদিকে যাওয়া যাক্।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সব কিছু তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করল দীপক। কোথাও কোনও অসাধারণ কিছু দেখা গেল না। টেবিলের ওপর একখানা বই খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল।

হঠাৎ দীপক জোরে বলে উঠল—ইউরেকা ! আই হ্যাভ্ গট্ দি ক্লু।

মিঃ প্রামাণিক বোকার মত চেয়ে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—এই দেখুন, বইয়ের দু'পাতায় রক্তের দাগ।

—তাতে কি প্রমাণ হয় ?

- ওখানে বসে বই পড়তে পড়তে তিনি নিহত হন।

—তাতে আর আশ্চর্য কি আছে।

—খুন হবার সময় তিনি জেগেছিলেন। আর জানালাটা ঠিক তার সামনে। তাই জানালা দিয়ে অপরিচিত লোক ঢুকলে তিনি নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। তাহলে খুনী নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ।

—কিন্তু তাহলে ত' ছোরার উপরে নীতিশের সঙ্গে খুনী লোকের ছাপও থাকবে।

—দস্তানা পরলেই হাতের ছাপ পড়বে না, মিঃ প্রামাণিক।

—তাহলে খুনী ত' খুব ধূর্ত।

—অবশ্যই।

—চলুন এবার জানালার দিকে দেখা যাক্।

জানালাটা পরীক্ষা করে দেখে দীপক বলল—সেদিন ছিল বৃষ্টি। তাই জানালার শার্শিতে হাতের ছাপ। হুঁ, ওই বেঁটেটা দেখছি বটে নীতিশের ছাপ। কিন্তু ওই লম্বাটা?

—তাই ত। এতটা ত' খেয়াল করিনি।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলল—শীগ গির কাছাকাছি কোনও ফটোগ্রাফারকে ডেকে নিয়ে আয় ত। এটা এনলার্জ করে প্রিণ্ট নিতে হবে।

রতন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দারোগা মিঃ প্রামাণিকের দিকে চেয়ে দীপক বলে—কেসটা বড় জটিল মিঃ প্রামাণিক। আপনি যদি এতে সফল হন, তবে আপনার সুনাম বৃদ্ধি ও পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

—সে আপনার দয়া মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক কি বলতে যাচ্ছিল, কথা আরম্ভ হবার আগেই শোঁ করে একখানা ছোরা তার কাণের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খট্ করে দেয়ালে বিদ্ধ হল।

দীপক মাথাটা নামিয়ে রিভলভার বের করল।

জানালার পাশে ছায়া মূর্তি।

ধপ্।

লোকটা অদৃশ্য হল।

—কে মিঃ চ্যাটার্জী ?

—ওকে ধরুন মিঃ প্রামাণিক।

মিঃ প্রামাণিক ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলেন।

কিন্তু ততক্ষণে লোকটির কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

—ও কে মিঃ চ্যাটার্জী ?

—নিশ্চয়ই হত্যাকারীর অনুচর।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মিস্ বেলা নিয়োগী আর মিঃ তরফদার।

—মিঃ চ্যাটার্জী, কি ব্যাপার ? প্রশ্ন করে বেলা।

—ব্যাপার সামান্য। শুধু একখানা ছোরা।

—সেকি ?

—হ্যাঁ, আমাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল।

—কে ছুঁড়ল ? মিঃ তরফদার প্রশ্ন করলেন।

—যাদের কাজে আমি বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।

—অর্থাৎ ?

—হত্যাকারীর অনুচর।

—আশ্চর্য ত' !

হ্যাঁ, আশ্চর্য বটে। তবে এটুকু বুঝলাম আমি ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। নাহলে এ ধরণের আক্রমণের সম্মুখীন আমাকে হ'তে হ'ত না মিঃ তরফদার।

দীপকের স্বর সারা ঘরের মধ্যে গম্‌গম্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটু পরেই একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে রতনলাল প্রবেশ করল। দীপক তাকে শার্শীর উপরের দুটি ছাপেরই ফটো নিতে নির্দেশ দিল। ফটো নেওয়া শেষ হলে দীপক মিঃ তরফদারকে ডেকে বলল—আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই মিঃ তরফদার।

—অবশ্যই।

—একটু নিভৃতে।

—বেশ, চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক্।

পাশের ঘরে গিয়ে মিঃ তরফদারের দিকে চেয়ে দীপক প্রথম প্রশ্ন করল—আপনি কতদিন কাজ করছেন এখানে ?

—দু'বছর।

—এর আগে ?

—অন্যত্র চাকরী করতাম।

—বেলাদেবীই কি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ?

—তাই ত হওয়া উচিত।

—উনি ছাড়া মিঃ নিয়োগীর আর কে কে আত্মীয় আছেন ?

—দুজন দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে। তারা বিদেশে থাকে।

—তারা কিছু পাবে না ?

—কিছু কিছু অবশ্য পেতে পারে। আমি উইল ত জানি না।

—ওঁর উইলটা কার কাছে আছে ?

—ওঁর এ্যাটর্নী মিঃ পিল্লাইয়ের অফিসে।

—আচ্ছা, মিঃ নিয়োগীর কি কোন শত্রু ছিল ?

—সে রকম ত দেখি না।

—ওর পুরাণো জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন ?

—তেমন বিশেষ কিছু না।

—কোন নিকটতম বন্ধুকে চেনেন ?

—না, তেমন কেউই নয়।

—আচ্ছা, বেলাদেবীর মা মারা যান কতদিন ?

—তা প্রায় কুড়ি বছর। উনি তখন তিন বছরের মেয়ে।

—ওকে তাহলে মানুষ করে তোলে কে ?

—শান্তা নামে এক ধাত্রীর কাছে মানুষ।

—সে এখন কোথায় থাকে ?

— তার বর্তমান ঠিকানা জানি না!

—আচ্ছা, মিঃ নিয়োগীর সমস্ত সম্পত্তির পরিমাণ কত হবে বলে মনে হয় আপনার ?

—প্রায় পঞ্চাশ লাখ মত হবে।

—আচ্ছা এতেই আমার আপাততঃ চলবে। পরে কিছু জানবার প্রয়োজন হ'লে সাহায্য অবশ্য পাব। কি বলেন ?

—হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই।

—দীপক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মোটরে বসে।

* * *

* * * *

পরদিন সকালে দীপক হানা দিল এ্যাটর্নী মিঃ পিল্লাইয়ের অফিসে।

মিঃ পিল্লাই কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দীপক কার্ড পাঠিয়ে দিতেই মিঃ পিল্লাই তাকে ডেকে পাঠালেন।

—নমস্কার মিঃ পিল্লাই।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী।

তারপর হঠাৎ কি প্রয়োজন ?

—প্রয়োজনটা জরুরী। আশা করি সদুত্তর পাব।

—সাধ্যমত চেষ্টা অবশ্যই করব। কিন্তু বিষয়টা কি ?

—মিঃ নিয়োগীর হত্যা ব্যাপার নিয়ে।

—কিন্তু খুনী ত ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়লেও আমরা ঠিক নিঃসন্দেহ নই। সে রকম প্রমাণও পাইনি। তাই সুবিধার জন্যে·········

—বেশ, কি জানতে চান বলুন।

—প্রথম কথা মিঃ নিয়োগীর মৃত্যুর পর ওঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে ?

—এটা গোপনীয় কথা।

—কিন্তু দিন তিনেকের মধ্যেই ত সংবাদপত্রে বের হবে।

—বেশ, বলতে আপত্তি নেই। তার একমাত্র মেয়ে বেলা নিয়োগীই হচ্ছেন ওঁর সম্পত্তির পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার উত্তরাধিকারিণী।

—আর বাকিটা ?

—সে ওঁর দুই ভাগ্নে, চাকর, সেক্রেটারী ইত্যাদির মধ্যে কিছু কিছু করে ভাগাভাগি হবে।

—কি ধরণের ?

—ভাগ্নেরা প্রত্যেকে দুই লাখ করে পাবে। আর সব দশ হাজার বিশ হাজার এমনি আর কি !

—আপনার অংশে কি পরিমাণ·········

—আমি পাব তিন হাজার। সামান্যই বলতে পারেন·········

—তা ত বটেই।

কথা শেষ হল না। হঠাৎ শোনা গেল বাইরে তুমুল বচসা। একটি গম্ভীর নারীকণ্ঠ অনিমাকে বলল—বিরক্ত করোনি বাপু। আমায় এখুনি এ্যাটর্নী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

অনিমা বলল—কিন্তু তিনি এখন ব্যস্ত।

—ওসব বাজে কথায় অন্য লোককে ভুলিও। আমাকে নয়।

—কিন্তু আপনি ত পরেও···

—না না, আমার প্রয়োজন জরুরী। সরে যাও এখান থেকে।

কথার শেষে দীর্ঘাঙ্গী এক প্রৌঢ়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মিঃ পিল্লাইয়ের দিকে চেয়ে বলল—তোমার এই মেয়েটা আমাকে আট্‌কাতে চায়। সাহস ত কম নয়!

মিঃ পিল্লাই বললেন—আচ্ছা অত চটে উঠছ কেন?

—চট্‌বো না? এই লোকটা আবার কে হে? ওসব লোককে হটাও। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

মিঃ পিল্লাইয়ের মুখ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করল। তিনি উঠে গিয়ে মহিলাটির কানে কানে কি যেন কথা বলে বললেন—বাইরে একটু দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি।

মহিলাটি বাইরে যেতেই দীপক মিঃ পিল্লাইকে প্রশ্ন করল—ও মহিলাটির নাম কি মিঃ পিল্লাই?

—দেখুন না, অত্যন্ত অসভ্য। বার দুয়েক এসেই যেন একেবারে মজা পেয়ে গেছে। শান্তা, না কি যেন নামটা······

শান্তা···ও···আচ্ছা চলি মিঃ পিল্লাই। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন।

মিঃ পিল্লাইকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দীপক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—সাত—

—ঘটনাচক্রে—

পরদিন সকালে লালবাজার থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল যে মিঃ নিয়োগীর ঘরের শার্শীতে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে তা হচ্ছে ভূতপূর্ব একজন ইন্‌ফর্মার হরিপদ পোদ্দারের।

খবরটা দীপককে চঞ্চল করে তুলল। সে তক্ষুণি লালবাজারে গিয়ে সোজা ইন্‌স্পেক্টর মরিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন হঠাৎ দীপককে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জী ?

—খবর সামান্যই।

—তবু ?

—দু'একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছা করি বলেই···

—ও, বুঝেছি। তবে বিষয়টা কি ?

—জমিদার অবিনাশবাবুর হত্যার মামলাটা নিয়ে···

—কি জানতে চান ?

—হরিপদ পোদ্দার আগে পুলিশের ইন্‌ফর্মার ছিল ?

—হ্যাঁ।

—ওর বাড়িটা কোথায় ?

—মোহনবাগান বস্তী, কম্বুলীটোলা।

—পুলিশের চাকরী ছাড়ল কেন, তা কি বলতে পারেন ?

—হ্যাঁ। একবার গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে···

—বুঝেছি। লোকটার সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু আছে নাকি ?

—মনে হয় না।

—কেন ?

—শুনেছি দু' একটা ব্ল্যাকমেলও করেছে। তবে তার বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না আমার। তাছাড়া···

—কি বলুন···

—ও খুনে ওর স্বার্থই বা কি ?

—সত্যি কথা।

—তবে সে যে খুনটা জানালার আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করেছে এমন হতে পারে।

—হুঁ।

—আর কিছু জানতে চান ?

—না। আমি প্রথমে দেখা করতে চাই হরিপদ পোদ্দারের সঙ্গে। তারপর মিস্ বেলা নিয়োগীর ধাত্রী শান্তার সঙ্গে।

—কতদূর এগোলেন ?

—দিন তিনকের মধ্যে শেষ করে ফেলব বলে মনে হয়। আচ্ছা চলি মিঃ মরিসন্—নমস্কার।

পথে পা দিয়ে দীপক সোজা একটা ট্রামে করে কম্বুলীটোলায় গিয়ে হাজির হল। গাড়ি নিয়ে গেল না। কারণ, সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা বেশি।

মোহনবাগান বস্তীতে পৌঁছে দীপক খোঁজ করল হরিপদ পোদ্দারের বাড়িটা। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দীপক অবাক হল। বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। কেউ নেই। দীপক কড়া নাড়ল। কেউ উত্তর দিল না।

দীপক আশেপাশে বাড়ির খোঁজ করতেই দুজন অশিক্ষিত লোক বেরিয়ে এল।

দীপক বলল—হরিপদ বাড়ি নেই ? ও কোথায় গেছে বলতে পার ?

কোথায় গেছে বলতে পারি না বাবু, তবে···

—তবে ?

—কাল বেরিয়েছে একটা গাড়িতে করে।

—কখন ?

—সন্ধ্যা ছটায়।

—কার গাড়ি সেটা ?

—তা ত জানি না।

—এ ধরণের গাড়িতে কি হরিপদ প্রায়ই চড়ে থাকে ?

—না, বাবু।

—বুঝলাম। তারপর সে আর ফিরে আসেনি ?

—না।

—আচ্ছা, গাড়িটা দেখতে কেমন ?

—খয়েরী রঙের পুরোণো অষ্টিন।

আর কথা না বাড়িয়ে দীপক সোজা থানায় পৌঁছল। সেখানে গিয়ে যে খয়েরী রঙের যে অষ্টিনে করে হরিপদ পোদ্দারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি খুঁজে বের করবার জন্যে চারিদিকে খবর প্রেরণ করল।

কিন্তু তবু কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না সারাদিনে।

খোঁজ পাওয়া গেল বিকেলের দিকে।

বসিরহাট থেকে খবর এলো, একটা গাড়ির মধ্যে একজন লোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার দেহের যা বর্ণনা শোনা গেল তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ওই লোকটিই হরিপদ পোদ্দার।

দীপক খবরটি শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ল। সে যেদিক থেকেই অগ্রসর হচ্ছে, সে দিকেই শুধু ব্যর্থতা।

শত্রুপক্ষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে অবাক হল সে।

—আট—

—হত্যা ও ষড়যন্ত্র

হরিপদ পোদ্দারের আকস্মিক মৃত্যু দীপককে যে পরিমাণ বিস্মিত করে তুলল ঠিক সেই পরিমাণ চিন্তিতও হয়ে পড়ল সে। তার প্রথম কাজ হল মিস্ বেলা নিয়োগীর ধাত্রী শান্তার সঙ্গে দেখা করা। সেদিন শান্তার সঙ্গে এ্যাটর্নী মিঃ পিল্লাইয়ের কথাবার্তা তার কাছে রহস্যজনক বলেই বোধ হয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে দীপক গাড়িতে করে রওনা হল বরাহনগরের দিকে। তেঁতুলতলায় একটা বস্তীতে ধাত্রী শান্তার বাড়ি।

কিন্তু বাড়িখানার সামনে পৌঁছেই দীপক একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল। বাড়ির ঠিক সামনে অজস্র লোকের ভিড়। দু'জন কনেষ্টবল ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে।

দীপক সাম্‌নে গিয়ে কনেষ্টবলের কাছে নিজের পরিচয় দিতেই সে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল—এই বাড়ির মধ্যে একটা মেয়েলোক মারা গেছে।

—মেয়েলোক ?

—হ্যাঁ, শান্তা না কি যেন নাম।

—আশ্চর্য ! কখন মারা গেল সে ?

—আজ দুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে একজন লোক দেখতে পায় তার গলায় ফাঁসী, সে একটা উঁচু জায়গা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।

—কিন্তু হঠাৎ এইভাবে নিজেকে ফাঁসী দেবার কোনও কারণ ত' নেই ! নিশ্চয়ই অন্যভাবে একে মেরে এইভাবে রাখা হয়েছে। রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলল।

ঘরের মধ্যে সার্চ করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। দীপক রতনকে

বলল —এরা যেন প্রতিটি পদে পদে ঠিক আগের মুহূর্তে এসে প্রমাণটা লুপ্ত করে দিচ্ছে। কিভাবে যে প্রমাণ সংগ্রহ করব, তা আমার ধারণার বাইরে।

দীপকের মনের চিন্তা তার মুখের রেখায় কিন্তু ফুটে উঠল না। তার নির্বিকার ভাব দেখে কিন্তু মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সে নিশ্চয়ই কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

• • •

দীপকের গাড়ি সেখান থেকে বের হয়েই এগিয়ে চলল থানার দিকে।

থানা থেকে কিছুটা দূরে একটা জঙ্গল। জঙ্গলের ঠিক সামনে এসে দীপকের গাড়ির টায়ার হঠাৎ বিরাট একটা শব্দ করে ফেটে গেল। দীপক গাড়ি থেকে নেমে দেখল একটা বড় কাঁচের টুক্রো তার গাড়ির টায়ারের মধ্যে প্রবেশ করে ওটাকে জীর্ণ করেছে। দীপক রতনকে বলল—থানা থেকে দারোগা মিঃ প্রামাণিককে ডেকে নিয়ে আয় ত!

রতন বলল—কিন্তু আমি দেখছি এখানে অজস্র কাঁচের টুকরো ছড়ান। নিশ্চয়ই আমাদের এখানে আটকাবার জন্তেই এভাবে কাঁচ ছড়ান হয়েছে। এভাবে তোর একা থাকাটা ঠিক নিরাপদ নয়।

দীপক হেসে বলল—তোর কোনও ভয় নেই রে। আমি কখনই নিজেকে বিপদে ফেলে কিছু করব না। এখানে শীগগিরই কোন একটা দৃশ্যের অভিনয় হবে।

রতন অগত্যা জোরে জোরে থানার দিকে চল্‌ল। দীপক গাড়ির পাদানিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে যেন কার জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল।

• • •

রতন ফিরল আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

সঙ্গে দারোগা মিঃ প্রামাণিক।

কিন্তু কোথায় দীপক চ্যাটার্জী ?

—দীপক, দীপক !

—দীপকবাবু। মিঃ চ্যাটার্জী।

কোনও উত্তর নেই।

বারুদের গন্ধ পাওয়া গেল। রতন বলল—একটু আগেই এখানে গুলি চলেছে মিঃ প্রামাণিক।

—তা ত বুঝতে পারছি।

—কিন্তু দীপক কোথায় গেল ?

—তাকে ত দেখা যাচ্ছে না।

—চলুন ওই জঙ্গলটার ভেতরে খুঁজে দেখা যাক।

—কিন্তু এত রাত্রে ?

—যদি ও আহত হয়ে ওধারে পড়ে থাকে।

রতনের স্বরে উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কোথায় দীপক ? বোধ হয় তার দেহটা শেয়াল কিংবা কোনও জন্তু টেনে নিয়ে গেছে। অথবা আততায়ীরাই তাকে বন্দী করে রেখেছে কিন্তু তার এই আকস্মিক অন্তর্ধানের পেছনে রহস্য কি ?

রতন খবরটা লালবাজারে জানাল। সর্বত্র সুরু হল কর্মচঞ্চলতা। কিন্তু তবুও দীপকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

—নয়—

—অনিমার বিস্ময়—

অনিমা ঠিক নটার মধ্যেই এ্যাটর্নি মিঃ পিল্লায়ের অফিসে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে।

সেদিনও অন্যান্য দিনের মত সে নটার মধ্যেই উপস্থিত হয়েছিল।

অফিসে উপস্থিত হয়ে সে দেখতে পেল মি: পিল্লাই তখনও এসে পৌঁছান নি।

অনিমা সোজা তার ঘরে গিয়ে বসল। একজন দারোয়ান এসে তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

—কে দিলে চিঠি ?

—আমাদের অফিস থেকে।

—তোমাদের অফিসের নাম কি ?

—দত্ত চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, এ্যাটর্নি অফিস।

অনিমা দেখল চিঠির উপরে নাম লেখা—অনিমা নিয়োগী।

অনিমা অবাক হয়ে ভাবল—একি আশ্চর্য্য ব্যাপার ? সে একখানা পিওন বুক সই করে দারোয়ানকে বিদায় দিল।

তারপর চারদিকে চেয়ে দেখল একবার।

অফিস ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

তাতে লেখা :

অনিমা নিয়োগী সমীপেষু,

আমাদের মক্কেল শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী তাঁর মৃত্যুর দিন এই চিঠিখানা আমাদের দিয়ে যান। এটার মুখ বন্ধ ছিল এবং এখনও বন্ধ আছে। তিনি বলেন, কোনও কারণে তাঁর মৃত্যু হলে এটি আপনার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমরা সেই কর্তব্য পালন করছি। চিঠিতে কি লেখা আছে তা আমরা জানি না। যদি এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলবার থাকে তাহলে পরে আমাদের কাছে জানাবেন। পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করে আমাদের দায়মুক্ত করবেন। ইতি—

ম্যানেজার

দত্ত চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, এ্যাটর্নি অফিস

বিস্মিতা অনিমার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। এ কি বিস্ময়ের ব্যাপার? কি অদ্ভুত প্রহেলিকা!

অনিমা চিঠি পড়ে চলল। প্রতি ছত্রে তার বিস্ময়ের ভাব বৃদ্ধি পেতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল এও কি সম্ভব?

ধীরে ধীরে অনিমা উত্তেজিত হয়ে উঠল। চিঠিতে লেখা আছে মৃত অবিনাশ নিয়োগীর মৃত্যুর কারণ····· নীতিশের নির্দোষিতার কথা······ কে কে এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছে তাদের খবর...হরিপদ পোদ্দারের মৃত্যুর কারণ······আর লেখা শান্তাদেবীর জীবনও নাকি বিপন্ন।

বিপন্ন? তারপর শান্তাদেবী মারা গেছে। আশ্চর্য। অনিমার সারা দেহের উপর দিয়ে বিদ্যুৎস্রোত বয়ে গেল।

পেছনে পদশব্দ।

কে?

চিঠিটা লুকোবার চেষ্টা করল অনিমা।

শয়তানি! তুই তাহলে সব কিছু জেনেছিস্।

অনিমার দুচোখে বিস্ময়। এই তাহলে এর পরিচয়?

অনিমার গলাটা টিপে ধরল সে সজোরে।

অনিমা আর্তনাদ করে উঠে জ্ঞান হারাল।

—দশ—

—তদন্তের তোড়জোড়

পরদিন কলকাতার প্রত্যেকটি কাগজে বেশ বড় বড় অক্ষরে বের হল যে সংবাদটি তাতে নগরীর বুকের উপর দিয়ে যেন বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল।

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী অজ্ঞাত
আততায়ীর হাতে নিহত!

বক্সের মধ্যে মৃতদেহ প্রাপ্তি!

হত্যাকারীর সন্ধানে পুলিশ বিভাগের ব্যর্থ প্রচেষ্টা!

সহরের বুকে বিস্ময়ের ঢেউ!

দেখতে দেখতে সেদিনের খবরের কাগজের বিক্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ।

সহরের সর্বত্র শোকের প্রবাহ বইতে স্বরু করলেও লালবাজার থানায় কিন্তু কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেল।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্‌ দক্ষিণেশ্বর থানায় কি যেন সব নির্দেশ প্রেরণ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে ওই নির্দেশের উত্তরে যে খবর ভেসে এলো, তার উত্তরে তিনি আরও কি সব জানালেন।

দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলালের কাছে সংবাদপত্রের রিপোর্টার এসে ভীড় জমাতে লাগল।

কিন্তু এই আকস্মিক শোকপূর্ণ সংবাদে রতন এমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

তবে তার কাছ থেকে যেটুকু জানা গেল, প্রত্যেকটি খবরের কাগজ সেই খবরই ছাপাল ফলাও করে।

নগরের লোকেরা সব কৌতূহলী হয়েছিল। তারা খবরটা নিয়ে নানা ধরণের জল্পনা কল্পনা স্বরু করে দিল।

নগরের লোকজন যখন এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত তখন এই সংবাদ শুনে একজনের বীভৎস মুখে যেন হাসির প্রবাহ খেলে গেল।

লোকটি একটি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্রী একটা আবহাওয়া যেন সেই অঞ্চলটার চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে পূর্বদিনের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যের কতকগুলি মাংস-হাড় পড়ে আছে।

লোকটার নাম ইয়াসীন।

সে জমিদার অবিনাশবাবুর বাড়ীতে মালীর কাজ করে। তবে তার বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে। এই বস্তীতে থাকে সে।

আগের দিন বোধ হয় একটা বকরী মারা হয়েছিল।

বাতাসে বিশ্রী দুর্গন্ধ।

ইয়াসীন বসে বসে কি যেন ভাবছিল।

কড়াটা নড়ে উঠল।

—কে ?

—আমি।

—বুঝেছি। ভেতরে এসো।

—না হে, ভেতরে যা দুর্গন্ধ। তুমি বাহিরে এসো।

ইয়াসীন বাইরে বেরিয়ে এলো। তার দিকে চেয়ে আগন্তুক বলল—সেই মেয়েটাকে অজ্ঞান করে বাক্সে রাখা হয়েছে। তুমি একে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

—আচ্ছা হুজুর।

—কাল টাকাটা পাবে। বুঝেছ ?

—আচ্ছা।

—কাল যেন ঠিক করা হয়। আর গতবারে তুমি যা হাতে টিপ দেখিয়েছ আমি সত্যি খুশী হয়েছি।

লোকটি চলে যায়।

ইয়াসীন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

—এগারো—

গ্রেপ্তার—

পরদিন বেলা দশটা।

একদল পুলিশ এসে এ্যাটর্নি পিল্লাইয়ের অফিসে হানা দিল।

মিঃ পিল্লাই বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—কাকে চান আপনারা ?

—আপনাকেই।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ।

—কি প্রয়োজন ?

—হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ, আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন মিঃ পিল্লাই। লছমন সিং হাতকড়া লাগাও।

—এর জন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে মিঃ মরিসন্।

—ধরা পড়লে সকলেই এ কথা বলে থাকে মিঃ পিল্লাই।

—কিন্তু প্রমাণ ?

—প্রমাণ এই চিঠি।

—চিঠি ?

—দেখুন। এটি আপনি জমিদার অবিনাশবাবুর বাগানের মালী ইয়াসীনকে দিয়েছিলেন।

মিঃ পিল্লাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল।

—আপনি অপরাধ স্বীকার করে স্বীকৃতিপত্র লিখে দিলে আপনার অপরাধ ক্ষমা করা হবে।

—বেশ আমি স্বীকৃতিপত্র দিতে প্রস্তুত।

সেদিনই বেলা তিনটে।

একদল পুলিশ এসে সদলে হানা দিল মৃত জমিদার মিঃ অবিনাশ নিয়োগীর বাড়ী।

—কাকে চান? প্রশ্ন করে দারোয়ান ভরত সিং।

—ভেতরে গিয়ে বল ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ এসেছেন। আমরা মৃত অবিনাশ নিয়োগীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ তরফদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিঃ তরফদার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তার পেছনে মিস্ বেলা নিয়োগী।

মিঃ মরিসন্ আদেশ দিলেন—মিঃ তরফদার, মিথ্যা পালাবার চেষ্টা করবেন না আশা করি। আপনার বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ।

—আমার বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ।

—প্রমাণ?

—এই দেখুন এ্যাটর্নি পিল্লাইয়ের স্বীকৃতিপত্র।

—এটা আমি বিশ্বাস করি না।

—আর এই দেখুন আপনার অনুচর ইয়াসীন…

—ইয়াসীন?

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ইয়াসীন।

—শয়তান! গর্জে উঠলেন মিঃ তরফদার।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ। হেসে উঠল ইয়াসীন। তারপর মাথার পরচুল ও মুখের দাড়ি খুলে ফেলতেই দেখা গেল, এ আর কেউ নয়, এ হচ্ছে স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী।

—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি মরিনি তা ত দেখতেই পাচ্ছ মিঃ তরফদার ওরফে বাজপাখি।

—বাজপাখি!

ঘরের মধ্যে বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল।

—হ্যাঁ, বলল দীপক। আর ওই মেয়েটা, বেলা নিয়োগী, এ হচ্ছে আর কেউ নয়, মিঃ তরফদার ওরফে বাজপাখির সঙ্গিনী। অবিনাশ নিয়োগীর আসল মেয়ে হচ্ছে অনিমা নিয়োগী। সে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে গরীবের ঘরে। ধাত্রী শান্তাই ছিল এর জন্যে দায়ী। তাকে ঘুষ দিয়ে ছেলেবেলায় বাজপাখি এক গরীবের মেয়ের সঙ্গে এই মেয়ে বদল করেছিল।

—হ্যাঁ, তারপর বেলা যখন টের পেল যে সে অবিনাশ নিয়োগীর কন্যা নয়, তখন সে বাধ্য হয়ে বাজপাখির সহযোগিতা করতে রাজী হল। আজ থেকে আঠোরো কুড়ি বছর আগে ওই রহস্যজালের প্রথম সূত্রের আরম্ভ আর আজ তার শেষ।

—শয়তান!

—স্কাউণ্ড্রেল!

দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, বেলা আর বাজপাখি।

মিঃ মরিসন্ বললেন—এদিকের ব্যাপার ত বুঝলাম, কিন্তু মিস অনিমা নিয়োগী কোথায়?

দীপক বলল—মিঃ তরফদার ওরফে বাজপাখি কাল ছদ্মবেশে আমার কাছে গিয়ে বলে আসে, ওকে পুঁতে ফেলবার জন্যে।

—কেন।

—কারণ, অনিমা জানতে পেরেছিল যে সেই হচ্ছে মিঃ নিয়োগীর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

—কি করে জানল।

—মৃত্যুর আগে শান্তা দেবী চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন তাকে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ, চরিত্রের দিক থেকে প্রচুর অধঃপতিত হলেও এতটা অধঃপাতে যায়নি শান্তা। তাই শেষ মুহূর্তে ও স্বীকার করে গিয়েছিল সব কিছু।

—কিন্তু শান্তা দেবীকে মরতে হল কেন ?

—কারণ আর কিছুই নয়, শেষ মুহূর্তে ও বাজপাখির উপরে ব্ল্যাক-মেল করতে চেয়েছিল।

—শুধু সেইজন্যে ?

—হ্যাঁ।

—আর হরিপদ পোদ্দার মরল কেন ?

—নরেশ নামে যে লোকের হাত দিয়ে বাজপাখি নীতিশের কাছে চিঠি পাঠায় সেই সময় হরিপদ তা দেখতে পেয়েছিল। তারপর ঠিক খুনের দিন সে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

—এর ভেতর এত চক্রান্ত ছিল ?

—হ্যাঁ।

—মিঃ পিল্লাইও কি এসব কথা জানত ?

—হ্যাঁ, জানত বলেই ত ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। বাজপাখি তাকে এক লাখ টাকা দিতে রাজী হয়েছিল।

দীপকের কথা শেষ হল। ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ বাজপাখির হাতে হাত কড়া পরিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

গুড়ুম। গুম্!

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রচণ্ড শব্দ!

স্মোক্ বম্ব!

ধোঁয়া!

সব ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল বাজপাখি অদৃশ্য।

মিঃ মরিসন্ বেলার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। হত্যাকাণ্ডে বাজপাখিকে সাহায্য করবার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

মিঃ মরিসন্ শুধু বললেন—এত করেও শেষ পর্যন্ত বাজপাখিকে ধরা গেল না, এটাই আফ্‌শোষের কথা।

দীপক বলল—তবে ঘটনার যবনিকাপাত হল। আর একজন নির্দোষকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম এটাও কম কথা নয়।

মিঃ মরিসন্ বললেন—অফ্ কোর্স।

* * *

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল অনিমা নিয়োগী। তার ঠিক পেছনে পেছনে প্রবেশ করল নীতিশ।

দীপক বলল—অনিমা দেবী, নীতিশবাবুর নির্দোষিতা প্রমাণ করে তাকে কারাগারের বাঁধন থেকে মুক্ত করে দিলাম। তারপর একটু থেমে বলল—কিন্তু আপনার বাঁধন থেকে মুক্তি নেই।

অনিমা কোনও কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মুখটা রাঙা করে মাথা নামাল।

নীতিশের তুচোখে তখন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি।

আদালতের বিচারে বেলা অবিনাশ নিয়োগীর মেয়ে নয় সে কথা প্রমাণিত হল। অবিনাশ নিয়োগীর সম্পত্তির মালিক হল অনিমা নিয়োগী।

কয়েকদিন বাদেই শুভলগ্নে অনিমার সঙ্গে নীতিশের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। দীপক, রতন, ইন্‌স্পেক্টর মরিসন্ আর দারোগা মিঃ প্রামাণিক সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

—শেষ—

দীপক চ্যাটার্জীর ডায়েরী থেকে

দীপক চ্যাটার্জী

'বাজপাখি' সিরিজের পাঠকদের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে আমার জীবনের একটি সত্যিকারের ঘটনা আপনাদের শোনাতে হবে। দীপক চ্যাটার্জী গোয়েন্দা – সে সাহিত্যিক নয়। তবে আমাদের বন্ধু সাহিত্যিকেরা আমার জীবনের ঘটনাগুলোকে নিয়ে গল্প লেখে। আর সে সব ঘটনাগুলোর গল্প পড়ে আপনারা আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হন। তাই আমি আমার জীবনের একটা ছোট্ট অথচ মজার ঘটনা আমার ডায়েরী থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি। ছোট্ট একটা চুরি কেসে তদন্তের সূত্র কেমন ইন্টারেষ্টিং হতে পারে ওটা পড়ে আপনারা তা স্বীকার করবেন।

ঠিক যে সময়ের কথা বলছি তখন বাজারে বিভিন্ন মিলের শেয়ারের দর হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। বাজারের এই ধরণের দ্রুত পড়তি অনেক বড়লোককে পর্যন্ত ঘায়েল করে তুলছে। শেয়ার মার্কেটে হৈ-চৈ, চলতি বাজারে গোলমাল।

চারদিকের যখন ঠিক এমনি অবস্থা, তখন একদিন বিকেলবেলা আমার অফিসের বেয়ারা এসে জানাল বিরাট একজন মিলিওনেয়ার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ভদ্রলোকের নামডাক আমি ইতিপূর্বেই শুনেছিলাম। মিলিওনেয়ার মিঃ সেনগুপ্তের নাম শেয়ার মার্কেট থেকে আরম্ভ করে চলতি বাজারের যে কোনও লোকই বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রতনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—আমি একা আপনার সঙ্গে কতকগুলি জরুরী বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই মিঃ চ্যাটার্জী।

আমি বললাম—ও হচ্ছে আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সহকর্মী রতনলাল।

এর সামনে আপনি নির্বিঘ্নে যে কোন কথা বলতে পারেন। আপনার কথার উপযুক্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

মিলিওনেয়ার মিঃ সেনগুপ্ত বিচিত্র হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বললেন—আপনি আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পেরেছেন দেখছি। আই এডমিট্ ইওর ট্যালেণ্ট। হাাঁ, এখন কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলা দরকার।

কথার শেষে মিঃ সেনগুপ্ত একটু থামলেন। আমি বেয়ারাকে ডেকে তিন কাপ কফির অর্ডার দিয়ে তাঁর কথায় মনঃসংযোগ করলাম।

মিঃ সেনগুপ্ত স্থরু করলেন :

বিগত ১৩ই মার্চ তারিখে আমার কাছে বোম্বে এবং কলকাতার শাখা হতে ওরকম তিনটি কটন মিলের তরফ থেকে একটি যুগ্ম চিঠি আসে। আপনি জানেন মিঃ চ্যাটার্জী বর্তমানে এই সব মিলগুলোকে ওভার প্রোডাকশানের জন্য কি ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওদের শেয়ারের বাজার দর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে এবং ওভাবে শেয়ার দর মাটির মূল্যে নেমে গেলে, সে কোম্পানীরও কোনও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ওরা তিনজনে আমাকে অনুরোধ করেছিল, যাতে আমি তিনটি কোম্পানীকে একত্রীকরণ করে ওদের পেছনে লাখ পনের কুড়ি টাকা খরচ করে ওদের ওই মারাত্মক অবস্থা থেকে উদ্ধার করি, তাহলে শেয়ার বাজারেও ওদের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

আপনি জানেন আমার কোম্পানীর এবং আমার ব্যাঙ্কের বাজারে যে পরিমাণ স্থনাম অক্ষুণ্ণ আছে তাতে আমরা এই প্রস্তাব ঘোষণা করলেই ওই তিনটি কোম্পানীর শেয়ার দর হু হু করে উঠতে থাকবে। যা হোক আমি ওই তিনটি কোম্পানীর প্রস্তাব ডিরেক্টারদের মিটিং-এ তুলি এবং সেটা পাশ হলে সেই প্রস্তাব এবং তার একটি নকল আমার কোম্পানীর আয়রণ সেফে রেখে দিই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরশু সকালে

আয়রণ সেফ খুলে দেখি নকলটি যথাস্থানে আছে, কিন্তু আসল কপিটি চুরি গেছে এর ফলে আমাদের কোম্পানী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম কিন্তু আপনাদের ক্ষতি হলো কোথেকে ?

মিঃ সেনগুপ্ত বললেন—ক্ষতি হয়নি ! আমরা এই প্রস্তাব বাজারে বের হবার আগে এই তিনটি কোম্পানীর মোটামুটি শেয়ার জলের দামে কিনে রাখতাম। তারপর প্রস্তাব পাশ হবার খবর বাজারে বের হলে যখন শেয়ারের দাম হু হু করে বেড়ে যাবে তখন সেগুলি বাজারে ছাড়তাম। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রস্তাব চুরি যাওয়ায় আগেই খবর রটে গেছে। ফলে লাভটা আমাদের কোম্পানীর একাউণ্টে না এসে, কতক গুলি চোরের পকেটে যাচ্ছে।

আমি বললাম—এতক্ষণে বুঝলাম, কিন্তু এর মধ্যে শেয়ারের দাম কি বাড়তে আরম্ভ করেছে ?

—অবশ্যই। এর মধ্যে শতকরা দশ টাকা বেড়ে গেছে। আপনি তিনদিনের মধ্যে চোরকে ধরতে না পারলে আমাদের প্রায় লাখ তিরিশ টাকার মতো ক্ষতি হবে।

—বুঝতে পারছি।

—আপনি কি আমার অফিস একবার তদন্ত করবেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—প্রয়োজন নেই।

—ডিরেক্টর মিটিংএর ঘরটা একবার···

—তারও প্রয়োজন নেই।

—তবে কি ভাবে তদন্ত করবেন

—সেটা পরে বলছি। আপাততঃ আর একটা প্রশ্ন। আপনি কি নিজের হাতে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটি সেফে রেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

- পরে সেফ ভাঙ্গা বা অন্য কোন ক্ষতি···

—না, তা হয়নি !

—খুব ভাল। আমি পরশুর মধ্যেই চোরকে গ্রেপ্তার করাতে সক্ষম হব মিঃ সেনগুপ্ত।

—ধন্যবাদ। আপনি সফল হলে আমরা আর আমার ডিরেক্টরেরা আপনাকে বিশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত মিঃ চ্যাটার্জী।

—ধন্যবাদ। আমি সে রকমই আশা করি।

* * *

সাধারণতঃ যে ধরণের পদ্ধতিতে গোয়েন্দারা তদন্ত করে থাকে আমার তদন্ত তার চেয়ে একটু ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করল। আমি চুরির জায়গা অথবা সেফের অবস্থা কিছু না দেখে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম শেয়ার মার্কেটে।

সেদিনই উপরোক্ত তিনটি মিলের অনেকগুলি শেয়ার কিনতে আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে একমাত্র একটি ছাড়া বাকি সব কটি শেয়ারই কিনলাম লায়ন্স রেঞ্জের পট্টভি এণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে।

ঘটনাটা আমাকে একটু চমকে দিল। যাহোক পরদিন শেয়ার মার্কেটে গিয়ে দেখি আমি যে শেয়ারগুলি কিনেছিলাম তার দাম বারো পার্সেণ্ট বেড়ে গেছে। আমি মোটা লাভে আমার ক্রীত শেয়ারগুলো বিক্রী করলাম।

সেদিনই বিকেলে মিঃ সেনগুপ্তের কাছ থেকে জরুরী ফোন এলো। তিনি জানালেন যে আমি আজ পর্যন্ত তদন্তে মাথা ঘামাচ্ছি না। তাঁর কোম্পানীর নানা বদনাম হচ্ছে। মোটা লোকসান বইতে হবে তাঁকে ইত্যাদি···

আমি তাঁকে অভয় দিয়ে জানালাম—পরদিন বেলা দশটার সময় আমার অফিসে এলেই আসল চোরকে ধরবার ব্যবস্থা করবো।

কথা শেষ করে আমি গেলাম লায়ন্স রেঞ্জে পট্টভি কোম্পানীর শেয়ার ব্রোকারীর অফিসে।

পাঁচতলার উপরে ছোট ঘর। সুন্দর আসবাব। মিঃ পট্টভি একজন প্রসিদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনার কি উপকারে লাগতে পারি স্যার ?

আমি বললাম—এই তিনটি কোম্পানীর যা শেয়ার আপনার কাছে আছে আমি সব কিনতে চাই।

—আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

—আমি একজন কোম্পানীর ব্রোকার।

—বেশ। কত পার্সেন্টেজ দিতে পারেন ?

আমরা আপনার শেয়ারের কারেন্ট মূল্যের উপরেও কুড়ি পার্সেন্ট দিতে প্রস্তুত।

—আপনার কোম্পানীর নাম ?

—কাল কিনবার সময় জানাব। কাল কটার সময় আমি শেয়ার-গুলো পাব ?

—কাল দশটায় আসবেন। আমি মিঃ সেনগুপ্তের সম্মতিটা নিয়ে নিই।

কথা না বাড়িয়ে আমি সোজা বেরিয়ে এলাম।

পরদিন বেলা দশটা।

মিঃ সেনগুপ্ত আমার অফিসে প্রবেশ করে বললেন—কই, কোথায় আপনার চোর মিঃ চ্যাটার্জী ?

আমি হেসে বললাম—কথাটা অপ্রিয় হয়ে যায় মিঃ সেনগুপ্ত।

—কেন।

—চোর আমার সামনে।

—মানে আমি ?

—হ্যাঁ, আপনার এজেন্ট পট্টভি এণ্ড কোম্পানী ত তাই বলে।

—কি করে জানলেন আপনি ?

—আমি আগেই বলেছিলাম, এক্ষেত্রে তদন্তটা হবে একটু অন্য প্রকারের। আপনিই প্রস্তাবের আসল কপিটা লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে সব লাভটা কোম্পানীর না হয়ে কিছুটা আপনার পকেটে যায়।

—কিন্তু আমার মতো একজন মিলিওনেয়ার যে একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে এ সন্দেহ আপনার হলো কি করে মিঃ চ্যাটার্জী ?

—টাকাটা একটা নেশার মতো। ওটার লোভও তাই আপেক্ষিক। তাই কাউকেই আমি সন্দেহ থেকে বাদ দিইনি।

—খুব ভাল। আশা করি কথাটা চাপা থাকবে। এই নিন আপনার প্রাপ্য বিশ হাজার আর গোপনীয়তার জন্য আরও দশ হাজার।

ত্রিশ হাজার টাকার একখানা চেক লিখে দিয়ে মিঃ সেনগুপ্ত তাঁর কারে গিয়ে উঠলেন। ওঠার ঠিক আগে একবার মুখ বাড়িয়ে শুধু বললেন—আপনার ট্যালেন্ট আর একবার স্বীকার করলাম মিঃ চ্যাটার্জী।

সমাপ্ত

এর পরের ঘটনা জানতে হ'লে 'নীলসমুদ্রে বাজপাখি' পড়ুন।

নীল সমুদ্রে

বাজপাখি সিরিজ—৮নং

নীলসমুদ্রে বাজপাখি

শ্রীস্বপনকুমার

॥ এক ॥

অমাবস্যার নিকট কালো আঁধারের ওপরে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের কালিমা। আকাশ অন্ধকার। অন্ধকার পৃথিবী।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

ঝলসে উঠল পৃথিবী সে আলোকের উজ্জ্বলতায়।

হ্যাঁ, ওই সেই লোক। মনে মনে ভাবল দীপক চাটার্জী। দস্যু বাজপাখির সহকারী শয়তান রশীদ।

—আত্মসমর্পণ কর শয়তান! মুহূর্তের দেরী করলেও তোমার বুকে প্রবেশ করবে আমার উত্তপ্ত বুলেট।

রিভলভারটা তুলে ধরল দীপক লোকটার কপাল লক্ষ্য করে।

লোকটা না নড়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন জমাট অন্ধকারের একটা পুঞ্জ। বহুদূর থেকে অনুসরণ করে এতক্ষণে সফল হয়েছে দীপক। এবার রশীদকে লক্-আপে পুরতে পারলেই বাজপাখির সন্ধান বের করতে দেরী হবে না তার।

আর এক ঝলক বিদ্যুতের আলো।

কিন্তু একি? এ তো রশীদ নয়। এ যে বাজপাখি স্বয়ং। সেই চেহারা। সেই মুখোশ। সেই দীর্ঘ দেহ। প্রখ্যাত দস্যু সর্দার বাজপাখি দাঁড়িয়ে তার সামনে।

দীপকের হৃদয় যেন আনন্দোন্মত্ত নৃত্য করে উঠল। সত্যি কি সে সফল হয়েছে বাজপাখিকে গ্রেপ্তার করতে?

—বাজপাখি আত্মসমর্পণ কর। এখনও বলছি—

দুম্!

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

একটা সাদা বল এসে ঠিক্‌রে পড়ল মাটির ওপরে।

'গুড়ুম! গুলী ছুঁড়ল দীপক। ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। স্মোক বম্‌।

ধোঁয়া সরে গেল।

বাজপাখি নেই। নিঃসীম আঁধার যেন তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে।

*   *   *   *

কোলকাতা শহরে সবেমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে……

ইদানীং মাল বোঝাই ষ্টিমার ও নৌকা থেকে বেজায় চুরি হচ্ছে, কিন্তু পোর্ট পুলিশ আজ পর্যন্ত এসব চুরির কোনও কিনারা করতে পারছে না।

বিরক্ত হয়ে পোর্ট পুলিশের প্রধান কর্মচারী মিঃ কার্টার সাহেব স্বয়ং লঞ্চে করে তদন্তে বেরিয়েছেন, সঙ্গে সুবিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী ও সাত-আটজন বলিষ্ঠ সশস্ত্র পটু কনষ্টেবল।

মিঃ কার্টার গম্ভীর ভাবে বললেন, দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী, যদিও ব্যাপারটা আপনাকে বিরক্ত করবার মত গুরুতর নয়, তবু আপনি যদি এ বিষয়ে সাহায্য করেন ত সুখী হব। এ পর্যন্ত অনেক জাহাজ ও নৌকা খানাতল্লাসী করে দেখা গেল, কিন্তু চোরাই-মালের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

মিঃ দীপক চ্যাটার্জী কপাল কুঁচকে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলেন—এ রকম প্রকাশ্য তদন্তে বিশেষ ফললাভ হবে বলে আমার বোধ হয় না; কারণ, খুব সম্ভব অপরাধীরা আপনাকে, আর পুলিশের কর্তা আপনি নিজে সদরে বেরিয়েছেন জানলে সকলেই সাবধান হবে। তার চেয়ে আমার মনে হয়, আপনার অধীনস্থ কোন বিচক্ষণ কর্মচারীকে গুপ্তভাবে এ বিষয়ে তদন্তের আদেশ দিলে সুফল হবে। আমার বিশ্বাস, ভালরকম চেষ্টা হ'লে পোর্ট পুলিশই এই চুরির কিনারা করতে পারবে, আমার

সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। যদি একান্ত আমার সাহায্যের আবশ্যক হয় তাহ'লে—ও কী ?

মিঃ চাটার্জীর দৃষ্টিটা ঠিকরে পড়ল দূরে স্রোতে ভাসমান একটা কি বস্তুর উপর। দীপক চাটার্জী বলল—দেখুন তো—অঙ্গুলী নিক্ষেপ করে দেখিয়ে দিল মিঃ কার্টারকে।

চোখে মনোকলটা লাগিয়ে মিঃ কার্টার বললেন—হ্যাঁ, কি যেন একটা—

কথাটা শেষ হবার আগেই দূরে স্রোতে-ভাসমান একটা জিনিষের দিকে মিঃ দীপক চ্যাটার্জী মিঃ কার্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মিঃ কার্টার দেখলেন, একটা ছ'ফিট্ মোটা তক্তার খণ্ড অবলম্বন ক'রে এক নরদেহ। জীবিত কি মৃত বোঝা যায় না। মিঃ কার্টার দ্রুত লঞ্চ চালাতে আদেশ দিলেন।

অল্পক্ষণ পরে লঞ্চটি তক্তাটির কাছে আসতেই দেখা গেল একটি নরদেহ। দু'জন কনষ্টেবল সেটা ধরে তুলে ফেলল।

মিঃ দীপক চাটার্জী পরীক্ষা করে বলল—না এখনো বেঁচে আছে, আমি এর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করছি। মিঃ কার্টার একে থানায় নিয়ে চলুন, কি জানি এর জীবনে কি রহস্য লুকানো আছে ?

মিঃ কার্টার হেড কোয়ার্টারের কাছে লঞ্চ ভিড়তে আদেশ করলেন। পোর্ট পুলিশের হেড কোয়ার্টারের এক আলো ও বাতাসযুক্ত ঘরে মূর্চ্ছিত দেহটিকে নিয়ে গিয়ে শোয়ান হ'ল।

মিঃ দীপক চাটার্জী মিঃ কার্টারকে একজন ডাক্তার ডাকতে অনুরোধ করে মূর্চ্ছিত লোকটিকে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

লোকটির বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হতে পারে। মাথার চুলগুলি খুব ঘন কোঁকড়ানো, বাঁ-হাতের কোণে বিরাট জড়ুলের ছাপ। আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বস্তু আছে—সেটি হচ্ছে মুখে রুমাল বাঁধা। তার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে যেন একটা দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে।

দুঃখ-দৈন্যে নিষ্পেষিত হলেও তার মুখের উপর থেকে বিগত আভিজাত্যের ছাপ একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। রুমালটা মুখ থেকে খুলে দিল। জলমগ্ন ব্যক্তির জ্ঞান-সঞ্চারের যে সমস্ত প্রক্রিয়া মিঃ দীপক চ্যাটার্জীর জানা ছিল, সেগুলি প্রয়োগ করতেই লোকটির ঈষৎ জ্ঞান ফিরে এল।

সে মিঃ দীপক চ্যাটার্জীর দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে অস্পষ্টস্বরে—দীপকবাবু—এই বলে পুনরায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

মিঃ কার্টার বিস্মিত হয়ে মিঃ দীপক চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে এ চেনে বলে বোধ হচ্ছে, আপনি একে চেনেন নাকি?

মিঃ দীপক চ্যাটার্জী ভ্রূ কুঁচকে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—ঠিক বুঝতে পারছি না। এর আগে বোধ হয় কোথাও দেখেছি। সম্ভবতঃ আগে যখন একে দেখেছিলাম তখন এর এরকম একমুখ দাড়ি-গোঁফ ছিল না।

বাঁ-হাতে ঔষধের বাক্সটা আর ডানহাতে স্টেথিস্কোপ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ নীহার সেন। টেবিলের উপর জিনিষগুলো রেখে নীচু হয়ে বসে পরীক্ষা করে একটা ইন্‌জেকশন্ দিয়ে বললেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। না খেতে পেয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জ্ঞান আসবে। ভালরকম খাদ্য পেলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

মিঃ কার্টার হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন—এর দাড়ি-গোঁফগুলো কামিয়ে দিলে কেমন হয়?

ডাক্তার নীহার সেন ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে করতে হেসে রসিকতা করে ডিটেক্‌টিভ মিঃ দীপক চ্যাটার্জীর দিকে চেয়ে বললেন—ক্ষতি কি? যদি ও সেরে উঠে নালিশ করে, আপনাদের বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তা'ছাড়া এতে ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে। নীহার সেন সরকারী ডাক্তার। ডাক্তারী বিদ্যার চেয়েও মিষ্টি হল ওঁর কথাবার্তা। রোগীকে কখনও জানতে দেয় না যে সে রোগে ভুগছে। এত সুন্দর তার Treatment.

ডাক্তার নীহার সেন চলে যাবার পর রোগীর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দেওয়া হ'ল। মিঃ দীপক চ্যাটার্জীর চোখ হীরের মতন জ্বলে উঠল, আশ্চর্য, মুখটা তার বিশেষ পরিচিত, কিন্তু কিছুতেই সে মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে তাকে।

মিঃ কার্টার ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে এসে দীপক চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—চিনতে পারলেন নাকি?

রোগীর কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়ে দীপক চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে আবার ভয় ভয় চোখ বুজলো। ব্রাণ্ডির সঙ্গে এক কাপ গরম দুধ খাইয়ে দেবার পর রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল।

মিঃ দীপক চ্যাটার্জী মুখ নীচু করে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি আমাকে চেনেন?

লোকটা ঘোলাটে চোখ দু'টি দিয়ে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আমার গত জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে পরিচয় দেবার মত আমার কিছু নেই।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দীপক চ্যাটার্জী বলল—আপনি নির্ভয়ে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিন।

লোকটি মুখ টিপে একবার হাসল। তারপর বলল—আপনাকে সমস্তই বলব। এক কালে আমার নাম ছিল ডাঃ প্রণব সেন এম-বি কিন্তু এখন···

দীপক চ্যাটার্জীর মনের উপর থেকে সহসা বিস্মৃতির যবনিকা সরে গেল। সে বলল—ডাঃ সেন! আপনিই না ৪'৫ বছর আগে একটা উইল-সংক্রান্ত কেসে আসামী ছিলেন?

ডাঃ সেন বললেন—আজ্ঞে হাঁ, সেই কেসেই আমি তিন বছরের জন্য জেলে যাই আর সরকার থেকে আমার ডাক্তারী পাশ করার উপাধিটা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করবেন, আমি প্রকৃত দোষী ছিলাম না? জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এখন পর্যন্ত কোনরকম বে-আইনী কাজ করিনি আর সেই জন্যেই আমার আজ এই দুর্দশা।

গম্ভীর হয়ে দীপক চ্যাটার্জী সব শুনছিল। তারপর এ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরো অংশটা ফেলে আর একটি ধরিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমার এখন বেশ মনে পড়ছে। আপনি নয়নপুরের জমিদারের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো কাকাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার অপরাধে আর আপনি তাঁর সহায়তা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। ভাইপোটির ফাঁসি হয়। আপনার তিন বছর সশ্রম জেল। আমি যদিও প্রত্যক্ষভাবে সে কেসের তদ্বির করিনি, তবুও আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, আপনি নির্দোষী এবং আমারই পরামর্শে আপনার বিরুদ্ধে আরেকটি চার্জ পরিত্যক্ত হয়, হয়ত দণ্ড আরো বেশী হ'ত। আমার মনে হয়, আপনার সারল্যের সুযোগ নিয়ে কু-চক্রী লোকে আপনাকে ঐ কেসে জড়িত করেছিল।

ডাঃ সেন কোন রকমে উঠে বসলেন। হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে দীপক চ্যাটার্জীকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। জগৎ শুদ্ধ লোক আমাকে অপরাধী বলে জেনেছে। আজ আর আমার পূর্বের মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, মর্যাদা, কিছু নেই। বোধ হয়, একমাত্র আপনি আমার নির্দোষিতায় বিশ্বাসী।···বহুকাল পরে আপনার মুখে 'ডাঃ সেন' এই সম্মানজনক আহ্বান শুনলুম। কিন্তু হায়! আমি আজ সে অধিকার হারিয়েছি।

দীপক চ্যাটার্জী আরাম করে একটা সিগারেটে টান দিয়ে বলল—কিছুই হারায় নি। যেহেতু জেল থেকে ফিরেও আপনি মনুষ্যত্ব হারান নি। আমি আপনাকে আপনার লুপ্ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করব; আপনার কপাল থেকে অপরাধের গ্লানি মুছে দেবো। কিন্তু আপনি সত্য করে বলুন দেখি, আমরা আপনাকে গঙ্গাবক্ষে এভাবে পেলুম কেন?

ডাঃ প্রণব সেন বললেন—আমি আপনাকে সমস্তই বলছি।

॥ দুই ॥

আরেকবার দুধটুকু খেয়ে নিন—বলল দীপক চ্যাটার্জী।

আরেকবার ব্রাণ্ডি মেশানো ঈষদুষ্ণ দুধ পান করার পর ডাঃ সেন বলতে আরম্ভ করলেন :

জেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, আমি একান্ত নিরাশ্রয়। এই সংসারে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। তার ওপর সরকার বাহাদুর উপাধি থেকে বঞ্চিত করাতে ভদ্রভাবে জীবন নির্বাহ করবার আমার একমাত্র উপায়ও বন্ধ। কোন উপায়ে বৌ-বাজারের এক খারাপ ঘরে মাথা গুঁজে থাকবার একটু জায়গা জোগাড় করে, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলুম।

"বৌ-বাজারের বস্তিতে মানবেন্দ্র মিত্র নামে একজন লোক বাস করত। তার সঙ্গে জেলে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা হলে সে প্রায়ই বলত, দেখুন, আপনি ভদ্রলোক হয়ে কেন এত কষ্ট করে থাকবেন? আমাদের দলে আসুন, পয়সার অভাব হবে না, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।

আমি তাদের কার্যকলাপের বিশেষ খোঁজ না রাখলেও এই পর্যন্ত জানতুম যে তারা নানা প্রকার বে-আইনী কাজে লিপ্ত। সুতরাং তার প্রস্তাব আমি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলুম।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

কাল হঠাৎ সন্ধ্যার পর মানবেন্দ্র এসে আমায় বললে—আচ্ছা আপনি তো একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার।

আমি বললুম—হ্যাঁ, এককালে ছিলুম বটে।

মানবেন্দ্র বিড়িতে জোরে টান দিয়ে বলল—এককালে কেন, এখনও

আছেন। সরকার আপনার খেতাব কেড়ে নিয়েছে, বিদ্যে ত' আর কেড়ে নিতে পারেনি। যাক আমার সঙ্গে আসুন, আপনার কিছু পাবার ব্যবস্থা করে দেবো—যে অবস্থায় পড়েছেন হয়ত কিছু দিন ভাল যাবে।

এই বলে সে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরের রাস্তার একটা মোটরে এনে তুললো।

আমি সেদিন কিছুই উপার্জন করতে পারিনি, সমস্ত দিন অনাহারেই ছিলুম। ভাবলুম যদি কিছু আসে ত মন্দ' কি।

মানবেন্দ্র টেনে নিয়ে যেতে আমি অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত গিয়ে ষ্টার্ট দেওয়া মোটরে উঠলুম। হয়ত বা দুঃখ-কষ্টে মনের মধ্যে একটা প্রলোভনের উদয়ও হয়ে থাকে।

সেদিকে গলির মোড়ের গ্যাস লাইটটা জ্বলেনি, মোটরটা অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে আমি কিছু ঠাওর করতে পারিনি। উঠে দেখি, মোটরে দু'জন গুণ্ডার মত চেহারার লোক বসে আছে, কিন্তু আলো-বিবর্জিত তাদের ঠিক ভাল করে দেখা গেল না।

তাদের একজনকে মানবেন্দ্র আমার পরিচয় দিয়ে বলল—ইনি বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বাজপাখি, আর ইনিই ডাঃ প্রণব সেন।

বাজপাখি বিকৃত এক হাসি হেসে বলল—ভালই হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার মাপ করবেন, আপনাকে একটু অসুবিধা ভোগ করতে হ'ল। এই বলে সে একটা রুমাল চট করে পকেট থেকে বের করে আমার চোখ বেঁধে দিল। আমি আপত্তি করার আগেই আমার কপালে কি একটা ঠাণ্ডা বস্তু ঠেকল। হাত দিতেই দেখি একটা নল। বেশ বুঝলুম, সেটা একটা পিস্তল। আমার সর্বশরীর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। শরীরের ভেতর দিয়ে উষ্ণ ভাব বেরুতে লাগল। ঘামে সর্বশরীর ভিজে গেল। একান্ত নিরুপায় হয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

নানান রাস্তা ঘুরে মোটর উল্কা গতিতে ছুট্‌তে লাগল। তাদের এরকম করার কি উদ্দেশ্য বুঝতে পারলুম না। এবং কোথায় নিয়ে চলেছে, ভেবে

দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলুম। দস্যু বাজপাখির কবলে শেষ পর্যন্ত পড়তে হল !

যেখানে এসে গাড়ি থামল মনে করলুম প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হ'ল।

দুজনে আমার দু'হাত ধরে নামিয়ে নিলে। গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে ঘুরে চলে গেল। প্রায় একশো গজ হেঁটে যাবার পর এদের মধ্যে একজন বলল —এইবার সিঁড়ি আছে, সাবধানে ওঠো।

প্রায় ছ'টা ধাপ উঠে মনে হ'ল যেন একটা ভাঙা স্যাঁতসেঁতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকছি তারপর অনুভব করলুম, যেন একটা দালানের ওপর দিয়ে তারা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।

খানিকটা নিয়ে যাবার পর তারা বলল—এখানে সিঁড়ি আছে, ওপর তলায় যেতে হবে।

পরে ধাপে ধাপে উঠে মনে হল, তেতলায় এসেছি।

সেখান থেকে তারা আমায় একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘর বন্ধ করে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে চোখের রুমালটা খুলে দিলে। চোখটা একবার ভাল করে ঘষে নিয়ে দেখি, মানবেন্দ্র নেই। কেবল সেই দস্যু বাজপাখি ও তার সঙ্গীটি সেখানে রয়েছে। চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে আগুন আর কপালে দেখা দিয়েছে ঘাম।

এইবার ভালো করে তাকিয়ে দেখি আলোতে, বাজপাখি লোকটি গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় ও বেশ সুপুরুষ। তার বেশভূষাও সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মত। কিন্তু তার সঙ্গীটি দেখতে ঠিক এপ্‌ম্যান, যাকে বলে গরিলার মত কদাকার। তার চোখে মুখে এক পৈশাচিক ভাব মাখানো।

বাজপাখি আমাকে ভদ্রভাবে বলল—ডাক্তার, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হলুম, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে একজন রোগী দেখবার জন্যে আনা হয়েছে। এজন্য আপনাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

আমি এরকম ভাব দেখে মনে ভয় পেলেও মুখে সাহস ফুটিয়ে বললুম—রোগী কোথায় ?

বাজপাখি বলল—আসুন। এই বলে সে সেই ঘরের মধ্য দিয়ে তার পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা আকারে কিছু ছোট। দরজা জানালা বলতে কিছুই নেই। প্রবেশ এবং বেরোবার পথ এই ঘরের মধ্য দিয়েই। টিম্ টিম্ করে জ্বলছে টর্চের বাতিটা, এবং সেখানে দেখলুম, অতি বলবান ও দীর্ঘকায় একটি লোক বিছানার ওপর শুয়ে ছাগল কাটার মত কাতরাচ্ছে।

বাজপাখি বলল—এই আপনার রোগী।

ঘরের এই atmosphere দেখে এবং পেসেণ্ট দেখেই আমার মধ্যে সুপ্ত চিকিৎসকের মন সাড়া দিয়ে উঠল। আমি মন থেকে অন্য চিন্তা দূর করে শীঘ্র গিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলুম, তার হাতের চেটোর প্রায় সবটা কোন দাহ্য পদার্থ বা এ্যাসিডে পুড়ে গেছে। রোগীর অবস্থা এবং ঘর দেখে আমি বললুম—এ ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে খোলা জায়গায় রাখতে হবে আর শীঘ্রই এর হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হবে, নয়ত সমস্ত শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য।

বাজপাখি এই কথা শুনে, একবার তার সঙ্গীর সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। রোগীর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ স্বরে বললে—শুনলে ত' কালাচাঁদ ? এখন কি করা যায় ?

কালাচাঁদ ওরফে কালু যন্ত্রণায় একবার ঠোঁট কামড়ে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলে—যা করবার শীঘ্র করে কেল।

তখন বাজপাখির আদেশে তার অনুচর একটা চামড়ার বাক্স এনে দিল।

বাজপাখি বলল—আর দেরী করবেন না, এর মধ্যে সমস্ত ডাক্তারী যন্ত্রই পাবেন।

আমি দেখে আশ্চর্য হলুম যে, ব্যাগটার মধ্যে নানারকম ডাক্তারী যন্ত্রপাতি আছে। দরকারী যন্ত্রগুলো বের করতে গিয়ে আমার মনে হ'ল, একাজ করা আমার আইন-সঙ্গত নয়। কারণ, আমার ডাক্তারী উপাধি নেই, আর যদি রোগী এই অস্ত্রের পর মারা যায়, তাহলে আইন-বিরোধী কাজ করায় আমায় আবার পুলিশের হাতকড়া পরে হাজত বাস করতে হবে।

আমি শান্তকণ্ঠে বাজপাখিকে বললুম, দেখুন আপনারা অন্য একজন ডাক্তার ডাকুন, আমি অন্য রকমে সাহায্য করতে পারব, কিন্তু অস্ত্র ধরতে পারব না।

বাজপাখি হো-হো করে হেসে উঠল।

পুনরায় হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে কর্কশ-কণ্ঠে বাজপাখি বলল—সেকি! অন্য ডাক্তার ডাকবার হলে এত কষ্ট করে আপনাকে নিয়ে আসার দরকার ছিল না! এ কাজ আপনাকে করতেই হবে।

হঠাৎ আমার মনে হল, সম্ভবতঃ এরা কোন বে-আইনী কাজ করেছে, সেই জন্যেই রেজিষ্টার্ড ডাক্তার ডাকতে সাহস করছে না।

আমার আর দ্বিধা রইল না। কণ্ঠে সাহসের জোর রেখেই দৃঢ়ভাবে বললুম —আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

যন্ত্রপাতিগুলোকে টেবিলের ওপরে সরিয়ে রেখে আমি বাজপাখির কাছে হাত জোড় করে কত কাকুতি মিনতি করে বললুম, আমি এ কাজ করতে পারব না। আমাকে মুক্তি দিন, মুক্তি দিন।

বাজপাখি রেগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। আমাকে সে অনেক অনুরোধ উপরোধ করল। কিন্তু কিছুতেই আমি রাজী না হওয়াতে চোখ দুটি ক্ষুধার্ত শিকারীর মত জ্বলে উঠল। শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাণীর মত চিৎকার করে উঠল, শেষবার বলছি ডাক্তার—আমার কথা রাখো—

আমি তখন দৃঢ়ভাবে বললুম—না। আমার দ্বারা হতে পারে না। বে-আইনী কাজ করতে পারবো না।

তার সুন্দর মুখ এক পৈশাচিক দীপ্তিতে বিকৃত হয়ে গেল। সে মাটিতে

সবুট পদাঘাত করে তার অনুচরকে বললে—হীরু, এটাকে ভাল রকম শিক্ষা দিয়ে দে—

হীরু এগিয়ে এসে আমাকে হাত ধরে চুপি চুপি বলল—ডাক্তার সাহেব, কর না, তোমার কিছু ক্ষতি হবে না, মোটা টাকা পাবে—আর যদি না কর—এর শাস্তি ভীষণ, মানে মৃত্যু।

আমার সর্বশরীর বেতসপত্রের মত থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ছে। দৃঢ়কণ্ঠেই জবাব দিলাম, হীরু, এ আমার দ্বারা হতে পারে না। এর যা শাস্তি আমাকে ভোগ করতেই হবে।

এখনো সময় আছে ডাক্তার—বলল বাজপাখি।

—না।

হীরু দেরী ক'রো না, একে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবে।

হীরু তখন আমাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে সিঁড়ি থেকে হিড়-হিড় করে টানতে লাগল নিচে। একতলায় একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিতেই আমি ছিট্‌কে পড়লাম দেওয়ালে। হীরু সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট হতে লাগল। হাওয়া বাতাস মোটেই নেই। তারপর দু'দিন পেটে দানাপানি কিছু পড়ে নি—শরীর একেবারে দুর্বল। কখন জ্ঞান হারালাম মনে নেই।

তারপর কি হয়েছিল জানি না। পরে আপনি আমায় গঙ্গাবক্ষ থেকে উদ্ধার করেন।

॥ তিন ॥

ডাঃ সেনের করুণ কাহিনী শুনে স্তম্ভিত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী বলল—মিঃ কার্টার, জানি না আবার কোন গুণ্ডার দল অন্ধকারের অন্তরালে কি শয়তানি মতলব ফাঁদছে।

মিঃ কার্টার গম্ভীর-কণ্ঠে বললেন—হুঁ।

দীপক চ্যাটার্জী ডাঃ সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—আমাকে এ রহস্য ভেদ করতেই হবে। ডাঃ সেন, এ বিষয়ে আপনার কি সাহায্যের আশা করতে পারি।

ডাঃ সেন শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন। আপনার কোন কাজে আসতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করব।

দীপক চ্যাটার্জী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা মুখে ধরিয়ে বলল—ডাঃ সেন, যদি কিছু না মনে করেন, আমি বন্ধুভাবে আপনার সমস্ত ভার নিতে চাই। আপনি উপস্থিত বড় দুর্বল, চলুন আমার বাড়ীতে, সেখানে গৃহকর্ত্রী রমার তত্ত্বাবধানে আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ডাঃ সেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

দীপক চ্যাটার্জী, মিঃ কার্টারের নিকট বিদায় নিয়ে ডাঃ সেনকে সঙ্গে করে নিজের টু সিটার কারে গিয়ে উঠল।

গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলল।

আগের রাত্রে দীপক চ্যাটার্জী বাড়ি ফেরে নি। রমা ও রতনলাল সেদিন প্রাতে চায়ের টেবিলে দীপক চ্যাটার্জীর জন্য প্রতীক্ষা করছিল। এমন সময় ডাঃ সেনকে নিয়ে ঝড়ের মত প্রবেশ করল ব্যালকনিতে। ডাঃ সেন এসব দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল।

দীপক চ্যাটার্জী ডাঃ সেনকে রমা ও রত্নলালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল এবং সংক্ষেপে ডাঃ সেনের কাহিনী বর্ণনা করল। তারপর হাসতে হাসতে বিশেষ করে বললে—ডাঃ সেন এখন অসুস্থ, তাঁর ভার তোমাকে দিলুম।

রমা চেয়ার ছেড়ে ডাঃ সেনকে এমার্জেন্সি রুমে নিয়ে গিয়ে আদেশ করল —আজ থেকে আপনি আমার রোগী, আর আপনার নার্স হচ্ছি আমি। যা বলব তা করবেন। কেমন? শুয়ে পড়ুন। চা এনে দিচ্ছি।

ডাঃ সেন লজ্জিত হয়ে বলল—না—না, কেন আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করবেন?

—তা হয় না ডাঃ সেন। দীপকদার অনুরোধে সবকিছু আমাদের করতে হবে।

রমা অবিলম্বে ডাঃ সেনের পরিচর্যায় নিযুক্ত হ'ল।

। চার।

দীপক চাটার্জী ওভালটিন্ খেতে খেতে সেদিন সকালের বিশ্ববার্তা খবরের কাগজে হঠাৎ দেখতে পেলো এক জায়গায় বড় বড় হরফে লেখা।

পৈশাচিক হত্যা

গতকল্য রাত্রি ১২টার সময় জনৈক সার্জেন্ট কার্জন পার্কের একটা বেঞ্চে এক মৃতদেহ দেখতে পায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি সেখানে ছিল না। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, লোকটাকে গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। মৃতদেহ সনাক্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, নিহত ব্যক্তি মিণ্টে কাজ করিত। হত্যাকারী ধরা পড়ে নাই বা হত্যার কারণ জানা যায় নাই। তবে পুলিশ এক মূল্যবান সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। নিহত ব্যক্তির গলায় হত্যাকারীর তিনটি আঙ্গুলের সুস্পষ্ট ছাপ আছে, যাহা পুলিশ কোর্টের পুরাতন পাপীদিগের হাতের ছাপের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সহজ হইবে এবং আরও একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমে মারপিট হয়, তাতে বোঝা যায়, আততায়ী এক ঘুঁষিতে নিহত ব্যক্তিকে কাবু ক'রে, তারপর তাকে গলা টিপে হত্যা করে। চোয়াল কেটে রক্ত পড়তে থাকে। এখনও পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ধরা পড়ে নাই—জোর তদন্ত চলিতেছে।

*　　　*　　　*

চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে চিন্তিত হয়ে পড়ে দীপক চাটার্জী। এই ঘটনা পড়ে হঠাৎ একটা কথা তার মনে বিদ্যুতের আলোর মত উদয় হ'ল। ডাঃ সেনের বিবৃতির সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্বন্ধ নেই তো? দেখা যায় দীপক চ্যাটার্জী চিন্তার সাথে সাথে সিগারেটের পর সিগারেট উড়িয়ে যায়। এই ঘটনার আততায়ী কে? মনে মনে অনুমান করল, কাঁলাচাঁদ নয় ত? হ্যাঁ কাঁলাচাঁদই

হত্যাকারী। পুলিশের আবিষ্কৃত সূত্র নষ্ট করবার জন্য সে স্বেচ্ছায় নিজের হাতের চেটো অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল। সে ফাঁসী-কাঠ থেকে নিষ্কৃতি পাবে ভেবেছিল ; কিন্তু দৈব বিরূপ। সেইজন্য এরূপ করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়—অর্থাৎ প্রাণসংশয় হল। তখন বাধ্য হয়ে বাজপাখির দলের মানবেন্দ্রকে বৌবাজার থেকে ডাঃ সেনের শরণাপন্ন হতে হ'ল।

লম্বা-চওড়া সুঠামদেহী যে লোকটি দীপকের সামনে বসেছিল সে হ'ল রতনলাল।

দীপক তার সহকারীকে অর্থাৎ রতনলালকে তার সন্দেহের কথা খুলে বলল।

রতনলাল সমস্ত অবগত হয়ে স্বীকার করল যে, দীপকের সন্দেহের যথার্থ কারণ আছে।

রতনলাল একটিপ্ নস্য নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল—এখন কি করবে দীপক ?

দীপক চ্যাটার্জী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল—ডাঃ সেন সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, আমার এখন কর্তব্য ডাঃ সেনের সাহায্যে সেই বাড়িটার খোঁজ করে পুলিশ নিয়ে গিয়ে সেই নৃশংস দুর্বৃত্তদের প্রথমে গ্রেপ্তার করা। সুতরাং দু'চারদিন অপেক্ষা করতেই হবে। পরে যদি পুলিশ অফিসের নজির থেকে হত্যাকারী সনাক্ত হয় ত' সে আলাদা কথা।

নস্যিটা নাকে চেপে নিয়ে রতনলাল জিজ্ঞাসা করল—তোমার কি মনে হয় পুলিশ আঙুলের ছাপ থেকে হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পারবে ? আর তাছাড়া—

—আর তাছাড়া ? আর কি ?

—আর কি ? চোয়ালের রক্ত জমাটের ওপর আংটির নামের যে ছাপ পড়েছে—সেটার কি হবে ?

হবে আর কি ? ধরা পড়বে—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে মারপিট করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

—নিহত লোকটি হয়ত বাঁচবার জন্য চেষ্টা করেছিল।

—হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে। কিন্তু ঐ লোক যে গলা টিপ্‌ছে এও তো না হতে পারে। হয়ত দু'জন লোকের দ্বারা সম্ভব হতে পারে।

—হুঁ, তাও হতে পারে। খবরের কাগজটার ওপর আর একবার ঝুঁকে পড়ল রতনলাল।

খানিক পরে রতনলাল বলল,—এই ব্যক্তির দ্বারা যে দুটো কাজ হয়েছে তা' তো লিখছে না। লিখলেও আংটির যে নামের আদি অক্ষরের ছাপ পড়েছে, তাও তো লিখতো।

দীপক চাটার্জী বলল—লেখেনি সেটা?

—না।

দীপক চাটার্জী বলল—সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ নানা কারণে আমার মনে হয় এই দুর্বৃত্তদল গড়ে উঠেছে। ওদের মধ্যে খুব কম লোকই ধরা পড়েছে। সুতরাং পুলিশ অফিসে যে সকল আঙুলের ছাপ আছে তা থেকে এদের ধরা যাবে না।

দীপক চাটার্জী সিগারেটের পোড়া অংশটুকু মেঝের ফেলে বুটের তলায় পিষে উঠে দাঁড়াল। ঘর পেরিয়ে উত্তর দিকের ব্যালকানিতে গিয়ে ত্রিপায়ের ওপর থেকে রিসিভারটা তুলে লালবাজারে ফোন করতেই ডেপুটি কমিশনার মিঃ উইলিয়াম্‌স্ বড় দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ লালবাজারে নেই। সুতরাং এই খুনের তদন্তের জন্য তিনি প্রাইভেট গোয়েন্দা দীপক চাটার্জীর সাহায্য চান। দীপক সম্মতি জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দিল।

ব্যালকানি থেকে বেরিয়ে পূর্ব ব্যালকানিতে গিয়ে সহকারী রতনলালকে টেলিফোনের মর্ম জানিয়ে দীপক বলল,—আমিও একটা এই রকম কিছু ভাবছিলুম। কিন্তু একটা কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, এই হত্যার উদ্দেশ্য কী? যতদূর জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির কিছু অপহৃত হয়নি, সুতরাং চুরি

এর উদ্দেশ্য নয়। ষ্টিভেনশন্ কোম্পানীর মালিককে, রামদাস মতিলাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, আর মিণ্টের কর্মচারীকেই বা হত্যা করবে কেন ? যাক, যখন আর উপায় নেই, তখন আজকের দিনটাই বৃথায় গেল। আশা করা যায়—

—হ্যালো রমা, তোমার পেসেণ্ট কেমন আছে ? কতদিন আর লাগবে ? হাস্তে হাস্তে বলল দীপক চ্যাটার্জী।

রমা কৌতুক-চোখ ছ'টিকে রতনলালের দিকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—আপনার যত সব বাজে কাজ। রাস্তা থেকে লোক ধরে নিয়ে আসবেন—আর আমাকে করতে হবে সেবা ? এটাই আমার শেষ। এলুম একটু তদন্ত করবো বলে—তা না, একটার পর একটা কাজে এন্‌গেজ্‌ড্ করে রাখবেন।

দীপক হাস্তে হাস্তে বলল—নারীরা সেবার জন্যেই তো।

—হ্যাঁ, সেবাই করে যাবো। রমা বসল রতনলালের পাশের চেয়ারে। একটা সেফ্‌টিপিন্ রতনলালের গায়ে ফোটাতেই রতনলাল ধমক দিয়ে বলে উঠল,—কি হচ্ছে রমা দেবী ?

মনোনিবেশ দিয়ে কি দেখছেন ? গোয়েন্দা হয়ে গেলেন দেখছি। আমি এসেছি, কই বসতে তো বললেন না ?

—বসুন। রতনলালের দৃষ্টি তখনো খবরের কাগজের অংশটার দিকে।

দীপক রতনলালকে বলল, আশা করা যায় কাল ডাঃ সেন অনেক সুস্থ হয়ে উঠবেন, তখন তাঁর কাছ থেকে বাড়িটা সম্বন্ধে সবিশেষ জেনে আমাদের অনুসন্ধান শুরু করতে হবে।

—ধরুন। ছ'টি চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় রমা।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন সকাল···

ব্যালকানিতে বসে দীপক চ্যাটার্জী আর রতনলাল।

চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে দীপক রতনলালকে বলল—আজকে ডাঃ সেনের কাছে সমস্ত বিবরণটা শুনে সেই মত কাজ করতে হবে।

রতনলাল বলল,—ডাঃ সেন কই, এখনও পর্যন্ত চায়ের আসরে এলেন না দেখছি। সত্যি রমা সেবা করতে পারে।

মেঘ না চাইতেই জল।

রমার পিছনে পিছনে ডাঃ সেন হাসতে হাসতে দীপক চ্যাটার্জীর পাশের বেতের মোড়াটায় বসলেন।

রমা চায়ের কেটলীটা নিয়ে চা ঢালতে ঢালতে দীপককে উদ্দেশ্য করে বলল—দেখুন—ডাঃ সেন এসেছেন।

দীপক আর রতনলাল আজকের চায়ের টেবিলে ডাঃ সেনকে আশাতীত সুস্থ দেখে, সত্যিই আনন্দ অনুভব করল। তাঁর মুখ চোখ দেখে বোধ হ'ল, বিগত গ্লানি প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে।

দীপক চা খেতে খেতে ডাঃ সেনকে বলল—যদিও দুর্বৃত্তরা আপনাকে চোখে রুমাল নিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, তবু সেই বাড়িটা সম্বন্ধে এবং পথটার কোনও ধারণা হয়েছে? জানতে ইচ্ছা করি।

টোস্ট আর চায়ের পর্ব শেষ করে ডাঃ সেন বিগত দিনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পরে বললেন—আপনাকে আমি একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারলে বড়ই সুখী হতুম। কিন্তু কী বলব, আমি নিরুপায়। আপনাকে পূর্বে যা বলেছি, তার বেশি আর কিছু জানাতে পারবো না।

রতনলাল বলল—কিছু মনে পড়ে না? পথটা কোন দিকে। বাড়িটা সহরে না পাড়াগাঁয়ে?

—না কিছু তো মনে পড়ছে না।

দীপক হতাশ না হয়ে বললে—আচ্ছা, আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো, আপনি তার সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন।

প্রথমতঃ মোটরখানায় তারা আপনাকে কতখানি ঘুরিয়েছিল ?

ডাঃ সেন বললেন—সে অবস্থায় আমার সঠিক কিছু অনুমান করবার ক্ষমতা ছিল না, তবে আন্দাজে মনে হয় ঘণ্টা দেড়েক সময় হবে। কেননা একটু রাত্রি বলে মনে হয়েছিল।

দীপক বলল—আপনার কি মনে হয় যে, তারা অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনাকে নিয়ে গিয়েছিল না তারা বরাবর গন্তব্যস্থলে গিয়েছিল। না কোথাও অপেক্ষা করেছিল ? অবশ্য আপনি যা বলেন তা সঠিক না হতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার এ বিষয়ে কি ধারণা সেটা জানতে ইচ্ছা করি।

ডাঃ সেন বললেন, আমার মনে হয় বেশি ঘোরাঘুরি করেনি, আর পথিমধ্যে কোথাও অপেক্ষা করেনি—সোজা গন্তব্যস্থানে নিয়ে গিয়েছিল।

—যেখানে মোটরটা গিয়ে থামল সেটা কি রাস্তার ওপর বলে মনে হয় ?

—যেখানে মোটরখানা দাঁড়িয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই রাস্তার ওপরই। কিন্তু আমায় শ'খানেক গজ হাটিয়ে মাঠের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

—তারপর !

—তারপর বাড়ীর সামনে শিস্ দিতেই একটা লোক ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, কীরে মানবেন্দ্র, ধরে নিয়ে এসেছিস্ ?

মানবেন্দ্র হাসতে হাসতে বলল—বাজপাখির আদেশ কখনো কি আমার দ্বারা লঙ্ঘন হয়েছে ? তাঁর প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছি বলেই তো তিনি আমাকে তাঁর যোগ্যতর সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ! তাড়াতাড়ি দরজা খোল।

বাড়িতে ঢুকতে গেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

দীপক বলল—আপনি বলেছেন বাড়িটায় ঢুকতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, ক টা ধাপ উঠে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে পারা যায় বলতে পারেন ?

মাথা চুলকে ডাঃ সেন বললেন—ঠিক মনে করতে পারছি না, বোধ হয় সাতটা সিঁড়ি হবে।

রতনলাল বলল—বাড়িটা কি রকম ?

ডাঃ সেন বললেন—তখনও আমার চোখে রুমাল বাঁধা রতনলালবাবু।

দীপক বলল—চুপ কর এখন রতন। অনেক কিছু শোনবার আছে। বিরক্ত করিস না।

—বাড়িটায় ঢুকে কি আপনার মনে হ'ল সেখানে আরো লোকজন বাস করে ?

ডাঃ সেন বললেন বোধহয় বাড়িটায় অন্য কোন লোকজন বিশেষ ছিল না, কেননা বেশ শান্ত পরিবেশ। তেতলায় উঠবার আগে বড় একটা সাড়াশব্দ পাইনি।

—আপনাকে যে ঘরে নিয়ে গেল সে ঘরের জানালা কি খোলা ছিল না বন্ধ ছিল ?

—খোলা ছিল।

—আশা করি ঘরে ঢুকেই বসে ছিলেন।

—হ্যাঁ।

—আপনি যেখানে বসেছিলেন তার জানালা দিয়ে বাড়িটার আশেপাশে দেখতে পেয়েছিলেন কিছু ? কি দেখতে পেয়েছিলেন, তা' কিছু মনে পড়ে কি ?

ডাঃ সেন বললেন—যতদূর মনে হচ্ছে, আমার সামনে একটা জানালা খোলা ছিল। জানালার বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল দূরে একটা জাহাজের মাস্তুল; বোধ হয় স্থানটা গঙ্গার নিকটবর্তী। ঘরে পাখা না থাকলেও ঐ জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস এসে আমার ক্লান্ত দেহকে বেশ আরাম দিচ্ছিল। আরো দূরে দৃষ্টি ঠিক্‌রে পড়েছিল, দেখেছিলাম একটা মসজিদের চূড়া।

মসজিদটা খুব বড় হলেও তার অবস্থা অতি শোচনীয়। বোধ হয় অনেকদিন সংস্কার করা হয়নি।

দীপক গম্ভীর হল। সে বলল—ডাঃ সেন এতক্ষণের পর আপনি একটা মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন। যদি দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করবার সুযোগ হয় তা হ'লে এ সূত্র থেকেই হবে। সিগারেট কেশ থেকে সিগারেট বার করে ডাঃ সেনকে দিয়ে নিজেও একটা ধরালো। তারপর বলল—এইবার আমাকে বলুন, বাইরে আলো ছিল কিনা, নয়ত অন্ধকার রাত্রে আপনি কি করে এসব দেখ্‌তে পেয়েছিলেন ?

ডাঃ সেন সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দেন—কাল যে পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। তার আলোতে দেখতে পেয়েছিলাম।

দীপক হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডসেক্‌ করে বলল—আপনাকে ধন্যবাদ। আজ আর আপনাকে কষ্ট দেব না। যদি আবশ্যক হয়, আসামীদের সনাক্ত করবার জন্যে আপনাকে হয়ত আমার সঙ্গে সেই বাড়ীতে যেতে হবে।

রমা ফস্‌ করে বলল—আমি যাব দীপকবাবু।

ডাঃ সেন রমার দিকে চেয়ে বললেন—যাবে, যাবে, নিশ্চয় যাবে।

॥ ছয় ॥

'পরদা' কার্যালয়ের সম্পাদক হরপদ চাটুয্যে নিজের চেয়ারে বসে প্রুফ দেখছিলেন।

হরপদ চাটুয্যে একজন বিচক্ষণ সাহিত্য সেবী। তাঁর নেশা ছিল ক্যামেরায় যত মন্দির, চার্চ আর মসজিদের ফটোগ্রাফ তোলা। ছায়াচিত্রের কাগজে এসব প্রায়ই বেরোত। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মন্দির, চার্চ, আর মসজিদের জীর্ণ অবস্থা ও তাদের সংস্কারের ব্যাপারে সমাজের ঔদাসীন্য তাঁর প্রাণে বড় ব্যথা দিত। তিনি এ বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নিজ পত্রিকায় আন্দোলন করতেন। অনেক খ্যাত অখ্যাত মন্দির, চার্চ আর মসজিদের ফটো তাঁর সংগ্রহ ছিল।

সহসা ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী এসে সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

হরপদ চাটুয্যের বাল্যবন্ধু দীপক। বহুদিন পরে অকস্মাৎ তাকে দেখে হরপদ চাটুয্যে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন—কি দীপকবাবু যে। হঠাৎ কি মনে করে?

দীপক পকেট থেকে সিগারেট বার করে সম্পাদক হরপদ চাটুয্যেকে অফার করল। একসঙ্গে দু'জনে সিগারেট ধরালো।

তারপর হরপদ একটা কাজে না এলে কি শুধু হাতে তোমার কাছে আসব? তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—কাজটা হ'ল তোমার সংগৃহীত যত সব টেম্পল, চার্চ আর মসজিদের যে এ্যালবামটা আছে যদি দয়া করে একবার ড্রয়ার থেকে বার করে দেখাও বড্ড উপকার হয়, এবং সেটা এখুনিই।

প্রুফ দেখা ঘুচে গেল। হরপদ চাটুয্যে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর রেখে হাসতে হাসতে বলল—কি ব্যাপার? খুনী?

—হাঁা, সেই ব্যাপারেই দরকার। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল দীপক।

হরপদ চাটুয্যে কিঞ্চিৎ চেয়ার সরিয়ে সেক্রেটারী-টেবিলের ড্রয়ার খুলে এ্যালবামটা বের করে তার হাতে দিল।

দীপক এ্যালবামটা নিয়ে প্রথমে খিদিরপুর অঞ্চলের, বিশেষ করে মস্‌জিদের ফটোগুলো দেখতে লাগল। কোন কোন মসজিদের বিভিন্ন কোণ থেকে বেশি করে নেওয়া আছে। হঠাৎ দীপক সম্পাদক হরপদ চাটুয্যেকে জিজ্ঞাসা করলে—খিদিরপুরে গঙ্গার কাছাকাছি কোন মস্‌জিদের ফটো আছে কিনা—

আবার প্রুফটা সরিয়ে রেখে হাতের লাল পেন্সিলটা তুলে নিয়ে হরপদ চাটুয্যে চার-পাঁচটা মস্‌জিদের ফটো দেখিয়ে দিলেন।

তার মধ্যে একটি অতি পুরাতন বৃহৎ মস্‌জিদের দুই তিনখানা ফটো ছিল।

অনেকক্ষণ দেখে-শুনে দীপক বলল—আচ্ছা হরপদবাবু যদি মেহেরবাণী করে একদিনের জন্য এ্যালবামটি ছেড়ে দাও—

হরপদ চাটুয্যে ভ্রূ তুলে একটু ফিক করে হেসে জবাব দিল—অন্য কেউ হলে দিতুম না, কেননা এটি আমার নিজস্ব—থাক্ এক্ষেত্রে তুমি পাবে। যদি কিছু উপকারে আসে অনায়াসে নিয়ে যেতে পার।

—চা খাবে দীপক ?

—না ভাই, বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে।

—তোমার তো সব সময়ই কাজ—একটু বস। ওরে রামহরি—রামহরি ঘরে ঢুকে বলল—বাবু—

—দু'কাপ চা নিয়ে আয়—হাতে স্লিপটা দিয়ে দিল।

চায়ের পর্ব শেষ করে দীপক নমস্কার করে এ্যালবামটি নিয়ে বিদায় নিল।

বাড়িতে এসে দীপক ডাঃ সেনকে ড্রয়িং রুমে ডেকে পাঠাল।

ডাঃ সেন ঘরে ঢুকে বললেন—কী খবর দীপকবাবু ?

দীপক সামনের চেয়ারে বসতে বলে, এ্যালবামটি খুলে খিদিরপুরের সেই

বৃহৎ মসজিদটার ফটো দেখাতেই তিনি চমকে উঠে বললেন—চাঁদের আলোতে বেশ স্পষ্ট করে এই মসজিদটাই দেখেছি।

—ঠিক—এইটাই দেখেছেন তো ?

—হ্যাঁ, দীপকবাবু. আমার ভুল হয়নি। ঠিক এইটাই। এ্যালবামটা আরো চোখের সামনে নিয়ে এল।

দীপক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তার সহকারী রতনলালকে ডেকে বলল—রতনলাল, এইবার রেডি হয়ে নে। বদমাইশদের আড্ডার সন্ধান পাওয়া গেছে।

রতনলাল পাশের ঘরে দেশলাইয়ের খেলা দেখাচ্ছিল রমাকে। আপন ঝোঁকেই উত্তর দিল—এখুনি যাচ্ছি। মিনিট পাঁচেক পরে রতনলাল দীপকের কাছে এসে বলল—রেডি।

দীপক ডাঃ সেনকে ইঙ্গিত করে বলল—আমাদের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে।

ডাঃ সেন হাসতে হাসতে সম্মতি জানালেন।

অতঃপর তিনজনে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে পড়ল।

। সাত ।

খিদিরপুর অঞ্চল···

আঁকা-বাঁকা গলির পর গলি গাড়ি ঘুরতে লাগল। গঙ্গার ধারে আসতেই ডাঃ সেন বললেন,—হ্যাঁ, এখানে আমাদের গাড়িটা একটু জাম্প্ করেছিল। ঠিক মনে পড়েছে আমার। দীপকবাবু আর বেশি দূর নয়।

খানিকটা গিয়েই মস্‌জিদটা খুঁজে বের করতে দীপকের বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। এ্যাল্‌বামটার সঙ্গে ভগ্নপ্রায় মস্‌জিদটার সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলে। মোটর থেকে তিনজনে নেমে মিটার চার্জটা দিয়ে হাঁটতে সুরু করলে।

সহসা দীপকের অলক্ষ্যে একজন লোক ডাঃ সেনকে দেখে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দ্রুত প্রস্থান করলে।

খানিকক্ষণ খোঁজার পরে একটা পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ি দেখে দীপক একটু থেমে মনে মনে ভাবল হ্যাঁ, এটা হতে পারে। বাড়িটায় ঢুকতে ৪।৫ টা চিপি আছে, কিন্তু বাড়ির দরজার কাছে যেতেই হতাশ হ'ল দীপক। দেখে তালা ঝোলানো। পাশাপাশি দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করতেই তারা বলল—কিছুক্ষণ আগে একটা ভাড়াটে ফোর্ড এ জন-চারেক লোক বাড়িতে চাবি লাগিয়ে অলক্ষ্য হ'ল চলে গেছে।

দীপক বেশ বুঝতে পারল যে, পাখি উড়ে গেছে!

রতন হেসে বলল—যাই হোক, শুধু ফিরে যাওয়ার চেয়ে বাড়িটা একবার খানাতল্লাসী করে দেখা যাক্।

দীপক একমিনিট ভেবে এই কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ করল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় বীটের পুলিশটাকে দেখে সে বলল—এ বাড়িটা একবার খানাতল্লাসী করা প্রয়োজন এখুনি।

তারপর অদূরে টেলিফোন করে দিল খিদিরপুর পুলিশ ষ্টেশনে।

মিনিট দশেক পরে মোটাসোটা থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে জিপ থেকে নামলেন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু, এবং তাঁর সঙ্গে জনদশেক কনষ্টেবল।

দীপকের মুখে সমস্ত কথা শুনে ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন—নিশ্চয়, এখুনি—আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন দীপকবাবু।

দীপক ডান পকেট থেকে মাষ্টার চাবিটা বের করে তালায় ভেতরে ঢোকাতেই খুট করে আওয়াজ হ'ল।

দীপক, রতনলাল, ডাঃ সেন আর ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু ভেতরে ঢুকলেন। বাইরে পুলিশ ও জনকয়েক কনষ্টেবল দাঁড়িয়ে রইল।

দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকানিতে এসে দাঁড়াল তখন রতনলাল। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন দরকারী সূত্র পাওয়া গেল না।

অবশেষে দীপক একটা বন্ধ ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলে এক কোণে একগাদা চূণ ঢালা রয়েছে। কি মনে করে দীপক হাত দিয়ে চূণ সরাবার চেষ্টা করতেই তার হাত যেন পুড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলে।

পরীক্ষা করে ডাঃ সেন বললেন—এ হচ্ছে তীব্র দাহিকাশক্তি সম্পন্ন ক্ষার চূণ।

দীপকের সন্দেহ হ'ল এখানে রাখার উদ্দেশ্য কি? অতঃপর একগাছা লাঠি দিয়ে চূণগুলো সরাতেই কনুই পর্যন্ত একটা মানুষের তাজা রক্ত মাখানো হাত বেরিয়ে পড়ল। হাতের খানিক অংশ ক্ষয়ে গেছে। দীপক ডাক্তারের হাতে সেটা তুলে দিল।

ডাঃ সেন পরীক্ষা করে বললেন—সম্ভবতঃ এটা কালাচাঁদেরই হাত। আমি না করাতে কোন আনাড়ী লোক দিয়ে অস্ত্র করিয়ে এর ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। আর ঘণ্টা দু'য়েক থাকলে এ হাতের আর কোন চিহ্ন থাকতো না।

চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে দীপক দেখলো, ঘরের এক প্রান্তে একটা দেওয়াল আলমারীর দরজা আধ-ভেজানো অবস্থায় রয়েছে। তার কেমন সন্দেহ হ'ল। দরজার হ্যাণ্ডেলটা নাড়াতেই দীপক দেখল—আলমারীর ভেতর কোন সেল্ভ নেই। হঠাৎ আলমারীর ওপর দিকে একটা সবুজ বোতাম তার নজরে পড়ল।

দীপক বোতামটি পুস করতেই ভিতরের দিকে একটি গুপ্ত দরজা খুলে গেল। সে দেখলো, গুপ্ত দরজার পর ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। কিছুক্ষণ সকলে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল।

দীপক সকলকে তার সঙ্গে আসতে বলে পকেট থেকে টর্চ বার করে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নিচে গিয়ে দেখল, তারা একটা প্রকাণ্ড হলে এসে পৌঁচেছে। দীপক আশ্চর্য হয়ে দেখল, সেখানে একটা কারখানা ও অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে দীপক হঠাৎ একটা খোলা সিন্দুকের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকলে সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখল সিন্দুকটায় ভর্তি অজস্র নোট। এক সঙ্গে এক জায়গায় এত টাকা দেখে সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সকলেই বুঝতে পারল সেটা একটা জাল নোটের কারখানা।

ইন্স্পেক্টর বঙ্কিমবাবুর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে বললেন—আমার এলাকার মধ্যে যে এত রহস্য আছে আমি ঘুণাক্ষরে জানতাম না। অবশ্য এ বাড়ির লোকেদের ওপর নজর রাখবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা রিপোর্ট দিল, না লোকগুলির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ তারা পায়নি।

দীপক তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, সে লোকটা কার্জন পার্কে খুন হয় সে একজন mint এর কর্মচারী। এইবার যেন সে এই হত্যার কারণটা অনুমান করতে পারল। তার মনে হ'ল এই জালিয়াতের দল কোন রহস্য উদঘাটন করার জন্য mint এর কর্মচারীটিকে পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী তা কিছুতেই প্রকাশ করবে না বলায় দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে তাদের হাতেই প্রান দেয়। সে ইনস্পেক্টরকে বলল—এইবার আপনি এই বাড়িটার ভার নিয়ে যথাকর্তব্য করুন, আমার অনুসন্ধান এখনো কিছু বাকি আছে।

॥ আট ॥

দীপক তার ড্রইং রুমে বসে ভাবছিল। গুণ্ডাদের আড্ডার সামনে পেয়েও তাদের গ্রেপ্তার করতে না পেরে তার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। এখন তাদের সন্ধানের সব সূত্রই লুপ্ত। কি করে আবার তাদের সন্ধান পাওয়া যায়, দীপক মনে মনে তারই জল্পনা-কল্পনা করছিল।

ক্রিং···ক্রি···

রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই পুলিশ অফিস থেকে স্বয়ং কমিশনার মিঃ হেড্ওয়ার্থ জানাচ্ছেন যে mint এর আর একজন কর্মচারী হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে। অনুমান এই গুণ্ডাদলরাই তাকে গুম্ করেছে। পুলিশ তাকে জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই পায়নি।

দীপক ঠোঁট দুটোকে চেপে কি যেন ভেবে নিল। ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। আবার কোন পথে এই রহস্যের সূত্র পাবে সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে তার ঘরে ভৃত্য ভোলা এসে জানাল, ওয়েটিং রুমে একজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা করছেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

দীপকের হঠাৎ চমক ভাঙ্গে। সে ভৃত্যকে অনুমতি দিল স্ত্রীলোকটিকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

কিছুক্ষণ পরে সুন্দরী, সুশ্রী একটি তরুণী প্রবেশ ক'রে দীপক চ্যাটার্জীকে অভিবাদন জানাল। তরুণীর বেশভূষা সাদাসিধা হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন ; তাতে পরিপাট্যও আছে।

দীপকের অনুরোধে আসন গ্রহণ করে সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে তরুণী বলল—আপনার সুনামই আপনার সাহায্য নিতে আমায় টেনে এনেছে।

* * * * * *

* * * * *

দীপক সিগারেট ধরালো। তারপর সে হেসে বলল, what can do for you ? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ?

তরুণী বলল—তাহলে প্রথম থেকেই আপনাকে বলতে হয়। আমার নাম শাস্বা সেন। আমি যখন ক্যাম্বেলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখতুম, রঞ্জন রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। রঞ্জন একজন চিত্রশিল্পী। সে ভাল আঁকতে পারতো। আমরা পরস্পর গুণমুগ্ধ ছিলাম কিন্তু রঞ্জন ছিল বড্ড গরীব। অনেক পরিশ্রম করে সে বৃদ্ধা মা'র ভরণ-পোষণ চালাত। রঞ্জনের আত্ম-সম্মান জ্ঞান খুব ছিল। ধাত্রী-বিদ্যায় ডিপ্লোমা পেয়ে যখন কিছু উপার্জন করতুম তাকে সাহায্য করতে চাইলেও সে প্রত্যাখ্যান করত। হঠাৎ তার অবস্থা ফিরে গেল, সে যথেষ্ট উপার্জন করতে লাগল। সে আমায় বলল—সে একটা ভাল চাকরী পেয়েছে। এইবার সে আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে কিছুদিন বাদেই জাল নোট চালাবার চেষ্টা করার অপরাধে তার ছয় মাস জেল হয়। অনেক পীড়াপীড়িতেও সে পুলিশের কাছে তার দলের কারুর নাম জানায় নি। সম্প্রতি সে জেল থেকে বেরিয়ে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে আর তাদের দলে মিশবে না। কিন্তু আজ তার দলপতি বাজপাখি এসে তাকে শাসিয়ে গেছে, সে যদি তাদের দলে যোগ না দেয়, তাহলে তার বিশেষ অনিষ্ট হবে। আমি সেইজন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এখন আপনি তাকে বাজপাখির কবল থেকে রক্ষা করুন।

তরুণীর করুণ আবেদন দীপকের হৃদয় স্পর্শ করল। শুধু তাই নয়, সে যেন

অন্ধকারের মধ্যে একটা নতুন আলো দেখতে পেল। সে বুঝল, যাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সে এত চেষ্টা করছে, সে এই বাজপাখি ছাড়া আর কেউ নয়। সে তরুণীটিকে আশ্বাস দিয়ে বলল—শান্তা দেবী, আপনি আশ্বস্ত হোন, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। উপস্থিত আমি একবার রঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শান্তা দীপককে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—রঞ্জন এখন আমার ঘরে আছে। যদি এখন দয়া করে আমার সঙ্গে আসেন ত' তার দেখা পাবেন।

এক মিনিট অপেক্ষা করুন, বলে দীপক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

* * * * * *

শান্তা গোয়েন্দা দীপক চাটার্জীকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

দীপক দেখলে—রঞ্জন এক সুদর্শন-যুবক। তার মুখে সরলতা মাখানো এবং তাতে অপরাধের কোন চিহ্নই নাই। দীপক তাকে বলল—আপনাকে আমি দু'একটা প্রশ্ন করব, আপনি সঠিক উত্তর দেবেন।

—প্রথমতঃ বাজপাখি কোথায় থাকে ?

—তাদের তিন চারটা আড্ডা আছে। আগে তারা খিদিরপুরে এক পাড়াতে ছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের সন্ধান পাওয়াতে সেটা আপাততঃ বন্ধ করে গোয়াবাগানে আড্ডা করেছে।

—এ দুটো ছাড়া তাদের অন্য কোন আড্ডার ঠিকানা আপনি জানেন ?

তাদের সমস্ত আড্ডার সন্ধান আমাকে দেয়নি, আমাকে প্রধানতঃ খিদিরপুরের আড্ডাতে যেতে হ'ত। তবে শুনেছি ৪নং খাল পেরিয়ে তাদের আর একটি আড্ডা আছে।

—আজ যখন বাজপাখি এসে আপনাকে শাসিয়ে যায়, আপনি কি তার কথায় রাজি হয়েছিলেন ?

—না। আমি শান্তা দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার অতীত জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে জীবনকে সুপথে পরিচালিত করব, এর জন্য আমার যে বিপদই হয় হোক্। সুতরাং আমি বাজপাখির প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি।

* * *

* * * * * *

দীপক একটু ভেবে বলল—তাতে সে কি বলল ?

—আমাকে অনেক বোঝাল, কিন্তু তাতে রাজি না হওয়াতে সে আমার কোন কথা গ্রাহ্য না করে আমার হাতে দশ টাকার দশখানা নোট গুঁজে দিয়ে বলল—বাজে কথা বলবার এখন আমার সময় নেই, আজ সন্ধ্যায় বিডন ষ্ট্রীট সার্কুলার রোডের মোড়ে যেন তার সঙ্গে দেখা করি, সে মোটর নিয়ে উপস্থিত থাকবে। না গেলে, আমার কিন্তু মৃত্যু······

—তাদের কখানা মোটর আছে ?

—তিনখানা।

—কোনও মোটরের নম্বর বলতে পারেন ?

—একটি মোটরের আসল নম্বর B L A 4774 এই নম্বরে লাইসেন্স করা হয়েছে কিন্তু দরকার বুঝলে তারা প্লেটখানা বদলে অন্য নম্বর লাগিয়ে দেয়। সাধারণতঃ B L A 7777. এই নম্বরের প্লেটই লাগায় ও আসলটি গাড়ির ভিতরেই থাকে।

—আপনি তার কথা মত আজকের সন্ধ্যায় দেখা করবেন। আমি ছদ্মবেশে কাছাকাছি থাকবো। যখন আপনাকে তারা গাড়িতে তুলবে—আমিও follow করব। আপনার কোন ভয় নেই।

রঞ্জন সিগারেটটা ধরিয়ে শাস্তাকে ডেকে হেসে বলল—দেখ দীপকবাবু আমাকে আজকে মৃত্যু-মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন। তুমি যেন এর জন্যে দুঃখ ক'রো না।

দীপক হাসিমুখে বলল—রাখে হরি মারে কে ?

পরস্পর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা বাড়ি ফিরল।

॥ নয় ॥

সেদিন সন্ধ্যা…

ম্যাণ্ডেভিলা বাজারের সামনে একজন শিখ ড্রাইভার একখানা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ট্যাক্সির ভিতরে একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ছিলেন। হয়ত কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন।

কাফে ডি মুনের সামনে একজন যুবক দাঁড়িয়ে যেন কার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এমন সময় একখানা মোটর এসে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়াল। মোটর আরোহী একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু যুবক।

তিনি যুবকটিকে সিগ্‌ন্যাল দিতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে ঐ যুবকটি কাফের সামনে থেকে এগিয়ে গিয়ে মোটরে উঠল। মোটরখানা তখন সার্কুলার রোডের দক্ষিণ দিকে ছুটল।

ট্যাক্সি চালকটি তীব্র দৃষ্টিতে মোটর আরোহীর কার্যকলাপ দেখছিল। তখন বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি নিম্নস্বরে ট্যাক্সি চালককে বললেন— দীপকবাবু, ঐ ব্যক্তিই বাজপাখি। বলা বাহুল্য ট্যাক্সিচালক ছদ্মবেশী দীপক চ্যাটার্জী আর আরোহী ডাঃ সেন।

দীপক দেখল মোটরখানার নম্বর B L A 4774 তার আর সন্দেহ রইল না। সে তখন ট্যাক্সি নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করবার জন্য স্টার্ট দিল।

কিন্তু একি! টায়ারে যে হাওয়া নেই। সে আশ্চর্য হ'ল, কারণ সে বেরোবার আগে সব দেখে বেরিয়েছে।

ষ্টীয়ারিং ছেড়ে নেমে দেখে টায়ারের গায়ে কে ছুরী দিয়ে কেটে দিয়েছে। সে ভাবল এ অন্য কোন লোক নয়—নিশ্চয় এদের দলের লোক আমাদের সন্দেহ করে, নিঃশব্দে কাজ সেরে গেছে।

এই বিষয়ে ভাবতেই তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ডাঃ সেনের ছদ্মবেশ সুচতুর বাজপাখির চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। এদিকে মোটরখানা হু-হু করে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

এদিকে মিনিট পনেরো পরে তার পুরাণো বন্ধু অমল এসে হাজির মোটর সাইকেল-এ। দীপক পেছনের সীটে বসে ডাঃ সেনকে বলল, আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি অপেক্ষা করুন।

মোটর সাইকেলের স্পীড তখন পঞ্চাশ ষাট মাইল। বেগে ছুটে চলেছে··· ডাঃ সেনের বুঝতে বাকি রইল না যে, এই ভদ্রলোকটি মিঃ রতনলাল।

দূরত্ব ক্রমে কমে আসছে···

জোরে···আরো জোরে···হাত দশেক পিছনে মোটর সাইকেল চলল।

সামনের মোটরখানা আরও স্পীড বাড়ালো···

মোটরখানা পার্ক ষ্ট্রীট···চৌরঙ্গী রোড···হরিশ মুখার্জী রোড··· ···আলিপুর···মাঝের হাট···ডায়মণ্ডহারবার···

গঙ্গার কাছে একটা বড়ো ভাঙ্গা বাড়ির সামনে এসে থামলো···পাছে তারা সন্দেহ করে বলে রতনলাল আর বেশী অগ্রসর না হয়ে একটু দূরে থেমে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। সে দেখল মালী এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

দীপক রতনলালকে বলল—তুই থানায় মোটর সাইকেলটা রেখে আয়। আমি ততক্ষণে এগোচ্ছি। তুই একেবারে ঐ পশ্চিমের দেওয়ালের কাছে আসিস্।

দরজাটা ঠেলে দীপক দেখল ভেতরে থেকে বন্ধ। বাঁদিকে বেরুতেই

ছোট একটা ডিঙোবার মত পাঁচিল। সেটার ওপর নিঃশব্দে উঠে রতনলালের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই রতনলাল আসতেই দীপক আর সেই পাঁচিলটার ভেতরে নামল না। চুপটি করে বসে আছে। দোতলার ঘর থেকে একটা নীল আলো এসে পড়েছে মাটিতে। ঘরটায় জানালার গরাদ নেই। দীপক ভাবছে, কি উপায়ে ঘরের মধ্যে ঢোকা যায়?

একটা water pipe তেতলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। দীপক শেষ পর্যন্ত water pipe-টা ধরে দোতলার জানালার কাছে উঠে এসে মুখ বাড়াল। দেখলো ঘরের মধ্যে কোন প্রাণী নেই।

দৃষ্টিটাকে আরো প্রসারিত করে দেখলো ডানদিকের এক কোণে দু'জন লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে।

তাদের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পেরেছে—সে হ'ল মিঃ রঞ্জন রায়। দীপক চিন্তা করে ভাবল, যে রঞ্জন তার কথা শুনে আজ বিপদে পড়েছে। কি উপায়ে উদ্ধার করা যায় তাকে, ভাবতে লাগল।

পকেট থেকে ছুরিটা বার করে জানালা দিয়ে নেমে দীপক ঘরের ডানদিকের কোণে যেতেই দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় দরজা খুলে বাজপাখি সেই ঘরে ঢুকে গোয়েন্দা দীপক চাটার্জীকে দেখেই চিনতে পারল।

বাজপাখি মুখে একটা কুৎসিত আওয়াজ দিতেই চার পাঁচজন যমদূতের মত লোক সেই ঘরে ঢুকে দীপককে আক্রমণ করল।

দীপক তৈরী হয়েই ছিল।

হাতের মুঠিটাকে শক্ত করে বাগিয়ে নিয়ে এক প্রচণ্ড ঘুষি প্রথম লোকটিকে মারতে সে ছিটকে পড়ল আর নিমেষের মধ্যেই তার আততায়ীরা একটু তটস্থ হ'ল। কিন্তু পরক্ষণে বাজপাখির আদেশে দ্বিগুণ উৎসাহ পেয়ে আক্রমণ করল।

দীপক তখন আত্মরক্ষার জন্যে রঞ্জনকে এড়িয়ে কোণ থেকে চেয়ারখানা তুলে নিয়ে দ্বিতীয় লোকটির মাথায় সজোরে ঘা দিল। কিন্তু একা আক্রমণকারীদের সঙ্গে কতক্ষণ লড়তে পারা যায়, তাই ভেবে দীপক অতি পরিচিত স্বরে শিস্ দিতে লাগল। এই দেখে বাজপাখি নিচের লোকটিকে ধরে রাখবার জন্যে লোক পাঠাল।

এদিকে একজন আক্রমণকারী লাঠির সাহায্যে দীপকের মাথা লক্ষ্য করে মারতেই রতনলাল দীপকের মাথাটা বাঁ হাত দিয়ে এক নিমেষের মধ্যে সরিয়ে দিল।

বাজপাখি এতক্ষণ সব লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলল—hands up Mr. Chatterjee, (হাত তুলে দাঁড়াও মিঃ চ্যাটার্জী) লক্ষ্মী ছেলের মত পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দাও!

দীপক নিরুপায় হয়ে পিস্তলটা তার হাতে তুলে দিল।

আক্রমণকারীরা দীপককে দড়ি দিয়ে মিঃ রঞ্জনের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল।

বাজপাখি দাঁত খিঁচিয়ে বিদ্রূপ করে বলল—কেমন, যার ভরসায় আমার কথায় রাজি হওনি, এখন তার দুর্দশা দেখলে তো?

বিষণ্ণ মনে রঞ্জন চুপ করে রইল।

এদিকে পেছন থেকে আট দশ জন লোক নিচে নেমে রতনলালকে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসছে। রতনলাল মনে মনে ভাবল, নিশ্চয় ওপরে দীপক বিপদে পড়েছে তা না হ'লে দুবার Signal দিতো। কিন্তু সে একা এতগুলো শত্রুর বিপক্ষে কি করে দীপককে উদ্ধার করবে?

সুতরাং সে স্থির করলে থানা থেকে পুলিশ নিয়ে এসে দীপককে উদ্ধার

করবে। কিন্তু পালানো অসম্ভব। শত্রুরা প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে। সে পালাতে পালাতে একবার পিছন দিকে তার পিস্তলটা থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করল।

ক্ষণকালের জন্যে শত্রুরা একটু ইতস্ততঃ করে আবার তাকে আক্রমণ করলে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে পাঁচিল টপকে রাস্তায় এসে পড়ল। দু'চার জনকে গুলি করে মারতে পারতো, কিন্তু মেরে এতগুলি ক্ষিপ্ত শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। তাই সে মোড়ের মাথায় এসে fire alarm কাচটা ভেঙে দু'বার হ্যাণ্ডেলটাকে ঘুরিয়ে দিল।

এদিকে শত্রুরা সব এসে গেছে। গুলি ছুঁড়লো বাধ্য হয়ে রতনলাল। প্রথম লোকটি আর্ত চীৎকারে ধপাস করে রাস্তায় পড়ে গেল। এমন সময় দূরে ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা শুনে লোকগুলো দেখল গতিক ভাল নয়। তারা উর্দ্ধশ্বাসে অদৃশ্য হ'ল।

এদিকে বাজপাখি যখন শুনল, যে তার প্রেরিত লোকেরা রতনলালকে ধরতে পারেনি আর সে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়েছে, সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তখন উপায় নেই দেখে সে তার অনুচরদের পলায়ন করতে আদেশ দিল। দু'জন লোক তিনজন বন্দীকে নিয়ে মোটরে উঠে পালাল। দীপক আর রঞ্জনকে নিয়ে যাবার তার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মোটরে জায়গা না থাকায় পেরে উঠল না। ইত্যবসরে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের রতনলাল সমস্ত জানিয়ে দিতে তারা সারা একতলা খুঁজে কিছু পেল না। দোতলায় সেই ঘরটিতে দীপক ও রঞ্জনকে বন্ধনাবস্থায় দেখে শীঘ্র সকলে তাদের মুক্ত করে দিল।

মুক্ত হয়ে দীপক বলল—তাড়াতাড়ি থানায় ফোন করে দাও B L A 4774 ও 7777 নম্বরের মোটর আটক করে আরোহীদের গ্রেপ্তার করতে।

অতঃপর ফায়ার ব্রিগেডের ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে দীপক বলল—আপনারা

আমায় এবং রতনকে উদ্ধার করাতে বিশেষ কাজের সুবিধে হল। আচ্ছা নমস্কার, ফায়ার ব্রিগেড ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল……

রতনলাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—সব থানায় খবর চলে গেছে দীপক। এবার বাড়ী চল।

রঞ্জন আর দীপক একটা পরম নিশ্চিন্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দুর্বৃত্তদের সংঘর্ষে দু'জনেই অল্পবিস্তর জখম হ'য়েছি। চল, আজ রাতটা ভাল করে বিশ্রাম নিতে হবে। কাল যদি মোটরের নাম্বার পাওয়া যায় পরে যথাকর্তব্য করা যাবে।

॥ দশ ॥

পরদিন সকাল……

চা শেষ করে দীপক আর রতনলাল রমার সঙ্গে গল্প করছে এমন সময় ক্রিং ……ক্রিং……ক্রিং……

রিসিভারটা তুলে রতনলাল বলল—ডায়মণ্ড-ক্যানিং পুলিশ ষ্টেশন থেকে ফোন করে জানাচ্ছে মোটরখানা পাওয়া গেছে গঙ্গার ধারে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায়। সম্ভবতঃ আরোহীরা মাতাল অবস্থায় ভীষণ বেগে পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে চালাচ্ছিল—হঠাৎ একটা গাছে ধাক্কা লেগে গাড়িখানা উল্টে গঙ্গার পাড়ে পড়ে যায়। গাড়ীখানার নম্বর ॥ L. A 4774…আরোহীদের মধ্যে কাকেও জীবিত বা মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

—দীপক আশ্চর্য! কি ব্যাপার বলত? এ রকম দুর্ঘটনার পর আরোহীদের ভীষণভাবে আহত হওয়াই সম্ভব, সুতরাং সে অবস্থায় তারা গেল কোথায়? রিসিভারটা নামিয়ে বলল রতনলাল।

দীপক বলল— চল, আর দেরী করে লাভ নেই। ব্যাপারটা ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে।

* * *

ডায়মণ্ড ক্যানিং পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর মিঃ পরিমল সরকার দীপক আর রতনলালকে কেস-ডায়েরী দেখিয়ে বললেন বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার দীপকবাবু। লোকগুলো গেল কোথায়? আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি।

সুতরাং মনে হয় তারা এ বিপদ দেখে গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দীপক বলল—যাই হোক, চলুন এবার ঘটনাস্থলটা দেখতে যাই।

অতঃপর ঘটনাস্থলে তিনজনে এসে হাজির হতে সেখানে দেখলো কারুর কিছুই সন্ধানই নেই। accident কি করে সম্ভব হয়? অন্ততঃ কিছু না কিছু পড়ে থাকা উচিত। আস্তে আস্তে দীপক বলল যে—তারা পুলিশের চোখে ফাঁকি দেবার জন্যে মোটর থেকে নেমে গাড়িটাকে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে সরে পড়েছে। তারপর তারা নিরাপদে তাদের কোন আডডায় পালিয়েছে।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সরকার বললেন—আপনার অনুমান সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু এখন তাদের সন্ধান করার উপায় কি?

দীপক বলল—আপনি আমাকে civil dress-এ জন দশেক লোক দিন, আমি তাদের নিয়ে ঐ বাড়িটায় উপযুক্ত পাহারা দেবো। দরকার মত তাদের ইঙ্গিত করলেই তারা গুণ্ডাদের আক্রমণ করে বন্দী করবে।

ইন্‌স্পেক্টর এক মুখ হেসে বললেন—নিশ্চয় দেবো। কারণ এ ঘটনা আমার এলাকায় হয়েছে, আর এ বিষয়ে আমার একটা দায়িত্ব আছে।

* * *

চারপাশে সাধারণ বেশধারী লোক ঘুরতে লাগলো ঐ বাড়িটার আশ-পাশে। দীপক, রতন আর ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সরকার হাঁটিতে হাঁটিতে গঙ্গার ধার ঘেঁষে যেতেই দীপক বলে উঠল—একসঙ্গে তিনজনে গেলে চলবে না, শয়তানগুলো বড় ধূর্ত। টের পেলে সন্দেহ করবে। আমি এপারে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি আর রতনলাল নৌকায় গঙ্গার ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করুন। তাছাড়া, বিপদে পড়লেই আমার signal পাবেন। তখনই আপনারা সদলবলে এসে শয়তানদের আক্রমণ করবেন।

এই উপদেশে রতন আর দীপক নৌকায় চড়ল। রতনলাল নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বলতে পার, কাল মাঝ রাতে জনা চারেক একসঙ্গে পার হয়েছে কিনা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রতনলাল আর দীপক চোখ চাওয়া চাওয়ি করল।

—তুমি তাদের কোথায় পৌঁছে দিয়েছিলে? বলতে পার কি?

—হ্যাঁ, ঐ বাজপাখির আড্ডায়।

দীপক সন্তুষ্ট হয়ে বলল—তুমি আমাদের সেখানে পৌঁছে দাও, বক্‌শিস দেবো।

দশ টাকার একখানা নোট বার ক'রে মাঝির হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—তুমি ও পারের ইন্‌স্পেক্টর সরকারবাবুকে ডেকে আনো আর তার সঙ্গে জন আষ্টেক লোক যেন আসে কেমন?

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বলল—হ্যাঁ বাবু—

• • • •

• • •

দীপক, রতনলাল আর ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সরকার প্রত্যেকের হাতে উদ্যত পিস্তল। আস্তে আস্তে বাজপাখির আড্ডায় ঢুকতে লাগল।

একজন লোক বাইরে বসে ঘুমে ঢুলছিল, হঠাৎ খস্‌খস্ শব্দে তন্দ্রার ঘোর কাটতেই চীৎকার করতে যাবে, এমন সময় দীপক পিস্তলটা তার সামনে উচিয়ে বলল চুপ! সে প্রাণের ভয়ে চুপ করল, দীপক চুপি চুপি তাকে বলল—বাজপাখি কোথায় আছে?

হঠাৎ লোকটা চীৎকার করতেই চার পাঁচটি ভীষণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দীপককে ধরে মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে যাবে এমন সময় রতনলাল পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণকারীর কোমরটা জাপটে ধরে মাটি থেকে তুলে নিল।

এদিকে ইন্‌স্পেক্টর হুইশল দিলেন, বাইরে থেকে পাঁচ-ছয় জন কনষ্টেবল এসে পড়ল। রতনলাল দীপকের আক্রমণকারীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আর একজনের দিকে এগিয়ে যাবে, এমন সময় একটা সুইচ বোর্ডে সবুজ

আলোর নিশানা জ্বলছে আর নিভছে দেখে দীপক বলল—চল, তাড়াতাড়ি চল সমুদ্রের পাড়ে।

ইন্‌স্পেক্টর লৌহকড়া দিয়ে দীপকের আক্রমণকারীর হাতে লাগাতে যাবেন অমনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন তার একটা হাত কৃত্রিম। এদিকে দীপক বাজপাখিকে ধরবার জন্যে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, বাজপাখির একজন প্রিয় সহচর হীরালাল একটা বোতাম টিপতেই মেঝের খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল···তারপর সব ম্যাজিকের মত অদৃশ্য···

দীপক আর রতনলাল এসে সে ফাঁকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখে ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। কি ভয়ানক অন্ধকার। এবং আরো দেখলো, একটা বিরাট সুড়ঙ্গ—সেই সুড়ঙ্গ পথে দীপক নামতেই দেখে সেটা এসে মিশেছে কাকদ্বীপের সমুদ্রের পাড়ে। সে রতনলালকে বলল—তুই আমার পিছনে পিছনে থাকবি, বিপদে পড়লে তবে গুলি চালাবি বুঝলি।

* * *

পোর্ট পুলিশ অফিসে দীপক চাটার্জী নিয়ে গিয়ে মিঃ কার্টারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলল—আপনাদের একবার লঞ্চটা দিতে হবে।

পোর্ট পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বললেন—দেখুন দীপকবাবু আপনাকে মিঃ কার্টারের সার্টিফিকেট না দেখালেও চলত। কেন না ইদানীং মালবাহী জাহাজ আর নৌকা থেকে যে পরিমাণে মাল অদৃশ্য হচ্ছে, তাতে করে আপনি যদি উপযুক্ত লোক ধরতে পারেন সেটা তো আমাদের গৌরবের বিষয়।

রতনলাল বলল—দেখুন আর দেরী করবেন না। হয়ত শিকারী এতক্ষণ বোট নিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

চাবিটা দীপক হাতে দিয়ে পোর্ট পুলিশ বললেন—কে চালাবেন, আপনি না লোক দেবো সঙ্গে ?

—ধন্যবাদ। চাবিটা নিয়ে দীপক চ্যাটার্জী লঞ্চে স্টার্ট দিল…

তীব্র সার্চের আলো দূরে নীল সমুদ্রের ফেনায় আছড়ে পড়ছে…কৈ বোট তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যে রতনলাল…

রতনলাল চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখলো। খানিক পরে বলল—ঐ যে রে গাছের ঝোপে. ওরা বোধহয় আশ্রয় নেবে কিংবা পালাচ্ছে—জোরে চল…

সত্তর আশি মাইল বেগে ঠিকরে পড়ছে মাইল মিটারের কাঁটা। বাজপাখির বোটে তীব্র সার্চলাইটের আলো পড়তে গুলি ছুঁড়লো…গুড়ুম…গুড়ুম…

দীপক রতনলালকে বলল—তুইও ready হ'। ওরা গুলি ছুঁড়লেই তার জবাব দিবি।

দীপকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বাজপাখি গুলি ছুঁড়লো দীপকের উদ্দেশ্যে…

মোটর লঞ্চ তীব্রবেগে ছুটে চলেছে সমুদ্রের জল কাটতে কাটতে…

গুড়ুম একটা গুলি এসে দীপকের মাথা ঘেঁসে রতনলালের বাঁ হাতে বিঁধল উঃ, চীৎকার করে সে তার জবাব দিল গুড়ুম…

বোট থেকে লাফিয়ে পড়ল নীলসমুদ্রে কে যেন।

কে যেন চীৎকার করে বলছে, So long Mr. Chatterjee. So long দীপক নিজে এবার গুলি ছুঁড়লো। উঃ বিকট এক চীৎকারে নৈশ অন্ধকারকে খান্ খান্ করে দিলে।

মোটর লঞ্চটি এসে ভিড়ল বোটের পাশে…

যার গায়ে গুলি লেগেছে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং হীরালাল…চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল দীপক। কোথায় গেল বাজপাখি? রতনলাল ডান হাতে কোন রকমে লালাদের হাতে লৌহকড়া পরিয়ে দিল।

আবদ্ধ লোকটিকে মুক্ত করে দিয়ে জানা গেল, মিন্টের কর্মচারীটি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন, তিনিই এর নায়ক।

দীপক এককোণে দাঁড়িয়ে বনাকে বলল—রতনলালের বাঁ হাতে যদি না লাগতো তাহলে জীবন্ত বাজপাখিকে ধরতে পারতুম—কিন্তু—

তাতে কি হয়েছে দীপকদা, আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন…আস্তে আস্তে রমা রতনলালকে ডেকে দীপকের বুকে আশ্রয় নিয়ে বলল—কতদিন তোমার বুকে আমার আর রতনলালের মাথা রাখিনি বল দিকিনি দীপকদা।

পরম নিশ্চিন্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপক ভাবছে, So long Mr. Chatterjee বাজপাখির কি আস্পর্দ্ধা…হ্যাঁ বোন, কত আরাম কত তৃপ্তি…

যথা সময়ে দুর্বৃত্তদের দল যথোপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। দীপকের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে ডাঃ সেন তাঁর চিকিৎসকের অধিকার ও উপাধি ফিরে পেলেন। সমাজে তাঁর পূর্ব্বের সম্মানিত স্থান প্রশস্ততর হয়ে উঠল।

তারপর রঞ্জন আর শান্তার শুভ মিলনোৎসবে এই গল্পের উপসংহার।

—শেষ—

* পরবর্তী ঘটনা জানতে হলে 'বাজপাখির কূটচক্র' পড়ুন।

বাজপাখীর
কূটচক্র
শ্রীস্বপনকুমার
KAILESH BABU

বাজপাখি সিরিজ— ৯নং

বাজপাখির কূটচক্র

শ্রীস্বপন কুমার

ষষ্ঠ মুদ্রণ

জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, (১১৫ এ, আপার চিৎপুর রোড)
কলিকাতা-৭০০০০৬

১৩৮৪ সাল

মূল্য—২·৫০

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

সবচেয়ে সেরা ডিটেকটিভ সিরিজ

অনবদ্য রচনা-নৈপুণ্যে, প্রচ্ছদের তিনরঙা ছবিতে আর
সব চেয়ে অল্পদামে, যা যে-কোনও পাঠকের
মনোহরণ করতে সক্ষম।

ডিটেকটিভ সাহিত্যের যাদুকর

শ্রীস্বপনকুমারের লেখা

—"বাজপাখি সিরিজ"—

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি
২। বাজপাখির পুনরভিযান
৩। বাজপাখির রক্তলীলা
৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার
৬। হত্যাকারী বাজপাখি
৭। বাজপাখির রহস্যজাল
৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র
১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

প্রত্যেকখানির দাম ১·৫০ পয়সা

মুদ্রাকর: শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
জেনারেল প্রিণ্টার্স
৪৫০বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৫

বাজপাখির কূটচক্র

—এক—

—চক্রান্তজালে বাজপাখি—

খবরটি কলকাতা সহরকে তোলপাড় করে তুলল।

বিখ্যাত দস্যুসর্দার বাজপাখি তার অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতার জালে বন্দী হয়েছে।

বিচারের জন্য বাজপাখি আদালতে প্রেরিত হয়েছে। ঘনিয়ে এসেছে তার সমস্ত কীর্তিকলাপের শেষ অধ্যায়। আর সামান্য কয়েকটি দিন মাত্র তার আয়ু। বিচারে যে নিশ্চয়ই বিচারক তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন এ সম্বন্ধে সাধারণ লোক সুনিশ্চিত।

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা বের হতে সুরু হয়েছে। সকলের মুখে মুখে ফিরছে শুধু বাজপাখির খবর।

সেদিন বিকেলের বিশেষ টেলিগ্রামে যে খবরটি প্রকাশিত হল তা হচ্ছে এই :

চক্রান্তজালে বাজপাখি !

সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা ! !

বাজপাখিকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে প্রেরণ ! ! !

বিশেষ বিচারের জন্য বাজপাখিকে সেসনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ! ! ! !

বাজপাখির অন্যতম সহকর্মী মিরজা রাজসাক্ষী হইবার জন্য মনস্থির করিয়াছে ! !

এতবড়ো একটা খবরে শুধুমাত্র সাধারণ লোকেই বিস্মিত হয় নাই। বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীও এই খবরটি অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া বাজপাখির কোনও সহকর্মী যে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এটা ধারণা করতে পারেনি দীপক। তাই শুধু আশ্চর্যই সে হয়নি, সেদিন বিকেলে বাজপাখিকে দেখবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

*　　　*　　　*

বিকেল পাঁচটা।

বেশভূষা শেষ করে গাড়িতে উঠে দীপক ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আদেশ দিল—লালবাজার পুলিশ ষ্টেশন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী তাকে বুকে নিয়ে লালবাজারে এসে উপস্থিত হল।

বিখ্যাত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মরিসন্ আনন্দের সঙ্গে দীপককে আহ্বান করে বললেন, আপনি দীর্ঘদিন বাজপাখির সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু এ ধরণের খবর বোধ হয় আপনার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। তাই না?

দীপক হেসে বলল সত্যিই, হঠাৎ খবরটা দেখে আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না মিঃ মরিসন্।

মিঃ মরিসন্ হেসে বললেন দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভন্ এণ্ড আর্থ, মিঃ চ্যাটার্জী, হ্বাট ইউ ক্যানট ড্রিম অফ্।

দীপক বলল—কিন্তু হঠাৎ তার এত বড় একজন অন্তরঙ্গ সহকারীর এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কি মিঃ মরিসন্?

মিঃ মরিসন্ বললেন মাস চার পঁাচ আগে, বাজপাখির গ্রেপ্তারকারীকে অথবা গ্রেপ্তারে সহায়তা করলে তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

—তা জানি মিঃ মরিসন্।

—কিন্তু শুধু এই পুরস্কার নয়, বাজপাখির এই সহকর্মী মিরজার হাতে বাজপাখি বিশ্বাস করে লাখ দেড় টাকা প্রায়ই রাখত। সেই সম্পূর্ণ টাকা সে আত্মসাৎ করেছিল। অবশেষে সে সেই সমস্ত টাকা নষ্ট করবার অজুহাতে বাজপাখির অন্য এক সহকর্মী কর্তৃক ধৃত হয়। একথা বাজপাখির কাণে গেলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বাজপাখি নিশ্চয়ই তার মৃত্যুদণ্ড দিত। বাজপাখির অভিধানে এ ধরণের অপরাধের একটিমাত্র শাস্তিরই বিধান আছে, আর তা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

—ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্রটা এতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল?

—হ্যাঁ, তাই সে সময় থাকতেই গোপনে লালবাজারের থানায় খবর পাঠায়। আমরাও উপযুক্ত সময়ে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে তাকে গ্রেপ্তার করি। তারপর তার ওই সহকর্মী মিরজা রাজসাক্ষী হতে স্বীকৃত হয়েছে।

—এ খবরটা অবশ্য মূল্যবান।

—কিন্তু একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী···

—কি কথা বলুন।

আপনি কি মনে করেন বাজপাখির অনুচরেরা মিরজাকে তার এই ধরণের মারাত্মক অপরাধের পরও ক্ষমা করবে?

—না, এরপর বাজপাখির অন্যান্য সহকর্মীরা যে প্রতিহিংসা নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কিন্তু একটা কথা মিঃ মরিসন্···

—কি কথা বলুন মিঃ চ্যাটার্জী···

—বাজপাখির যদি ফাঁসীর হুকুম হয়, এবং যদি সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই বাধ্য হয় তবে সমস্ত দলটাই ভেঙে-চুরে যাবে। তখন আর সুশৃঙ্খলভাবে মিরজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে ধ্বংস করবার

মতো একজন কেউ থাকবে না। তাছাড়া তার অন্যান্য সহকর্মীরা মানে রশীদ, ফু চাউ হোয়াংলী ওরা সকলেই এখন পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে থাকবে। সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করে মিরজাকে শাস্তি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

—তা অবশ্যই সত্যি মিঃ চ্যাটার্জী, বললেন মিঃ মরিসন্। তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আপনি কি জন্য লালবাজারে এলেন তা ত বললেন না মিঃ চ্যাটার্জী ?

দীপক বলল—কথাটা সামান্যই, আমি একবার বাজপাখির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। গোটাকয়েক কথা জানবার জন্যে আমার খুবই কৌতুহল হচ্ছে মিঃ মরিসন্।

—বেশ। তাতে আর আপত্তির কি আছে ?

মিঃ মরিসন্ একজন সার্জেণ্টকে ডেকে আদেশ দিলেন—একে আপনি একবার বাজপাখির সেলে নিয়ে যান। ইনি বাজপাখির সঙ্গে দু'একটা কথা নিয়ে আলোচনা করতে চান।

পুলিশ সার্জেন্ট খট করে একটা স্যালুট ঠুকে দীপকের দিকে চেয়ে বলল—আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

* * *

বাজপাখিকে প্রথম দর্শনে একটা পিঞ্জরাবদ্ধ রয়্যাল বেঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে।

দীপক সেলের বাইরে থেকে মোটা লোহার গরাদের ওপারে বন্দী বাজপাখির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই বাজপাখি, আশা করি আপত্তি হবে না তোমার।

বাজপাখি বলল—দীপক চ্যাটার্জী, আমি ক্রাইমটাকে জীবনের মস্ত বড় স্পোর্টস্ বলেই গ্রহণ করেছি। তাই তুমি আমার পরম শত্রু হলেও তোমার প্রতি এতটুকু রাগ আমার নেই। তুমি যে কোনও প্রশ্ন

করলে আমি সানন্দে তার উত্তর দেব—তবে ব্যক্তিগত কোনও প্রশ্ন ছাড়া।

দীপক হেসে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা। কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে আমার সত্যিই কৌতূহল আছে।

বাজপাখি বলল—কোন্ কোন্ বিষয় বল।

—তুমি কি তোমার সহকর্মীর এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আগে থেকে আঁচ করতে পারোনি ?

—কিছুটা করেছিলাম।

—তবে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করোনি কেন ?

—আমি তাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে দেখছিলাম, সে তার মর্যাদা রাখে কি না।

—কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত ত এখন করতে হচ্ছে তোমাকেই।

—কেন ?

—বিচারে নিশ্চয়ই…

বাধা দিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল বাজপাখি। বলল—গভর্নমেন্টের কয়েদখানা এখনও এত শক্তিশালী হয়নি যে বাজপাখিকে আটকে রাখতে পারে।

—কেন ?

—বিচারের প্রহসন চলা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা ক তারপর…

—তারপর ?

—তারপর আমি নির্বিবাদে জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করতে সচেষ্ট হব।

—এ সম্বন্ধে তুমি কি স্থির-নিশ্চয় ?

—স্থির-নিশ্চয় না হয়ে আমি কোনও কথা বলি না ডিটেকটিভ দীপক

চ্যাটার্জী। তুমি অন্ততঃ জান যে আমার কথার উপযুক্ত মর্যাদা আমি রাখি। মিরজাকে তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব না আমি।

—কিন্তু মিরজা ত তোমাকে প্রতারিত করে অজস্র অর্থের অধিকারী হয়েছে এখন।

—তার সমস্ত অর্থ আমি নিঃশেষ করে নিয়ে আবার তাকে এমন অবস্থায় ফেলব যে তাকে সামান্য দুমুঠো অন্নের জন্যে পথে পথে চীৎকার করে ঘুরে বেড়াতে হবে। বিশ্বাসঘাতককে আমি যে শাস্তি দিয়ে থাকি তা দিই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু। কিন্তু আমি তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেব।

কথা শেষ করে বাজপাখি বার দুয়েক পায়চারী করল। তারপর দীপকের দিকে চেয়ে বলল—আমার পক্ষ সমর্থন করবার উপযুক্ত উকিল এবং ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। তাদের এই পরিশ্রম এবং অকুণ্ঠ ত্যাগ আমি কোনদিনই ভুলব না দীপক। আজ এদের মরণপণ সহায়তাই বাজপাখিকে বাজপাখিতে পরিণত করতে পেরেছে।

কথা শেষ করে বাজপাখি হাসল বিচিত্র রহস্যময় এক হাসি। দীপক সেখান থেকে বেরিয়ে এল। মনে তার অজস্র চিন্তার ছায়া।

—দুই—

—সেসন কোর্ট—

বাজপাখির বিচার আরম্ভ হবে।

সংবাদপত্রে খবর বের হয়েছে।

সেসন কোর্টের সামনে বিরাট ভিড়। অফুরন্ত জনস্রোত সকলেই বাজপাখির এই বিচারের খবর শোনবার জন্যে উন্মুখ।

সকলের মনেই শুধু কি-হয়, কি-হয় ভাব।

বাজপাখির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ আরম্ভ হল।

প্রথমেই ডাক পড়ল তার সহকারী মিরজার।

বিশ্বাসঘাতক মিরজা।

সে বন্দী বাজপাখির দিকে চেয়ে একবার কি যেন ভাবল। হাতে পায়ে মোটা শৃঙ্খল। দুজন বন্দুকধারী পাহারা দুপাশে দণ্ডায়মান।

কোনও উপায়েই পালিয়ে যাবার উপায় নেই।

মিরজা নিঃসন্দেহ হল।

একে একে সে বলে যেতে লাগল বাজপাখির বিরুদ্ধে সমস্ত কথা। সরকার পক্ষের উকিল এই সব মিথ্যা কথাগুলো তাকে বেশ করে মুখস্থ করিয়ে রেখেছিল।

সাক্ষ্য শেষ হল।

আদালতের বুকে মৃদু গুঞ্জন।

ছদ্মবেশে রশীদ ও হোয়াংলী কোর্টের এককোণে দাঁড়িয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে হোয়াংলী ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বলল—শয়তান বিশ্বাসঘাতকটাকে পেলে নখ দিয়ে ওর টুঁটি টিপে মেরে ফেলতাম।

রশীদ বলল—ওসব কথা এখন থাক।

কেন ?

—প্রভুর হুকুম না পেলে আমরা কিছু করতে পারি না।

—কিন্তু তিনি ত বন্দী।

—বন্দী ? হো হো করে হেসে উঠল রশীদ—তারপর হোয়াংলীর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—পৃথিবীর বুকে এমন শক্তি নাই কে প্রভুকে বন্দী রাখে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। এই বিচার চলা পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী থাকবেন।

—তারপর ?

—তারপর কারাগারের লৌহ বাঁধন এড়িয়ে তিনি বেরিয়ে পড়বেন নতুন নতুন সংগ্রামের দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে।

—কিন্তু কি করে রশীদ ?

—সে কথা থাক্। পরে হবে। এখন এই প্রকাশ্য আদালতে সে সব আলোচনা চলতে পারে না।

—বেশ।

* * * *

* * *

দুজনে চুপ করে বিচার শুনতে লাগল।

মিরজার সাক্ষী শেষ হলে আদালত থেকে বাজপাখিকে প্রশ্ন করা হল—এর কথার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?

বাজপাখি হেসে বলল কিছু বলবার নেই। এ সবই একটা প্রহসন চলেছে। তবে···

—থামলে কেন ?

মিরজার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাজপাখি বলল—আমার বক্তব্য আছে একজনের বিরুদ্ধে। তবে তা এখন নয়।

বাজপাখি কথা শেষ করল।

সে দৃষ্টির দিকে চেয়ে মিরজা এই প্রকাশ্য আদালতের মধ্যে দাঁড়িয়েও ঘামতে লাগল। চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠল, প্রবল উত্তেজনায় নিঃশ্বাস হল দ্রুততর।

মিরজার সাক্ষী শেষ হতেই সে দিন কোর্টের কাজ শেষ হল।

*　　　*　　　*

বিচারের ফল বের হলো ঠিক একমাস পর।

বাজপাখির বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ।

কিছু কিছু প্রমাণিত হলো, কিছু হলো না!

বাজপাখির স্বপক্ষে এক নামকরা ব্যারিষ্টার অজস্র সব কথা বলে শেষ করলেন।

দেখতে দেখতে সারা শহরের বুকে এক নিমিষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা।

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো হরফে সংবাদ ছাপা হলো :

বাজপাখির দশ বৎসর কারাদণ্ড!

নির্জন কক্ষে আটক রাখিবার সিদ্ধান্ত !!

—তিন—

বিশ্বাসঘাতক মিরজা

বাজপাখির বিচার শেষ হবার পরে মাসখানেক কেটে গেছে।

হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটের তিনতলার একখানা ঘরে এখন মিরজার একটা বিরাট অফিস চল্‌ছে।

শেয়ার মার্কেটে মিরজার প্রচুর নাম! যে কোনও কোম্পানী শেয়ার কেনাবেচার আগে মিরজার মতামত এবং তার কার্যপদ্ধতির কথা বেশ ভাল করে স্মরণ করে। যথেষ্ট সুনামও আছে তার বাজারে।

বর্ত্তমানে বাজারে তার নাম বি ডাটা। 'ডাটা কথাটা দত্তের অপভ্রংশ কিনা জানা নেই, তবে মিরজা যে হঠাৎ কি ভাবে 'ডাটা'তে পরিবর্তিত হ'তে পারে তা আন্দাজ করতেও পারে না কেউ।

এই খবরটা রাখে কেবল তিনজন লোক। বাজপাখীর দুজন সহকারী রশীদ আর হোয়াংলী এবং বাজপাখি নিজে। কিন্তু মিরজা নিজে অন্তত বুঝতে পারেনি যে ইতিমধ্যে তিনজন লোক তার এই ছদ্ম পরিচয়ের খবরটা জেনে ফেলেছে।

জানতে পারল সে সেদিন বিকেলে।

বেলা পাঁচটা।

অফিসে লোকজন বিশেষ নেই।

হঠাৎ বেলটা বেজে উঠল।

—কে? প্রশ্ন করল 'ডাটা' ওরফে মিরজা।

—ভেতরে আসতে পারি কি?

—আসুন।

—নমস্কার।

—আপনি?

—তুমি যেমন নাম পাল্টে মির্জা থেকে ডাটা হয়েছ, আমিও ঠিক তেমনি রশীদ থেকে হয়েছি ডাঃ ব্যানার্জী। কথাটা বলেই আগন্তুক তার গোঁফটা আর মাথার পরচুল একটানে খুলে ফেলল।

—তুমি? অবাক হয়ে বলে উঠল মির্জা।

—হঁ্যা।

—কিন্তু···

—পকেটে হাত পুরো না মির্জা। গর্জে উঠল রশীদ। সঙ্গে সঙ্গে সে তুলে ধরল তার অটোমেটিকটি। আমি জানি মির্জা ও চেষ্টা তুমি করবে। কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা। লোক ডাকবার চেষ্টা করলে এটার ব্যবহার করতে বাধ্য হব।

অর্থাৎ?

—তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু ঘটালে কোনও পাপ নেই মির্জা। কিন্তু সেটা প্রভুর ইচ্ছা নয়। তাই···

—তাই আমি এ যাত্রা বাঁচলাম?

—অবশ্যই। বুঝতে পারছ তোমার মত শয়তানের উন্নত মাথা মাটিতে লুটিয়ে দিতে আমার এক মুহূর্তও সময় লাগে না।

—সেটা কি অত সহজে?

—নয় কেন শুনি?

—তুমি আমাকে গুলি করলে চারদিক থেকে লোক···

—হাঃ হাঃ হাঃ···হেসে উঠল রশীদ। ভুলে যেও না মির্জা আমি সর্বশক্তিমান বাজপাখির বিশ্বস্ত অনুচর।

—না শয়তানের দোসর?

—তার মানে?

—তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান বাজপাখি এখন কারাগারের ভেতরে পচছেন।

—যে কোনও মুহূর্তে তাঁকে মুক্ত করবার ক্ষমতা আমাদের আছে, বুঝলে ?

—তোমাদের পাগলামীটা আপাতত একটু বন্ধ রাখ রশীদ।

—তার মানে ?

—এই দেখ টেলিগ্রাফ নিউজ; রোজ জেল থেকে তেইশ নম্বর বন্দীর খবর আমি তারের সাহায্যে জেনে থাকি। আজকের খবরটা দেখ :

মির্জার কণ্ঠে বিদ্রূপ। সে টেলিগ্রাফটা পড়তে লাগল :

তেইশ নম্বরের অবস্থা পূর্ববৎ। তবে বাহ্যিকতঃ সে অত্যন্ত গম্ভীর। বিশেষ কোন কিছু ঘটলে পরে জানান হবে।

—জেল সুপার

খবরটা পড়ে দেখল রশীদ। আর পরে বলল—ওর থেকে তুমি কি বলতে চাও মির্জা ?

—বলতে চাই এই যে, এক বিরাট পাষাণ প্রাকার ভেদ করে সে মুক্তি পেয়ে আমাকে শাস্তি দিতে আসবে একথা কল্পনা করতেও আমার হাসি আসছে।

—ও। কারাগারে প্রবেশ করবার ঠিক আগের মুহূর্তে বাজপাখির দুচোখের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিটার কথা বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ মির্জা ?

—তার অর্থ ?

—অর্থ যথা সময়েই টের পাবে।

—বেশ, সেজন্যে প্রস্তুত থাকলাম।

—তা থাকো। এখন তুমি তোমার এই বড় লোহার সেফটার চাবিটা কি আমাকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করবে ?

—বাঃ! এটা কি আবদার পেলে নাকি ?

—আবদার নয়, দাবী

—কিন্তু দাবী করলেই কি চাবী পাওয়া যায় নাকি হে ?

—নিশ্চয়ই।

—অবশ্যই নয়।

—তাহলে তোমার ভাগ্য……

—যাক্। আমার ভাগ্যে যা কিছুই ঘটুক, চাবী মিলবে না।

—কেন ?

—চাবী এখানে নেই।

—তবে কোথায় ?

—এক সেট নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আর এক সেট কোনও একটা ব্যাঙ্কের সেফ্ ভোল্টে জমা আছে। তুমি যে এক কথায় চাবিটা নিয়ে দলিলগুলো বের করে তার বলে বাজপাখিকে মুক্ত করবে অত সহজে তা হবে না।

—অতি উত্তম কথা।

কথা শেষ করেই রশীদ টেবিলে দুবার চাপড় মারল।

সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার হাতে ঘরে প্রবেশ করল আর একজন লোক।

—একি ! হোয়াংলী যে, অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মির্জা।

—হ্যাঁ শয়তান। চুপ করে বসে থাক, নইলে এক কথায় তোমার খুলিটা উড়িয়ে দেব। আমি রশীদের মত অত ভালমানুষ নয়, বুঝলে ?

রশীদ বলল—তুমি একে দেখ হোয়াংলী। আমি দেখছি চাবি ছাড়াও সেফ্ খোলে কি না। স্বরে তার তীব্র শ্লেষ।

হোয়াংলী রিভলভারটা মির্জার দিকে উঁচিয়ে ধরল।

খট্ খট্ খট্……

হুস্ হুস্ হুস্……

তীব্র এক ঝলক আলো গিয়ে পড়ল লোহার সেফটার একটা অংশের উপরে !

দেখতে দেখতে বিরাট একটা ফোকর দেখা গেল সিন্দুকের গায়ে।

রশীদ সেখান দিয়ে হাতটা গলিয়ে কতকগুলো কাগজপত্র টেনে বের করল।

তারপর একে একে সেগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

দুচোখে তার ফুটে উঠল বিস্ময়।

—একি? অবাক হয়ে বলল সে।

হো হো করে হেসে উঠল মিরজা! বলল—কি হল দোস্ত, কাগজপত্র পেলে?

—শয়তান! গর্জে উঠল রশীদ।

কিন্তু মিরজার হাসি কমল না এতটুকুও। অট্টহাসির বেগে যেন ফেটে পড়তে চাইল সে।

হাসির বেগ কমলে বলল—তুমি যেমন আমাকে চেন, আমিও চিনি তোমাকে। রতনে রতন চেনে, বুঝলে ভাই রশীদ। তাই ওই সেলফে আসল দলিল রাখিনি আমি। সেটা যেখানে আছে সেখান থেকে সহস্রবার খুঁজেও বের করতে পারবে না তা। এখন তুমি এই নকল কাগজগুলি নিয়েই ঘরে যাও বন্ধু।

মিরজা আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

নির্বাক বিস্ময়ে রশীদ আর হোয়াংলী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ধীর পদবিক্ষেপে।

—চার—

—নকল তেইশ নম্বর—

কয়েদীদের ভিজিটিং আওয়ার !

অধিকাংশ কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্তেই দু একজন লোক অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগের ছাপ। দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনে প্রত্যেকের ঠোঁটের কোণেই ফুটে উঠছে আনন্দের হাসি।

বাজপাখির সঙ্গে দেখা করবার জন্তেও এসেছে একজন লোক।

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের লেখা স্লিপটা সেনট্রির হাতে দিতেই সে দরজা খুলে দিল। কিন্তু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সেনট্রি। এর চেহারার সঙ্গে বাজপাখির চেহারার কোন পার্থক্য নেই। এরও গলাতে একটা চৌকো পিতলের ফলকে লেখা তেইশ। এর পরনে কয়েদীদের ধরণের পোষাক। তবে তার উপরে একটা ওভারকোট চাপান।

বন্দীর কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পেয়েই লোকটা তার ওভারকোটটা খুলে একপাশে রাখল। এবার আর দুজনের মধ্যে কোনও পার্থক্যই চোখে পড়ে না।

বাজপাখির পাশে গিয়ে বসল লোকটি।

সেনট্রি ততক্ষণে ওপাশে চলে গেছে।

বাজপাখি বলল—সত্যিই রুশীদের কাজ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আপনার নামটা কি মিঃ—

—এন্ ব্যানার্জী। নলিনাক্ষ ব্যানার্জীও বলতে পারেন। সত্যিই আপনার চেহারার সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল আছে।

বাজপাখি বলল—আচ্ছা, আপনি কি কারণে এইভাবে আমার পরিবর্তে এখানে দশবৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে প্রস্তুত হলেন? সামান্য দশ হাজার টাকার বিনিময়ে—

বাধা দিয়ে লোকটি বলল—তা নয় মিঃ বাজপাখি! ওই সময়ে এই টাকাটা না হলে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে হয়ত অনাহারে মরতে হত। উঃ সে কি নিদারুণ দারিদ্র্য···

লোকটির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

—আমি সবই বুঝতে পারছি মিঃ ব্যানার্জী। আমার উপায় থাকলে আমি আপনাকে নির্দয় কষ্ট না দিয়ে নিঃস্বার্থভাবেই ওই টাকাটা দিতে পারতাম। আমার সংগ্রাম তথাকথিত আরামবিলাসী লক্ষ লক্ষ টাকার অধীশ্বরদের বিরুদ্ধে। আপনাদের মত দরিদ্র ও অসহায়দের আমি অনেক যত্নে রক্ষা করে থাকি। কিন্তু বর্তমানে আমি একজন সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত। আমার প্রতিটি মুহূর্ত কি চরম উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কাটছে—

—তা আমি জানি মিঃ বাজপাখি। আর এজন্যে আমি এতটুকুও দুঃখিত নই। বরং এই যে আপনার আকস্মিক দয়ায় আমার ও আমার স্ত্রী-পুত্রের জীবনরক্ষা হলো, এজন্যেই আমি নিজেকে আপনার কাছে পরম কৃতজ্ঞ বলে মনে করছি। এটা বোধ হয় ভগবানের দান। তাঁর করুণা—

খট্ খট্ খট্······

সেনট্রির পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাজপাখি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে লংকোটটি গায়ে টেনে নিয়ে জোরে জোরে বলল—চলি মিঃ বাজপাখি। আবার দেখা হবে।

বাজপাখির বেশে মিঃ ব্যানার্জী চুপ করে বসে রইল।

সেনট্রি বাজপাখিকে সঙ্গে করে গেট পর্যন্ত নিয়ে এল। গেটে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে কার্ডটা পরীক্ষা করে তাকে ছেড়ে দিল।

কারাগারের দরজা পেরিয়ে মুক্ত আলোবাতাসে শ্বাস নেবার সৌভাগ্য অর্জন করে আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল বাজপাখির সারা দেহের উপর দিয়ে।

পেছনে কারাগারের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

*　　　*　　　*

বাজপাখি সামান্য কয়েক পা মাত্র—এগিয়েছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল—স্যর···

বাজপাখি চেয়ে দেখল এ হচ্ছে তার সহকর্মী রশীদ আর তার পাশে দাঁড়িয়ে হোয়াংলী। বাজপাখি এগিয়ে এসে বলল—সব ঠিক আছে ত ?

রশীদ বলল—হ্যাঁ স্যর।

বাজপাখি বলল—সত্যিই আমার দীর্ঘদিন কাজের মধ্যে অনেক সহকর্মীকেই আমার চলার পথে সাথী করে নিতে হয়েছে, কিন্তু ঠিক তোমাদের মত আমার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল আর কাউকেই আমি পেলাম না, রশীদ আর হোয়াংলী।

দুজনেই লজ্জায় মাথা নীচু করল।

বাজপাখি বলল, চল—গাড়িতে গিয়ে ওঠা যাক্।

তিনজনে অদূরে দণ্ডায়মান মোটরটাতে গিয়ে উঠতেই সেটা তীব্রবেগে এগিয়ে চলল মহা-নগরীর দিকে।

কিছুক্ষণ আগেও যে বাজপাখি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় ছিল, সে যে এখন মুক্ত একথা যেন সকলের কল্পনারও বাইরে।

বাজপাখি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

—পাঁচ—

—চক্রান্তের বাষ্প—

গাড়ি এসে থামল কলকাতা শহরের একটা প্রকাণ্ড অঞ্চলের একটি বিরাট বাড়ির সামনে।

বাজপাখি বলল—তুমি আমার পলিসিটা ঠিকই বুঝতে পেরেছ দেখছি রশীদ।

রশীদ হেসে বলল—এত বছর আপনার সঙ্গে কাটিয়ে···

বাজপাখি বলল—হ্যাঁ, বাস করতে হলে এভাবে প্রকাশ্যেই করা উচিত। কেননা, সহরে সমস্ত গলিঘুঁপ্‌চিগুলো পুলিশ প্রায়ই নানা ধরণের সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খোঁজ করে। কিন্তু এখানে এত প্রকাশ্য ভাবে কারও সামান্যতম সন্দেহও হবে না। কিন্তু এখানে আমার নাম কি তা মনে আছে ত?

—হ্যাঁ স্যর, আপনার নাম তরুণ মিত্র।

—অত্যন্ত আনন্দিত হলাম রশীদ। এখন বল ত আমার প্রফেশন কি হবে?

রশীদ বলল—কই সেটা ত আগে বলেননি স্যর।

—ও, বলিনি বুঝি? বেশ, ভাল করে মনে রেখো আমি একজন শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার। এ ছাড়া ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রচুর শেয়ার আমি সুবিধামত খরিদ করে থাকি।

—কিন্তু ওটা ত স্যর মির্জার প্রফেশন।

—তাইত চাই। জান ত, কথা আছে, 'মেন অফ দি সেম প্রফেশন ডাজ্‌ নট্‌ এগ্রি,' মানে একই পেশার কয়েকজন লোক পরস্পরকে সুনজরে দেখে না। আমি তাই চাই। আমি চাই অত্যন্ত অল্পদিনে শেয়ার মার্কেটে একটি স্থায়ী সুনাম।

—আপনার পক্ষে তা করতে অসুবিধা হবে না!

—কেন বল ত রশীদ ?

—আপনি প্রায় সব কোম্পানীর ভেতরের সিক্রেট জানেন। তাই সুযোগ বুঝে শেয়ার কেনা এবং সময় মত তা ছাড়তে পারলেই আপনার লাভও হবে—আর সুনামের জন্যেও ভাবতে হবে না।

—ভেরী গুড্, সত্যই তোমার দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারছি না রশীদ।

—কিন্তু তাতে মিরজাকে জব্দ করা যাবে কোন্ পথে?

অত্যন্ত সহজ সে পথ। বাজারে আমাদের আউট ষ্ট্যাণ্ডিং সুনাম রটে গেলেই মিরজা চেষ্টা করবে আমাদের কোম্পানীর সিক্রেটগুলো বের করতে। এই সময় আমরা আমাদের লোক পাঠাব ছদ্মবেশে। সেই সব সিক্রেট সে জানবে—তবে একটু ভিন্ন। যাক্, এখন ওর বেশী বললে সুবিধে হবে না। তুমি শুধু তিনদিনের মধ্যে বেশ ভাল একটা অফিসের ব্যবস্থা কর।

কথা না বাড়িয়ে রশীদ চা এবং খাবারের অর্ডার দিল একজন বয়কে ডেকে।

বাজপাখি জিজ্ঞেস করল—ক'জন চাকর নিয়োগ করেছ?

রশীদ হেসে বললে—আজ্ঞে, তিনজন।

কোনও প্রয়োজন নেই। একজনেই আমার চলবে। তুমি বরং বাকী অর্থে একজন সুন্দরী এবং স্মার্ট মেয়েকে এ্যাপয়েন্ট কর—টাইপিষ্ট, ষ্টেনো এবং পার্সোন্যাল হিসেবে।

—তাতে লাভ কি হবে স্যর?

—লাভ নেহাত কম হবে না রশীদ। সেই হবে আমার চক্রান্তের ফাঁদের প্রধানা নায়িকা। অর্থাৎ সমস্ত সিক্রেটগুলো বাইরে ছড়াবার জন্যই তার প্রয়োজন।

—বুঝেছি স্যর।

—হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানীর নাম হবে 'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোং'। ঠিক তিনদিনের মধ্যে দোতলার বড় ঘরখানায় কোম্পানীর অফিস বসবে এবং প্রচুর বিজ্ঞাপন দিতে সুরু করা হবে।

বাজপাখিকে নমস্কার করে রশীদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—ছয়—

—মিরজা বনাম ডাটা—

মাত্র ছমাসের মধ্যে যে কোন একটি কোম্পানী বাজারে এতটা আউটষ্ট্যাণ্ডিং সুনাম অর্জন করতে পারে, তা না দেখলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোং'-এর তরুণ মিত্রের নাম শেয়ারের বাজারে সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেকটি রাইভ্যাল কোম্পানী 'টি, কে, মিত্রের' বিজ্‌নেসের সিক্রেট খবরগুলো জানবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে। ইতিমধ্যে মিরজা ওরফে মিঃ ডাটা বাজারে কিছুটা লোকসান দিয়েছে। তার আনুমানিক অঙ্ক হবে প্রায় হাজার সাতেক টাকা।

এই সামান্য লোকসানে অবশ্য মিরজা ভয় পায়নি! তার সঞ্চয়ের পরিমাণ দুলাখ টাকার কাছাকাছি। তাই এই সামান্য লোকসান তার কিছু মনে করবার কথাও নয়।

তবুও টাকার পরিমাণ বাড়াতে কে না চায়?

মিরজা তাই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল এই নতুন কোম্পানীর কিছু কিছু সিক্রেট খবর বের করবার জন্যে।

কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করে এবং অজস্র ঘোরাঘুরি করেও সে যখন এই কাজে ব্যর্থ হয়ে কি করবে ভাবছে, এমন সময় একটা আকস্মিক সুযোগ ঘটে গেল তার।

তরুণ মিত্রের পার্সোন্যাল এ্যাসিষ্টেন্ট ওরফে ষ্টেনো হচ্ছে মিনতি নামে একটি মেয়ে। অসাধারণ সুন্দরী সে। তাছাড়া অন্যান্য যে সব গুণ তার সঙ্গে আছে, তাতে অত্যন্ত সহজে সে যে-কোনও পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে।

মির্জা যখন শেয়ার বাজারের খবরাখবর জানবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সময় একদিন দেখা গেল তার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের অফিসে একজন মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

এই মেয়েটি আসলে 'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোম্পানী'র মিনতি ছাড়া অন্য কেউ নয়।

সামান্য একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা মিঃ ডাটার ছিল না। তাই তিনি তার এ্যাসিটেন্টকে দিয়ে বলে পাঠালেন—মিঃ ডাটা খুব ব্যস্ত। এখন তাঁর পক্ষে দেখা করা সম্ভব নয়। আপনি কে তা তিনি জানতে চাইলেন। এই কাগজটাতে লিখে দিন।

মিনতি কাগজটার বুকে বেশ পরিষ্কার করে লিখল—মিস্ মিনতি হালদার পার্সোন্যাল এ্যাসিস্টেণ্ট অব তরুণ মিত্র।

কাগজটা পড়ে মিঃ ডাটা যেন লাফিয়ে উঠলেন। আশ্চর্য—আর একটু হলেই তিনি একে ফিরিয়ে দিতেন। তিনি তক্ষুণি মিনতিকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই মিনতি বলল—আপনার সঙ্গে যে সব কথা সুব তা একটু নিরিবিলিতে—মানে পার্সোন্যাল।

মিঃ ডাটা স্মিতমুখে বললেন—অবশ্যই মিস্ হালদার। আই র‍্যাম্ সো গ্লাড টু মিট্ ইউ।

মিনতি বলল—কি যে বলেন! আমার মত সামান্য একটি মেয়েকে···

মিনতির অসামান্য রূপলাবণ্যের দিকে চেয়ে মিঃ ডাটা বললেন—আপনি কি পাকাপাকিভাবে আমার এখানে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট চান মিস্ হালদার?

মিনতি বলল—তাহলেই সুবিধে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মত সুন্দর এবং অমায়িক লোককেই আমি মনিব হিসেবে পেতে চাই। কিন্তু মিঃ তরুণ মিত্রের মত বিশ্রী মেজাজ এবং ও ধরণের কুৎসিত ব্যবহার আমি ইতিপূর্ব্বে দেখেছি কিনা সন্দেহ।

মিঃ ডাটা বললেন—আমার কাছে কিন্তু ব্যবহার পাবেন ঠিক উল্‌টো।

—তা দেখেই বুঝেছি।

—বেশ, চলুন পাশের ঘরে গিয়ে আমাদের গোপনীয়···

—না না···

—সে কি মিনতি দেবী

—অফিসে বসে পার্সোন্যাল কথা হয় না।

—তবে কোথায়?

—চলুন বরং কোনও হোটেলে।

—বাঃ, আপনার সাজেশান ত খুব সুন্দর। সত্যিই এত অল্প সময় আপনার সঙ্গে মিশেও আমি আপনার এডমায়ার না করে পারছি না।

দেহকে বিচিত্র ভঙ্গিতে আন্দোলিত করে মিনতি বলল—থাক।

ক্রিং ক্রিং······

কলিংবেল বেজে ওঠে।

বেয়ারা প্রবেশ করে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

—গাড়ি বের করতে হুকুম দাও—বললেন মিঃ ডাটা।

একটু পরেই গাড়িখানা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল কলকাতা মহানগরীর সুপ্রশস্ত পথ ধরে।

* * * *

* * *

গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্রিষ্টল হোটেলের সামনে।

মিনতি বলল—এখানে না।

—কেন?

—এখানে মিঃ মিত্র মাঝে মাঝে আসেন।

—তবে?

—চলুন কোনও নিভৃত হোটেলের দিকে।

—বেশ। আউটরাম ঘাটের বুফেতে গেলে কেমন হয়?

—সত্যই চমৎকার সাজেশান।

—তবে তাই চল।

কথার ফাঁকে ফাঁকে মিঃ ডাটা মিনতিকে তুমি বলে সম্বোধন করে বসল। আর মিনতিও কোনও আপত্তি জানাল না।

গাড়ি ছুটে চলল।

* * *

একটু পরেই গঙ্গার ধারে আউটরাম ঘাট থেকে কিছুদূরে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

দুজনে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে উঠল দোতলায়। গঙ্গার বুকের উপরে ভাসমান রেষ্টুরেন্ট 'বুফে'।

—কি অর্ডার দেব মিনতি?

—যা কিছু।

—বেশ দু'কাপ চা আর গোটা আষ্টেক পেষ্ট্রী।

বয় সেলাম ঠুকে চলে যায়।

—এখন বল মিনতি, কি কি সর্তে তুমি আমার কাছে কাজ করবে।

—আপনি যদি আমাকে আপনার পার্সোন্যাল সেক্রেটারী করতে চান—

—না না, এখন থাক ; তুমি তরুণ মিত্রের কাছেই কাজ কর। শুধু মাঝে মাঝে ওঁর প্রাইভেট সিক্রেটগুলো আমার কাছে এসে বলে দেবে।

—শুধু এইটুকু ?

—হ্যাঁ, আপাততঃ তাই! তবে পরে সুবিধেমত আমার কাছেই এ্যাপয়েন্টমেণ্ট পাবে।

—আপনার কথার বিরুদ্ধে অবশ্য যেতে পারি না। কিন্তু·—·····

—হ্যাঁ, তরুণ মিত্র তোমাকে কত মাইনে দেয় ?

—মাত্র দেড়শো।

—বেশ। তুমি ওর কাছে এই পরিমাণ টাকা ত পাচ্ছই, তা ছাড়া আমি তোমাকে দেব পাঁচশো।

—আপনার যা ইচ্ছে।

—কিন্তু তুমি ওদের সিক্রেট খবরগুলো সব দিতে পারবে ত ?

—নিশ্চয়।

—কি করে ?

—আমি সমস্ত কিছু শেয়ার কেনাবেচার হিসেব রাখি কিনা। বুড়ো হাড়-কিপটে হলেও আমাকে বিশ্বাস করে খুব।

—তরুণ মিত্র কি বুড়ো নাকি ?

—হ্যাঁ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হবে। আর বিশ্রী, বদমেজাজ।

—কিন্তু আপাততঃ তোমায় ওখানে থাকতেই হবে মিনতি। আর সেটা আমার সুবিধের জন্তেই।

—বেশ, তাই হবে।

—তোমার এতে অসুবিধে হবে না?

—কিন্তু সেই অফিসারটার কথা ভাবলেই আমার গা জ্বালা করে।

—বুঝেছি। আচ্ছা, আপাততঃ ওরা কোন্ কোম্পানীর শেয়ার কিনছেন আর কোন্ কোম্পানীর বিক্রী করছেন সে খবরগুলো কি তোমার জানা আছে মিনতি?

—নিশ্চয়ই। এখন ন্যাশানাল ড্রাগের শেয়ার বিক্রী করছেন প্রচুর। আর কেনা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলের শেয়ার।

—বুঝেছি।

—কিন্তু ওই সিক্রেট খবরগুলো আপনাকে দিতাম না। কেবল আপনি বলেই···

—জানি। এজন্যে, আর আমাদের প্রথম দিনের বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ আমি তোমাকে দুশো টাকা দিলাম। ফর মিয়ার প্রেজেণ্টেসেন।

কথা শেষ করে মিঃ ডাটা মিনতির হাতে দুখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দেন।

মিনতি মিঃ ডাটার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

আধঘণ্টা পরে গাড়ি যখন চৌরঙ্গী দিয়ে পাশ করতে থাকে তখন মিঃ ডাটা মিনতির অপূর্ব দেহের দিকে চেয়ে বলে—চলুন, কিছুক্ষণ কার্জন পার্কে গিয়ে বসি, দুজনে নিরালায়।

মিনতি হেসে বলে—আজ থাক। এরপর ত প্রায়ই আমাকে আসতে হবে আপনার কাছে।

—সাত—

—বাজপাখির কূটচক্র—

তিন দিনের পর।

সেদিন সকালে 'টি, কে, মিত্র এণ্ড-কোম্পানী'র কোণের একখানা ঘরে বসে কথা হচ্ছিল মিঃ মিত্র আর তাঁর সহকর্মী রণীদের মধ্যে।

মিঃ মিত্র বললেন—তোমার কি রকম মনে হচ্ছে রণীদ ?

—যতদূর বুঝেছি মির্জা টোপ গিলেছে।

—কিন্তু তোমার এই মেয়েটা কি পারবে ঠিকভাবে চলতে ?

—সত্যই আমার ওর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। প্রথম দিনেই এতটা এগোতে আর কেউ পারত কি না সন্দেহ।

—তা অবশ্যই সত্য।

—আর একটা কথা।

—কি ব্যাপার ?

—প্রথম দিন মিনতি আন্দাজে যে দুটি কোম্পানীর শেয়ার কেনা বেচার কথা বলেছিল, সেটি সত্যই কার্যকরী হয়েছে। মির্জা হাজার দুয়েক টাকা লাভ করেছে। এর ফলে সে এখন মিনতির কথা ঠিক অন্ধের মতোই মেনে চলবে।

—হ্যাঁ, এবার আমরা যে যে কোম্পানীর শেয়ার কিনলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়, সেই সেই কোম্পানীর নামই বলে পাঠাব মিনতিকে দিয়ে।

—সে ত বটেই। কিন্তু মির্জা কতোটা বিশ্বাস করবে ঠিক সেটাই আমি ভাবছি।

—তুমি জানো না রণীদ, পুরুষের মন যখন কোন নারীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন সে তাকে কতটা বিশ্বাস করতে পারে। অর্থ ত সামান্য জিনিস, প্রাণ পর্যন্ত দিতে তার কুণ্ঠা থাকে না। আর

আমরা সেই দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়েই কার্যোদ্ধার করতে চাই। মিরজাকে মিথ্যা হত্যা করে কোন লাভ নাই। আমি চাই তিলে তিলে ওকে অধঃপাতের পথে নামিয়ে আনতে। যে অর্থের মোহে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল, সেই অর্থের শেষ পাই পর্যন্ত নিঃশেষ করেই আমি নেব আমার প্রতিশোধ। আমার এই কূটচক্রের জাল ভেদ করে মুক্ত হবার মতো ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো আছে বলে মনে করি না আমি।

—সেটুকু বিশ্বাস আমার আছে।

—বেশ, মিনতিকে ডেকে পাঠাও রশীদ।

একটু পরেই মিনতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। বাজপাখি তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—তুমি কতদূর সফল হলে মিনতি?

—আমার পথে আর কোন বাধাই নেই।

—বেশ, তুমি এই কোম্পানীগুলোর লিষ্ট নিয়ে যাও। সে প্রশ্ন করলেই তাকে বলবে—এই কোম্পানীগুলোর প্রচুর শেয়ার আমরা দুহাতে কিনছি। এর পেছনে অন্ধের মত সব করলেও তা থেকে লোকসান যাবার ভয় নেই।

আপনার কথা অনুসারেই কাজ হবে স্যর।

মিনতি বাজপাখিকে নমস্কার করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—আট—

—মির্জার বিস্ময়—

মিঃ ডাটার অফিসে পৌঁছেই মিনতি দেখল সারা অফিস জুড়ে যেন উৎসবের আনন্দ সুরু হয়েছে।

প্রথমেই মিনতি প্রবেশ করল মিঃ ডাটার ঘরে।

মিঃ ডাটা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন—এসো মিনতি। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি।

—সে কি স্যর?

—হ্যাঁ, আমি আজ বিরাট এক দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেলাম।

—আপনার কথা যেন হেঁয়ালীর মতোই শোনাচ্ছে স্যর।

—না না, ভয়ের কিছু নাই। আমার এক বিরাট শত্রু পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চলেছে। আমি আজ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা কাটিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছি।

—কে আপনার এই শত্রু?

—বাজপাখির নাম শুনেছ?

—বাজপাখি? সে কি কোনও জীবজন্তু?

—না, বিরাট এক দস্যু দলপতি।

—সে-ই কি আপনার শত্রু?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছে তার?

—সে কারাগারে বন্দী ছিল। সে মুক্ত হলে অবশ্য আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু এইমাত্র খবর পেলাম সে মৃত্যুমুখে পতিত হতে চলেছে।

—তাই নাকি ?

—হঁ্যা, এই টেলিগ্রামটা পড়ে দেখ।

মিঃ ডাটা মিনতির হাতে একটা টেলিগ্রাম তুলে দেয়।

মিনতি পড়ে দেখে সেখানা।

তাতে লেখা :

তেইশ নম্বর মৃত্যুশয্যায়।

কোনও দিন আর বেঁচে উঠবে এ আশা নেই।

মৃত্যুর পূর্বে সে কোন কথাই বলছে না। আজ রাত্রির মধ্যেই

তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে!

—জেল সুপার

টেলিগ্রামখানা পড়ে দেখে মিনতি বলল—এই তেইশ নম্বরই কি বাজপাখি নাকি ?

মিঃ ডাটা বল্লে—হঁ্যা, ইনিই সেই বিখ্যাত বাজপাখি।

কিন্তু আপনার মতো নির্বিরোধী লোকের সঙ্গে তার হঠাৎ শত্রুতা হলো কি ভাবে ?

—ব্যাপারটা অত্যন্ত সামান্য। কোনও একটা ব্যাপারে আমি ওর বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলাম। এতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে—জেল থেকে ফিরে এসে তোমাকে দেখে নেব।

—এ কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়।

—অন্যায়টাই ত দস্যুদের পেশা।

—কিন্তু একটা কথা মিঃ ডাটা।

—কি কথা বলো।

—আমার মনে হচ্ছে, আমি সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে মিরণা নামে একজন সহকর্মীর মিথ্যা সাক্ষ্যে বাজপাখির জেল হয়েছিল।

—মির্জা! অবাক বিস্ময়ে মিঃ ডাটা ওরফে মির্জা প্রশ্ন করে।
হ্যাঁ মিঃ ডাটা!

—এ রকম অদ্ভুত নাম আমি জীবনে শুনিনি কখনও।

—তাই নাকি! তা হতে পারে। যাক, এদিকের খবর খুব ভাল।

—কি রকম?

—এই লিষ্টটা দেখুন।

—কিসের লিষ্ট এটা?

ওরা যে যে কোম্পানীর শেয়ার কিনছেন, সেই সেই কোম্পানীর একটা বিরাট লিষ্ট তৈরি করে এনেছি।

—তুমি ঠিক জান ত?

—হ্যাঁ, তবে আপনাকে জোর করে বলতে পারি না যে আপনিও এই কোম্পানীগুলোর শেয়ার কিনুন।

—তা ত বটেই।

—হাজার হলেও এ একটা জুয়াখেলা।

—জুয়াখেলা হলেও তরুণ মিত্র যে কোম্পানীর শেয়ার কিনছে তার সংবাদ পেয়ে আমি সে খবর হেলায় নষ্ট করতে পারি না।

—সে অবশ্যই সত্যি।

—লোকটার স্পেকুলেশ্যান অদ্ভুত।

হ্যাঁ, বুড়োটা বদমেজাজী হলেও, ওর এই বাজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাটার প্রশংসা করি আমি।

কথা শেষ করে মিঃ ডাটা মিনতির দেওয়া লিষ্টটার উপরে চোখ বুলিয়ে যেতে থাকে।

চোখ বুলিয়ে মিঃ ডাটা বলে—আমি যতদুর জানি বাজারে এই কোম্পানীর প্রত্যেকটির সম্বন্ধে অজস্র দুর্নাম। সকলেরই ধারণা এই কোম্পানীগুলো ফেল পড়বে। তাই তরুণ মিত্র সস্তায় এদের প্রচুর

শেয়ার কিনে চড়া দামে পরে বিক্রী করবে এই মতলব করেছে নিশ্চয়ই।

কথা শেষ করে মিঃ ডাটা ফোন তুলে নেয়।

—হ্যালো···

—কে···

—আমি মিঃ ডাটা কথা বলছি।

—সে কি ?

—হ্যাঁ, এক্ষুণি আপনার সঙ্গে জরুরী প্রয়োজন। আপনিই তো নিউ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ?

—হ্যাঁ।

—আমি মিঃ ডাটা কথা বলছি। কতকগুলি সিক্রেট নিউজ পেয়েছি অন্ত কোম্পানী থেকে। আপনার ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওভার ড্রাফ্‌ট চাই।

—এক্ষুণি ?

—হ্যাঁ;

—অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করি না। কিন্তু বিকেলের দিকে হলে সুবিধে হতো

—না, আমি আমার সহকারী সিন্‌হাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি তার হাতে টাকাটা এক্ষুণি দেবেন। আজকের মধ্যে না কিনতে পারলে দর চড়ে যেতে থাকবে।

—বুঝেছি বেশ, আপনার কথামতোই কাজ হবে মিঃ ডাটা।

ডাটা ফোন ছেড়ে দিয়ে মিনতির দিকে চেয়ে বলে—সত্যিই, তুমি অপূর্ব মিনতি। তোমাকে এই তিনদিনের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছে কতো বড়ো আপনার জন। ইউ আর এন এ্যাঞ্জেল্‌।

মিনতি অপূর্ব হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। মিঃ ডাটা তার দিকে দু'পা

এগিয়ে যায়। এমন সময় তার গতিতে বাধায় সঞ্চার করে কে যেন বাইরে থেকে বলে ওঠে—মে আই কাম ইন্?

—ইয়েস্।

ঘরে প্রবেশ করে মিঃ ডাটার সহকারী সিন্‌হা। সিন্‌হা বলে—আমাকে খুঁজছিলেন কেন স্যর?

—তোমাকে এক্ষুণি নিউ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কে যেতে হবে।

—সে কি স্যর?

—হ্যাঁ, সেখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওভারড্রাফট্ নিচ্ছি আমি। তুমি শুধু এই শেয়ারগুলো কিনে ফেলবে। এই লিষ্টটা আমি 'টি কে মিত্র এণ্ড কোম্পানী' থেকে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি।

—দেখি।

—সিন্‌হা শেয়ারের লিষ্টটার উপরে চোখ বুলিয়ে বলে উঠে—সত্যি কথা বল্‌তে কি স্যর 'টি কে মিত্র কোম্পানী'র গোপন খবর না হলে আমি বলতাম, এই শেয়ারগুলো কেনা মানে টাকা জলে ফেলা।

—তা আমিও জানি সিন্‌হা।

—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঠিক উল্‌টো। এই শেয়ারগুলো ঠিক মাটির দামে কিনে পরে যদি এর দাম চড়ে যায় তবে অগ্নিমূল্যে বিক্রী করা সম্ভব হতে পারে।

ঠিক তাই। আর এজন্যে কৃতিত্ব প্রাপ্য আমার এই নিউ ফ্রেণ্ডের।

মিনতির দিকে চেয়ে সিন্‌হা বলে—নমস্কার ম্যাডাম। আপনাকে যেন ইতিপূর্বে 'টি কে মিত্র কোম্পানী'তে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

মিনতি হেসে বলল—হ্যাঁ, আমি তরুণ মিত্রের পার্সোন্যাল এ্যাসিষ্টেণ্ট।

—পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আপনার কৃপায় এখন আমাদের কোম্পানীও একটু দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে।

নমস্কার জানিয়ে সিন্‌হা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—নয়—

—মিনতির পরিবর্তন—

মিঃ ডাটা লোকটাকে বাইরে থেকে দেখতে যতো সহজ ও সাধারণ বলে মনে হয়, আসলে সে যে তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক চতুর তা দিনকয়েকের মধ্যেই টের পেল মিনতি।

শেয়ার এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জের বাজারে বিভিন্ন খবরাখবর সেও যে কিছু না রাখে তা নয়, তবে কেবল 'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোম্পানী'র নামেই তাকে অনেকটা বোকা বানান সম্ভব হয়েছিল। তবে প্রচুর টাকার শেয়ার কেনার পরও সে বাজারে ওই সব কোম্পানী সম্বন্ধে নানা বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে লাগল।

কিন্তু কোনও বিশেষ সংবাদ না পেয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। অতি অল্প দিনের মধ্যে সব কোম্পানীর শেয়ার দরের দ্রুত উন্নতির কোনও সম্ভাবনাই নেই।

ইতিমধ্যে কয়েকদিনের মধ্যেই মিনতি আরও গোটা আষ্টেক কোম্পানীর আর একখানা লিষ্ট নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

মিঃ ডাটা এবারে শেয়ার কেনবার আগে কিছুটা চিন্তা করে মিনতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—তুমি সঠিক সংবাদ এনেছ ত মিনতি ?

অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে মিনতি বলল—আমি ত আগেই বলেছি, সঠিক সংবাদ ছাড়া কোনও কিছু জানাই না। তবে একথা আমি বলেছি যে, আমার কথার উপরে নির্ভর করেই তুমি টাকা ইন্‌ভেষ্ট ক'রো না। তোমার মন যদি সায় না দেয়, তবে মিথ্যা তোমাকে চাপ দিতে চাই

আমি···

মিনতির নিবিড় অভিমানভরা চোখের দিকে চেয়ে মিঃ ডাটা বললেন—তোমার জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি মিনতি, এই পরিমাণ টাকা ত সামান্য কথা!

মিনতি বলে—থাক্, অতোটা সেন্টিমেণ্টালিটি আমি পছন্দ করি না। তুমি ব্যবসা করবার জন্যে অফিস খুলছ, আমার চেহারা দেখবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়!

মিঃ ডাটা অবাক হয়ে বললেন—তুমি এভাবে, আমার মনে আঘাত দিচ্ছো মিনতি?

—আঘাত যদি পাও, আমি কি করে তা রুখব?

—বেশ, এই কোম্পানীগুলোর শেয়ার কিনে আমি প্রমাণ করব যে আমি সত্য কথা বলছি কি না।

—সে কিনবে তোমার নিজের স্বার্থে, আমার জন্যে নয়...

—কিন্তু আমার স্বার্থ আর তোমার স্বার্থ অভিন্ন মিনতি......

—অর্থাৎ?

—সেটা কি বুঝিয়ে না বললে বুঝবে না মিনতি?

—না, তবুও আমি স্পষ্ট করে শুনতে চাই। তোমার এতদূর স্পর্ধা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে। তোমার কাছে চাকরী করা মানে নিজের সত্বাকে বলি দেওয়া, নয়?

—সে কি মিনতি? তুমি এভাবে আঘাত দিতে পার?

—আমাদের সম্বন্ধটা চাকরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। আমি এতদিন বন্ধুত্ব বলে যেটাকে ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তুমি তার অন্যপ্রকার অর্থ করছ। তাই বাধ্য হয়েই তোমাকে জানাচ্ছি। আচ্ছা চলি আজকের মতো।

—কিন্তু একটা কথা মিনতি—

—কি কথা?

—আমি তোমাকে প্রেজেন্ট দেবার জন্তে একটা নেকলেশ—

—না না, আমার প্রাপ্য মাইনের উপরে একটি পয়সাও আমার প্রয়োজন নেই তোমার কাছ থেকে।

—সেকি ? বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন…

—না, এখন আমাদের সম্পর্ক শুধু কাজের এবং অর্থের। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে তুমি পদদলিত করেছ—

—তুমি—তুমিও এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছিলে মিনতি।

—ভুল সেটা। ভুল আমার নয়, তোমার। তুমি যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকে অন্য কিছু মনে করেছ সেটাতে দুঃখ পাওয়া উচিত তোমার—আমার নয়।

কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিনতি।

মিঃ ডাটা সিন্‌হাকে ডেকে বললেন—এই আটটি কোম্পানীর লিষ্ট এইমাত্র পেলাম। এদের পেছনেও পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনভেষ্ট করবার ব্যবস্থা কর সিন্‌হা।

—কিন্তু কোনও ব্যাঙ্ক আর ওভারড্রাফট দিতে চাইবে না যে !

—না, প্রয়োজন হলে ষ্টক শেয়ারগুলো বিক্রী করবার ব্যবস্থা করো সিন্‌হা। আমি চাই যে কোনও উপায়ে হোক ওগুলো আজই কিনে ফেলতে।

—দশ—

—বাজপাখির প্রতিশোধ—

এর পর দিন সাতেক কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে যে কোম্পানীর শেয়ার মিরজার কেনা ছিল, তাদের বাজার দর হু হু করে নেমে চলেছে।

সেদিন বেলা দশটা।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে অফিসে প্রবেশ করল মিরজা।

অফিসে প্রবেশ করতেই তার চোখে পড়ল বিরসমুখে এককোণে বসে আছে সিন্‌হা। তার মুখে যেন বিশ্বের পাণ্ডুরতা।

—কি হল সিন্‌হা?

—ব্যাপার গুততর স্যর।

—কেন? কি হয়েছে হঠাৎ?

—শেয়ারের দর হু হু করে নেমে যাচ্ছে।

—সে খবর ত জানা আছে আমার।

—আর বাজারে আমাদের ধার নেওয়া ত চলবেই না, উল্‌টে এখনই সমস্ত কোম্পানীগুলো এমন অবস্থা সুরু করে দিয়েছে যে কোম্পানী তুলে দিতে হবে।

—সে কি সিন্‌হা?

—হ্যাঁ। যে সব ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের ওভারড্রাফট নেওয়া ছিল, তারা সব একযোগে ফোন করেছিল। তারা এক্ষুণি টাকা ফেরত চায়।

—কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়া ত অসম্ভব।

—তা আমিও জানি স্যর। তার জন্যেই ত এতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

—এখন উপায় ?

—একমাত্র উপায় আছে স্যর।

—কি উপায় শীগগির বল।

—যদি অন্য কোথাও থেকে সব ব্যাঙ্কের ঋণের অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ টাকা নগদ এনে দিতে পারেন তবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

—সে অসম্ভব সিন্‌হা।

—তাহলে উদ্ধারের আর কোনও পথ জানা নেই আমার।

—কিন্তু মিনতি কোথায় ?

—কে মিনতি ?

—সেই মেয়েটা।

—তার কোনও খবরই পাওয়া যায়নি এর মধ্যে। সে সেই দিন যে রাগ করে চলে গেল তারপরে আর আসেনি।

—তাহলে কি উপায় এখন ?

—কোনও উপায় নেই স্যর।

— তাহলে ত কোম্পানীকে লিকুউডেশনে দিতে হয়।

—শেষ পর্যন্ত কি এই আমাদের ভাগ্যে ছিল স্যর ?

দুজনের মুখে কথা নেই।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

ফোনটা বেজে ওঠে।

—কে ?

—আমি, মির্‌জা।

—আমি কে ?

—তোমার পুরাণো প্রভু বাজপাখি—যাকে তুমি একদিন পথের ধুলায় নিয়ে বসিয়েছিলে, আজ সেই ফিরে এসেছে তোমার দুর্দিনে।

—অসম্ভব। বাজপাখি জেলে মারা গেছে।

—হাঃ হাঃ হাঃ…সে অন্যলোক। আর আজ তোমার যে দুর্দশা তার মূলেও আমি। আমি আর তরুণ মিত্র অভিন্ন লোক।

—তুমিই তরুণ মিত্র—শয়তান। তাহলে মিনতি তোমারই অনুচর?

—অবশ্যই।

—উঃ তোমার শয়তানীর কথা ভাবতেও শিউরে উঠছি আমি।

—হ্যাঁ, যে টাকার লোভে তুমি একদিন আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে, সেই টাকার শেষ অঙ্ক পর্যন্ত ছিনিয়ে নিলাম আমি—

—স্কাউণ্ড্রেল।

—কথা শেষ করেই মিরজা ফোন রেখে দিল। তারপর কি মনে করে ফোন তুলে দীপক চ্যাটার্জীর নম্বর চাইল।

—হ্যালো কে?

—দীপক চ্যাটার্জী, ডিটেকটিভ।

—বাজপাখি পালিয়েছে স্যর।

—সেকি? সংবাদ পেলাম সে মৃত্যুমুখে।

—না, সেটা ভুল সংবাদ স্যর। বিখ্যাত শেয়ার ব্রোকার তরুণ মিত্র আর বাজপাখি অভিন্ন লোক।

—সেকি?

—হ্যাঁ, সে আজ আমাকে নিঃস্ব, রিক্ত পথের ভিখারীতে পরিণত করেছে। আপনি এক্ষুণি তাকে গ্রেপ্তার করুন স্যর। নইলে আমার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন।

—আচ্ছা দেখছি।

—এগারো—

—অনুসন্ধান—

সদলবলে পুলিশ গিয়ে হানা দিল 'টি কে মিত্র এণ্ড কোম্পানী'র অফিসে।

কিন্তু কারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

তরুণ মিত্র—বিখ্যাত শেয়ার ব্রোকার ও শেয়ার পারচেজার যেন হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে।

কয়েক ঘণ্টা পরে দীপক ফিরে এলো হতাশ হয়ে। বাড়িতে বসে সে অবাক হয়ে বাজপাখির ক্ষিপ্রকারিতার কথা ভাবছে এমন সময় ফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

—হ্যালো কে?

—বাজপাখি।

—বাজপাখি?

—হ্যাঁ।

—কারাগারের পাষাণ প্রাকার ভেদ করে পলায়ন করেছ তুমি?

—সেটা কি এতক্ষণ পরে বুঝতে পারছ?

—না বুঝেছি সামান্য আগে।

—হ্যাঁ শয়তান মির্জাকে পথের ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছি আমি। ওর জীবনের অবশিষ্ট অংশের প্রতিটি মুহূর্ত কাটবে করুণ বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে। নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে সে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে একমুঠো অন্নের আশায়।

—কিন্তু তুমি?

—হ্যাঁ, আমার অভিযান অব্যাহত গতিতে চলবে। দিক থেকে দিগন্তরে ধ্বনিত হবে আমার বিজয়রথের চক্রধ্বনি। আচ্ছা চলি দীপক। আশা রইল ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে।

শব্দ মিলিয়ে যায়।

বাজপাখি কি অভিনব কূটচক্রের জাল রচনা করে মির্জাকে কি অদ্ভুতভাবে শাস্তি দিয়েছে তা ভাবতে ভাবতে দীপক তন্ময় হয়ে পড়ে।

বাইরে রাত্রি নামে।

সমাপ্ত

এর পরের ঘটনা জানতে হলে "বাজপাখির মারণ মহোত্‌সব" পড়ুন।

—শুধু দুটি দাগ

শ্রীস্বপন কুমার

ঘটনাটি বহুদিন পূর্বের।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তখন সবে দু' একটা কেসে হাত দিয়ে সামান্য খানিকটা সুনাম অর্জন করেছে।

পুলিসের দু' একজন অফিসার কোনও কোনও বিষয়ে জরুরী প্রয়োজন হলে তার সাহায্য নিয়ে থাকে।

বেলা প্রায় এগারোটা কি তার কিছু বেশি হতে পারে।

দীপক তার চেয়ারে বসে দু' একটা পুরোনা জটিল কেসের তদন্ত ব্যাপারে কি করা যায় এ সব নিয়ে চিন্তা করছিল।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

বেজে উঠল টেলিফোনটা।

—হ্যালো কে?

—আমি দারোগা বঙ্কিমবাবু কথা বলছি। শ্যামপুকুর থানা থেকে বলছি আমি। একটা ইনট্রিকেট্ মানে জটিল কেসে সাহায্য চাই আপনার। আপনি যদি সময় করে একবার...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু কেসটা কি ধরনের?

গ্রিভিয়াস্ হার্ট। মানে গুরুতর রকমের আঘাত...

—ও, ভিকটীম কে? মানে কাকে আঘাত করা হয়েছে বঙ্কিমবাবু?

—বাগবাজারের একজন ভদ্রলোককে।

—তিনি কি আঘাতকারীকে দেখতে পাননি?

—না।

—কিভাবে আঘাত করা হয়েছিল ?

—পেছন থেকে এসে আততায়ী এমন সহসা তাঁকে দুটি ঘুসি মারে যে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান। তারপর তাঁর কাঁধে একটি ছোরা বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—তিনি এখনও বেঁচে আছেন কি ?

—হ্যাঁ, হাসপাতালে আছেন। অবস্থা সঙ্কটজনক। বাঁচবেন কি না ঠিক করে বলা যায় না। তবেডাক্তারবাবু বলেছেন, আশা আছে।

—স্পটটা দেখেছেন।

—হ্যাঁ, কোনও সূত্র পাইনি।

—ওকে যখন আঘাত করা হয় তখন রাত কটা বেজেছিল তা কি আপনি বলতে পারেন ?

—হ্যাঁ সেদিন রাত প্রায় দশটায় উনি আহত হন। ও অঞ্চলে ও সময় লোকজন একেবারে থাকে না বললেই চলে। সেই সুযোগেই আঘাতকারী ওঁকে আঘাত হানে।

—আচ্ছা, আমি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি, আপনিও সেখানেই চলুন। ওখানেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি আহত ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—ধন্যবাদ।

দীপক টেলিফোনটা রেখে বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

*　　*　　*

*　　*

হাসপাতালে পৌঁছে দীপক দেখতে পেল বঙ্কিমবাবু তার আগেই হাসপাতালে এসে অপেক্ষা করছেন।

ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে দুজনে প্রবেশ করল রোগীর কক্ষে সেখানে আহত বিমলবাবু চুপচাপ শুয়েছিলেন।

বিমলবাবুর জ্ঞান ছিল বেশ খানিকটা।

দীপক প্রশ্ন করল—কাল রাতে যে আপনি আহত হবেন এ ধরনের কোনও রকম কিছু আন্দাজ আপনি আগেই করতে পেরেছিলেন কি?

বিমলবাবু বললেন—না।

—আচ্ছা আঘাতকারী আপনার কোন্ জায়গায় আঘাতটা করেছিল?

—সে আমার চোয়ালে সজোরে ঘুসি মেরেছিল।

—কোন চোয়ালটা?

—এই ডানদিকে।

—দেখি। দীপক মনোযোগ দিয়ে ডানদিকের চোয়ালটা বেশ ভাল করে দেখে বললে—এই জায়গায় না?

—হঁ্যা।

—দীপক সেখানে বেশ মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখল। তারপর পকেট থেকে একটা ম্যাগ্নিফাইং লেন্স বের করে সেই জায়গায় বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বলল—ঠিক আছে। তারপর দ্বিতীয় আঘাতটা করেছিল কোন্ জায়গায়?

—মাথায়।

—ওখানেও নিশ্চয়ই এমনি দাগ পড়েছে। কিন্তু চুলের মধ্যে সেটা দেখা যাবে না। কিন্তু এ দুটি দাগই আমাকে খুনী খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

—সে কি দীপকবাবু?

...হঁ্যা, আচ্ছা আপনার কি বাগবাজার অঞ্চলে কোনও শত্রু অথবা ঐ ধরনের লোক আছে?

...না।

—সেখানে আপনার কোনও শত্রুই নেই ?

—না।

—আচ্ছা আপনার পরিচিত কে কে সেখানে আছে ?

—পরিচিত অনেক আছে। তার মধ্যে মনে পড়ছে যে ক'জনের নাম তাই বলছি। পঞ্চু, অসিত, কানু, গোবিন্দ, বিনয়, ভূধর এই ক'জন লোকেরই আমার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।

দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা গোবিন্দবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়টা কি রকম ? কোনও রকম শত্রুতা ?

—সাধারণ যে রকম হয়ে থাকে। কোনও শত্রুতা নেই।

—বেশ। সম্পর্কটা কি ?

—বন্ধুত্ব।

—উনি কি কাজ করেন ?

—উনি আমার কারবারে দেখাশুনা করেন।

—আচ্ছা আপনি মারা গেলে উনি যদি আপনার কারবারটা বে-দখল করবার চেষ্টা করেন, আপনার উত্তরাধিকারীরা তাকে বাধা দিবেন কি ?

—সেটা অবশ্য খুবই কঠিন। কিন্তু গোবিন্দ আমার বন্ধু। সে হঠাৎ এতবড় শত্রুতা···

—হ্যাঁ বিমলবাবু। গোবিন্দবাবুই আসল অপরাধী। এই দেখুন সে আপনার চোয়ালে যে আঘাত করেছিল তাতে ওখানে অর্থাৎ আপনার চোয়ালে আংটির দাগ পড়েছে। দাগের ওপর তার নামের প্রথম অক্ষর 'গ' আপনার চোয়ালে ফুটে উঠেছে। সেটাই আমি ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্স দিয়ে দেখছিলাম।

—সে কি ?

হ্যাঁ, এই দাগই আসল খুনীকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করল। বিমলবাবু।

দীপক বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল বাগবাজারের উদ্দেশ্যে।

*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

বাগবাজারে পৌঁছেই দীপক গোবিন্দবাবুর বাড়ি গিয়ে হানা দিল। বেলা তখন তিনটে!

গোবিন্দবাবু স্নান খাওয়া শেষ করে সবে বের হবার উদ্যোগ করেছেন, এমন সময় দীপক তার সঙ্গে দেখা করল।

—আপনি কে?

—আমি গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আর ইনি পুলিশের দারোগা বঙ্কিমবাবু।

—আপনারা কেন হঠাৎ এখানে এসেছেন?

—কারণটা সামান্যই। বিমলবাবুকে খুন করবার চেষ্টায় অপরাধে আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করতে চাই।

মুহূর্তে গোবিন্দবাবুর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল। একটু পরেই সে এক লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল।

বাইরে দুজন পুলিশ অপেক্ষা করছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলল।

ধরা পড়ে গোবিন্দবাবু যে অপরাধ স্বীকার করেছিল এবং তার তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল তা বিস্তৃত না বললেও চলবে।

এই বহু পুরোণো ঘটনাটি দীপক কখনও সারাজীবনে ভুলতে পারেনি। সামান্য দুটি দাগ থেকেই একটি খুনীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল সে।

———

পাতায় পাতায় আতঙ্ক, চক্রান্ত, রহস্য, রুদ্ধশ্বাসকারী
ঘটনাচক্র, পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হবে।

ড্রাগন সিরিজ

শ্রীস্বপনকুমার রচিত। প্রতিটি মূল্য—১·২৫

১। ড্রাগনের আবির্ভাব	৭। সাগরতলে ড্রাগন
২। রক্তলোলুপ ড্রাগন	৮। মরণজয়ী ড্রাগন
৩। আকাশ পথে ড্রাগন	৯। আন্তর্জাতিক চক্রে ড্রাগন
৪। ছদ্মবেশী ড্রাগন	১০। মহাশূন্যে ড্রাগন
৫। ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগন	১১। পাতাল পুরীতে ড্রাগন
৬। অজানা দ্বীপে ড্রাগন	১২। ড্রাগন ও দস্যুনেত্রী চপলা

এর পরে আরও বের হতে থাকবে

আমাদের প্রকাশিত আর একটি আকর্ষণীয় রহস্য উপন্যাস গ্রন্থমালা

'ক্রাইম ওয়ার্ল্ড সিরিজ'

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীস্বপনকুমার রচিত। প্রতিটি মূল্য: ২·০০

১। অপরাধী	৬। বিচারক
২। কে তুমি ?	৭। ন্যায়দণ্ড
৩। জিঘাংসা	৮। অন্তরাল
৪। বিশ বছর পরে	৯। কার পাপে ?
৫। কালোছায়া	১০। আগন্তুক

এর পরে আরও বের হতে থাকবে

রাধা পুস্তকালয়

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাজপাখীর
মারন মহোৎসব
শ্রীস্বপন কুমা
SAILESH PAUL

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বাজপাখি সিরিজ—১০ নং

বাজপাখির

মারণ-মহোৎসব

শ্রীস্বপনকুমার

পুনর্মুদ্রণ

জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, (১১৫এ আপার চিৎপুর রোড)
কলিকাতা-৭০০০০৬

৩৮৫ সাল

মূল্য: ১·২৫ টাকা

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিণ্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

সবচেয়ে সেরা ও উত্তেজনাপূর্ণ
ডিটেকটিভ সিরিজ

অনবদ্য রচনা-নৈপুণ্যে, প্রচ্ছদের তিনরঙা ছবিতে
আর সবচেয়ে অল্পদামে যে কোনও পাঠকের
মনোহরণ করতে সক্ষম।

ডিটেক্‌টিভ সাহিত্যের যাদুকর
শ্রীস্বপনকুমারের লেখা
"—বাজপাখি সিরিজ—"

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি
২। বাজপাখির পুনরাভিযান
৩। বাজপাখির রক্তলীলা
৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার
৬। হত্যাকারী বাজপাখি
৭। বাজপাখির রহস্যজাল
৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র
১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

প্রত্যেকখানির দাম মাত্র এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

মুদ্রক : শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, জেনারেল প্রিণ্টার্স, ৪৫০বি, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৫

—এক—

পূবের আকাশে এখনও উষার আলোকরেখা দেখা দেয়নি। পাখিরা শুরু করেনি প্রভাতী সংগীত।

মাঝরাতে কলকাতার উত্তরদিকে শহরতলীর এই ঘিঞ্জি অঞ্চলটাতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথের মাঝে কিছু কিছু জল জমে রয়েছে তখনও। বৃষ্টিসিক্ত পথে পথিকের আনাগোনা প্রায় বন্ধ।

ঠিক এমনি পরিবেশে সরু রাস্তা ধরে চারিদিকে চাইতে চাইতে ধীর পদে যে লোকটা এগিয়ে চলেছিল তার ভাবভঙ্গি দেখে কিছুটা সন্দেহ জাগা যে-কোনও লোকের পক্ষেই সম্ভব। গায়ের ওপর ভারী রেনকোট চাপান। মাথার টুপিটা সামনের দিকে এমনভাবে নামানো যে তাতে মুখের উপরাংশ সাধারণের কাছে প্রায় অদৃশ্য। পায়ের ভারী বুটটাতে জল এবং কাদায় মাখামাখি।

একটা ছোট্ট টিনের চাল দেওয়া বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেকেণ্ড দুয়েক কি যেন ভাবলে সে।

টক্ টক্ টক্…

পর পর তিনটি টোকা পড়ল দরজায়।

কোনও সাড়া নেই।

আবার শব্দ—

টক্ টক্ টক্…

বাইরের জোলো হাওয়ার করুণ নাকী কান্না যেন এই শব্দের তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর জ্ঞাপন করল।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা লোকটির জীবনে প্রথম। সে যখন যেখানেই গেছে আগে থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে। তাই কোনওদিন এভাবে তাকে ব্যর্থতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি।

বাড়ীর জীর্ণ অবস্থা দেখে লোকটার মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। তবে কি এখানে যে থাকত সে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত? কিন্তু সে ত চিরদিনই নির্দিষ্ট নিয়মে তার উদ্দেশ্যে টাকা পাঠিয়েছে।

বার দুয়েক পায়চারি করে লোকটি এক সময় জীর্ণ বাড়িখানার পেছন দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল।

নিরন্ধ্র আঁধার যেন বাড়িখানাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করে রেখে অদ্ভুত এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। না, আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যেতে পারে না। লোকটি মনস্থির করে ফেলল। এক্ষুণি বাড়ীর ভিতরে তাকে প্রবেশ করতে হবে।

প্রাচীরটা টপ্‌কে বাড়ির উঠোনে লাফিয়ে পড়ল সে। ধুপ্‌ করে শুধু শব্দ হল একটা।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিতেই ভেসে এলো একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরে পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বাললো সে।

একি!

বিস্ময়ে লোকটির মুখে কোন কথা ফুটল না।

ঘরের কোণে বসে রয়েছে তার বহুদিনের প্রভুভক্ত সঙ্গী ও সাহসী রোশনলাল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। বুকের ওপরে একটি বিরাট ছোরা আমূল বিদ্ধ।

লোকটির মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে। বার দুয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি করল সে। কিন্তু না, কোনও সূত্রই নেই। এবার মৃতদেহের ওপর টর্চটা ফেলে চাইতেই একটা জিনিষ তার চোখে পড়ল। মৃতের

চোখের পাশে একটা পিন্ ফুটানো রয়েছে—আর তার সঙ্গে আটকানো রয়েছে একটা ছোট্ট কাগজ। তাতে একটা লাল ফুটকি।

লাল ফুটকি !

লোকটির সারা দেহের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। এ ত সেই সামসুল সর্দারের দলের চিহ্ন! কিন্তু সামসুল সর্দার এলো কোত্থেকে ? সে তো দীর্ঘদিন আগে তারই হাতে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিল। তবে কি সে মরেনি ? তবে কি মরণ-সাগরের ওপার থেকে প্রাণ পেয়ে ফিরে এলো কোনও একটা প্রতিহিংসাকামী সৈনিক ?

উত্তেজিতভাবে বারকয়েক পায়চারি করে লোকটি বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। না, এভাবে আর এ ঘরে সে এক মুহূর্তও কাটাতে পারবে না।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই তীব্র একটা হুইশেলের শব্দে লোকটির চমক ভাঙল। ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখে, দূর থেকে পাঁচ ছ'জন লোক যেন তারই দিকে ছুটে আসছে।

ওরা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী পুলিশ।

লোকটির মাথার মধ্য দিয়ে চিন্তার প্রবাহ খেলে গেল।

তাহলে সামসুল সর্দার নিশ্চয়ই তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশে খবর দিয়েছে। আর বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী বাজপাখির নাম শুনলে তার দলবল নিয়ে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্ত থেকে ছুটে আসবে।

কিন্তু না। বাজপাখিকে ধরা অত সহজ নয়। সামান্য দু'চারটে পুলিশের সাধ্য নেই বিখ্যাত দস্যুসর্দার বাজপাখিকে গ্রেপ্তার করে।

দ্রুতগতিতে নিঃশব্দ মার্জারের মত বাঁ দিকের একটা বাড়ির ওপরে উঠে বসল সে। সেখান থেকে হালকাভাবে লাফ দিয়ে পড়ল পাশের বাড়ির ছাদে। তারপর নিরন্ধ্র আঁধারের বুকে সে যে কিভাবে মিলিয়ে গেল তার সামান্যতম চিহ্নও প'ড়ে রইল না পৃথিবীর বুকে।

বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী, তার সহকারী রতনলাল আর পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই চমকে উঠলেন।

ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ, তার চোখের ওপর পিন্ দিয়ে আটকানো একটি লাল ফুটকি।

কিন্তু লাল ফুটকি কেন?

সকলে অবাক হয়ে যায়। এটা ত বাজপাখির চিহ্ন নয়! কিন্তু ওকি! একটু ভাল করে খুঁজতেই ঘরের কোণে পাওয়া গেল একখানা কার্ড। তাতে লেখা রয়েছে বাজপাখির নাম। আর আঁকা রয়েছে একটি বাজপাখির ছবি। ঠিক যেন শিকারের উপরে লাফিয়ে পড়বার জন উদ্যত।

কিন্তু এদের দু'জনের একই সঙ্গে এখানে আবির্ভাব ঘটল কি করে? আর বাজপাখির দীর্ঘদিনের সহচর রোশনলালকেই বা হত্যা করল কে?

—দুই—

প্রতিকূল বাতাস কেটে ট্রেনখানা ছুটে চলেছিল দু'ধারে ঘন জঙ্গল আর মাঝে মাঝে দু'একটি বস্তির মধ্য দিয়ে।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের যে দু'জন যাত্রী—তাদের মধ্যে একজন ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তখন নিবিষ্টচিত্তে ডায়েরী থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দেখছিল—তাতে লেখা: 'সামসুল' এবং লাল ফুটকি।

এক সঙ্গে দু'জনের আবির্ভাব।

আশ্চর্য!

রতনলাল বাইরে আকাশের পানে তাকিয়ে কি সব আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

অকস্মাৎ রতনলালের ডাকে দীপক হাতের কাগজটা পকেটে পুরে বলে উঠল—কি রে, কি বলছিস?

মৃদু হেসে রতনলাল জবাব দিল—আজকের এই আকাশের রঙটা দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস্…

তাকে শেষ করতে না দিয়ে দীপক বলে উঠল—আকাশের রঙ তো জানি চিরকাল কবিচিত্তকেই প্রক্ষুব্ধ করে তোলে, কিন্তু তুই কি হঠাৎ কবি-টবি হয়ে উঠলি নাকি?

রতনলাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ চলন্ত ট্রেনখানা মাঝপথে থেমে পড়তেই তারা গভীর বিস্ময়ে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখে, দূরে গার্ডসাহেব টর্চ হাতে এগিয়ে আসছেন।

মাঝের একখানা কামরা থেকে একটি লোক তাকে সম্বোধন করে বলল—দেখুন, এর নীচে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হচ্ছে।

গার্ডসাহেব তার নিকটবর্তী হয়ে অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—এর নীচে থেকে? শব্দটা কেমন বলুন তো।

লোকটি কামরা থেকে নেমে এল। কিন্তু তার পানে চোখ পড়তেই গার্ডসাহেবের সমস্ত শরীরটা যেন বেতসপত্রের মত বারেকের জন্য থর্ থর্ করে কাঁপতে শুরু করল। লোকটির হাতে একটি নিকষ কালো পিস্তল এবং তাঁরই বক্ষদেশ লক্ষ্য করে উদ্যত।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে সে কতকটা আদেশের সুরেই বলল — সাবধান! আর এক পাও···

পূর্বের কামরাখানা থেকে তখনও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু কারো কিছু করবার নেই। পাথরে-গড়া মূর্তির মতই তাঁরা বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হতভাগ্য বিপন্নদের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতার মাঝে নিরুপায় যাত্রীদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দশ বারো জন কালো পরিচ্ছদধারী ব্যক্তি লুন্ঠিত জিনিসগুলি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

কিন্তু তার পেছনে কালো চশমা, কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত পরিচ্ছদ আবৃত, পায়ে বুট সেই লোকটিকেও দেখা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শত শত উৎসুক নেত্র এক পাশের জানালা দিয়ে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লুণ্ঠনকারীদের গতি লক্ষ্য করতে লাগল। ব্যতিক্রম দেখা গেল শুধু দুটি প্রাণীর। দীপক আর রতনলালের।

অন্ধকারের মাঝে দস্যুদলের ছায়া মিলিয়ে যাবার পূর্বেই দীপক চট্ করে একখানা কাগজে কি লিখে, সেটা গার্ডের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে রতনলাল সহ বিপরীত দিকের দরজা পথে নেমে নিবিড় জঙ্গলের অন্ধকারগর্ভে ঝুপ্ করে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে গার্ডসাহেবের ইঙ্গিতে ট্রেনখানা পুনরায় হেলতে দুলতে চলতে শুরু করলো।

—তিন—

অন্ধকার জঙ্গলের পথ বোধ করি একেবারেই দুর্গম।

প্রতি পদক্ষেপে দীপক এবং রতনলাল হোঁচট খেতে খেতে দস্যুদলের অনুসরণ করতে লাগল। একে গভীর জঙ্গল, তার উপর মশা। প্রতি মুহূর্তে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনায় তাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

হঠাৎ সশব্দে জঙ্গলের মাঝে খানকয়েক ইটের উপর পায়ে হোঁচট খেতে রতনলাল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। চমকে দীপক পেছন ফিরতে সে বলে উঠল—আচ্ছা পথ দিয়ে আমরা চলেছি বটে! এখানে কী আর মানুষ চলতে পারে? তুই আমাকে অনুসরণ করে আয়।

—মানুষ না পারলেও গোয়েন্দাদের না পারার কথা নয় বন্ধু। দীপক মৃদু হেসে বলল।

পুনরায় তারা অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু দু'এক পা এগোতেই বিস্মিত-ভাবে তারা দেখল, দস্যুদল কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যথাসম্ভব তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করেও দীপক তাদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলে না। সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলের পথে তাদের সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া গেল না।

গভীর চিন্তায় অতি অকস্মাৎই দীপকের রগের শিরা দুটো স্ফীত হয়ে উঠল। ভাবতে লাগল, এবারে তারা কোন্ পথে এগোবে? মুহূর্ত পূর্বেও প্রতি পদক্ষেপে বিপদের আশঙ্কায় দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে তারা সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ঠিক তাদেরই কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে যে এতদূর নিঃসহায় হয়ে পড়তে হবে—একথা দীপক ভাবেনি। এ দুর্গম জঙ্গলপথে তারাই তো ছিল তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

রতনলাল বলল—এ দিকেই তো গেছে, এগোনো যাক।

অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাকে চলতে আদেশ দিয়ে দীপক বলল—সাবধান! শব্দ-টব্দ যদি ওরা পেয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় লক্ষ্য রাখছে আমাদের চলায়।

লঘু মার্জারের মতই সন্তর্পিত পদে দীপক অগ্রসর হতে রতনলাল তাকে নিরাপদে অনুসরণ করতে লাগল।

* * *

* * *

চারিদিকে লতাগুল্মবেষ্টিত একটি খোলার ঘরের অভ্যন্তরে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। তারই ক্ষীণ আলোয় ভেতরের খানিকটা দেখা গেল। দশ-বারোজন বিরাটকায় লোক চারধারে বসে। মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে অগণিত রৌপ্যমুদ্রা এবং স্বর্ণালঙ্কারাদি স্তূপাকারে সজ্জিত। পাশে উপযুক্ত ছোরা, পিস্তল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র।

সব ক'টি প্রাণীর মুখেই তখন এক পৈশাচিক আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাদের উল্লসিত কণ্ঠের দু'একটি কথা দীপকের কানে এসে বাজতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় সকলে উঠে দাঁড়াল। দীপক আর রতনলাল অতি মৃদু সন্তর্পণে আর একটু দূরে গিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল! কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রদীপটি নিভে যাওয়ায় তারা আর কিছু দেখতে পেল না।

রতনলাল বলল—শুয়ে পড়ল বোধ হয়। আমরা তাহ'লে এখন কি করি?

দীপক রতনের হাতে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা মুখে লাগিয়ে দু'জনে অগ্নিসংযোগ করতে করতে মৃদু হেসে বলল—এই জঙ্গলের মাঝে গাছের ওপর ঘুমোবো।

—তা কথাটা মন্দ বলিসনি ভাই। রাত্তিরটা কোন রকমে কাটিয়ে সকালে চা খেয়ে-দেয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করা যাবে, কি বল ?

—বেলঘরিয়া পুলিশ স্টেশন হতে মিঃ হাড্‌সনের কাছ থেকে আমার হঠাৎ চলে আসায় ওরা খুব চিন্তায় থাকবে। কিন্তু আজকের এই নরহত্যা, ট্রেনের মধ্যে খুন, লুঠতরাজ পর পর ঘটনার সঙ্গে বিখ্যাত দস্যু বাজপাখির কোন সংশ্রবই নেই।

—আমাদের দু'জনের একজনের অন্ততঃ সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। ধর, চিঠিখানা গার্ডসাহেব ঠিক যদি পৌঁছে না দেন···

—না দিলে চাকরীটা যাবার আশঙ্কা নেই তাঁর? এত বড় দরকারী চিঠি যখন···

কথা তার শেষ হবার আগেই উভয়েই সভয়ে দেখলো, একটি যমদূতাকৃতি লোক সেই খোলার ঘরের অভ্যন্তর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। লোকটার গায়ের রং কালো—বোধ করি মা দুর্গার বাহনের মতোই কালো। কেননা, অন্ধকারের মাঝে তার দেহটা শুধু একটা ছায়ামূর্তি বলেই বোধ হয়, মানুষমূর্তি নয়।

লোকটি ক্রমে দীপকের দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। পিছনে তার আর একটি লোক, তারও পেছনে আর একজন—ক্রমে আট-দশজন লোকই দীপক আর রতনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ইশারায় রতনলাল দীপককে জানিয়ে দিল সরে পড়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু দীপক তার উত্তরে বললে—না-না, সরে পড়লে চলবে না। জলে যখন একবার ডুব দিয়েইছি, তখন পাঁক না তুলে আর ছাড়ব না।

প্রথম লোকটা তখন দীপকের প্রায় গা ঘেঁষেই চলেছে। দীপক পাথরের মূর্তির মতই নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। একে একে আটজন তাদের

ছেড়ে চলে যাবার পর শেষের লোকটা মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে দীপকের পাশে থমকে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে রতনলাল পিস্তলটা উদ্যত করতেই দীপক ব্যগ্রভাবে তার হাতখানা চেপে ধরল। তাদের এই হাতের শব্দে মুহূর্তে সচকিত হয়ে লোকটি কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—কে ? কে ?

চীৎকার শুনে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে তাকালে। লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে—কে ?

কিন্তু দীপক আর রতনলাল তখন নিঃশ্বাসটিকে চেপে রেখে পাথরের ঢেলার মতোই এমনভাবে সেখানে পড়ে রইল যে, লোকগুলো তা বোধ করি ধরতেই পারল না। নইলে হয়ত আজকের ঘটনাটা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকতো।

এক সময় একান্ত বিরক্তিভরেই লোকগুলো চলে গেল। দূরে—বহুদূরে তাদের পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই রতনলাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল—যাক, আপদ গেছে।

ওষ্ঠপ্রান্তে তর্জনীটা ঠেকিয়ে দীপক বললে—চুপ! ঘাঁটি আগলাতে হয়ত এখানে কেউ আছে। চল, ভেতরটা দেখে আসি।

—চার—

দীপকের অনুমান কিন্তু মিথ্যে নয়।

হঠাৎ টর্চের আলোটা অদূরে একটা ঢিপির ওপর গিয়ে পড়তেই একটি লোক গর্জন করে উঠল—কে?

এক হাতে টর্চ আর অপর হাতের মুঠোয় পিস্তলটা দৃঢ়ভাবে ধরে দীপক আর রতনলাল এগোতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বিস্ময়ের এক অব্যক্ত ধ্বনি—কে! তারাপদ? তুমি এখানে?

ভয়ে-বিস্ময়ে তারাপদ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নোত্থিতের মত সে উচ্চারণ করল—দীপক চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ, আমি···

—দোহাই আপনার, আমি কিছুই জানি না, আমি এদের হুকুম তামিল করবার চাকর মাত্র···

বাধা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে দীপক আদেশ করল—আগে আলোটা জ্বালো, তারপর শুনছি।

আতঙ্কে-বিস্ময়ে প্রায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তারাপদ প্রদীপটা জ্বালল।

দীপক বলল—ওইখানটায় চুপ করে বসে আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমাদের কোন অনিষ্ট করবার চেষ্টা করলে···

পিস্তলটা উদ্যত করতেই তারাপদ বলে উঠল—না বাবু, আমি কিচ্ছু করব না।

কতক্ষণ সকলেই নির্বাক। চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা। ক্ষুদ্র এক সূঁচ পতনের শব্দও বোধ করি কানে আসে।

এক সময় দীপক নীরবতা ভঙ্গ করলো প্রথম। বলল—তুমি এ দলে এলে কি করে?

বার কয়েক ঢোক গিলে তারাপদ বলল—আজ্ঞে আমার কোন দোষ নেই। পাল্লায় পড়ে আমায় এ কাজ করতে হচ্ছে। কোলকাতার হেদোর মোড়ে জে এন দাঁ বই-এর দোকানের বিলাসবাবু আমাকে এখানের একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। আপনার কি মনে আছে, মালয় কেবিনে বয়ের কাজ করতুম? সেখানে বেচুবাবু বলে এক ভদ্রলোক চা খেতে আসতেন প্রতিদিন। তিনিই আমাকে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে এনেছেন এখানে। বুঝতেই তো পারছেন, যা মাইনে পেতাম তাতে একদমই চলত না। তাই বেচুবাবুর কথাটা সেদিন ঠেলতে পারিনি।

হঠাৎ কি মনে হতেই দীপক বলে উঠল—আগে বল, যারা বেরিয়ে গেল এইমাত্র, তারা ফিরবে কখন?

—দুদিনের মধ্যে নয়।

—বেচুবাবু লোকটা কে? এখন থাকে কোথায়?

—পরিচয়টা আমি জানি না বাবু। আগেও শুধু মুখের আলাপ ছিল, এখনও তাই। তিনি এই দলেই আছেন। এই একটু আগেই তো এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—এই দলের কার কার নাম-ঠিকানা তুমি জান, সব বল।

—আজ্ঞে, সে সব কিছুই জানবার উপায় নেই। নাম-ঠিকানা দলপতির কাছে লেখা আছে। কিন্তু সেগুলো দলের ভেতরেও কেউ প্রকাশ করে না। এখানে আমাদের এক, দুই, তিন করে সব নাম রাখা

হয়। এ দলের কে কবে কোথায় কি করবে তা জানে না। যখন যা করবার দলপতিই সব জানিয়ে দেন।

—দলপতি লোকটা কে? দেখতে কেমন?

—আজ্ঞে, আমি তাকে দেখেছি এবং তার ঘরেও বহুবার গিয়েছি, কিন্তু কি রকম দেখতে বা কোথায় থাকেন, জানি না।

—তার মানে?

—তাঁকে ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। আমাদের সামনেও তিনি কালো পরিচ্ছদে সমস্ত দেহটাকে ঢেকে রাখেন। চোখে কালো গগ্‌লস্। ম্যানেজারই তাঁর বাড়ি চেনে। আমাদের যখন নিয়ে যায়, তখন আমাদের চোখে রুমাল বাঁধা থাকে, সেখানে গিয়ে খুলে দেয়।

—দলপতি বেশি কথা বলেন না। তাঁর একখানা খাতা আছে, সেটাতেই লিখে আমাদের কাজের আদেশ করেন।

গভীর চিন্তায় দীপক আবার কিছুক্ষণের জন্য নিমগ্ন হয়ে গেল। পরে বললে—এরা তোমাকে যা দেয়, আমি তার চেয়ে অনেক বেশিই দেবো, যদি একটা কাজ করে দাও—

—কি কাজ বাবু?

—তেমন কিছু নয়। তুমি এ দলে যেমন আছ তেমনি থাকবে। আমরা তোমাকে arrest করবো না। তবে কিছুদিনের ভেতর দলপতির নির্দেশমত লেখা সেই খাতাটা আমাকে এনে দিতে হবে।

আতঙ্কে তারাপদ শিউরে উঠল। চোখ দু'টো বড় বড় করে বললে—বাবাঃ, আমি সে পারব না বাবু। আপনি জানেন না, আমাদের দলপতি কী ভীষণ লোক। খাতাখানা সব সময় তাঁর সামনেই থাকে, সেখানে আমাদের যাওয়ার হুকুম নেই।

—যদি আনতে পার, তাহলে তোমাকে হাজার টাকা দেব। ভেবে দেখ, কিছুদিন কিছু করে খেতে হবে না। বসে বসে খাবে। এ দাঁও ফসকালে শেষে মাটির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে দীপক সিগারেট ধরিয়ে রতনলালকে বলল—আজ কোন রকমে রাত কাটিয়ে কাল ভোরে আমাদের বেলঘরিয়ার পথে পা বাড়াতে হবে, বুঝলি?

রতনলাল নাকে একটিপ নস্যি টিপে নীরবে সম্মতি জানাল।

দিন দুই পরে…

বেলঘরিয়ার পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্‌-এর ঘরে জরুরী পরামর্শ-সভা বসেছে। ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ বাসু, সহকারী মিঃ টেগার্ড ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনকয়েক উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটটায় একবার সজোরে টান দিয়ে মিঃ হাড্‌সন্‌ বল্‌লেন—কিন্তু মিঃ দীপক চ্যাটার্জী তো এখনও এসে পড়লেন না। বুঝতে পারছি না কবে নাগাদ আসবেন। সুতরাং আপনি কাজ শুরু করে দিন মিঃ বাসু। কাঁহাতক আর চুপ করে বসে থাকা যায়, বলুন? এদিকে…

বাধা দিয়ে মিঃ বাসু বল্‌লেন—চিঠিতে দীপকবাবু কি জানিয়েছেন?

—জানিয়েছিলেন—কথাটা শেষ না করে পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে সেটা মিঃ বাসুর দিকে এগিয়ে দিলেন পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্‌।

ভাঁজটা খুলে মিঃ বাসু দেখলেন, তাতে লেখা:

"বিশেষ ব্যাপারে পথের মাঝে আটকে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচ্ছি। এ কাজটা হাঁসিল না করে গেলে হয়তো আর এ সুযোগ পাব না। তাই, ভাবনার কিছু নেই। রতনলালও আমার সঙ্গে আছে। সেরকম যদি কিছু বুঝি বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে, তাহলে পাঠিয়ে দেবো রতনলালকে, কেমন? ইতি—

দীপক চ্যাটার্জী।"

পড়া শেষ করেই তিনি কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পদশব্দ শুনেই পেছন ফিরে তাকালেন।

বাঃ মাঃ—২

—May I come in ? হাসতে হাসতে বল্ল দীপক চ্যাটার্জী।

মুহূর্তের জন্যে মনে হল, ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্ সহাস্যে চেঁচিয়ে বল্লেন—Yes! আসুন, আসুন, মিঃ চ্যাটার্জী। এইমাত্র আপনার সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল আমাদের মধ্যে।

দীপক কিন্তু সে হাসিতে যোগ না দিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বল্ল—সামসুল কেমন আছেন ?

পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সনের মুখে বেদনার একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল। বললেন—তিনি মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! বিস্ময়ের এক অব্যক্ত ধ্বনি করে উঠেই দীপক বল্ল—কবে মারা গেলেন ? তার পরেই নাকি ?

—হ্যাঁ, বলছি, বসুন। পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্ দীপককে একটা সিগারেট 'অফার' করে বলতে শুরু করলেন।

—সেইদিন ঝড়-জলের রাত্রে বারোটা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়ে সামসুলের বাড়িতে গিয়ে দেখি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বাড়িতে চাকর ছাড়া আর কেউই ছিল না। এমন সময় তাকে বাইরে থেকে গুলি করা হয়। হাসপাতালে মরবার আগে তিনি নিজেই বলে গেছেন এই কথাগুলো।

—কে মারল, কেনই বা মারল, সে সব কিছু বলেছেন কি ?

—হ্যাঁ, বলেছেন, কিছুদিন থেকে তিনি বাজপাখির সন্ধান করছিলেন গোপনে। জানতেও পেরেছিলেন কিছু কিছু। তিনি সন্দেহ করেছেন তা হয়ত তারা বুঝতে পেরেছিল। তাই তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরি করল না।

—বাজপাখির বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন ?

—মরবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি বিকট চীৎকার করে বলে উঠলেন—

উল্টোডাঙ্গার এক বিরাট বাড়িতে বাজপাখির অনুচরেরা থাকে। আর দুটো যে খুন হয়েছে এবং হত্যার পরে যে লাল ফুটকি চিহ্ন, তারই নায়ক হলো ওই বাজপাখি।

—আর কিছু ?

—না, আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করতে পারেননি। একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্ বল্‌লেন্—বাজপাখির আস্তানা কোথায় তা বলা বড় কঠিন—কিন্তু রেলওয়ে রিপোর্টারদের কাছ থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে এর আগে, আমার মনে হয় কোলকাতা ছাড়া আরও কয়েকটা আড্ডাস্থল আছে—ওঁরা জানিয়েছেন : পায়রাডাঙ্গা স্টেশনের কাছে আস্তানা। কেননা, সামসুল বল্‌লেন, পায়রাডাঙ্গা জঙ্গলের ধারে একখানা জরাজীর্ণ দোতলা পাকা বাড়ি ও তার চারপাশে বেশ খানিকটা জংলা জায়গা আছে। কারণ রিপোর্টাররাও আজকাল মাঝ-পথে ট্রেন থামার খবর দিচ্ছে।

কি একটা অজানা আনন্দে দীপকের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বল্‌ল—ঠিক এক জায়গায় মানে জংগল পরিবেশের মাঝে আমরা আটকা পড়েছিলাম।

অধীর আগ্রহে পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্ বলে উঠলেন—তার মানে ?

সব ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে দীপক বল্‌ল—আমাদের মনে হয়, ওইটাই বাজপাখির আসল আস্তানা। আর যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে যে, আমাদের কবলে পড়তে বাজপাখির আর বেশি দেরি নেই।

এক লহমার জন্যে কি ভেবে নিয়ে দীপক প্রশ্ন করলে—বেলঘরিয়ায় যে দুটি খুন হয়েছে, সেগুলো বাজপাখির কীর্তি কি না, সামসুলের জবানবন্দী ছাড়া আর কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি ?

—নিশ্চয়ই। আমাদের মিঃ বাসু তদন্ত করে জেনেছেন, এবং একজনকে এ্যারেষ্টও করা হয়েছে।

—বেশ, তাহলে আমাকে কি করতে বলেন ?

—আমি আর কি বলব, আপনিই ভেবে দেখুন কি করবেন। কেননা, আপনি যে খবর দিলেন বাজপাখির সম্বন্ধে, আমার মনে হয় আপনাদের ওদিকে থাকাটাই ভাল। এদিকটা না হয় আমাদের মিঃ বাসুই দেখাশুনা করুন। আপনি কি কোলকাতায় আজ ফিরে যাবেন এখন ?

—না। কোলকাতায় ফিরব কি না কোন ঠিক নেই। সিগারেট ধরিয়ে দীপক বললে—কেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুলিশ অফিসার মিঃ হাড্‌সন্ বললেন—না, আপনি যে সংবাদটা এনেছেন, আজকে একটু নজরে···

দীপক তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বললে—পথে একবার ওই জায়গাটিতে নেমে যেতেও পারি।

—ধন্যবাদ।

দীপক বিদায় নিল পরস্পরকে নমস্কার জানিয়ে।

—ছয়—

রূপনগর···

কোলকাতার কাছাকাছি হলেও এ গ্রামটিতে আসতে কেউ চায় না বড় একটা। কারণও অবশ্য আছে। একে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, তাতে আবার গভীর জঙ্গল। নানা জাতের মানুষ এখানে বাস করে। তারাই শুধু এখানকার মাটি কামড়ে বসে আছে। চারদিকের আবহাওয়াটা যেন থমথমে আর নীরব।

তবু একদিন যখন দেখা গেল, কোলকাতা থেকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বিঘাখানেক পরিমাণ জমির উপর বিরাট অট্টালিকা তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন, তখন গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

নিজের সুখ-সুবিধার জন্য বেশ খানিকটা জায়গা সুরকি দিয়ে এবং মোটর চলবার জন্য ষ্টেশন পর্যন্ত একটা ইটের রাস্তা তৈরি করে নিলেন। পানীয়ের জন্য গোটাকয়েক টিউবওয়েল বসালেন, স্নানের উপযোগী দুটো পুকুরও বাঁধিয়ে নিলেন—আরও কত কী। কিন্তু ভদ্রলোকের রুচির পরিচয় দেয় ছোট্ট একটু বাগান, বেশ সুশ্রী এবং শান্ত পরিবেশের মাঝে।

কিন্তু এত করলেন যিনি, তাঁকে নাকি গ্রামবাসীরা কেউই একবার স্পষ্ট করে চোখের দেখাও দেখতে পাননি। মোটর চড়ে তিনি যখন বেড়াতে বার হন, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ থাকে কালো পোশাকে আঁটা, মুখে কালো রং-এর গগ্‌লস্। সেই অবসরে যে তাঁকে এতটুকু দেখে নিয়েছে, সেই বলে—ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাট। কেউ আবার প্রতিবাদ করে, না—না, চল্লিশের বেশি হতেই পারে না।

বাড়িটার চারপাশে কাঁটা তার দিয়ে সীমানা টেনে দেওয়ায় এত বড় বাড়িতে যে বাসিন্দা ক'জন—কেউ বলতে পারে না। কতকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলেন—বাড়িটাতে গৃহস্বামী ছাড়া থাকে একটিমাত্র চাকর। তাকেও বড় একটা বাইরে বেরোতে দেখা যায় না।

নবাগত গ্রামবাসী এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে আরও কত কথাই না প্রচার হয়ে গেল। কেউ বল্‌ল—লোকটা একজন সাহিত্যিক, দিনরাত লেখে আর পড়ে। কেউ বল্‌লে—সাহিত্যিক নয়, গায়ক—সারাদিন অর্গান বাজিয়ে গান করে। কেউ বল্‌লে—সাহিত্যিকও নয়, গায়কও নয়—একজন বৈজ্ঞানিক, অষ্টপ্রহর কাঁচের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

—সাত—

বন্ধ চোখটা তারাপদর খুলে দিতেই সে প্রথমে কিছুক্ষণ চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। ক্রমে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে এলে দেখল, যেখানটায় তাকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে, সেটা একটা প্রশস্ত হলঘর—কিন্তু সেখানে কেউ নেই।

বাঁ দিকের দেওয়ালের ধারে মেহগিনি কাঠের তৈরী বড় বড় আলমারি—রাশীকৃত বই-এ ভর্তি। ডানদিকের দেওয়ালে নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র। আর একপাশে টেবিলের ওপর কাঁচের যন্ত্রপাতি। কত রকম ছোট বড় শিশি, বোতল, আর, রবারের টিউব।

মধ্যস্থলে একটা জ্বলন্ত স্টোভে কি একটা পদার্থ সিদ্ধ হচ্ছিল। তারই সামনে চেয়ারের ওপর দলপতি স্টোভটার পানে তাকিয়ে কি চিন্তা করছিল।

সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ থাকায় দ্বিপ্রহরে ঘরখানার ভেতর রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। স্টোভের স্তিমিত আলোয় সেই অন্ধকার আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

দলপতির দেহ অন্যদিনের মতোই কালো পোশাকে ঢাকা, চোখে কালো চশমা। চশমার ওপর স্টোভের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় কাঁচ দুটো যেন জলন্ত অঙ্গারের মতোই জ্বলছে।

তারাপদর মনে হলো, ভীষণ অন্ধকারে অরণ্যের ভেতর থেকে একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ার হিংস্র-লোলুপ দৃষ্টিতে তার শিকারের দিকে তাকিয়ে আছে। এ দৃশ্য তার কাছে আজ নতুন নয়। এ দলে আসা অবধি বহুদিন তাকে এরকম দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ঘরখানা তার কাছে একটা বিভীষিকা মনে হ'ল।

সমস্ত শরীরটা তার থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। মাথাটাও কেমন ঝিম্‌ঝিমিয়ে উঠেছিল। যেন সমস্ত ঘরখানা সমেত সে কোন রসাতলে নেমে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই সকলে নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দলপতি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করল না। তারাপদ ভাব্‌তে লাগল, আর কতক্ষণ এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কে জানে! এর চেয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অনেক সুখের।

সহসা দলপতির ডান হাতটা নড়ে উঠ্‌ল। সে ক্ষিপ্রহস্তে একটা শিশি থেকে দু'এক ফোঁটা তরল পদার্থ সেই ফুটন্ত বস্তুটির ভেতর ফেলে দিতেই তা থেকে একটা ফিকা নীল ধোঁয়া উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট হাসিতে ঘরখানা যেন শিউরে উঠল।

সেই আকস্মিক অট্টহাসিতে তারাপদ ভয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল।

দলপতি চমকে উঠে তার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারাপদ বজ্রাহতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ম্যানেজার ইঙ্গিত করলে দলপতি তার কানে কানে কি যেন বলে দিল।

ম্যানেজার তারাপদকে বল্‌লে—তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

শুষ্ককণ্ঠে তারাপদ বল্‌ল—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তুমি সাতদিন ছুটি নিতে পার।

তারাপদ যেন স্বর্গ পেল। তার আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ থেকে একটা অব্যক্ত স্বর ছাড়া আর কিছুই বা'র হ'ল না।

ম্যানেজার বল্‌ল—কিন্তু সাবধান, দলের একটা কথাও যেন বাইরে প্রকাশ না হয়।

—আজ্ঞে না, না বাবু!

তারপর দলপতি অন্য সকলকে কি যেন দিয়ে দেখাল। সকলেই মাথা নত করে আজ্ঞা গ্রহণ করল। তারাপদকে তা দেখান হ'ল না। কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝতে পারল, এ আর একটা লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র মাত্র।

খাতাটির পানে চোখ পড়তেই তার বুকটা সহসা কেঁপে উঠল। এই খাতাখানার মূল্য তার কাছে হাজার টাকা।

* * *

পুনরায় চোখ বেঁধে তারাপদকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারপর সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, তাকে একটা মোটরে চড়ানো হ'ল। কিছুক্ষণ পরেই মোটরটা শুরু করল চলতে।

কতক্ষণ চলার পর এক সময় গাড়িটা থেমে গেল। চোখটা খুলে দিতে তারাপদ দেখ্‌ল, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের মোড়ের মাথায় সে দাঁড়িয়ে। পাশেই ম্যানেজার।

ম্যানেজার আর একবার তারাপদকে সাবধান করে দিল—দলের একটি কথাও যেন বাইরে প্রকাশ না হয়…

সে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—না, না।

অতঃপর সে চলতে শুরু করলে—কিছুটা পথ যাবার পর হঠাৎ তার নজরে পড়ল, বিপরীত ফুটপাতে দুটি লোক তার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

মুহূর্তেই তার মাথাটা ঘুরে গেল। তবে কি ওরা দলপতির চর?

তাড়াতাড়ি পা ফেলতে ফেলতে সে একটা চায়ের দোকানে এসে চড়া গলাতেই হুকুম করল—এক কাপ চা দেখি…

খানিক পরেই সেই দুটি লোক বাইরে থেকে এসে তার পাশের চেয়ার দুটো দখল করে বসল। তার পানে তাকাতেই সে বলে উঠল—কি চান আপনারা? আমার পিছু পিছু বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো?

লোক দু'টির প্রথম জন অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বল্‌ল—চাই না কিছু, শুধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—আমার সঙ্গে? কেন?

—আজ্ঞে—আপনি তো ওই গাড়ি থেকে নামলেন?

—কোন্ গাড়ি থেকে?

—ওই, যে গাড়িখানা রূপনগরে নতুন বাড়িতে যায়।

ক্রমেই আশ্চর্য হতে লাগল তারাপদ। বল্‌ল—তার মানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই গাড়িখানা আমরা অনেকবার দেখেছি। রূপনগরের বাড়ি কিনা আমাদের।

তারাপদ ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—রূপনগরের কোন্ বাবুর বাড়িতে যায় বললেন?

—আজ্ঞে, তাহলে তো মুশকিলে ফেল্‌লেন। বাবুর নামটা আমাদের জানবার উপায় নেই। তাঁর মেজাজ যা চড়া, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে কার সাধ্য! দেখা পর্যন্ত যায় না—যা দু'এক সময় বার হন, তাও সব শরীর কাপড় ঢেকে, চোখে চশমা এঁটে। পায়ের নখটি পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই। নতুন বাড়ি বলেই বলি আমরা।

চিন্তিত স্বরে তারাপদ আপন মনেই বলে উঠল—যাক! এতদিনে তবু একটা হদিশ পাওয়া গেল।

পরক্ষণেই লোকটির উদ্দেশে বল্‌ল—না, আমি ও বাড়ি থেকে আসছি না।

তারাপদর কথায় লোক দু'টো বোধ করি সন্তুষ্ট হতে পারল না। বাইরে বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় লোকটি বল্‌ল—বলেছিলাম না—আলাপ করা যাবে না ? ও বাড়ির কুকুরটার পর্যন্ত ওই এক মেজাজ ।

ওদিকে তারাপদও তখন মনের আনন্দে সিঙ্গাড়া আর চা খেয়ে নিয়ে পথে নেমে এলো। দলপতির বাড়িটার কথা স্মরণ হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল তার হাজার টাকার নোট এবং পা দু'খানা মনে হ'ল যেন সেই বাড়ির দিকে এগোতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ !

—আট—

দীপক তার ঘরে বসেছিল। হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট আর সামনেই টেবিলের ওপর পড়েছিল অনাবৃত চায়ের পেয়ালাটা।

অকস্মাৎ ঘরে ঢুকল ব্যোমকেশ। মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান বাবু।

দর্শনপ্রার্থীকে নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে দীপক পেয়ালাটায় একবার চুমুক দিল। তারপর সিগারেটটায় একবার সজোরে টান দিয়ে আপন মনেই বলে উঠল—হঠাৎ এ সময়ে আবার এল কে ?

একটু পরেই ব্যোমকেশের পেছন পেছন যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করল—সে তারাপদ !

তাকে দেখেই দীপক গভীর আগ্রহে বলে উঠল—কি হ'লো, কি খবর তোর ? কোন হদিশ পেলি ?

চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে তারাপদ জবাব দিল—হ্যাঁ, হদিশ একটা পেয়েছি। তবে সেটার ভালভাবে সন্ধান না নিয়ে আপনাকে কোন কথা দিতে পারছি না। দিন সাতেকের মধ্যে আপনাকে খাতাখানা এনে দিতে পারব, আশা করছি। কিন্তু টাকাটা আমার সঙ্গে সঙ্গেই চাই। কেননা এ দেশ ছেড়ে আমাকে পালাতেই হবে।

—না, তোকে পালাতে হবে না। আমি তোর প্রাণ বাঁচাবো। তবে টাকা আমি তোকে সঙ্গে সঙ্গেই দেবো, কোন ভয় নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুই আমার সঙ্গে দেখা করবি কবে ?

লহমার জন্য ভেবে নিয়ে তারাপদ বলল—আজ থেকে সাতদিন পর রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন······

—কিন্তু কোথায় ?

—মালয় কেবিনে।

—সেখানে কোন ভয়ের কারণ নেই তো তোর ?

—নেই বলেই মনে হয়।

খুশী-ভরা কণ্ঠে দীপক বল্‌ল—তুই যদি আমাকে সাতদিনের মধ্যে খাতাটা এনে দিতে পারিস, তাহলে তোকে আরও কিছু টাকা বকশিশ করবো।

অতঃপর সামান্য দু'চারটে কথার পর তারাপদ সেখান থেকে বিদায় নিল।

*　　　*　　　*

গভীর রাত···

চারধার নিস্তব্ধ···নিথর···মৃত্যুপুরীর মতোই।

রূপনগরের নতুন বাড়িখানার পেছন দিকে যে প্রাচীর ছিল, অকস্মাৎ এই সময় দেখা গেল, তারাপদ সেটা টপ্‌কিয়ে ভেতরে এসে পড়ল।

দারোয়ান বোধ করি এখন বাইরের দিকে পাহারা দেবার ছলে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বেরোবার পথটা খুলে রেখে তারাপদ ধীর সন্তর্পিত পদে একটার পর একটা ঘর সন্ধান করে ফিরতে লাগল।

অকস্মাৎ একখানা ঘরের সাম্‌নে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ঈষদুন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, দলপতি তখন সেই খাতাখানায় কি যেন লিখ্‌ছে।

পরনে তার এখন আর সেই কালো পোশাক নেই, নেই চোখের কালো চশমা। চশমাটা টেবিলের ধারে পড়ে রয়েছে।

তারাপদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, অতঃপর সে কি করবে। এক এক করে পাঁচ দিন পার হয়ে গেছে। আজ শেষ করতে না পারলে আর আশা নেই। হাজার টাকা। ওঃ, যার এক পয়সা রোজগার

করবার ক্ষমতা নেই—সেই হাজার টাকা তার কাছে এখন এক মহামাত্রাজা।

তারাপদ অধীর হয়ে উঠল। বারম্বার সে মনে মনে ভাবতে ও বলতে লাগল—আজই—আজ রাত্রেই খাতাটা যে-কোন রকমে তাকে হস্তগত করতে হবে।

অকস্মাৎ দলপতি ধীরে ধীরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

তারাপদ বারান্দার অপর দিকে একটা গুপ্তস্থান থেকে বিস্ফারিত নেত্রে দলপতিকে দেখতে লাগল।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ তার দেহ। আকর্ণ-বিস্তৃত চোখ দুটি তার নিমগ্ন। ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত। প্রশস্ত ললাটে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে চিন্তার রেখা। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। হাত দুটি পিছনে নিবদ্ধ। অতি ধীর পদক্ষেপে তার ফুটে উঠেছে দৃঢ়তা ও গভীর চিন্তাশীলতা।

হঠাৎ ঠোঁট দুটো তার উঠল কেঁপে। চিন্তার উত্তেজনায় তখন আপন মনেই কথা বলতে শুরু করেছে।

গভীর আগ্রহের সঙ্গেই তারাপদ তা শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার একবর্ণও সে বুঝতে পারল না।

সহসা দলপতি নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে হেসে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রমে পদশব্দ তার মিলিয়ে গেলে তারাপদ গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে দলপতির ঘরে প্রবেশ করল। সামনেই টেবিলের ওপর খাতাখানা খোলা রয়েছে। পাশেই একটা পিস্তল। খাতাখানা ছোট্ট—একখানা নোট বই।

কম্পিত হস্তে সেখানা পকেটস্থ করে, পিস্তলটা হাতে নিয়ে তারাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বারান্দায় আস্তেই সে থমকে দাঁড়াল। সামনেই তীব্র দৃষ্টিতে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দলপতি।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে দলপতি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তারপর শুরু হ'ল প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি। একবার দলপতি, একবার তারাপদ—দু'জনেই মাটির বুকে গড়াতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে কাট্‌বার পর তারাপদ পিস্তলের ট্রিগারটা দিল টিপে।

'দুম্' করে একটা শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে দলপতি একবার চীৎকার করে বসে পড়ল। গুলিটি তার ডানহাতের কব্জি ভেদ করে চলে গেছে।

দৌড়ে তারাপদ গিয়ে উঠল সেই সু-উচ্চ প্রাচীরটার ওপর। দলপতি ছাড়বার পাত্র নয়। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। প্রাচীর টপ্‌কে পথে পড়ল তারাপদ।

তারপর শুরু হ'ল ছোটার প্রতিযোগিতা। কিন্তু আহত ডান হাতখানা চেপে ধরে দলপতি বেশিক্ষণ আর পারল না তাকে অনুসরণ করতে। সেই-খানেই সে ধপাস্ করে বসে পড়ল।

তার চোখের সামনে থেকে তারাপদ অদৃশ্য হয়ে গেল।

—নয়—

অসীম মজুমদারের আস্তানায় জুয়ার আড্ডা কোনদিন রাত চারটের আগে ভাঙ্গে না। কিন্তু আজ খেলতে বসেই আধ ঘণ্টার ভেতর সর্বস্বান্ত হয়ে রাত বারোটা না বাজতেই সে খেলা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে একে একে চলে গেছে। কিন্তু ধীরেন্দ্র শেঠ তখন অসীমের সঙ্গে গল্প-গুজব করছিল।

ধীরেন্দ্র শেঠের কথায় সায় দিয়ে অসীম বল্‌ল—হাঁ দাদা, আজকাল পকেট মেরেও সুখ নেই। দেশের অবস্থা যা হয়েছে, কারোর পকেটে একটি পয়সা থাকে না।

কথা শেষে সে মৌনভাবে কতক্ষণ হাতের জলন্ত সিগারেটটায় ধুমোদ্গীরণ করতে লাগল।

ধীরেন্দ্র শেঠ বল্‌ল—যাক্ দাদা, খেলা যখন শেষ হ'ল, এবারে উঠি।

অসীম শ্যামবাজারের বুক ষ্টলে একজনের কাছে দশ টাকা পূর্বের পাওনা ছিল, সেটা আনবার জন্য বাইরের দিকে পা বাড়াল। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবছে, এ পর্যন্ত কখনও হারেনি—আজ নিশ্চয়ই জোচ্চুরি করেছে। হঠাৎ অদূরে গ্যাসপোষ্টের কাছে নজর পড়তেই দেখল একটি লোক পড়ে আছে।

অসীম ধীরে ধীরে সেদিকে পা বাড়াল। মাথা নীচু করে লোকটির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই সে আতঙ্কে শিউরে উঠল।

লোকটির বুক থেকে রক্তস্রোত বইছে। ভয়ে, আতঙ্কে তার সারা মুখখানা বীভৎস রূপ ধারণ করেছে।

অসীম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল পুলিশে খবর দেবে—পর মুহূর্তেই ভাবল, যদি পুলিশ তাকেই আটক করে?

ধীরে ধীরে মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে সে পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে যা পেলে সব তুলে নিয়ে অবশেষে দ্রুত সে বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল।

দূরে দাঁড়িয়ে একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিল। অসীমের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেও সেইদিকে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

* * *

রাত একটা

তারাপদর কাছে খাতাটা পেয়ে দীপক রতনলালকে সঙ্গে করে সোজা লালবাজারে এসে হাজির হ'ল।

পুলিশ কমিশনার মিঃ বয়েড আর তারই সহকারী মিঃ পিয়ার্সনকে সে ডেকে পাঠাল। আর দু'চারজন উচ্চপদস্থকে ডেকে পাঠাতে ভুল্‌ল না। জরুরী আলোচনা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই এলেন। পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার দীপকবাবু?

—বাজপাখির সন্ধান পেয়েছি। অবশ্য এ সন্ধানটার জন্য হাজার টাকা খরচ হয়েছে। যাক্‌। পকেট থেকে খাতাখানা বার করে নিয়ে দীপক পুলিশ কমিশনারের হাতে তুলে দিল।

দীপকের হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে কমিশনার পাতা উল্টে দেখ্‌লেন। তাতে লেখা: ধোপার খাতা।

শান্ত-কণ্ঠেই তিনি বললেন—বাজপাখির কাছে তাহ'লে ধোপাও এসে জুটেছে। পরক্ষণেই দীপকের কাছে খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—না, আপনিই বলুন।

দীপক কম্পিত হস্তে খাতাটা নিয়ে দেখতে লাগল: ধোপার হিসাব,

বাজারের হিসাব, বাড়ি-ভাড়া ইত্যাদি বার হতে লাগল। কিন্তু কৈ বাজপাখির কোন সূত্রের নাম-গন্ধ নেই! তবে এ কিসের খাতা?

হঠাৎ দীপকের সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লাগল। রাগে, দুঃখে, লজ্জায় সে সহসা উন্মাদের মত উঠে দাঁড়িয়ে একটা অব্যক্ত চীৎকার করে বসে পড়ল।

ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ।

দীপকের কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হ'ল। সে কোন রকমে বিকট চীৎকার করে বলে উঠল—ওঃ! সব জোচ্চুরি!

—দশ—

হাতের ব্যাণ্ডেজটা বাজপাখি বাঁধ্তে বাঁধতে প্রশ্ন করলে—তুমি গিয়ে কি দেখলে ?

ম্যানেজার দলপতির উত্তরে বল্ল—আমি বিলাসবাবুর কাছে খবর পেয়ে 'মালয় কেবিনে'র কাছে হাজির হ'লাম। তারাপদ তখন দীপককে কাগজ-পত্তর দিয়ে বেরিয়ে আস্ছে। তবুও তাকে আমি অনুসরণ করি। কিছুদূরে যাবার পর দেখি একটি লোক তাকে চড় মেরে ফেলে দিয়ে বুকে ছোরা বসিয়ে তাকে খুন করে চলে যায়। লোকটার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারলাম না। ঠিক এই সময় আর একটা লোক আসতে হত্যাকারী পালিয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য থেমে ম্যানেজার পুনরায় বল্লে—দ্বিতীয় লোকটা তারাপদর পকেট থেকে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন আমি তাকে অনুসরণ করি এবং বাসস্থানটা দেখে আসি।

—দীপকের সাথে কখন তারাপদর দেখা হয়েছিল ?

—প্রায় বারোটা।

—তাহলে কাল সকালের আগে সেগুলো পুলিশের হাতে ও দিতে পারবে না, কি বল ?

—খুব সম্ভব তাই।

দু'জনেই নিরুত্তর।

বাজপাখি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—খাতাখানা কখনও আমি অসাবধান বশতঃ কোথাও রাখি না, কিন্তু সেদিন যে কি করে আমার ভুল হ'ল তা বলতে পারি না। কী কুক্ষণে যে পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখেছিলাম !

পুনরায় ম্যানেজার নিরুত্তর।

বাজপাখি চুপ করে থেকে ভাবতে লাগল।

ম্যানেজার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলল—আমি তারাপদকে অবশ্য সন্দেহ করেছিলাম সেদিন। কিন্তু সে যে এতটা করবে, তা কখনোই ভাবতে পারিনি।

* * * *

* * * *

ম্লানমুখে দীপক বাইরের ঘরে বসে ছিল। নৈরাশ্য-জনিত ভীষণ ক্লান্তি এসে তাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। দুঃখে দুশ্চিন্তায় চোখের কোণে কালো ছায়া পড়েছে।

আজ বহুদিন ধরে ডিটেক্‌টিভের কাজ করে আসছে। কত জটিল রহস্যজাল ভেদ করে সে দুর্দমনীয় দুর্বৃত্তদের পরাস্ত করেছে। কিন্তু গত রাত্রের অকৃতকার্যতা যেন তার সমস্ত জয়-গৌরবকে রসাতলের অতলগর্ভে প্রোথিত করে দিয়েছে।

গত রাত্রের সেই দৃশ্যটি যতবার তার মনে হতে লাগল, ততবারই তার গর্বোন্নত শির যেন লজ্জায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। সরকারের অসামান্য অর্থ-ব্যয় করে সে আজ যা করেছে, তা ছেলেখেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এত সতর্ক হয়েও এত বড় ভুল যে সে কোনদিন করবে, দীপক তা পূর্বে কখনও ধারণা করতে পারেনি।

দীপক আর ভাবতে পারল না। বিক্ষিপ্ত মনটাকে কোনমতে সংযত করবার আশায় সে খবরের কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরল।

তার সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে কেঁপে উঠল—খুন! খুন!

দীপক বিস্ফারিত নেত্রে সংবাদটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে দেখতে লাগল: কে, এ লোকটা? তারাপদ নয় ত? আকৃতি এবং পোশাকের যে বর্ণনা

দিয়েছে, তাতে তারাপদ বলেই তো বোধ হয়। কে তাকে হত্যা করল? তাদের দলের কেউ? কেন? সে তো কাগজ-পত্র আনেনি? তবে কি টাকার লোভে কেউ তাকে হত্যা করেছে? বোধ হয় তাই।

দীপকের ম্লান-মুখে একটু দুঃখের হাসি ফুটে বার হ'ল।

হায় হতভাগা! এতবড় জুয়াচুরি করে যে অর্থ তুমি উপার্জন করলে অবশেষে সেই অর্থই তোমার মৃত্যুর কারণ হ'ল!

ঠিক এমনি সময়ে এক ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করে বলল—নমস্কার দীপকবাবু!

দীপক অভিবাদন করে তাকে বসতে বল্‌ল।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ভদ্রলোকটি বল্‌লে—গত রাত্রে একটা খুন হয়েছে, জানেন?

—হ্যাঁ, এইমাত্র পড়েছি।

—সেই লোকটার সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য আমি এসেছি।

—কি, বলুন।

মুহূর্তের জন্য কি ভেবে নিয়ে ভদ্রলোকটি বল্‌ল—এ লোকটা মারা যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?

—সে সংবাদে আপনার প্রয়োজন?

—অবশ্য আপনার যদি বলতে আপত্তি থাকে, আমি জোর করে শুনতে চাই না।

—না, আমার আপত্তি নেই। হ্যাঁ, দেখা করেছিল।

—আপনাকে সে কোন কাগজপত্র দিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লে—সেই কাগজগুলো আমাকে দিন।

—তার মানে?

—তার মানে সেগুলো আমার দরকার।

দীপক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে প্রশ্ন করল—আপনি কে?

—আমি যেই হই, কাগজপত্রগুলো আমাদের।

—সেকি! জানেন, সে কাগজপত্রগুলো কিসের?

—জানি, বাজপাখির।

—তবে সেগুলো আপনাদের কি করে হলো?

—আমাদেরই; কারণ, আমি বাজপাখির দলের একজন কর্মী।

দীপক হঠাৎ চমকে উঠল। বাজপাখির একজন কর্মী! প্রকাশ্য দিবালোকে গোয়েন্দার বাড়িতে ডাকাতদলের একজন লোক এসে যে এভাবে কথা বলতে পারে, এ রকম সম্ভাবনা দীপকের মনে কোনদিন উদয় হয়নি।

কঠিন কণ্ঠে দীপক বলল—ওসব নেকামির বা ভণ্ডামির কথা এখানে নয়।

—নেকামি, ভণ্ডামি—কথাশেষে লোকটি তড়িৎবেগে পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে দীপকের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত করল।

সঙ্গে সঙ্গেই দীপক এক লাফে পাশে সরে গিয়ে পিস্তলটা সমেত তার হাতখানা ধরে মোচড় দিতেই পিস্তলটা গেল মাটিতে পড়ে।

কিন্তু ভদ্রলোকটি হঠাৎ হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে দীপকের নাকের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে এক ঘুষি মারল।

মুহূর্তে দীপক মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র হস্তে পিস্তলটা তুলে নিতে চেষ্টা করতেই পেছন দিক থেকে একটা ভীষণ ধাক্কা খেয়ে একেবারে দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সে আর আক্রমণ না করে বাইরের দিকে এক লাফে চলে গেল।

রতনলাল তাড়াতাড়ি তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল।

কিন্তু তাকে ধরবার আগেই লোকটি মোটরবাইকে চড়ে তীরের বেগে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিরাশ হয়ে রতনলাল দীপকের কাছে ফিরে এল।

দীপক ততক্ষণে উঠে এসে চেয়ারে বসেছে।

মৃদু একটু হেসে সে বললে—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি লোকটাকে কিছু বললাম না, কারণ, সে খানিকটা উপকার করে গেল।

রতনলাল বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলে—সে কি!

সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করে দীপক বললে—এতে বেশ বুঝতে পারছি, তারাপদ আসল কাগজপত্রগুলো এনেছিল। কারণ, তা না হলে লোকটা সেগুলোর খোঁজ নেবে কেন?

রতনলাল ইতস্ততঃ করে বলল—সে যদি এনেই থাকবে, তাহলে দিলে না কেন?

দীপক বলল—সে কাগজখানা এনেছিল সত্যি কথা, আমাদের যে সব দিয়ে যায়নি এটাও সত্যি কথা। এই না দিয়ে যাওয়াটা মোটেই তার ইচ্ছাকৃত নয়।

রতনলাল উৎসুক হয়ে বল্‌ল—তবে সে খাতাখানা এখন কোথায় থাকার সম্ভাবনা বলে তোর মনে হয়?

দীপক দৈনিক কাগজখানা দেখিয়ে বল্‌লে—এ মৃত ব্যক্তি তারাপদ ছাড়া আর কেউ নয়—সে এনেছিল সত্যি, কিন্তু হত্যাকারী তাকে মেরে সব কেড়ে নিয়ে গেছে। এবং হত্যাকারীর কাছেই সেগুলো আছে।

—তাহলে তো মুশকিল। এই খুনের কিনারা করতে না পারলে তো আর খাতা পাবার আশা নেই।

মৃদু হেসে দীপক বল্‌লে—ভয় নেই, এ হত্যাকারীটা ধরা পড়ল বলে।

বিস্মিতভাবে রতনলাল তার দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপক বলে চলল—তারাপদকে যে টাকা আমি দিয়েছি, তার সব নোটেরই নম্বর লেখা আছে আমার। চারদিকে এমনভাবে লোক লাগাতে হবে যে, লোকটা যদি টাকা ভাঙাতে চেষ্টা করে, তাহ'লেই ধরা পড়বে।

—তাহলে চারদিকে সংবাদ পাঠানো দরকার।

—নিশ্চয়ই।

দীপক কথা সেরে উঠে দাঁড়াল।

—এগারো—

বিডন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে জে, এন, দাঁ কোম্পানীর পাশে 'মালয় কেবিনে'র ওপর পুলিশের দৃষ্টি চিরকাল একটু সজাগ। তবু দেখা যায়—তুনিয়ার যত চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা, যত জালিয়াতি, খুনখারাপি এবং ইদানিং মেয়েদের গুপ্ত রহস্য—নীরবেই এখানে সমাধা করে।

বাড়ি থেকে ড্রেস বদলে সোজা দীপক জগন্নাথ দাঁর কাছে একখানা 'জঙ্গীচীন' বই নিয়ে এই কেবিনে প্রবেশ করল।

দোকানের মালিক হরেনবাবু তখন এক কোণে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছিল। দীপককে সে চেনে ভাল করেই। কিন্তু আজকে সহসা সাধারণ একজন ড্রাইভারের বেশধারী দীপককে সে চিনতে পারল না মোটেই। তাই শারীরিক কুশল প্রশ্ন তাকে না করে বল্‌ল—কি দোব আপনাকে ?

এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিয়ে দীপক দোকানটার চারদিক একবার তাকিয়ে নিল। তারপর 'জঙ্গীচীন' বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মাসের শেষে দোকানে তেমন ভিড় ছিল না। বয় এসে চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের ওপরে নামাতেই দীপক ইশারা করলে—তুটো কথা আছে।

ড্রেস পরিবর্তনকারী দীপককে কিন্তু বয়টিও চিনতে পারল না মোটে। তাই বোকার মত খানিকটা চাইতেই দীপক তার হাতে এক টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে মৃত্থ কণ্ঠে বল্‌লে—আমি বাইরে বেরোলে একবার দেখা করো, কেমন ?

মিনিট দশেক পরে চায়ের দাম দিয়ে দীপক বেরোতেই বয়টি পিছন পিছন চলে এল।

রায়বাগান ষ্ট্রীটের সরু গলির মধ্যে ঢুকে দীপক তাকে জিজ্ঞেস করল—আমাকে চিনতে পারছ ?

বয়টি এমনভাবে তাকাল, যাতে দীপকের এক মুহূর্তও দেরি হল না বুঝতে যে, সে মোটেই চিনতে পারেনি তাকে। মৃদু হেসে সে বল্‌ল—আমি দীপক চ্যাটার্জি।

এবারে কিন্তু বয়টি সলজ্জ হেসে উঠল। দীপককে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সে বলে উঠল—বাবু, কাল যাকে আপনি টাকা দিলেন, সে-লোকটা খুন হয়েছে ওখানটায়। অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে।

কিছু না জানার ভান করে বিস্মিত কণ্ঠে দীপক বল্‌লে—খুন হয়েছে কি রে ! কে করেছে ?

—বোধ হয় অসীম তাকে খুন করেছে।

—কি করে জান্‌লি ?

—আপনি কাল বেরিয়ে যাবার পরই অসীম তাকে অনুসরণ করেছিল। তারপরই···

বাধা দিয়ে দীপক বল্‌ল—একথা আর কাউকে জানাসনি। এখন আমি চললাম।

গভীর একটা তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপক জোরে জোরে পা চালাল।

* * * *

বাজপাখি জলন্ত চুরুটে টান দিয়ে বল্‌লে—তাহলে পুলিশের হাতে খাতাটা নেই ? কে বল্‌লে ? বীরেন্দ্র শেঠ ?

সামনেই একটা চেয়ারে বসে ছিল তারই ম্যানেজার। একটা ঢোক গিলে সে বল্‌লে—হ্যাঁ, সে-ই বলেছে।

—কার কাছে আছে ? বীরেন্দ্র মজুমদারের কাছে ?

—হ্যাঁ।

—বীরেন্দ্রের খোঁজ পুলিশ পায়নি ?

—তারা সন্দেহক্রমে বেচুকে ধরেছে। বেচু খুন স্বীকার করেছে কিন্তু খাতাটার কথা কিছু সে জানে না বলেছে। পুলিশ তার বাড়ি সার্চ করে কিছু পায়নি।

বাজপাখি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—হুঁ! বীরেন্দ্রকে তাহলে বলো, বেচুর বাড়ি সার্চ যদি পুলিশ আগে করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার আগেই খাতাটা চুরি করে ফেলে। আর সব কাগজপত্রগুলো নষ্ট করে দেয়। মোটের উপর পুলিশ যেন কোন রকমে কোনকিছু টের না পায়। আর বেচু খাতাটার কোন রকম নকল রাখবার আগেই বীরেন্দ্র যেন সেটা হস্তগত করে।

তারপর আবার সব চুপ চাপ্। ঘরের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। একটা উৎকট স্তব্ধতা। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ।

ম্যানেজার বাজপাখির আদেশ নিয়ে বেরোবার আগেই বাজপাখি বলে উঠল—শোনো, খেলা বোধ হয় আমাদের শেষ হয়েছে। সুতরাং একটা কথা মনে রাখো, যাবার সময় দীপক চ্যাটার্জীকে আমরা নিয়ে যাব। তার সঙ্গে রতনলালকেও। এখন ওরা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

—বারো—

বেলা বারোটা···

খাওয়া-দাওয়া সেরে অসীম তখন বোধ করি সবেমাত্র একটু দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছিল, এমন সময় দ্বারে অশ্রান্ত করাঘাত শুনেই সে বাইরে বেরিয়ে এল।

দরজাটা খুলতেই সে দেখল, একটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। পরনে দারোগার বেশ।

তাকে দেখেই অসীমের বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধক্ করে উঠল। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে সে বিরক্তিপূর্ণ তিক্তকণ্ঠেই বল্‌ল—কি চাই আপনার? কোত্থেকে আসছেন?

লোকটি বল্‌ল—অসীমবাবুকে চাই। তিনি আছেন?

একবার অসীম মনে করল নিজের পরিচয়টা গোপন রেখে বলে দেবে যে সে বাড়িতে নেই। কিন্তু পুলিশ-বেশী লোকের কাছে সে মিথ্যা বলবার সাহস পেল না। কি জানি, যদি লোকটি তাকে চিনেও না চেনার ভান করে? তাই গলাটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে নিয়ে সে বল্‌ল—অসীম? আমারই নাম। কোত্থেকে আসছেন আপনি?

তেমনি শান্তকণ্ঠে লোকটি বল্‌লে - আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। বলেই পকেট থেকে কাগজখানা বার করে তার সামনে মেলে ধরল।

অসীম লেখাপড়া জানে না। তাই সে কেবলমাত্র একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কি দেখল বা কি বুঝল সে-ই জানে। অতঃপর ভীত-স্বরে সে বল্‌লে—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা—কিন্তু কেন জানতে পারি কি?

— স্বালয় কেবিনে'র পাশে যে খুনটা কাল হয়েছিল······

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অসীম পূর্ববৎ ভীত-স্বরেই বল্‌ল—আমি তো খুন করিনি।

মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে লোকটি বল্‌ল—আপনি খুন করেননি, খুন করেছে বেচু। কিন্তু মৃতের পকেটে যে কাগজপত্রগুলো ছিল, সেগুলো আপনার কাছে আছে।

—কই না, আমার কাছে কিছু তো নেই। আমি সেই সময় কাল বাড়িতে ছিলাম না।

—পুলিশের কাছে লুকিয়ে ফল হবে না, এখন আসুন দিকি, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

কি একটা ভেবে নিয়ে অসীম বল্‌ল—আজ্ঞে আমি সবই স্বীকার করছি। কিন্তু কোন উপায় কি নেই?

—উপায় একটা আছে। যদি কাগজপত্রগুলো সব দিয়ে দেন, তাহলে আর ভয় নেই।

—আচ্ছা, আমি সব এনে দিচ্ছি।

কথা বলতে বলতে তারা 'মালয় কেবিনের' কাছে এসে পড়তেই দেখে সারা বাড়িটাকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে।

অসীম হঠাৎ বলে উঠল—আমি তো সব দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আবার পুলিশ কেন?

লোকটি বল্‌ল—আমি হচ্ছি গোয়েন্দা পুলিশ, আর ওরা হচ্ছে থানার পুলিশ। আপনি চট্‌ করে কাগজপত্রগুলো পাঠিয়ে দিন, নিজে আসবেন না কিন্তু। ততক্ষণে আমি মোটরে উঠ্‌ছি।

বাড়ি ফিরে এসে অসীম তার ছোট ছেলেটাকে দিয়ে কাগজপত্রগুলো সব গোয়েন্দা পুলিশের হাতে পৌঁছে দিল। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে আরও জনকয়েক পুলিশের সঙ্গে তাকে বাড়িতে দেখে ভয়ে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল।

পুলিশের সঙ্গে দীপক ও রতনলাল এসেছিল। অসীমের সামনে এসে দীপক জিজ্ঞাসা করল—একে কোথায় পাঠীয়েছিলে ?

অসীম আম্‌তা আম্‌তা করে বলল—আজ্ঞে, গোয়েন্দা পুলিশের কাছে।

—গোয়েন্দা পুলিশের কাছে! কে সে ?

মোটরে অপেক্ষমান লোকটি মোটর ছেড়ে দিল।

—আজ্ঞে, ঐ মোটরটায় যিনি বসে আছেন।

দ্রুতগতিতে মোটরখানা বাঁ দিকে বেঁকে গেল।

অসীমের কাছে দীপক সমস্ত ঘটনাটা শুনে নিল। আত্মরক্ষার জন্য সেও তার কাছে কিছু জানাতে কার্পণ্য করল না।

পরিশেষে দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠ্‌ল—আচ্ছা চাল চেলেছে বটে !

তারাপদর বর্ণনা মত এবং অসীমের নির্দেশমত অতঃপর দীপক, রতনলাল ও জন চারেক পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ছুটল রূপনগরের নতুন বাড়িটার সন্ধানে…

—তেরো—

—রূপনগর···

দীপক এসে প্রথমেই বাড়িখানা সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেল্‌ল। তারপর প্রায় দশ-বারোজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে দীপক আর রতনলাল বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল।

হঠাৎ সামনের ঘরখানায় দীপকের দৃষ্টি পড়ল। ঘরের ভেতর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্ত শরীর কালো পোশাকে আচ্ছাদিত, চোখে কালো রংয়ের চশমা। টেবিলের ওপরে ষ্টোভে ফুটবলের মত কি একটা পদার্থ গরম হচ্ছে।

সকলে সাবধানে বারান্দায় উঠল। দীপক ইঙ্গিত করে সকলের অগ্রগামী হ'ল। ভেতরে লোকটি নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছে। তার সামনে যে এতগুলো পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

পাঁচ মিনিট···

দীপক পিস্তলটা হাতে নিয়ে বল্‌ল—আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি বাজপাখি।

তবু লোকটা দৃক্‌পাত করল না। দীপকের কথাগুলো নিজের কানেই উপহাস বলে বোধ হতে লাগল। একি অদ্ভুত ব্যাপার!

ঘরের ভিতর দীপক এক পা এগিয়েই সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—একি—বীরেন্দ্র! তুমি এখানে?

দলপতি বাজপাখির ডানপাশে দূরে দু'টি লোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বীরেন্দ্র দীপকের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। শুধু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে ডানহাতে একখানা খাতা তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—একি, সেই খাতা!

খাতার নাম শুনে রতনলালও ঘরের ভেতর প্রবেশ করে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল।

ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে দীপক বল্‌ল—ওঃ, শয়তান! C.I. D.-তে ঢুকেছিলে এদের গুপ্তচর হয়ে?

বীরেন্দ্র শেঠ হাস্‌তে হাস্‌তে খাতাখানা স্টোভের পাশে রেখে দিল।

ক্রোধে ঘৃণায় দীপকের সারা দেহ কাঁপছিল। সে বাজপাখির দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল—আমরা তোমাদের গ্রেপ্তার করলাম।

কথা শেষে সে আর এক পা এগোবামাত্র একটা পৈশাচিক অট্টহাসিতে সমস্ত ঘরখানা কেঁপে উঠ্‌ল। মুহূর্ত পরেই সাতশত কামান গর্জনের মত বিকট শব্দের সঙ্গে চারদিকে অগ্নির লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত হয়ে পড়ল। দীপক আর রতনলাল লাফ দিয়ে পড়বার পরেই বাড়ির ছাদখানা ভেঙে গেল এবং বাজপাখির কঠিন স্বর ভেসে এল: বাজপাখিকে অত সহজে ধরা যায় না দীপক চ্যাটার্জী!

বাইরে সমস্ত পুলিশবাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলো।

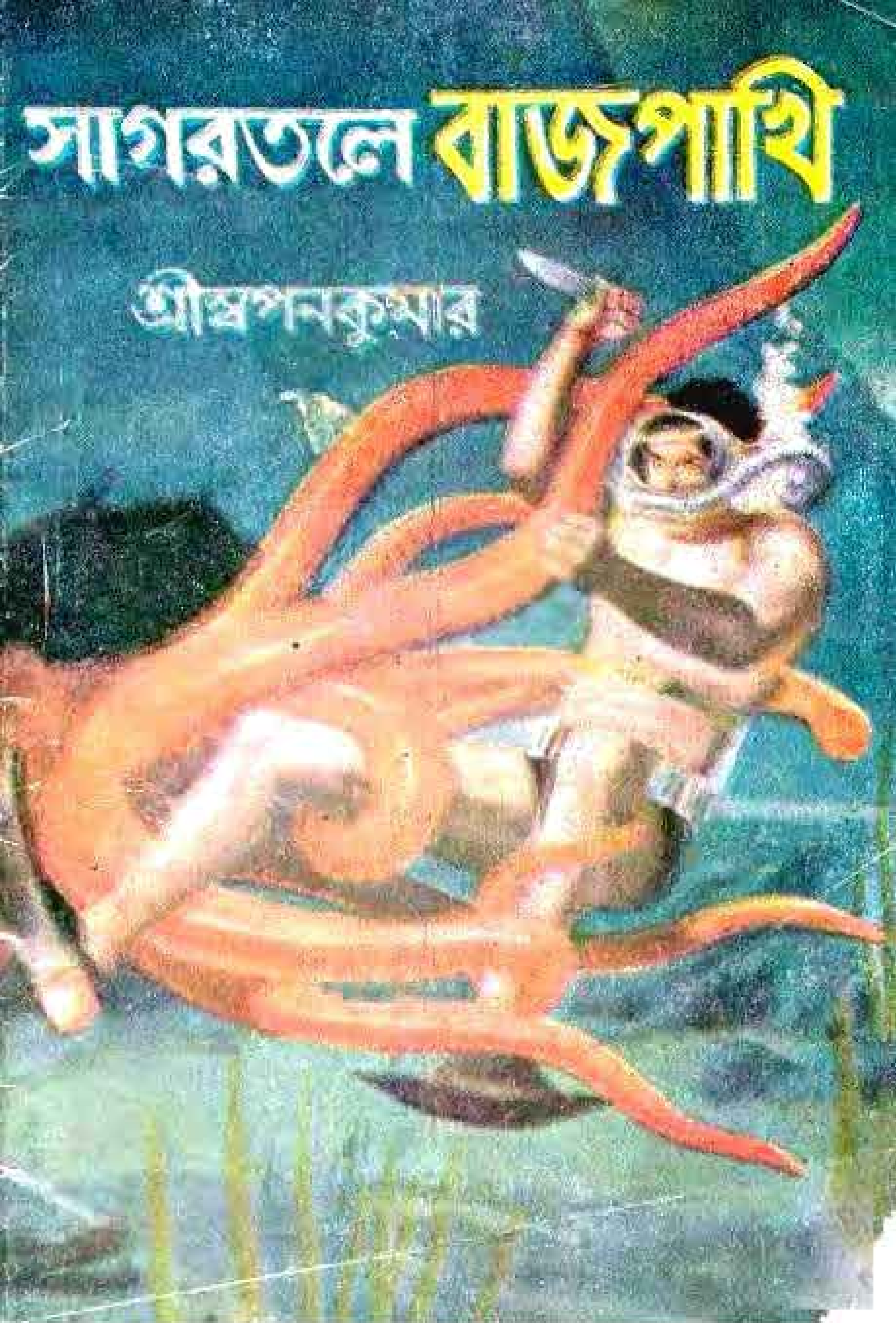
সাগরতলে বাজপাখি
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—নং ১১

সাগরতলে বাজপাখি

শ্রীস্বপন কুমার

প্রকাশক ঃ
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩১২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি,	২। বাজপাখির পুনরভিযান,
৩। বাজপাখির রক্তলীলা,	৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা,
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার,	৬। হত্যাকারী বাজপাখি,
৭। বাজপাখির রহস্যজাল,	৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি,
৯। বাজপাখির কূটচক্র,	১০। বাজপাখির মরণ-মহোৎসব,
১১। সাগরতলে বাজপাখি	১২। আকাশপথে বাজপাখি,
১৩। মহাশূন্যে বাজপাখি,	১৪। অদৃশ্য বাজপাখি,

১৫। আন্তর্জাতিক চক্রে বাজপাখি

এর পর আরো বেরোচ্ছে

প্রতিটির মূল্য আট টাকা

মূল্য : ৮'০০

মুদ্রক ঃ
শ্রীভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

॥ এক ॥

সকাল সাড়ে নটা।

কোলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ বাসু তাঁর নিজের কোয়ার্টারে বসে সেদিনের ডাকে আসা এক তাড়া চিঠির উপরে চোখ বুলিয়ে চলেছিলেন।

প্রতিটি চিঠি জরুরী—তার মধ্যে কিছু সরকারী—কিছু বা সাধারণ মানুষের লেখা। তাতে নানা বিষয়ের আবেদন লিখিত হয়েছে।

হঠাৎ—

একটা নীল রঙের খামের উপরে মিঃ বাসুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তিনি সেটা তুলে নিলেন।

খামের উপরে একটি ছবি কোণের দিকে। একটি শিকারী বাজপাখির ছবি—যেন শিকারের উপরে ছোঁ মারতে উদ্যত।

মিঃ বাসু সেটা ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিটা বের করলেন।

তাতে লেখা ঃ

প্রিয় মিঃ বাসু,

দীর্ঘদিন আমি গেছিলাম ভারতের বাইরে। আমি পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য ইউরোপ ভ্রমণ করেছি প্রায় নয় বছর ধরে।

আপনাদের সঙ্গে, বিশেষ করে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে তাই ইতিমধ্যে আমার সংগ্রাম হয়নি।

কিন্তু আবার আমি এলাম ফিরে।

দীর্ঘদিন পরে ভারত যেন আবার আমাকে ডাক দিয়েছে।

আমি জানি আমি আবার ফিরে এসেছি শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন না আপনারা।

একদিকে পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদি আবার অত্যন্ত বিপর্যস্ত বোধ করবে—অন্যদিকে কয়েকজন সমাজের শোষণকারী ধনীলোক ও চক্রান্তকারী সামাজিক দস্যুরাও আমার ভয়ে আতঙ্কে উঠবে। আপনি একথা জেনে রাখুন কাজ না করে আমি থাকতে পারি না।

আর আমি লুকিয়েও কাজ করি না। কারণ পুলিশ বিভাগ বা গোয়েন্দাদের আমি ভয় করি না। আপনাদের নাকের ডগায় বসে অতীতে বহু কাজ আমি করেছি—ভবিষ্যতেও করব।

যদি আপনাদের ক্ষমতা থাকে—আমাকে ধরতে চেষ্টা করবেন।

এটি হলো আমার বিশেষ ও প্রথম ঘোষণা। ইতি

বাজপাখি

পুনশ্চ—এ চিঠির কথা টিকটিকি দীপক চ্যাটার্জীকেও জানাতে পারেন। তাকে আর পৃথক চিঠি দিলাম না।

• • •

এখানেই চিঠি শেষ।

সেটা হাতে নিয়ে ভালভাবে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন মিঃ বাসু।

ভেতরের চিঠির কাগজটা দামী। এককোণে একটি বাজপাখির ছবি এতেও আঁকা।

দামী কালীতে লেখা এটা। অথচ কোনও ফিঙ্গার প্রিন্ট তাতে নেই।

চিঠির প্রতিটি ছত্রে যেন উদ্ধত স্পর্ধা ফুটে বের হচ্ছে।

এ চিঠি যে বাজপাখিরই তাতে কোনও সন্দেহ হয় না মিঃ বাসুর।

তিনি গভীরভাবে কিছুক্ষণ ধরে নানা কথা চিন্তা করেন।

তারপর টেলিফোনটা তোলেন।

—হ্যালো…

উল্টোদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—কে আপনি ?

—মিঃ বাসু কথা বলছি।

—কি ব্যাপার ?

—বিশেষ জরুরী খবর আছে। দস্যু বাজপাখি দীর্ঘদিন পরে আবার ভারতে ফিরে এসেছে।

—সে কি !

—হ্যাঁ, আমি এইমাত্র তার চিঠি পেলাম।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

—দেন্ বী অ্যালার্ট মিঃ বাসু। এ রকম একটা এত বড় নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল বোধ হয় বিশ্বে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

—অল্ রাইট্ !

মিঃ বাসু ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

* * *

অমাবস্যার রাত।

ভয়াবহ অন্ধকার যেন সারা বিশ্ব প্রকৃতিকে গ্রাস করেছে।

শীতের দিন, তার উপরে কিছু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে পথেঘাটে।

সোঁ সোঁ শব্দে বয়ে যাচ্ছে বাদলা হাওয়া—মানুষের হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত যেন কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে।

পথে-ঘাটে মাঝে মাঝে জল জমে আছে। রাস্তা কর্দমাক্ত। এমনি আবহাওয়ার রাত দশটায় গঙ্গার ধার দিয়ে যে লোকটা

এগিয়ে চলেছে সে নিশ্চয়ই বিনা কারণে ঘর থেকে বের হয়নি।

লোকটা গঙ্গার ধার দিয়ে কাদা ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে একটি জায়গায় এসে দাঁড়াল।

পরণে কালো স্যুট, মুখে তার মুখোস আঁটা। চেহারার মধ্যে একটা যেন অদ্ভুত আতঙ্ক মেশানো।

পায়ের বুটটাতে কাদা মাখানি। বোঝা যায় যে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

সে যে কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল তা যেন বুঝতে পারা যায়।

সময় কাটে।

কুলকুল শব্দে বয়ে যায় গঙ্গার স্রোতধারা।

হঠাৎ—

দূরে দেখা যায় একটা জেলে ডিঙি এগিয়ে আসছে তীরের দিকে।

সে নৌকায় একটিও আলো নেই। নৌকাটা যেন নিজের উপস্থিতি জানাতে রাজী নয় কিছুতেই।

নৌকায় বসে একজন দীর্ঘদেহী লোক। পরণে কালো স্যুট। মাথায় নাইটক্যাপ।

নৌকাটা সে নিজেই দাঁড় টেনে নিয়ে আসছে।

একটু পরে নৌকা তীরে ভিড়ল।

নৌকা থেকে নামল দীর্ঘদেহী লোকটা। নৌকা এক পাশে বাঁধল সে।

তারপর নেমে এলো।

আগের লোকটি তাকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাল ভক্তি-সহকারে।

—কে ?

—ছাব্বিশ নম্বর।

– ঠিক আছে। ওরা তৈরী ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—সকলেই এসেছে ত ?

—পাঁচজন এসেছে।

—কে আসেনি ?

—দশ নম্বর।

—কেন ?

—সে আগেই একটা কোন কেসে গেছে স্যার।

—ঠিক আছে। চল।

দুজনে এগিয়ে চলল।

চারদিকের যত বাড়ি নিস্তব্ধ, নিঝুম। কোন বাড়িতে একটিও আলো দেখা যায় না।

পথের মোড়ে মোড়ে শুধু ল্যাম্পপোস্ট। তাদের ক্ষুদ্র আলো পথকে যেন আরও স্বপ্নাতুর করে তুলেছে, যেন না জানা রহস্যের ছোঁয়া প্রতিটি পথের কোণে জমে আছে।

তার মধ্য দিয়ে নির্ভীকের মত এগিয়ে চলল ওরা দুজন। তাদের ভঙ্গি দেখে মনে হয় পৃথিবীর কোনও লোককে তারা এতটুকুও গ্রাহ্য করে না।

॥ দুই ॥

কিছুটা এগিয়ে আঁকাবাঁকা যে সব পথ দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল, সেপথে বোধ হয় কোন সভ্য লোক যাতায়াত করে না।

গলি ঘুপচির গোলকধাঁধা পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি ক্ষুদ্র গলির প্রায় অন্ধকার একটি বাড়ির সামনে এসে দুজনে দাঁড়াল।

দীর্ঘদেহী লোকটি বললে—এই বাড়ি ত?

—হ্যাঁ স্যার।

—হাততালি দাও।

সঙ্গীটি তিনবার হাততালি দিল।

নিমেষের মধ্যে যেন আকাশ ফুঁড়ে একটি ঢ্যাঙ্গা মূর্তি এসে দাঁড়াল তার সামনে।

কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তিটি বিচিত্র কায়দায় হাতদুটি একত্র করে হাঁটুটা একটু বেঁকিয়ে নবাগতের দিকে নিক্ষেপ করল।

নবাগত ঢ্যাঙ্গা লোকটি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নতজানু হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত দুটো একত্র করল। তারপর হিন্দী ভাষায় বললে—আসুন।

দুজনে এগিয়ে চলল।

বাড়িটি অন্ধকার। দুজনে ভেতরে প্রবেশ করে কিছু ঘুরে একটা বড় হলঘরে দাঁড়াল।

হলঘরে একটি আলোও জ্বলছে না। বাইরের পৃথিবীর কোনও লোক জানতেও পারবে না তাদের অস্তিত্ব।

ঘরের এক কোণে একটি বিরাট মর্মর নির্মিত সিংহ বসান।

ওর চোখ দুটি যে বহুমূল্য প্রস্তর নির্মিত তা সহজেই বোঝা যায়। এই জমাট আঁধারেও তা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

ঢ্যাঙ্গা লোকটি হুলঘরেই দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত আগন্তুকটি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে সিংহটির চোখ দুটোর ওপর পর পর দু'বার চাপ দিল।

অভূতপূর্ব পরিবর্তন। একটা ঘর ঘর শব্দ। সিংহটা কিছুটা বাঁ দিকে সরে গেল। সেখানে দেখা দিল একটা গোপন গহ্বরের মুখ।

কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত লোকটি গহ্বরের আঁধারের মধ্যে নিমেষে মিশে গেল। পেছনের গহ্বরটাও বন্ধ হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এলো সিংহটি।

বাইরের পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাস থেকে লোকটি কোন্ অজানা গোপনতার মাঝে তলিয়ে গেল তার চিহ্ন পড়ে রইল না একটুও।

কে জানে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে গোপন করল সে ?

কিন্তু যবনিকার আড়ালে আর এক নতুন দৃশ্যের দ্বার উন্মোচন করলেই বোঝা যাবে কোথায় সে গোপন রহস্যের উৎস।

মাটির তলে ছোট্ট একটা ঘর। পৃথিবীর আলো বাতাস, মুক্ত প্রকৃতির অবারিত আনন্দ কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন।

প্রায়ান্ধকার কক্ষটিতে বসে পাঁচটি প্রাণী।

ওদের পাঁচজনই পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের চোখে সন্দেহপূর্ণ রহস্যজনক ব্যক্তি। জীবনে ওরা পেছনে এমন কোন প্রমাণ ফেলে যায় না যার ফলে কেউ ওদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

ষষ্ঠ যে লোকটি দ্রুত পায়ে ঘরে প্রবেশ করল সে আমাদের আগের দুইজন ঢ্যাঙা লোক।

সকলেই বসল সন্ত্রস্ত ও উৎকর্ণ হয়ে। ডুবে গেল মনোনিবেশের গম্ভীরতায়।

নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশের মাঝে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল ওরা।

একটু পরেই ঘরটার মধ্যে শোনা গেল একটা গম্ভীর আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠধ্বনি। শঙ্খধ্বনির মত উদাত্ত, অসির মত ক্ষুরধার। একটি মাইক্রোফোনের মধ্য দিয়ে কে যেন বলছে—বন্ধুগণ। বহুদিন পরে আবার তোমাদের কানে গিয়ে পৌঁছেছে আমার আহ্বান।

সারা পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে আমি আবার ফিরে এসেছি ভারতে।

কিন্তু তোমরা ছয় জনই হচ্ছ আমার সমস্ত আদেশ পালনের প্রথম সোপান। দিকে দিকে আমার যে অজস্র অনুচরেরা ছড়িয়ে আছে, তারা জানে 'বাজপাখিকে'। বাজপাখির নাম শুনে বুকের স্পন্দন দ্রুততর না হয় এমন লোক সারা ভারতবর্ষে একটিও নেই। কিন্তু এ সমস্তই তোমাদের কল্যাণে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়েই আমার আদেশ বাণী গিয়ে পৌঁছবে আমার সহস্রাধিক অনুচরের কানে। তাদের প্রাণকে বিপন্ন করেও তারা আমরণ কাজ করবে আমার আদেশ অবলম্বন করে।

এবার তোমাদের প্রত্যেকের ওপর আমি যে সব স্থানের ভার অর্পণ করব বেশ ভাল করে শুনে রাখ তোমরা।

শোন রহমৎ আলী, তোমার অসীম শক্তি এবং সাহসের পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমার ওপরে তাই পশ্চিমবাংলার ও বিহারের ভার দিচ্ছি আমি।

বলবন্ত কাজ করবে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানও থাকবে তার মধ্যে।

হোয়াংলি হলো বোম্বে ও দক্ষিণ দিকের প্রতিনিধি। আর

দুটোও কাজ করবে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যাতে। সব জায়গায় থাকবে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তোমাদের প্রত্যেকেরই প্রচুর সাহস, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমাদের প্রত্যেকের ওপরেই যথেষ্ট বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু তোমরা মনে রেখো তোমাদের ওপরে আমার তীব্র দৃষ্টি অনুক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও আদেশ পালনে সামান্য ত্রুটি ও বিচ্যুতি যেন না হয়—কারণ আমার রোষবহ্নি যার ওপর পড়ে তার যে কী পরিণাম হয় তার প্রমাণ পেয়েছ তোমরা বহুবার।

তাই তা থেকে নিজেদের দূরে রাখবার চেষ্টা যে করবে তা আশা করি তোমাদের মতো বুদ্ধিমানদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। এবার তোমাদের পরবর্তী কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি যে উপদেশ দিচ্ছি তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে চেষ্টা করবে। শোন—

॥ তিন ॥

প্রিয় শেঠ বিজয়মল—

তুমি দশ বছর আগে প্রথম ব্রহ্মদেশে যখন পদার্পণ করো তখন তোমার সম্বল ছিল মাত্র দেড়শো টাকা আর মাথায় সামান্য বুদ্ধি। কিন্তু এই সামান্য জিনিসের ওপর ভরসা করেই তুমি সুদূর আজমীর থেকে ব্রহ্মদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিলে। ভেবে দেখ তুমি আজ পুরোনো দিনের কথা।

তুমি আজ লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী তা আমি জানি। কিন্তু কি ভাবে তুমি তোমার পার্টনারদের ফাঁকি দিয়েছ, কি ভাবে নকল কাঠকে আসল শালকাঠ বলে চালিয়েছ, কি ভাবে ভাল ঘিয়ের সাথে বিষাক্ত চর্বি মিশিয়ে অজস্র টাকা লাভ করেছ, তা আর কেউ না জানলেও এর প্রত্যেকটির ওপরেই আমার তীব্র দৃষ্টি রয়েছে।

তোমার বয়েস আজ চল্লিশের কোঠায়। হয় ত বড় জোর আর পনের বিশ বছর বাঁচতে পার। সুতরাং এত টাকা নিয়ে তুমি কি করবে? ব্যাঙ্কের সেফ ভল্টে তোমার টাকা পড়ে থেকে থেকে তাতে ছাতা ধরে যাচ্ছে। তাই তুমি যদি তোমার এই বিরাট অঙ্কের সামান্য একটা অংশ আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দান কর, তবে সেটা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে অনেকটা সবল করে তুলবে। এর বেশী অনেক টাকাই হয়তো দাবী করতে পারতাম কিন্তু আমাদের লোভ বেশী নয়।

কিন্তু তোমার অজস্র টাকার সামান্য অংশটা যদি তুমি আমাদের দিতে রাজী না হও তবে তোমার জীবনের বাকী পরমায়ুটিকেও সংক্ষিপ্ত করে দেবে। অর্থাৎ চার দিনের মধ্যে টাকাটা না পেলে বুঝব যে এই টাকাটা দেওয়া তোমার অভিপ্রেত নয়।

সেক্ষেত্রে আমি বাধ্য হব তোমার কাছ থেকে তিন গুণ তার মানে তিন লক্ষ টাকা আদায় করতে। আর সেই সঙ্গে তোমার জীবন বায়ুটাও বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

আশা করি তোমার মত বুদ্ধিমান লোক আপত্তি করবে না।

টাকাটা কি ভাবে আমাদের হাতে পৌঁছে দেবে তা জানতে চাও?

যে কোনও দিন (চার দিনের মধ্যে) তুমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে এনে তোমার শোবার ঘরের খোলা ডেস্কের মধ্যে রেখে দিলেই তা আমাদের হস্তগত হবে।

কিন্তু এই চিঠিটা যদি নেহাত ভাঁওতা অথবা মিথ্যা ভয় প্রদর্শন বলে মনে করো তবে তোমার ভবিষ্যৎ ভাবতেও আমার আতঙ্ক হচ্ছে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। ইতি—

বাজপাখি

* • *

চিঠিটা পড়া শেষ করে শেঠ বিজয়মল তাঁর দৃষ্টিটাকে তুলে ধরলেন চিঠির কোণের দিকে। সেখানে আঁকা রয়েছে বিরাট একটা রাজহংস আকৃতির বাজপাখি। শিকারের প্রত্যাশায় ওৎ পেতে বসে আছে সেটা।

শেঠ বিজয়মলের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল। হাত দুটো থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা পড়ে গেল। বাজপাখির কথা তিনি এর আগেও যে ছিটে-ফোঁটা না শুনেছিলেন তা নয়, তবে এভাবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে নানা রকম চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুতেই এই চিঠিটাকে মন থেকে ফেলতে পারলেন না তিনি।

কিছুক্ষণ পরে বসে পড়লেন ঘরের কোণে একটা সোফায়।

তারপরে ড্রয়ারটা খুলে একটা মদের বোতল বের করে এক ঢোকে চোখ বুজে খেয়ে ফেললেন সবটুকু। শেঠ বিজয়মলের জীবনে তিনি এভাবে মদে আসক্ত হয়ে পড়েছেন যে ও জিনিসটা ছাড়া কোনও কাজেই মনঃসংযোগ করতে পারেন না।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর খাস ভৃত্য রাম সিংকে ডাকলেন গাড়ি বের করতে হুকুম দেবার জন্যে।

রাম সিং ঘরে ঢুকে শেঠ বিজয়মলের হাতে তুলে দেয় একটা ছোট্ট চিঠি। বলল—হুজুর, কারখানা থেকে একটা লোক এসে এই চিঠিটা দিয়ে গেল।

শেঠ বিজয় মল চিঠিটা খুলে দেখলেন তাতে লেখা—

প্রিয় শেঠ বিজয় মল্‌ঃ

পুলিশের সাহায্য নিতে চেষ্টা করো না। কোলকাতার পুলিশ যে কি অকর্মণ্য তা তুমিও আমার চেয়ে কম জান না। কারণ, ওরা কর্মক্ষম হলে কি তোমার মত একজন মারাত্মক লোক আজ এত টাকার মালিক হতে পারতো?

যাক আমার দৃষ্টি যে সর্বদা তোমার চারপাশে ঘুরছে, এই চিঠিটা তার আরও একটা প্রমাণ। ইতি—

বাজপাখি

শেঠ বিজয়মল ধমক দিলেন—এই চিঠি কে দিয়ে গেল কারখানা থেকে।

রাম সিং বলল—তা তো জানি না হুজুর। লোকটাকে আগে কখনো দেখিনি। বলল—আপনি নাকি ওকে নতুন নিযুক্ত করেছেন। চিঠিটা দিয়েই একটা বাসে উঠে চলে গেল তক্ষুনি।

শেঠ বিজয়মল ওদের কর্মপদ্ধতি ও নিপুণতা দেখে অবাক হয়ে বসে পড়ল। তারপর হেঁকে বলল—গাড়ি বের করতে বল্‌।

॥ চার ॥

আলোকোজ্জ্বল মহানগরী কোলকাতা।

যেন সাজান একটি ছোট্ট কবিতা। নিজের অপূর্ব রূপকে সবার দৃষ্টির সামনে অতীব রমণীয় করে তুলে ধরেছে। সেদিকে চেয়ে কারো ধারণা করা দুষ্কর, কি ভাবে এই মহানগরেই কোন এক নিরালা কোণে গোপন চক্রান্তের বিষাক্ত বাষ্প উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা।

দুটি লোক হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের পরিবেশের প্রতি বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেবার সময় নেই তাদের।

একজনের পরনে কালো স্যুট পায়ে কালো জুতো মাথায় ফেল্ট হ্যাট, মুখে দামী টোব্যাকো পাইপ। পুরো সাহেবী পোষাক। অপর জন অনেকটা পাঞ্জাবীর মত দেখতে। মুখে চাপ দাড়ি। মাথায় পাগড়ী পরনে চুস পাজামার ওপরে পাঞ্জাবী আর জহর কোট।

সামনেই বিরাট নিয়ন আলোতে লেখা রয়েছে ক্যালকাটা কাফে।

দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানে চলেছে বয়-বেয়ারাদের ছুটোছুটি। বিক্ষিপ্ত কত গুঞ্জন। কাপ, চামচ, ছুরির ঠুং ঠাং আওয়াজ।

এককোণে দু'জন লোক বসে গোগ্রাসে খাবার গিলছে আর চারপাশে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তারা যেন কারোও প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

সাহেবী ও পাঞ্জাবী বেশী লোক দু'জন ভেতরে প্রবেশ করেই সোজা গিয়ে ঐ দুজন লোকের কাছেই দুটি ফাঁকা চেয়ার দখল করে

বসে পড়ল। তারপর দিলদরিয়া মেজাজে বয়কে ডেকে প্রচুর খাবারের অর্ডার দিল।

পূর্বোক্ত লোক দুটির দৃষ্টি এদের দিকে আকৃষ্ট হল বটে—কিন্তু এদের হাবভাব আর নিশ্চিন্ত দ্রুত কথাবার্তায় সন্দেহ দূর হতে দেরী হল না।

মিনিট পনের কেটে গেল। চারিদিকের পরিবেশের থেকে এদের কাউকেই পৃথক করে ধরা যায় না।

দ্বারপ্রান্তে একজন বার্মিজকে দেখা গেল। সবে সে হোটেলের ভেতরে প্রবেশ করেছে, এমন সময় শোনা গেল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ।

সমস্ত হোটেলটির ওপর দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলোড়নের ঢেউ বয়ে গেল। ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর আচ্ছন্ন। প্রবেশোন্মুখ বার্মিজটা ততক্ষণে ক্ষীণ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ছুটোছুটি হৈ-চৈ হুল্লোড়—

পাঞ্জাবীবেশী লোকটি সাহেববেশী লোকটিকে কি একটা ইঙ্গিত করল। দু'জনে ছুটে এল পতিত বার্মিজটার দিকে। তার সারা মুখখানি ঘিরে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া পরিব্যাপ্ত। বার দু'য়েক অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে চারদিকে চেয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করল।

সাহেবী পোষাকধারী লোকটা তার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কিছু বলতে চাও?

লোকটা অদ্ভুত, আতঙ্কিত, ভয়ার্ত দৃষ্টিটা চারদিকে ফেলতে চেষ্টা করল। তারপরে অনেক কষ্টে মুখটা তুলে বিড় বিড় করে শুধু বলল—বাজপাখি···বাজ····বিডন স্কোয়ার—তারপরেই ঢলে পড়ল অনন্ত নিদ্রায়···

কোণের যে বার্মিজ দু'টি এতক্ষণ খাবার খাচ্ছিল তারা অনেক

আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এইবার দ্বারের দিকে অগ্রসর হলো। হঠাৎ সাহেববেশী লোকটি ছুটে গিয়ে একটা উদ্যত রিভলবার তাদের দিকে তুলে ধরে বলল—এই, এক পাও নড়তে চেষ্টা করলে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তোমাদের বাঁচাতে পারবে না বন্ধু—

লোক দুটি এভাবে বাধা পাবার জন্যে বোধ হয় আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। দুজনে হাত তুলে দাঁড়াল বটে কিন্তু একটু ফাঁক পেলেই সামনের বার্মিজটি আচমকা একটা লাথি মারল সাহেবী পোষাক পরা লোকটির তলপেটে। আর্তনাদ করে ছিটকে পড়তেই বার্মিজ দুটি এক লাফে পথে পড়তে চেষ্টা করল।

পাঞ্জাবীবেশী লোকটির হাতেও একটি রিভলবার গর্জে উঠল। একজন বার্মিজ লুটিয়ে পড়ল—অপরজন ততক্ষণে অদৃশ্য—

সাহেববেশী লোকটি একটু পরেই উঠে দাঁড়াল।

হোটেলের ম্যানেজার ছুটে এলেন। সাহেব ও পাঞ্জাবীবেশী লোক দু'টির দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের আমি শান্তিভঙ্গের অভিযোগে পুলিশে দিতে চাই।

লোক দু'টির একজন ম্যানেজারের কানে কি সব কথা বলেই একটা কি যেন বের করে দেখাল। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যানেজারের মুখ।

আহত বার্মিজটিকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দু'জনে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে হুকুম দিল—এই, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স···

লোক দু'টির একজন যে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর অপরজন যে কোলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ গুপ্ত তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত।

ট্যাক্সিটা কিছুটা এগুতেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাঁ কোণে একটা ছোট্ট রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছাল।

দীপক চ্যাটার্জী ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল—এক মিনিট অপেক্ষা কর।

রাস্তার ধারেই একজন খঞ্জ বিকৃতাঙ্গ ভিখারী লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে একঘেয়ে করুণ-সুরে ভিক্ষা করছিল। তার নিকট-বর্তী হয়ে হাতে একটা দশ পয়সা ফেলে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে দীপক জিজ্ঞাসা করল—খবর কিরে? আমাদের ক্যালকাটা কাফে থেকে বার্মিজটি…

ভিখারীটি মৃদু হেসে বলল—বিডন স্কোয়ার…

দীপক আবার গাড়িতে উঠে বসে চালাতে বলল।

॥ পাঁচ ॥

কোলকাতার সবচেয়ে কুখ্যাত অঞ্চলগুলির অন্যতম বিডন স্কোয়ার?

গাঢ় অন্ধকারের বুকে আবছা ছায়ার মত তিনতলা বহু পুরোনো বাড়িটা বাইরে থেকে দেখে ধারণা করা যায় না যে এই বাড়িটিতে কেউ বাস করে।

এ অঞ্চলটা সত্যিই অন্ধকার—তার ওপর বাড়িটার কোনও অংশ থেকে বিন্দুমাত্রও আলোক রেখা চোখে পড়ে না। কল্পনা করাও যায় না এ বাড়িটার কোথাও কোনও জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব।

জীবনে বার্মিজটি বহুবার বহু দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সত্যি—কিন্তু এতটা সাহস তার মধ্যে বড় একটা দেখা যায়নি। একথা অনেকটা স্বীকার্য। বিডন স্কোয়ারের নৈশ মহোৎসবে সে ছুটে এসেছে একা। কোমরে জড়ান একটিমাত্র রিভলবার সম্বল করে।

বিডন স্কোয়ারের বাড়িটার সামনে এসে যে বার্মিজটা দাঁড়াল

তাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করলে তার দেহাভ্যন্তরস্থ রিভলবারটি সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসম্ভব। তাছাড়া একটা গরীব বার্মিজ। দামী রিভলবার পাবেই বা কোত্থেকে ?

বার্মিজটা পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো বের করল, তাতে বেশ স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—১১৩—

লোকটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। বাড়িটার সামনের দিকটা ভাল করে দেখে সে ঘুরে ঠিক পেছনে এসে উপস্থিত হলো। বারকয়েক কান পেতে শুনল কোনও শব্দ তার শ্রুতিগোচর হয় কিনা। শোনা গেল ঝিঁঝিঁর একটানা করুণ কান্না। আর প্রবহমান বাতাসের দোলায় গাছের পাতায় হিস্-হিস্ শব্দ।

এবার সে যে জিনিসটা দোতলার বারান্দার রেলিং লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল তা একটা বড় দড়ির প্রান্তে কতকগুলি লোহার হুক লাগান। ভাল করে একবার টেনে সে নিঃসন্দেহ হল যে বাড়িটা পুরোনো হলেও এখনও বেশ মজবুত আছে। ধীরে ধীরে দড়িটা বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে সে ওপরে উঠতে লাগল। একটু ভাল করে নজর করলেই বোঝা যায় যে, একাজে সে বেশ অভ্যস্ত...

দোতলার বারান্দায় পা দিয়ে ভাল করে একবার চারদিকে দেখল সে। নাঃ। জনমানবের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই বাড়ির কোথাও। তবে কি সে ভুল খবর পেয়ে এসেছে ? মার্জারের মত লঘুপদে সে এগিয়ে চলল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটাকে যতদূর সম্ভব চারিদিকে ভাল করে মেলে ধরে।

আঁকাবাঁকা একটা করিডর। তার শেষ প্রান্তে সারি সারি কয়েকটি ঘর। অধিকাংশই তালাবন্ধ। একটিমাত্র ঘরের দরজা খোলা।

ঘরের মধ্যে পা বাড়াল লোকটি। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘর।

কোথাও জনমানবের সাড়া মাত্রও নেই। লোকটি ফাঁপরে পড়ল। এবার কোন দিকে যাওয়া যায়।

মিনিট সেকেন্ড নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শোনা গেল কার একটা কণ্ঠস্বর। ফিস্ ফিস্ করে একজন লোক কাকে উপদেশ দিচ্ছে বলে মনে হয়। অন্ধকার চোখে অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে। লোকটি ভাল করে দৃষ্টিটাকে মেলে ধরে দেখল—ঘরে একজনও লোকও নেই। তবে কথা ভেসে আসছে কোত্থেকে ?

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল লোকটা পায়ে পায়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। বেশ স্পষ্ট শব্দ শোনা গেল এবার। দেওয়ালের ওপাশে কোনও গোপন কক্ষে বোধ হয় কেউ কথা বলছে। কিন্তু ওদিকে যাবার ত কোন পথ নেই। সব ঘরগুলিই ত একদিকে দরজা আর ওধারে ত করিডর। তারপর নিচে নামবার সিঁড়ি···বেশ ভালভাবে দালানের গায়ে কান পেতে রইল বার্মিজটি। একটু পরেই শোনা গেল কথোপকথনের শব্দটা স্পষ্ট করে। একজন লোক অপর একজনকে কিছু বলছে যেন। কণ্ঠস্বর ভারী, গম্ভীর।

কণ্ঠস্বর বলছে—ইস্মাইল সর্দার! তোমার মূঢ়তার পরিচয় আজ পেলাম। তুমি কেন হোয়াংলীকে কোনও নিরালা স্থানে না নিয়ে গিয়ে সবার সমক্ষে ওই ক্যালকাটা কাফের দরজায় মারতে গেলে ?

উত্তরে যেন কে একজন বলল—ওখানে হোয়াংলীকে না মারলে সে নিশ্চয়ই দলের অনেক কথা ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছে গিয়ে ফাঁস করত। ওই ক্যালকাটা কাফেতে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আর মিঃ গুপ্ত ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছিল। আমার মনে হয় এভাবে তাকে হত্যা করলে সে সব প্রকাশ করে আমাদের বিপদ

ডেকে আনতো…

কণ্ঠস্বরে বলল—কিন্তু আমাদের যে লোকটি ধরা পড়েছে—

—ওকে বিশেষ ভয় নেই, সবে ও দলে প্রবেশ করবে স্থির করেছিল। দলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ত জানে না। আমাদের দলের অপর লোকটি ত নির্বিঘ্নে গা ঢাকা দিয়েছে—

—কিন্তু হোয়াংলী মৃত্যুর আগে কিছু প্রকাশ করতে পারেনি ত?

…না বিশেষ কিছুই নয়—

তীব্র হুঙ্কার ভেসে এল—অপদার্থের দল! বিশেষ কিছুই নয় একথা শুনে লাভ কি? কোনও একটা কথা প্রকাশ করাও যে আমাদের পক্ষে কতটা মারাত্মক তা জানো না! দিনের পর দিন তোমাদের কর্মক্ষমতায় যেন ভাটা পড়ে আসছে। আমাদের নজর রাখতে হবে শহরের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি লোকের ওপর, প্রতিটি কাজের সূক্ষ্মতম অংশের প্রতি। বাজে কথা আমি শুনতে চাই না—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী এখন কোথায়?

—পুলিশ হেড কোয়ার্টারে…

—তার সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওই বাঙ্গালী শয়তানটাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। সারা কোলকাতার পুলিশের যা সাধ্য নেই তার চেয়ে অনেক বেশী কর্মক্ষম ওই একটি মাত্র লোক। তোমাদের মধ্যে কে ওর ভার নিতে প্রস্তুত আছ জানাও—

এতক্ষণ পরে বার্মিজটার দেহে যেন সম্বিত ফিরে এল। নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তদ্বার দিয়ে ওপাশে গিয়ে আবার তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তদ্বারের চাবিকাঠি। একটু তৎপর না হলে ওরা এক্ষুনি হয়তো তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ওধারে তখন শোনা গেল : ফু চাও—দীপক চ্যাটার্জী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

দীপক বিস্মিত।

কয়েকজন ছুটে এসে তাকে ঘিরে ফেলবে হয়ত এক্ষুনি।

কিন্তু কি করে বাজপাখি তার অস্তিত্ব টের পেল তা সে বুঝতে পারল না।

তাজ্জব ওর ক্ষমতা বটে!

ওধার থেকে শোনা গেল একটা অদ্ভুত অট্টহাসি। হাঃ হাঃ হাঃ।

তারপর শোনা গেল, কণ্ঠস্বর বলছে—শুবে শোন অপদার্থের দল। তোমরা যা কল্পনাও করতে পার না, সেই সব প্রতিটি ঘটনা থাকে আমার নখদর্পণে। তোমরা মনে করছ গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী নির্বিঘ্নে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে বসে খানা খাচ্ছে? না। তোমাদের ভুল আর একটু হলেই টেনে নিয়ে যেত সর্বনাশের পথে। তোমাদের ঠিক পাশের ঘরেই গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী দাঁড়িয়ে শুনছে তোমাদের কথা—সে ভেবেছে বার্মিজের ছদ্মবেশে সে আমার চোখে ধুলো দেবে। কিন্তু তা পারেনি। যাও, মুহূর্তও বিলম্ব নয়। ও পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

বার্মিজবেশী দীপক প্রথমে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে নির্ভীকভাবে কোমর থেকে অটোমেটিক রিভলবারটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। যে কোন উপায়েই হোক না কেন শত্রুপক্ষের হাত থেকে বাঁচতে হবেই। এই সাহসে নির্ভর করেই একদিন সে বিখ্যাত দস্যু নিয়তির সাথে মুখোমুখি সংগ্রাম করেছিল।

ক্লিক করে একটা কিসের শব্দ হলো। দীপক ঠিক বুঝতে পারল না ওটা কিসের শব্দ হলো। ওধার থেকে একটা ক্লিং ক্লিং শব্দও শোনা গেল। আর তার সাথে সাথেই দালানের খানিকটা

অংশ সরে গেল। দেখা গেল একটা দরজা। তিনজন লোক দরজাটা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। দপ্ করে একটা আলো জ্বলে উঠে ঘরটিকে উদ্ভাসিত করে তুলল।

দীপকের সারা দেহের ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। একটা অদ্ভুত উন্মাদনা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। অগ্রবর্তী লোকটাকে লক্ষ্য করে সে ট্রিগার টিপ্‌লে।

গুড়ুম! গুড়ুম!

কেঁপে খান্ খান্ হয়ে গেল নৈশ নিস্তব্ধতা।

কিন্তু লোকগুলি তেমনি দাঁড়িয়ে। সারা দেহে সামান্য মাত্রও আঘাত লেগেছে বলে মনে হলো না।

দীপক এক পা এগুতেই দেখল অদ্ভুত একটা স্বচ্ছ কাঁচের দেওয়াল দিয়ে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। জীবনে এরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সে এর আগে সঞ্চয় করেনি।

হাতে রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে দীপক শত্রুর হাতে বন্দী হলো।

ওধারে লোকগুলি দাঁড়িয়ে দীপকের দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে লাগল। অদ্ভুত একটা ক্রোধ এবং উত্তেজনায় দীপকের সর্বশরীর যেন জ্বালা করে উঠল।

নেপথ্যে অবস্থিত একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল—তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে অগ্রসর হও। ওর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হবে তা তোমাদের পরে জানাব।

দুজন বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। একজন পাঞ্জাবী গুন্ডা বসে রইল রুদ্ধ হতভম্ব দীপকের তত্ত্বাবধানের জন্যে—

দীপকের কানে এসে বাজতে লাগল নেপথ্যোস্থিত কণ্ঠস্বরের অপসৃয়মান অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ—

॥ ছয় ॥

চারদিন কেটে গেছে।

শেঠ বিজয়মল কোন কথা ভয়ে পুলিশকে জানাতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল যে এসব কথা পুলিশে জানালে পুলিশ বিভাগ তাঁকে সন্দেহ করবে।

কোথেকে সে এত টাকা পেল ? কি উপায়ে উপার্জন করল ?

পুলিশ বিভাগ এইসব প্রশ্ন করলে তিনি তার কি উত্তর দেবেন ?

কোন যোগ্য উত্তর তার নেই !

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে শেঠজী উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন—

অবশেষে এল চতুর্থ দিন।

বাধ্য হয়ে শেঠজী ফোন করে পুলিশে। লালবাজারে তাঁর ফোন ধরলেন মিঃ গুপ্ত।

—হ্যালো—কে ?

—আমি শেঠ বিজয়মল স্যার।

—শেঠজী ? কি ব্যাপার ?

—বিশেষ জরুরী ব্যাপার স্যার।

—তার মানে ?

—মানে দস্যু বাজপাখি আমার কাছে একলক্ষ টাকা দাবী করে চিঠি দিয়েছে।

—কবে ?

—আজ চারদিন হলো।

—সর্বনাশ। শেষদিন কবে ?

—আজকেই !

—তাহলে আজই সে আপনাকে আক্রমণ করবে।

—হায় রাম! বলেন কি?

—ঠিকই বলছি। তাছাড়া বাজপাখির ব্যাপারে তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা ত আমাদের নেই। গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সাহায্য নিতে হবে।

—বেশ ত—আপনারা যা করতে চান করুন। যেন বিপদে না পড়ি।

—আচ্ছা। আমি তাহলে এক্ষুনি আমার পুলিশ বাহিনীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার বাড়িতে।

—ধন্যবাদ।

—ভয় পাবেন না। সাবধানে থাকবেন।

—আচ্ছা!

শেঠজী রিসিভার নামিয়ে রাখেন।

ঘণ্টা খানেক পর।

শেঠজীর বাড়িতে পুলিশ বাহিনী দলে দলে এসে যায় লালবাজার থেকে।

তাদের প্রধান হলেন সার্জেণ্ট জোন্স। তিনি নিজে গিয়ে শেঠজীর ঘরে গিয়ে বসেন।

মিঃ জোন্স বলেন—কোন ভয় নেই আপনার। আশা করি নগদ অর্থ বাড়িতে কিছু রাখেন না।

—আজ্ঞে, ব্যাঙ্কে সব টাকা থাকে—তবে তিন লাখ টাকা শুধু আছে ঐ সিন্দুকে।

—কেন? এত টাকা বাড়িতে রেখেছেন কেন?

—ব্যবসায় লাগে স্যার!

সার্জেণ্ট জোন্স রেগে ওঠেন, বলেন—এত টাকা যদি বাড়িতে

রেখে দস্যুদের আমন্ত্রণ জানান, তবে আমি কি করি বলুন ?

তা ত ঠিকই ! কিন্তু কি করি বলুন ? ব্যবসাতে সব সময় ক্যাশ টাকা দরকার হয়।

—তাই বলে তিন লাখ। আমার মনে হয় এইসব হচ্ছে ব্ল্যাক্ মানি।

—না, তা নয়।

—তবে ?

—এ টাকাটা শুধু ব্যবসার জন্যে রাখা।

সার্জেন্ট জোন্স বিরক্ত হয়ে বলেন—যাক্‌গে, সে সব খোঁজে আমার দরকার নেই। আমার দরকার দস্যু বাজপাখিকে।

শেঠজী বলেন—তা ত ঠিকই !

সার্জেন্ট জোন্স তারপর তন্ন তন্ন করে সারা বাড়িতে কোন গুপ্তস্থান আছে কিনা দেখেন।

সব দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি পাহারার কাজে রত হলেন।

ওদিকে মিঃ গুপ্ত ফোন করলেন দীপককে।

রতন ফোন ধরল—হ্যালো…

—কে, দীপকবাবু ?

—না, আমি রতনলাল।

—তিনি কোথায় ?

—জানি না। কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।

—যা হোক, আপনি তা হলে এক্ষুনি একবার শেঠ বিজয়মলের বাড়িতে আসবেন। বাজপাখির অভিযান তাঁর উপরে হতে পারে।

—বলেন কি ?

—হাঁ, তিনি চিঠি দিয়েছেন টাকা দাবী করে। আজই তার শেষ দিন।

—আপনারা গার্ড দিচ্ছেন ত ?

—হ্যাঁ।

—কে আছেন এ কাজে ?

—সার্জেন্ট জোন্স আর পনের জন আর্মড পুলিশ।

—কিন্তু তিনি যে রকম হামবড়া লোক, তাতে···

—কোন অসুবিধে হবে না। আমি তাঁকে বলেছি যে আপনারা থাকবেন।

—আচ্ছা !

—এখুনি যাবেন ত ?

—হ্যাঁ। আর চিঠি লিখে রেখে যাব যেন দীপক এলেই ওখানে যায়।

—আচ্ছা।

রতন রিসিভার নামিয়ে রাখে।

॥ সাত ॥

রতনলাল বেলা বারোটা পর্যন্ত দীপকের জন্য অপেক্ষা করল, তবু দীপক ফিরল না।

সে চিন্তিত হলো খুব।

তারপর একটা চিঠি লিখে রেখে সে রওনা হল শেঠ বিজয়মলের বাড়ি।

গিয়ে দেখল, সারাটা বাড়ি যেন একটা পুলিশ বেষ্টনী দ্বারা আগাগোড়া বেষ্টিত হয়ে রয়েছে।

একটা মাছি পর্যন্ত সেই ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রতন দোতলায় উঠে গেল।

বাধা দিল পুলিশ।

রতন বললে, আমি মিঃ গুপ্তের লোক।

—কার্ড আছে।

—হ্যাঁ।

রতন তার আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে জোন্স বেরিয়ে এলেন।

রতনকে দেখে বললেন—আপনি।

—হ্যাঁ।

—আমরা ভীষণ ক্লোজ গার্ড দিচ্ছি স্যার—কিছু মনে করবেন না।

—না না এত ভালই।

—আশাকরি বাজপাখি এলে তাকে আমি ঠিকই ধরতে পারব।

—বেশ ত।

দুজনে ভেতরে গেল।

রতন তার পিস্তল বের করে প্রস্তুত হয়ে বসল গার্ড দিতে।

সময় কাটে—

মিনিট, সেকেণ্ড, ঘণ্টা···

মিঃ জোন্স বলেন—আমি বলছি, এই ভয়াবহ পুলিশ গার্ড দেখে নিশ্চয়ই বাজপাখি এদিকে ঘেঁষবে না কখনো!

—আপনি বাজপাখিকে তাহলে চেনেন না।

—কেন?

—সে কাউকে পরোয়া করে না।

মিঃ জোন্স হাসেন।

—হাসলেন যে?

—আমি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করি না।

—অলৌকিক?

—তা নয়ত কি! সবাই বলে বাজপাখি নাকি হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়—তাকে কেউ দেখতে পায় না। তার সর্বত্র অগাধ গতি। সে অসম্ভবকে সম্ভব করে। এসব কি আপনি বিশ্বাস করেন রতনবাবু?

—না।

—তাহলে?

—সে অলৌকিক কাজ করতে পারে না বটে, তবে যা করে তাতে বোঝা যায় অসামান্য বুদ্ধি তার!

—তা হতে পারে বটে—তবে সে দুর্ধর্ষ যতোই হোক না কেন তাকে ধরা অসম্ভব নয়।

—তা হতে পারে—কারণ দীপক কয়েকবার তাকে ফাঁদে ফেলেছে, একথা ঠিক! কিন্তু তবু, তার সামনে পড়লে অনেক বড় বড় অফিসারও কাঁপতে থাকেন।

—বলেন কি?

—ঠিকই বলছি। আপনি যে পুলিশব্যুহ দুর্ভেদ্য আঁচ করছেন, সে হয়ত ত অতি সহজেই ভেদ করতে পারবে।

—তাও কি হয়!

—নিশ্চয়ই হতে পারে মিঃ জোন্স।

—কিভাবে?

—কোন অবস্থায় যে বাজপাখি কিভাবে কাজ করবে তা ভগবান জানেন না বোধহয়।

—এটা আপনাদের হীনমন্যতা রতনবাবু।

—তা হতে পারে।

ঢং ঢং···

চারটে বেজে গেল।

মিঃ জোন্স বললেন—সন্ধ্যার পর হয়ত ভয় কিছু থাকতে পারে। আমি তাই সন্ধ্যার পর লালবাজার থেকে আরো এক ভ্যান পুলিশ আনাব। দেখা যাক বাজপাখির কত ক্ষমতা।

কোন উত্তর দেয় না রতন।

* * *

আধঘণ্টা পর।

একজন কনস্টেবল ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে।

মিঃ জোন্স বলেন—কি খবর ভরত সিং?

—বড় সাব এসেছেন।

—কে! মিঃ গুপ্ত?

—না, পুলিশ কমিশনার মিঃ বাসু।

—তাই নাকি ?

মিঃ জোন্স উঠে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই মিঃ বাসু ঘরের মধ্যে ঢোকেন।

—আসুন স্যার ! নমস্কার !

—কাজ ঠিকমত চলছে তো ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—আমি চাই বেশ ভালভাবে কাজ করতে ! টাকাগুলো কোথায় আছে ?

—আজ্ঞে সিন্দুকে।

—দেখি !

শেঠজী সিন্দুক খুলে টাকাটা বের করে রাখেন টেবিলের ওপর। একটা ব্যাগ ভরা ছিল তিন লাখ টাকা।

মিঃ বাসু বলেন—আমি টাকাটা নিয়ে যাচ্ছি—এটা রাখব লালবাজার স্ট্রংরুমে। কাল শেঠজী ওটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেবেন। কেমন ?

—আচ্ছা !

মিঃ বাসু বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ জোন্স সেলাম করলেন তাঁকে।

* * *

পরদিন সকাল।

মিঃ জোন্স ফোন করলেন মিঃ গুপ্তকে। মিঃ গুপ্ত ফোন ধরলেন।

—হ্যালো কি খবর ?

—বাজপাখি আসেনি স্যার। সব ঠিক আছে।

—ভেরী গুড্‌ মিঃ জোন্স। টাকা-পয়সা সব ঠিক আছে ত?

—না স্যার, কাল সন্ধ্যায় ত মিঃ বাসু এসে টাকা সব নিয়ে এলেন।

—মিঃ বাসু!

—হ্যাঁ।

—বলেন কি? কাল দুপুর দুটোর পর ত তিনি লালবাজার থেকে কোথাও বের হননি। তিনি আমার সঙ্গে মিটিং করেছেন।

—তা হলে কে সেই লোক—আমরা দেখলাম তিনি। মিঃ বাসু—

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ গুপ্ত।

—হাসছেন স্যার?

—হ্যাঁ, মিঃ জোন্স। কারণ আপনাদের সবাইকেই বাজপাখি প্রতারণা করেছে। ছদ্মবেশ ধারণে তার জুড়ি ভারতে নেই! বুঝলেন?

মিঃ জোন্সের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না।

॥ আট ॥

শত্রুর চক্রান্তে এভাবে বন্দী হয়ে দীপক কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। হাতে গুলিভরা রিভলবার, সামনে শত্রুর অট্টহাসি অথচ তার কিছুই করবার নেই। স্বচ্ছ কাচের মত বস্তু নির্মিত যে দেওয়ালটি তাকে ঘিরে রেখেছে তা গুলির দ্বারা ভাঙবার নয়। সে প্রমাণ সে আগেই পেয়েছে। অথচ এভাবে কয়েক ঘণ্টা থাকলে ধীরে ধীরে বাতাসে অক্সিজেনের অভাবে সে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়বে।

কি করা উচিত তা স্থির করা দীপকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। স্নায়ুগুলো সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে তার।

যে লোকটি পাহারা দিচ্ছিল তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মোটাসোটা গড়ন। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত কামানো। মাথায় ঘন চুল। নাক চ্যাপ্টা। মুখে অজস্র বসন্তের দাগ আর চেহারাকে যেন আরও ভয়ঙ্কর ও বীভৎস করে তুলেছে।

ঘড়িতে একটা বাজছে টিক্ টক্ করে—লোকটা দীপকের তাচ্ছিল্যপূর্ণ মুখভাবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে। সে হাসিটাও যেন তীক্ষ্নধার ছুরির ফলার মতই বিভীষিকাপূর্ণ।

দীপকের মনে হলো এভাবে অতগুলি শত্রুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়ানো খুব বোকামি হয়েছে, কিন্তু তখন ও ছাড়া উপায়ও আর ছিল না কিছু।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে যেন একটু কষ্ট হচ্ছে। দপ্ দপ্ করছে কপালের রগ দুটো।

দীপকের মনে একটা ক্লান্ত অবসাদ। মৃত্যু যেন অক্টোপাসের

মত অষ্ট বাহু জড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে। বন্ধ ঘরের বায়ুতে শ্বাসকষ্টে সে হয়ত জ্ঞানহীন হয়ে পড়বে। তারপর ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। জানবেও না কেউ। শুনতেও পাবে না তার দেওয়ালের গায়ে মাথা কুটে ফিরে আসা আর্ত চিৎকার—

যদি কেউ বা দেখে তা হয়ত দেখবে ওই সব শত্রুপক্ষের লোকেরা যারা তার দুর্দশা দেখে দাঁত বের করে হাসছে বিদ্রূপের হাসি।

তবে কি সে সমুদ্র বার্মার বুকে এসে একটা দস্যুদলের চক্রান্তে প্রাণ হারাবে? সারা ভারত বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর হবে এমনি পরাজয়।

অদ্ভুত একটা উত্তেজনার স্রোত যেন বয়ে গেল তার সারা দেহের মধ্যে দিয়ে। প্রচণ্ড একটা আশার জোয়ার তার মনের সবকিছু হতাশাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বাঁচবার নতুন প্রেরণা পেয়ে যেন সবল হয়ে উঠল সে।

বাঁচতে তাকে হবেই।

বিপদে সাহস হারালে চলবে না।

ঘরের মধ্যে যে লোকটা পাহারায় ছিল সে বাইরে বোধহয় সঙ্গীদের সাথে বসে গল্প করতে ব্যস্ত। যে নিরেট শক্ত দেওয়াল দিয়ে তাকে ঘেরা আছে তা থেকে বের হবার উপায় যে তার নেই তা সে জানে—

দীপক ভাবল স্বচ্ছ দেওয়ালটি রিভলবারের গুলি প্রতিরোধ করতে পারে সত্য কিন্তু জোরে জোরে ধাক্কা দিলে কেমন হয়?

প্রাণপণে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে দেওয়ালে চাপ দিল।

কিন্তু দেওয়ালটা যেন পাথরের তৈরী।

বৃথা চেষ্টা—

হতাশ হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল—যদি কোন উপায় পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করেও কোন উপায় পেল না। ক্লান্তিতে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

এবার সে ঘরের মেঝেটা পরীক্ষা করতে লাগল। মেঝেতে পুরু ধুলো জমে আছে।

জোরে জোরে মেঝেতে পা ঠুকে দেখল কোথাও ফাঁপা আছে কিনা।

শক্ত সিমেন্টের তৈরী। লোহার মতই কঠিন।

ধুলো সরিয়ে দেখতে নজরে পড়ল এক জায়গায় একটা বল্টুর মত কি যেন মাথা উঁচু করে রয়েছে।

দীপক প্রাণপণে সেটাতে চাপ দিল, না—সে রকম কিছুই নয়। সিমেন্টের সাথে গাঁথা বল্টুটা কোনও কাজেই লাগে না।

হঠাৎ তার কি মনে হলো, চারিদিকে একবার ভাল করে চেয়ে বল্টুর চার পাশে তার পকেটের জাপানী ছোরাটা দিয়ে কুরতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বল্টুটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

এবার সে দাঁড়িয়ে জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে সেটার ওপরে প্রাণপণে চাপ দিল।

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়।

মেঝের খানিকটা অংশ শুদ্ধ দীপক নিচের দিকে নেমে চলেছে।

জানে না কোথায় সে নামার শেষ। পাতালপুরীর কোন অজানা গর্ভে মিলিয়ে যাবে যেন।

ধপ করে সে একটা নরম মাটিতে এসে পড়ল।

মেঝের অংশটা আবার আপনা থেকেই ওপরে উঠে গেল তার মাথার ওপরের ঢাকা অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

দীপকের চোখে ধীরে ধীরে আঁধারটা সহ্য হয়ে এসেছে।

বুঝল যে সে পাতালপুরীর একটা ঘরে।

দীপকের বুকে উত্তেজনা। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বের করে আলো ফেলল। সামনে একটা বিরাট গহ্বর দেখে বুঝতে পারল যে সেটা গোপন সুড়ঙ্গের মুখ।

দীপক ভাবতে লাগল আশ্চর্য হয়ে! কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়েছে কে জানে? এই সুড়ঙ্গ পথ—কোন্ অজানা বিভীষিকা হয়ত লুকিয়ে আছে এর মধ্যে।

কিন্তু না এগিয়েই বা কী করবে সে? চুপ করে বসে থাকলে মুক্তির উপায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না।

দীপক এগিয়ে চলল।

কী অসম্ভব অন্ধকার। বদ্ধ বাতাসের গুমোট গন্ধ। হাতের আলোটা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল। পথ কোথায় শেষ হয়েছে বোঝবার উপায় নেই। যেন মুখ ব্যাদিত একটা ভয়ঙ্কর সরীসৃপ।

পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে অপর একটা ঘরে। কিন্তু একি!

ঘরের মধ্যে একজন লোক বসে আছে। হাতে উদ্যত পিস্তল। কোমরে গোঁজা একটি ছোরা। লোকটার সারা মুখে যেন একটা হিংস্র অভিব্যক্তি।

মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে মার্জারের মত লঘুপদে এগিয়ে গেল দীপক। তারপরে আচমকা লোকটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকটি প্রস্তুত ছিল না। দীপক যুযুৎসুর একটি প্যাঁচে ওকে কাবু করে মুখে একটি রুমাল গুঁজে দিল।

দীপক বলল—বাইরে বেরুবার পথ দেখিয়ে দাও, নইলে এক-গুলিতে এখনই তোমাকে শেষ করতে একটুও দ্বিধা করব না।

লোকটির বাঁ কপালে বিরাট একটা ক্ষতচিহ্ন। ছুরির ফলার

মত খাড়াল দৃষ্টিটা যেন রক্তের নেশায় উদগ্র।

লোকটি অগ্রসর হলো। দীপক পেছনে।

ঘরের শেষে একটা দরজা। লোকটি দরজা খুলে দিল।

দীপক লোকটির দিকে চেয়ে বলল—এবারের মত তুমি যে আমার মুক্তিদাতা, তাই তোমায় কিছু বললাম না। বিদায়—

দীপক যখন পথে পা দিল তখন দিকচক্রবালের প্রান্তে অরুণোদয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতী রোদের আভা দেবতার আশিসের মতো ঝরে পড়তে সুরু করেছে।

॥ সপ্ত ॥

পরের দিন রাতের কথা।

রতন শেঠ বিজয়মলের বাড়ি থেকে ফিরে এল ভোরবেলা। সারাদিন কেটে গেল।

দীপক তখনো ফেরেনি।

সে মুক্তি পেয়েই নতুন ভাবে বাজপাখির পেছনে কাজ করতে ব্যস্ত হয়েছে। বাড়ি ফেরেনি।

রতন চিন্তিত হলো।

ভাল ঘুম হয়নি তার। মাথার মধ্যে যেন অজস্র চিন্তা জট পাকাচ্ছে।

বাথরুমে গিয়ে হাত পা মুখ ধুয়ে সে একটু চাঙ্গা হলো যেন। খাটের নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

স্তব্ধ বাড়ি।

রাতের কালো প্রহর গড়িয়ে চলে।

*　　*　　*

পরদিন ভোরবেলা।

রতনের ঘুম ভাঙল টেলিফোনের ঘন ঘন শব্দে। ফোনটা তুলল রতন।

—হ্যালো!

—কে দীপকবাবু?

—না, সে ফেরেনি। আপনি কে?

—মিঃ গুপ্ত।

—কি খবর?

—খবর খারাপ। দস্যু-বাজপাখি ভয় দেখিয়ে চিঠি দিয়েছিল একজন লোককে—মিঃ মিত্র কাল শেষ রাতে তাকে হত্যা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে চলে গেছে তাদের দল।

—বলেন কি?

—ঠিকই বলছি? অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে ব্যাপার গুরুতর হবে।

—তাহলে উপায়?

—তাইত ভাবছি। দীপকবাবুও ওদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন না ত?

—সত্যিই চিন্তার কথা।

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল দীপক। বলল—কি চিন্তা করছিস রে?

রতন দীপককে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আয়-আয়, ভেতরে আয়।

—তারপর খবর কি ?

—সব অঘটন ঘটছে।

—জানি। এই দেখ খবরের কাগজ।

খবরের কাগজ খুলল দীপক ! তাতে ছাপা হয়েছে :

বার বার পুলিশের ব্যর্থতা।
দস্যু বাজপাখির জয়াবহ কীর্তি।

তার নিচে বিস্তৃতভাবে ব্যর্থতার কাহিনী ছাপা হয়েছে।

রতন বললে—এখন উপায় ?

—উপায়ের জন্যেই ত চেষ্টা করছি। এদের হাতে ধরা পড়েও পালিয়েছি ! একটা আড্ডার সন্ধান পেয়েছি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, আজই রাতে হানা দেব।

—ক'টায় ?

—ঠিক সাতটায়। বী রেডি !

অলরাইট !

রতন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা।

॥ দুই ॥

ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় দীপক আর রতন মধ্য কোলকাতায় একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল।

নোংরা হোটেল।

সামনে সাইন্‌বোর্ড চাইনিজ কাফে।

রতন বললে—এখানে?

—হ্যাঁ।

এদের দুজনের পোষাক ঠিক যেন চীনেম্যানের মত। দুজনে ভেতরে ঢুকল।

একটা টেবিলে বসল দুজনে। খাবার অর্ডার দিল।

একটু পরে পাশের টেবিলে এসে বসল তিনজন। তাদের পোষাক নোংরা। তারা অবাঙ্গালী।

একজন বললে—আজই আসবেন কর্তা?

—হ্যাঁ।

—কটায়?

—আটটায়।

—ভেতরে?

—হ্যাঁ

—টাকা পাব ত?

—নিশ্চয়।

—যদি না আসেন?

—কর্তার কথার খেলাপ হয় না।

তারপর তারা খাদ্য ও পানীয়ে মন দিল।

দীপক রতনকে কি যেন ইশারা করল। রতন চলে গেল সোজা বাইরে।

কিছুদূরে গিয়ে একটা পাবলিক ফোন থেকে ফোন করল লালবাজারে।

মিঃ গুপ্তকে নির্দেশ দিল অবিলম্বে দু' লরী পুলিশ নিয়ে ওখানে হানা দিতে।

তারপর সে আবার ভেতরে চলে গেল।

দুজনে বসে চা খেতে লাগল।

পৌনে আটটায় লোকগুলি উঠে ভেতরে গেল। আর সব টেবিল থেকেও লোকজন উঠে ভেতরে গেল। হলঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

দীপক ফিস্‌ফিস্ করে বললে—ভেতরে গুপ্ত আড্ডা।

—তাই নাকি? তবে ভেতরে চল্।

—না।

—কেন?

—ওরা সাবধান হবে।

—তা ঠিক।

একটু পরে দু লরী পুলিশ এসে দাঁড়াল।

দীপক বাইরে বেরিয়ে এসেই ইশারা করল। মিঃ গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে হোটেল বাড়িটা ঘিরে ফেললেন।

দীপক দেখল সাড়ে আটটা বাজে। সে বললে—সবাই ভিতরে আছে।

—চলুন।

এরা সদলবলে ভেতরে ঢুকল।

* * * *

কিন্তু ভেতরে ঢুকে এদের হতাশ হতে হ'লো।

বিরাট একটা গ‍ুপ্ত ঘর দেখতে পেল এরা। কিন্তু কেউ সেখানে নেই।

মিঃ গ‍ুপ্ত বললেন—কোথায় গেল সব?

—নিশ্চয় কোন গ‍ুপ্ত দ্বার দিয়ে পালিয়ে গেছে।

তন্ন তন্ন করে খ‍ুঁজতে লাগল ওরা। অবশেষে গ‍ুপ্ত স‍ুড়ঙ্গ দেখতে পেল।

স‍ুড়ঙ্গের পথ গিয়ে শেষ হয়েছে বউবাজার স্ট্রীটের একটা ঘড়ির দোকানে।

দোকানের লোকটিকে বন্দী করে এরা জানতে পারল যে বাজপাখি সদলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

প‍ুলিশ ভ্যান নিয়ে দীপক, রতন ও মিঃ গ‍ুপ্ত সকলে চলল অন‍ুসরণ করে।

প্রচণ্ড বেগে চলল গাড়ি।

এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে দেখা গেল ওদের গাড়ি ছ‍ুটে চলেছে দক্ষিণের পথে।

দীপক বলল—ফলো অন্‌।

প‍ুলিশ ভ্যান নিরাপদ দ‍ূরত্ব বজায় রেখে অন‍ুসরণ করে চলল।

॥ এগারো ॥

ডায়মণ্ড হারবার।

দস্যু বাজপাখি সদলে উঠে পড়ল একটি ছোটখাত জাহাজে।

পুলিশ বাহিনী ও দুটি মোটর লঞ্চ ব্যবস্থা করে তাতে উঠে বসল।

দস্যুদের জাহাজটি ততক্ষণে অনেকদূরে চলে গেছে।

পুলিশ লঞ্চ দুটি প্রচণ্ড বেগে চলল ওদের পেছনে অনুসরণ করে।

কিন্তু তবু পাল্লা দিয়ে পারছিল না ওরা। শত্রুর জাহাজ খুব দ্রুত ছুটছিল।

তখন বাধ্য হয়ে পুলিশপক্ষ গুলি চালাতে শুরু করে দিল প্রবলবেগে।

অবিরাম গুলিবর্ষণ চলতে লাগল।

তখন শত্রু জাহাজটি ডুব দিল জলের তলে।

দীপক বললে—ওদের ওটা ডুবোজাহাজ, মানে—সাবমেরিন্ কি গুপ্ত।

—তাই ত দেখছি।

—এখন উপায়?

—অনুসরণ করতেই হবে।

পুলিশ লঞ্চ দুটি সাবমেরিনের কাছে গেলে তারা জলের তলা থেকে টর্পেডো ছুঁড়তে লাগল।

অনেক কষ্টে জলপুলিশের লঞ্চ রক্ষা পেল।

দীপক বললে—ডেপ্থ্‌চার্জ আছে?

—না।

—তাহলে ?

—তাইত ভাবছি।

—ওয়্যারলেসে খবর দিন।

—ঠিক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে চারদিকে খবর ছুটে গেল। একটু পরেই জবাব এলো!

একটা বিদেশী জাহাজ এদিকে আসছিল। তারা বেতারে খবর পেয়ে ছুটে এল।

সঙ্গে সঙ্গে ডেপ্‌থচার্জ শুরু হলো।

বাজপাখির দলের অনেকে বন্দী হলো।

* * *

কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

দলের ভেতরে বাজপাখিকে কোথাও পাওয়া গেল না।

একজন বললে—সাবমেরিন থেকে সে পালিয়ে গেছে স্যার।

—পালিয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কি করে ?

—ডুবুরীর পোষাক পরে জলে ঝাঁপ দিয়ে, ডুবে ডুবে চলে গেছে।

—কতক্ষণ আগে ?

—আধঘন্টা আগে।

—আচ্ছা আমরা খুঁজে বের করছি।

পুলিশ বাহিনী সাবমেরিনটা দখল করে জলের তলে ডুব দিল।

তন্ন তন্ন করে সারা সাগরতলে খোঁজ করা হলো বাজপাখির জন্যে।

কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

মিঃ গুপ্ত বললেন—সত্যি বাজপাখির আশ্চর্য ক্ষমতা বটে। অভাবনীয়।

—কেন?

—তা না হলে কিভাবে সে অদৃশ্য হতে সক্ষম হলো?

— বাজপাখি অতীতে যে সব কাজ করেছে, তাতে সে এ কাজ না করতে পারলেই আমি বিস্মিত হতাম।

—তা ঠিক।

মিঃ গুপ্ত একটু হাসলেন।

দীপক বললে—ভবিষ্যতে আবার নবরূপে সে আসবে কিনা কে জানে।

শিকার

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করতে করতে ভাবছিল সুরূপা সেন।

তার রূপ-যৌবনে ঘায়েল হয়েছে অনেকে। প্রতারিত হয়েছে অনেকে, তবু জালে শিকার পড়ার ঘাটতি নেই। এবারের শিকার —বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী, সুবিমল মল্লিক।

এর জন্যে দলের সর্দারের তারিফ করতেই হবে। বেছে বেছে শাঁসালো শিকারই জোটায় সে।

সর্দারের কথা মনে হতেই অনেক কিছু মনে পড়ে গেল সুরূপার। সে আনমনা হয়ে পড়ল।

আবছা আবছা মনে পড়ে। খুব ভীড়। কোথায় যেন সে গেছিল—সঙ্গে ছিল বাবা আর মা। ভীড়ের মধ্যে তারা হারিয়ে গেছিল। তারপর সর্দারের হাতে পড়ে সে। বয়স তখন মাত্র পাঁচ-কি-ছয়।

সর্দারই তাকে মানুষ করে তুলেছিল। লেখাপড়া—নাচ-গান শিখিয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলেছিল। দলের লোকেরা গোড়ায় গোড়ায় বিরক্ত বোধ করলেও পরে সর্দারের প্ল্যান বুঝে বাহবাই দিয়েছিল। বয়ঃসন্ধি থেকে সেই কাজ করে চলেছে সুরূপা। তার সর্দারের হাতে এনে দিয়েছে রাশি রাশি টাকা।

আজ থেকে প্রায় মাস তিনেক আগে—

মল্লিক এণ্টারপ্রাইজে একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিয়েছিল সুরূপা আরও অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে। বলাই বাহুল্য এটাও তার নানান ছলনার মধ্যে একটা। সুরূপা ভালই জানত—চাকরি তার হবেই। হলোও। সুরূপার ইচ্ছে ছিল মালিক সুবিমল মল্লিককে আরো কয়েক মাস নাচিয়ে তারপর কাজ হাসিল করবে। কিন্তু সর্দার নারাজ। আরো শিকার আছে। সুতরাং সুবিমলকে এরই মধ্যে ঘায়েল করতে হবে।

অগত্যা সুরূপা সুযোগের আশায় রইল। সৌভাগ্যক্রমে এসেও গেল সেই সুযোগ। মিঃ মল্লিক এই রবিবারেই তাঁকে বিশেষ কাজে ডেকেছেন অফিসে। সেখানে সে, মিঃ মল্লিক আর তার দারোয়ান ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কাজ ভালভাবে হয়ে যায় তো উত্তম নাহলে—ভ্যানেটি ব্যাগটার ভেতর ছোট্ট রিভলভারটার শীতল স্পর্শ অনুভব করল সুরূপা।

মাথা নীচু করে কাজ করছিলেন সুবিমল মল্লিক। হঠাৎ কাছেই সুরূপার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই তিনি যেন

সম্বিত হারিয়ে বসলেন। ভুবনমোহিনী অপরূপা এই মেয়েটি কে? তাঁরই—পি-এ সুরূপা সেন তো!

সুরূপা মন উচাটন করা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল মধুর কণ্ঠে—"কি দেখছেন? আমাকে? আমি খুব সুন্দরী, তাই না?"

অবাক হলেন সুবিমল। লজ্জাও পেলেন সেই সঙ্গে।

সুরূপা তার অস্ত্র ছাড়ল—'আমাকে পাবার আশা করছেন বোধহয়? আশ্চর্যের নয়, অনেকেই করে!'

রাগে লাল হয়ে উঠল মিঃ মল্লিকের মুখ। তিনি যে কেমন মানুষ তা এই প্রগলভা মেয়েটি জানে না। তাকে আজ এখুনি সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। সুবিমল ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আর ইউ অলরাইট, মিস সেন?'

—নিশ্চয়ই—সুবিমলবাবু একদম সুস্থ। কলকলিয়ে হেসে উঠল সুরূপা। নাম ধরে ডাকলুম বলে রাগ করলেন না তো?

এবার প্রায় ক্ষেপে গেলেন মিঃ মল্লিক। তিনি দৌপদ দাপটে চেঁচিয়ে উঠলেন: আই সে গেট আউট—বেরিয়ে যান এখান থেকে।

থতমত খেল সুরূপা। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—নতুন পরিস্থিতি। এর স্বাদ আগে পায়নি সে। তবু সে পিছলো না। গলা কড়া করে সেও বললে—নিশ্চয়ই যাব, তবে আমার ইজ্জতের দামটা না নিয়ে নয়।

—'হোয়াট ডু ইউ মীন!'

—'আই মীন জাস্ট হোয়াট আই সে। আপনি আমার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করেছেন। তার দাম চাই। দশ হাজার টাকা। ক্যাশ রাইট নাউ।'

সুবিমল মল্লিক হতবাক ও হতভম্ব।

সুরূপা চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল: নইলে কালকের

পেপারেই ছাপা হবে আপনার কুকীর্তি। আমি আদালতে গিয়ে হলফ করে বলব, আপনি কাজের অছিলায় আমাকে ছুটির দিনে ফাঁকা অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে, সুযোগ বুঝে জবরদস্তি করেছিলেন। তা করলে নিশ্চয় আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়বে না স্যার?

মিঃ মল্লিক ততক্ষণে রেডি করে ফেলেছেন নিজেকে। তিনিও সমান তেজে জবাব দিলেন: যা পারেন করুনগে যান। ভয় দেখিয়ে এক কপর্দকও আদায় করতে পারবেন না আমার কাছে।

—'বেশ। তবে মরুন।' ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে ফেলল সুরূপা।

মিঃ মল্লিকের সেফের কম্বিনেশন জানত সুরূপা। তাঁরই কাছে গিয়ে মৃতদেহটাকে ডিঙিয়ে সেফের ডালা খুলে ফেলল সে। তারপর নোটের বান্ডিলের দিকে হাত বাড়াতেই একটা ফটোগ্রাফ নজরে পড়ল তার। একি! এ কার ফটো? স্বামী-স্ত্রী তারা, তাদের মাঝে এই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি। তার হীরার লকেটেও রয়েছে ঠিক এমনি একটি মেয়ের মুখ। এ যে—এ যে তারই ছেলেবেলার ছবি। তবে কি···তবে কি···পাগলের মত হয়ে পড়ল সুরূপা। মিঃ মল্লিক তার বাবা! এ কি করল সে না জেনে। দু'চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সুরূপার। সে চীৎকার করে উঠল—বাবা!!

তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সুবিমল মল্লিকের মৃতদেহটার উপর।

সমাপ্ত

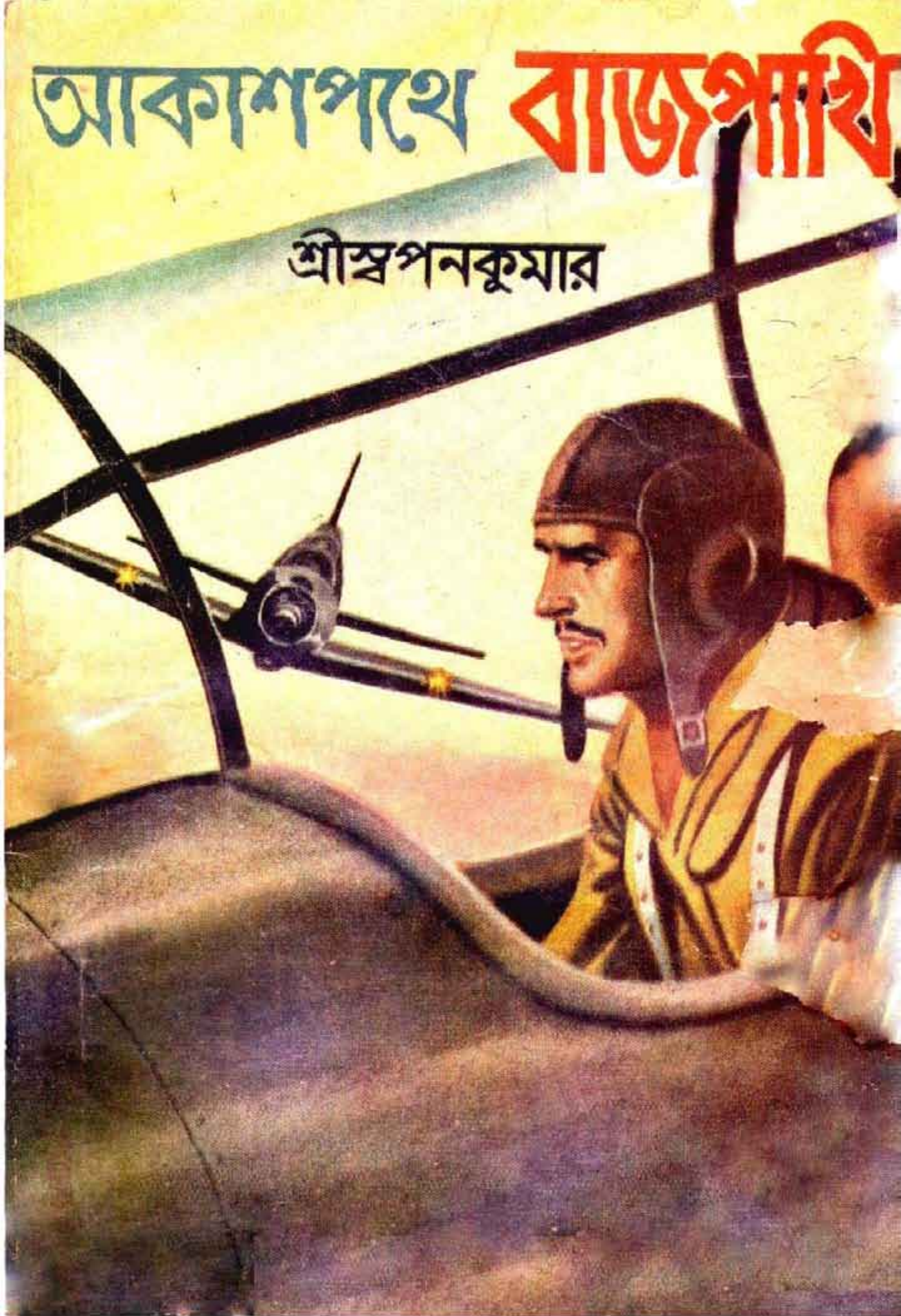
আকাশপথে বাজপাখি
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—১২ নং

আকাশপথে বাজপাখি

শ্রীস্বপন কুমার

প্রকাশক :
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ২.৫০ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীমতী শক্তি রায়
নিউ শক্তি প্রেস
১/এ, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

আকাশপথে বাজপাখি

—এক—

সকাল আটটা।

বিখ্যাত রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী ও তার সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল সকালের খবরের কাগজ পড়ছিল চা ও খাবার খেতে খেতে।

হঠাৎ দীপক ডাক দিল—রতন—

—কি রে ?

—এই দেখ, আবার একটা খবর বের হয়েছে কাগজে।

—কই দেখি !

দীপক কাগজটা এগিয়ে দেয় রতনের দিকে। রতন তা মন দিয়ে দেখে।

তাতে ছাপা হয়েছিল :

দণ্ডকারণ্যের বুকে আবার রূপার তৈরী মানুষ। বিশালদেহী মানুষের ওড়ার ক্ষমতা বিদ্যমান। ভিন্নগ্রহের কোনও প্রাণী বলে সন্দেহ।

তার নিচে ছোট ছোট হরফে ছাপা হয়েছিল :

আজ থেকে প্রায় দু-তিন মাস আগে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে একবার একজন পর্যটক দুটি রূপার মত ঝকঝকে সাদা ধাতুর দেহযুক্ত প্রায় বারো ফুট উঁচু দুটি মনুষ্য মূর্তি দেখেছেন।

অভিযাত্রীটি তাদের কাছে গেলে মানুষ দুটি দ্রুতবেগে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমরা এ খবরটা কাগজে তখন প্রকাশ করেছিলাম। তা পড়ে অন্য পত্রিকাগুলি আমাদের ঠাট্টা ও সমালোচনা করেছিল।

এমন কি দুটি পত্রিকা ত অভিযাত্রীটি গঞ্জিকা সেবন করেন বলে মন্তব্য করেছিলেন।

কিন্তু তাদের সব জল্পনা কল্পনার অবসান করে দিয়ে আজ আবার সব সংবাদ পত্রে যে সংবাদটি ছাপা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই আমাদের পুরোনো খবরটিকে সত্যি প্রমাণিত করবে।

এবারে ঘটনা ঘটেছে দণ্ডকারণ্যে।

সেখানে বন-জঙ্গল কেটে সরকার থেকে কলোনী তৈরীর চেষ্টা চলছে অনেকদিন।

সেদিন এখানেই একটি পাহাড়ের নিচে সরকারী কর্মচারীরা দুপুরবেলা কাজ করতে করতে দুটি উড়ন্ত মানুষকে নামতে দেখে। তাদের দেহ আগের দেখা সেই মূর্তিটির মতই। তাদের দেহের অঙ্গে কোনও পাখা লাগান নেই—অথচ তারা উড়তে পারে।

সরকারী কর্মচারীরা বন্দুক হাতে তাদের ধরতে গেলে তারা উড়ে পালায়।

সরকারী কর্মচারীরা গুলি চালায়, কিন্তু কোনও গুলিই তাদের দেহে লাগে না—কিংবা তাদের দেহের কোনও ক্ষতি হয় না গুলিতে।

তাই সরকারী কর্মচারীদের চোখের সামনে দিয়েই মূর্তি দুটি উড়ে চলে যায়।

মূর্তি দুটির একটি ফটোও তারা তুলতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা ফটো দুটি প্রকাশ করার চেষ্টা অবশ্যই করব।

* * *

খবরটা পড়ে মুখ তুলল রতন।

দীপক বললে—কি বুঝলি?

—ভাবছি।

—এটা যে গাঁজা নয়, তা আমি আগেই জানতাম—প্রথম খবরটা পড়েই।

—ঠিক নাকি?

—হাঁ, কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কি ?

—ঐ রূপালী রঙের উড়ন্ত মানুষ দুটি অন্য গ্রহের জীব ত না হতেও পারে।

—তা পারে।

—তাহলে তারা কি বল ত ?

—আমি ত কিছুই বুঝছি না।

দীপক একটু হেসে বললে—ওরা হয়ত এই পৃথিবীরই কোনও বৈজ্ঞানিকের সৃষ্ট অদ্ভুত জীব।

—তা হওয়া বিচিত্র নয় বটে।

—এখন এই খবরটা প্রকাশিত হওয়াতে বৈজ্ঞানিকটির গোপন তথ্য ফাঁস হলো। তাই তাঁর বিপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নয়।

—কেন ?

—যে বৈজ্ঞানিকের এত বড় মাথা আছে, তাঁকে দলে টানতে অনেকেই প্রলুব্ধ হবে।

—তা বটে। তা তুই এখন কি করতে চাস ?

—কিছু না।

—কেন ?

—আমি এখন পরবর্তী ঘটনার জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকব।

—কি ঘটনা ঘটবে আবার ?

—হয়ত ঐ বৈজ্ঞানিক কোনও ভয়াবহ কাজ করে বসতে পারেন কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে। যাক গে সে কথা—আমি এখন চিন্তা করছি বাজপাখির কথা। এতদিন পরে যে সে ভারতে ফিরে এলো, তারপর হঠাৎ কোথায় গেল ?

—গতবার যা শিক্ষা সে পেয়েছে, তাতে কোথায় হয়ত পালিয়ে যেতেও পারে।

—কে বললে সে কথা ?

—আমি তাই ভাবছি।

—আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কি রকম ?

—সেই এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে নেই ত ?

—তা কি করে হবে ?

দীপক হেসে বললে—পৃথিবীতে অনেক কিছুই হতে পারে ভাই। কি হবে আর কি হবে না, তা জানেন ভগবান।

রতন কোনও উত্তর দিল না।

—দুই—

কয়েকদিন পর।

এমন একটা খবর আবার সংবাদপত্রের বুকে প্রকাশিত হলো যে সারা ভারতে যেন তোলপাড় সুরু হলো।

বিখ্যাত মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক ভেংকট রমণ নিখোঁজ। বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী শীলা রমণ কর্তৃক পুলিশের সাহায্য গ্রহণ! বহু গুপ্ত সরকারী রিসার্চের কাগজ পত্র উধাও!

তার নিচে লেখা ছিল—দীর্ঘদিন ধরে ভারতের জনসাধারণ মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক ভেংকট রমণের নাম শুনে আসছেন। তিনি তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার জন্যে সারা ভারতে বিখ্যাত।

কয়েকদিন আগে তিনি নতুন কতকগুলি রিসার্চের কাগজপত্র তৈরী করেছিলেন।

গত বুধবার বিকেলে তিনি তাঁর শহরতলীর ল্যাবরেটরী থেকে কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে মূল্যবান কাগজপত্র সব ছিল।

কিন্তু পথের মধ্যেই কে বা কারা তাঁকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তিনি আর গৃহে ফেরেননি।

তাঁর স্ত্রী শীলা রমণও একজন বৈজ্ঞানিক। তিনিও বিজ্ঞানের ডক্টরেট।

তিনি স্বামীর বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ বিভাগকে স জানিয়েছেন।

তাঁকে খুঁজে বের করার জন্যে পুলিশ বিভাগ আপ্রাণ চেষ্টা করছে বটে, তবে এখনো পর্যন্ত তারা সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

আশা করা যায়, তারা সফল হবে—তা না হলে ভারত সরকারের বিরাট ক্ষতি হবে।

কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রও এই ব্যাপারে জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

আমরা পুলিশ বিভাগের সাফল্য কামনা করি।

*   *   *

খবরটা পড়ে দীপক রতনের দিকে চেয়ে বললে—কিরে এটা পড়েছিস নাকি?

—হুঁ।

—আমি তোকে সেদিন বললাম না—এই রকমই একটা কিছু আশংকা করছিলাম।

—কিন্তু তাঁকে অপহরণ করেছে কারা?

—তা ত জানি না—তবে নিশ্চয় বিরাট একটা চক্রান্ত এর মধ্যে আছে।

রতন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাতে বাধা পড়ে ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে রতন বলল—হ্যালো—কে?

—আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি।

—লালবাজার থেকে ?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার ?

—আপনাকে মাদ্রাজ সরকার বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, একটা কাজ হাতে নিতে···

—মিঃ ভেংকট রমণ অদৃশ্য হবার কেসটা ত ?

—হ্যাঁ।

—আমি কি একা ইনভাইটেড্ ?

—হ্যাঁ, তাছাড়া রতনবাবুও আছেন, এই ভেংকট রমণকে অবিলম্বে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে। তা না হলে সরকারের বিরাট ক্ষতি।

—জানি। কিন্তু সব জানি না।

—আমাদের ধারণা কোনও বড় ক্রিমিন্যাল বোধহয় এর সঙ্গে জড়িত।

—তা হতে পারে।

—তাহলে আপনি এ কেসটার ভার নিচ্ছেন ত ?

—কিন্তু দস্যু বাজপাখির ব্যাপারটা···

—সে ফিরে এসে করবেন। কেমন ?

—আচ্ছা !

—কাগজপত্র সব বুঝিয়ে—আপনি আজই প্লেনে মাদ্রাজ যাবেন।

—আজই ?

—হ্যাঁ, দেরী করলে অসুবিধা—কারণ ভারত ছেড়েও ত পালাতে পারে।

—তা বটে।

—তাহলে আপনি আসছেন ত ?

—ও. কে.।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখে।

* * *

দীপক কাগজ পড়ে বুঝতে পারল যে, এ কেসে তা থেকে কোনও সুবিধে হবে না।

সব কিছুই যেন কেমন ধোঁয়াটে, কোনও কাগজেই কোনও পরিষ্কার ইংগিত নেই।

দীপক বিস্মিত হলো।

এক্ষেত্রে তার সবার আগে কি করা কর্তব্য?

অনেক চিন্তা করে দীপক রতনকে সঙ্গে নিয়ে গেল প্রথমে শীলা রমণের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মাদ্রাজে।

মাদ্রাজ সহর থেকে কিছু দূরে সহরতলী অঞ্চলে একটা বিরাট বাগানবাড়িতে শীলা রমণ বাস করেন।

তিনি নারী হলেও বৈজ্ঞানিক।

স্বামীর প্রতিটি কাজে তিনি পতিপ্রাণা সতীর মত তাঁকে সাহায্য করেন।

কিন্তু তিনি খ্যাতি চান না—চান তাঁর স্বামীর নাম যাতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মিসেস রমণ খুশী হলেন দীপককে দেখে—সে এ কেসে অংশ নিয়েছে জেনে।

দীপক মিসেস শীলা রমণকে বললে—আমি কিছু গুপ্ত বিষয় জানতে সবার আগে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি মিসেস রমণ।

—বলুন?

—আচ্ছা মিঃ রমণ দীর্ঘদিন ভারত সরকারের কাজ ছাড়াও নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তিনি অদ্ভুত আবিষ্কার কিছু করেন কি?

—আপনার কাছে স্বীকার করছি—করেন।

—কি আবিষ্কার ?

—তিনি নতুন ধরনের এক যন্ত্রমানব তৈরী করেন —তা উড়তে পারে। ওই যন্ত্রমানব অসাধ্য সাধন করতেও সক্ষম বলে জানি।

—যেমন ?

—এই যন্ত্রমানব কোনও বন্দুক বা কামানে আহত হয় না—এত শক্ত ধাতু দিয়ে ওদের শরীর তৈরী। অথচ ওরা উপযুক্তভাবে চালিত হলে যে কোনও অসাধ্য কাজ পর্যন্ত করতে পারে।

—বুঝেছি। তাহলে এই রূপালী মানব ত যথার্থ কাগজে ছাপা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তিনি নিজে এত বড় বিরাট গবেষণার ঝুঁকি নিজের কাঁধে নিয়ে ভুল করেছিলেন।

—কেন ?

—তাই তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে।

—এখন তাহলে কি করা উচিত বলুন ?

—সে যন্ত্র কটি তৈরী হয়েছে ?

—হুঙকারানো ওঁর গবেষণাগারে পাঁচটি তৈরী হয়।

—তারপর ?

—তারপর উনি নিখোঁজ হলে সেই সঙ্গে সব কটি যন্ত্রও অদৃশ্য হয়।

দীপক কোনও কথা না বলে চিন্তা করতে থাকে।

—তিন—

কিছুক্ষণ কেটে যায়।

দীপক তারপর বলে—এ ব্যাপারে কি কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?

—হাঁ।

—কাকে?

—দিন পনের আগে একজন লোক এসে বহু টাকার বিনিময়ে সব কাগজ ও যন্ত্রাদি কিনতে চায়।

—কত টাকা?

—দশ লাখ।

—উনি রাজি হননি?

—না।

—কেন?

—কারণ উনি বলেন যে, এই যন্ত্রাদি বিক্রি করতে হলে তা ভারত সরকারকেই করবেন।

—বেশ। তারপর?

—তারপর সেই লোকটি রেগে ওঠে।

—কেন?

—সে বলে সে একজন পৃথিবীখ্যাত দস্যু দলের লোক। সেই দস্যু ও তার মাধ্যমে কোনও বিদেশী কোম্পানী এসব কিনতে চায় প্রচুর টাকা দিয়ে। তিনি রাজী না হলে তাঁকে এর জন্যে খেসারত দিতে হবে বলে ভয় দেখায়। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজী হননি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু এসব কথা কাউকে বলিনি আমি।

—তারপর ?

—তারপরই ত এইসব ঘটনা ঘটতে শুরু হলো। একই দিনে তিনি অদৃশ্য হন—ঐ একই দিনে তাঁর কারখানা ও ল্যাবরেটরীতে পুলিশ হানা দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেই সব যন্ত্র অদৃশ্য হয়।

দীপক একটু চিন্তা করে।

তারপর বলে কেসটা তাহলে জটিল। কিন্তু লোকগুলি কোথায় থাকে এ বিষয়ে কি আপনি কিছু অনুমান করতে পেরেছেন ?

—হাঁ।

—কি রকম ?

—তারা বলেছিল যে তাদের দলপতি হলো বিখ্যাত দস্যু। মাদ্রাজ সহরের স্যাভয় হোটেলে' থাকে।

—ভাল কথা। স্যাভয় হোটেল আমি চিনি।

—হাঁ—তাই আমি পুলিশকে সব কথা বলিনি। আপনি যখন এ কাজের ভার নিয়েছেন আপনি সব খুঁজে বের করুন।

—ঠিক আছে—আমি চেষ্টা করব।

—আর একটা কথা—

—বলুন ?

—আমার ধারণা যন্ত্রগুলিকে তারা কর্মক্ষম করতে পারেনি।

—কেন ?

—কারণ তা হলে তারা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারত, কিন্তু তা পারেনি।

—তা ঠিক।

—আমার ধারণা মাদ্রাজ সহরে তাদের হয়ত পাওয়া যাবে।

—বেশ, আমি চেষ্টা করব।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

দীপক চিন্তিতমনে শীলা রমণের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

* * *

দীপক তারপর সোজা রতনকে নিয়ে রওনা হলো মাদ্রাজ সহরে।

রতন বললে—অনেক তথ্য জানা হলো—এখন কি করা যায়?

—তাই ত ভাবছি।

—ওখানেই ত ওদের প্রধান কর্মক্ষেত্র মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এরা কারা?

—মনে হয় কোন ভারতীয় দস্যু, বিদেশী কোন দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একাজে নেমেছে।

—তা ঠিক।

—তাদের সন্ধান আমার চাই।

—কিন্তু তার আগে জানতে হবে তারা কারা?

দীপক হাসল।

রতন বললে—হাসলি যে?

—কারণ আমি জানি তারা কারা?

—তার মানে?

—মানে দস্যু বাজপাখি নিশ্চয় এই কাজে হাত দিয়েছে মোটা টাকার লোভে।

—তা হতে পারে!

—তাহলে কি করব বল্ ত?

—বাজপাখির দল হোক বা যে দলই হোক, পুলিশ সাহায্য ছাড়া তাদের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব।

—ঠিক।

বলে দীপক একটু হাসল। তারপর বললে—সেই কারণেই ত মাদ্রাজে এলাম।

রতন কোন কথা বললে না তাকে।

*　　　*　　　*

মাদ্রাজে এসে দীপক প্রথমে দেখা করল পুলিশ সুপার মিষ্টার এ. আয়েঙ্গারের সঙ্গে।

দীপক সবার আগে মিঃ আয়েঙ্গারের কাছে নিজের পরিচয় দিল।

মিঃ আয়েঙ্গার সব শুনে বললেন—আপনি কি চান তাই বলুন স্যার। আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে আমি রাজী।

—বেশি কিছু নয়—আমি চাই পুলিশ স্পাই প্লেন ড্রেসে আমার উপরে নজর রাখবে। আমি বিপদে পড়লে তারা সাহায্য করবে—কিংবা আমি যদি চাই, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হেল্প পাব।

—তা ত পাবেনই। কিন্তু…

—কিন্তু কি?

—পুলিশ স্পাই ত এপয়েন্ট করা যায় না।

—তা ঠিক। তা আমিও ভেবেছি।

—তবে?

—তাহলে আমি ইনফর্মার এপয়েন্ট করছি। দয়া করে আমার নাম শুনলেই যেন পুলিশ যায়।

—আচ্ছা। কিন্তু একটা সংকেত কিছু থাকা উচিত।

—বেশ। বলুন আপনি?

—আপনি বা আপনার অনুচর ফোন করার সময়ে রক্ত গোলাপ কথাটা ব্যবহার করবেন। এখানে আমরা মাত্র দুজন। অন্য কেউ একথা জানে না।

—ঠিক আছে। ঐ কথাই থাকল।

—ভেরী গুড্!

—তাহলে আমি আজকেই সবার আগে হোটেল স্যাভয়তে হানা দিচ্ছি,

—অলরাইট স্যার !

দীপক উঠে দাঁড়ায়। তারপর মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড করে পথে বেরিয়ে পড়ে।

—চার—

মাদ্রাজ সহরের সমুদ্র তীরে হোটেল স্যাভয়।

সুন্দর ছোট্ট হোটেল। থাকা খাওয়ার বেশ সুবিধা এখানে।

দীপক আর রতন মালপত্র নিয়ে উঠল এই স্যাভয় হোটেলেই।

একটি ঘর তাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হলো।

দীপক নিজের পরিচয় দিল একজন টুরিষ্ট বলে—রতন তার বন্ধু।

হোটেলের মালিক, ম্যানেজার, সকলে তাকে খুব খাতির করতে লাগল।

দীপক থেকে থেকে তিন নম্বর ঘরে আশ্রয় নিল। কারণ সে দেখল চার নম্বর ঘরে একজন বিদেশী লোক থাকে।

এ হোটেলে কোনও ভারতীয় থাকে না—যেমন ঐ লোকটি ছাড়া।

লোকটি বার্মিজ—তার নাম থানকুমি।

দীপক মিঃ থানকুমির ঠিক পাশের ঘরে নিজে থাকতে লাগল।

রতনকে সে বললে—একটা কথা কিন্তু সব সময় মনে রাখবি রতন।

—কি ?

—আমাদের অল্‌ওয়েজ বেশ এ্যালার্ট থাকতে হবে তা না হলেই মৃত্যু !

—তা জানি।

রতন দীপককে আশ্বাস দিল।

*　　　*　　　*

সেই দিনই রাতে।

দীপকের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ

খস খস···

অস্পষ্ট শব্দ বারান্দায়।

দীপক উঠে বসল বিছানায়।

রতনকেও ঠেলে তুলে দিল সে। দুজনে নাইট ড্রেস পরে অন্ধকারে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

আবার শব্দ।

দীপক কান পাতল।

হ্যাঁ, বারান্দায় কারা যেন ঘুরছে। ভাল করে তাকাল দীপক ও রতন।

দেখল দুটি কালো মূর্তি—আপাদমস্তক কালো পোষাকে ঢাকা।

দুজনে এসে বামিজ্ঞ খানকুমির ঘরের সামনে দাঁড়াল।

খট্ খট্···

দুবার কড়া নড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। বামিজটি তাদের দুজনকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল।

দীপক এবার দরজায় কান পাতল। ভেতরের সব শব্দ সে শুনতে পেল।

একজন বলছে—বুঝেছেন স্যার ?

—কি ?

—আমাদের ধারণা বিপদ আসন্ন।

—বিপদ !

—হ্যাঁ স্যার।

—কেন ?

—আমাদের সর্দার বাজপাখি বলেছে—হোটেলের পাশে নাকি দু' একজন ছদ্মবেশী পুলিশ চরকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

—বলেন কি ?

—ঠিকই বলছি।

—তবে উপায় ?

—কালই পালাতে হবে

—কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর তার ফর্মূলা এবং যন্ত্রমানব ছুটি পেলাম না আমরা।

—তা পাইনি।

—তবে সব টাকা সরকার দেবে না।

—সব ব্যবস্থা হবে।

—কি রকম ?

— কর্তা বলেছে, কাল মাদ্রাজ এরোড্রোমে বন্দী বৈজ্ঞানিককে বাক্সে পুরে আপনার কাছে হ্যাণ্ডওভার করে দেবে। তার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতিও সব পাবেন।

—তবে ত ভালই।

—হ্যাঁ। কাল ভোরেই পালাবেন। হোটেল থেকে বের হয়েই যাবেন এরোড্রোমে।

—বেশ ত।

—তাহলে আমরা চলি ?

—আচ্ছা।

দীপক ও রতন দরজা থেকে সরে গেল। একটু পরেই দেখা গেল দু'জন লোক আবার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

রতন বললে—এরা কারা ?

—বাজপাখির লোক নিশ্চয়।

—তা হবে।

ওরা আবার ঘরে ফিরে গেল।

—পাঁচ—

পরদিন সকাল আটটা।

মাদ্রাজ এরোড্রোম।

ডিটেকটিভ দীপক ও রতনকেও এই সময় দেখা গেল এরোড্রোমে।

তারা ফোন করল মিঃ আয়েঙ্গারকে।

আধ ঘণ্টা পর।

মিঃ আয়েঙ্গার একদল পুলিশ নিয়ে প্রবেশ করলেন এরোড্রোমে।

দলে দলে লোক জমা হলো এরোড্রোমে।

একটা প্লেন ছাড়ছিল।

প্লেনটি যাবার কথা সোজা মাদ্রাজ থেকে রেঙ্গুনের দিকে।

প্লেন ছাড়তে আধঘণ্টা বাকি।

এমন সময় পুলিশ এসে এ্যারেষ্ট করল সোজা মিঃ থানকুমিকে।

মিঃ থানকুমি বললেন—কি ব্যাপার?

—আপনি বার্মিজ?

—হ্যাঁ।

—কতদিন ভারতে এসেছেন?

—ছ' মাস।

—কেন এসেছেন আপনি এখানে?

—বেড়াতে।

—মিথ্যা কথা। আপনার ঐ দুটি বাক্সে কি আছে বলুন?

—জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাক্স দুটি খুলে ফেলল। একটি থেকে বের হলো বৈজ্ঞানিক মিঃ রমণ অজ্ঞান অবস্থায়, অন্যটিকে কতকগুলি যন্ত্র।

পুলিশ মিঃ থানকুমিকে গ্রেপ্তার করল।

এমন সময়···

একটি মোটরে উঠেছে বাজপাখি—অন্যদিকে তার দলবল।

পুলিশ এগিয়ে গেল তাদের ধরতে।

গুড়ুম্ গুড়ুম্···

ঘন ঘন পিস্তল গর্জে উঠল।

প্রচণ্ড সংঘর্ষ হতে লাগল।

বাজপাখি পিস্তলের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল।

সে ধরা পড়ল না!

তার সঙ্গীদের মোটরের টায়ার পুলিশের গুলিতে ফেটে গেল।

বাজপাখির অনুচররা ধরা পড়ল।

দীপক বললে—উঃ, এ যাত্রাও সে পালিয়ে গেল হাতের উপর দিয়ে।

—ছয়—

কোলকাতায় ফিরে এসে দীপক দেখল খবরের কাগজে সব খবর ছাপা হয়েছে।

মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক অপহরণ রহস্যভেদ!

বৈদেশিক চক্রান্তে বাজপাখির কীর্তি!

উড়ন্ত মানুষ-স্রষ্টা বৈজ্ঞানিকের মুক্তি!

বাজপাখির পলায়ন॥

তার নিচে বিগত সব ঘটনা ও বাজপাখির চক্রান্ত বিস্তৃত ছাপা হয়েছিল।

অবশেষে ছিল মন্তব্য :

এভাবে দিনের পর দিন যদি পুলিশবাহিনী নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকে এবং দস্যুদল ইচ্ছামত সর্বত্র ভ্রমণ করে যা ইচ্ছা তাই সাধন করে চলে, তবে ভারত শীগ্‌গিরই অরাজকতা লাভ করবে। আমরা চাই পুলিশ বিভাগ অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠুক। দস্যুদলকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় গ্রেপ্তার করে নাগরিকদের জীবন ও সম্মান নিরাপদ করা হোক।

* * *

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন রায়বাহাদুর চন্দ্রশেখর রায়চৌধুরী।

চায়ের পেয়ালা শেষ হলো। চাকরের হাতে এক চিঠির তোড়া। ছোট একটা চিঠির দিকে রায়বাহাদুরের নজর পড়ল। নিজের চোখকে যেন তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। নিঃশ্বাস হলো দ্রুত। কপালের শিরা ফুলে উঠল। দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল চোখ দুটো অব্যক্ত জ্বালায়—

চিঠিটা নীল একটা খাম—তার ওপরে রক্তাভ অক্ষরে আঁকা কুশ্রী একটা বাজপাখি যেন ঠিক শিকারের ওপরে ছোঁ মারছে। রায়বাহাদুরের মনে পড়ল মুহূর্ত পূর্বে খবরের কাগজের পৃষ্ঠার সঠিক ঘটনায় স্মৃতি। একি? তবে কি বাজপাখি—দ্বীপান্তরের আদেশ প্রাপ্ত পলায়িত দস্যু সর্দার বাজপাখি তাঁর ওপরেই প্রথম ছোবল মেরেছে? মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কি ফিরে এল মরণ সাগরের ওপার থেকে কোনও মৃত সৈনিক? না না, এ হতে পারে না কিছুতেই। এ অসম্ভব।

হাত দুটো তাঁর ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। আবার ছুটে গিয়ে তুলে এনে মেলে ধরলেন চোখের সামনে।

তারপর ছিঁড়ে ফেললেন খামের মুখটা। ভেতরে একটা পুরু নীলাভ কাগজের বুকে লেখা—ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আবির্ভাব হয়েছে তাদেরই একজনের। স্মরণ কর রায়বাহাদুর, বিশ বছর আগেকার কোনও একটি তমসাচ্ছন্ন সুপ্ত নিশিকে। তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও

চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিল একজন হতভাগা। তারই টাকায় তোমার এই বিপুল ঐশ্বর্য। এ সংবাদ পৃথিবীর আর কেউ জানে না এক আমি ছাড়া। কিন্তু একটি সর্তে এ কথাটা আমিও সম্পূর্ণ ভুলে যেতে রাজি আছি—বিশ হাজার টাকা। হ্যাঁ বিশ হাজারের এক পয়সাও কম নয়।

আর যদি আমার সর্ত মেনে না নাও, তবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক জানতে পারবে তোমার স্বরূপ। তোমার ঘৃণ্য বীভৎস রূপকে। আর আমার শাণিত তরবারি নিয়তির মত নেমে আসবে তোমার ওপরে। আগামী ৭ই জুন বুধবার, ধার্য হবে তোমায়'বিচারের দিন। সেজন্য ভেবে দেখ, এদিকে বিশ হাজার টাকা মাত্র। আর অপরদিকে তোমার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি এবং তোমার নিজের জীবন।

যদি আমার সর্তে প্রস্তুত থাক, তবে তিনবার চীৎকার করে বলবে—ও-কে! তাহলেই আমি বুঝতে পারব। তোমার প্রতিটি গতিবিধির ওপরে আমার দৃষ্টি আছে।—বাজপাখি।

রায়বাহাদুর ভাবতে লাগলেন—একি অবিশ্বাস্য ঘটনা-প্রবাহ! বিশ বছর আগে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে যে হতভাগা, তার সংবাদ কি করে পৌঁছাল বাজপাখির কানে। লোকটি কি মায়াবী, না যাদুকর? কোথায় কোন্ এক মুখোসের আড়ালে বসে সে পেতে চলেছে তার চক্রান্তের ফাঁদ?

রায়বাহাদুরের চোখ দুটি জ্বালা করে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল—কণ্ঠনালী উঠল শুকিয়ে। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেললেন তিনি মেঝের ওপরে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বার কয়েক অস্থির পায়চারি—আবার চেয়ারের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে হাঁক দিলেন—রামু ইধার আও—জলদি···

চাকর রামু ঘরের দিকে দ্রুত পায়ে ছুটে এল। হাতে তার এক টুকরো কাগজ।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কি?

—আপনার চিঠি, একটু আগে একটা লোক এটা দিয়ে গেল। রায়বাহাদুর রামুর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। তাতে লেখা :—

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পার রায়বাহাদুর। কিন্তু নিস্তার নেই জেনো। আমার চোখের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই তোমার এক মুহূর্তের জন্যও। আশাকরি কথাটা ভুলবে না।

বাজপাখি

রায়বাহাদুর ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা তুললেন—হ্যালো, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার লালবাজার ডি, ডি, নর্থ—

—সাত—

চা থেকে সুরু করে পানাহার অনেক কিছুই জোগান দিতে পারে সিঁথির মোড়ের ছোট্ট অখ্যাত কিংবা কুখ্যাত দোকান নিউ ইণ্ডিয়া।

দিনের বেলায় খদ্দেররা হাঁক দেয়—এই হাফ্ কাপ চা জল্‌দি—

রাতের আঁধারে আত্মগোপন করে যে নৈশ অভিযানকারীদের গুপ্ত চক্রান্তের ফেনিল ঢেউ বয়ে যায়, সে সব বৈঠকের উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের যোগান দিতে কসুর করে না, দোকানের প্রায় চলচ্ছক্তিহীন মালিক হরেকেষ্ট।

ভোরের আলো-আঁধারের খেলা চল্‌ছে পৃথিবীর বুকে…সম্পূর্ণ দূর হয়নি আঁধার তার কালো আবছায়ার রহস্যজাল নিয়ে।…

দোকানের ঝাঁপ তোলা হয়েছে। খদ্দের নেই।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন দোকানের চারদিকে দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে। তিনি দোকানের পরিচিত খদ্দের বোধহয়—কারণ, মালিক হরেকেষ্ট কোনও কথা না বললেও তার চোখের দৃষ্টির মাঝে যে মূক ভাষা ফুটে উঠল তা বুঝে নিতে লোকটির মোটেই কষ্ট হলো না।

চা এল, আর তার সাথে খাদ্যের প্রাচুর্য।

লোকটি গো-গ্রাসে গিলে চলল—হরেকেষ্ট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার পাশে এসে বসে পড়ল।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন শুধু।

হরেকেষ্ট ফিস্ ফিস্ করে কি যে কথা বলে চলল তার সাক্ষ্য রইল না কেউ। অনেকক্ষণ পরে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক তার হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি যেন বলল।

সামান্য খাবারের জন্য দশ টাকা হরেকেষ্টর প্রাপ্য নয় তবুও সে নির্বিবাদে টাকাটা নিজের পকেটে পুরে ফেলল।

মৃদু হেসে হরেকেষ্টর হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে লোকটি বেরিয়ে পড়ল দোকান ছেড়ে। তার এই নিভৃত চক্রান্তের সাক্ষী রইল না কেউ।

শুধু দোকানের কাপ, ডিস্ ধোয় যে বোবা আর কালা ছোকরা চাকরটি, তার মুখের ওপর দিয়ে যেন মৃদু হাসির ঢেউ বয়ে গেল— বোঝা গেল না তার মাঝে লুকিয়ে আছে কি দুর্বোধ্য অভিসন্ধি বা নির্বোধ অবাস্তবতা—

দোকানের সামনে যে ভিখারিটা সর্বাঙ্গে গলিত ঘা আর দাড়ি-গোঁফপূর্ণ নোংরা দেহ নিয়ে একঘেয়ে সুরে ভিক্ষা চেয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, সে কি কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল ওদের ফিস্‌ফিসানি ?

ঠিক তা বোঝা না গেলেও দেখা গেল একটু পরেই ও জীর্ণ পোষাকটা অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে দাঁড়াল। তারপরে ধীর পদে একটা বাঁকে ছোট গলির মধ্যে অদৃশ্য হলো।

একটু ভাল করে লক্ষ করলে বোধহয় চিনতে পারা যেত যে, এই ভিখারিটা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল ছাড়া অন্য কেউ নয়।

*   *   *

ঢং-ঢং-ঢং—রাত তিনটে।

জনবিরল পথের ওপর দিয়ে ধীর পদে এগিয়ে চলেছে যে সুদীর্ঘ বলিষ্ঠকায় ডকের খালাসী শ্রেণীর লোকটি, তার দিকে সামান্যতম নজর দেবার অবকাশও কারও নেই।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়াতেই উল্টো দিক থেকে আগত এক টি কালো বিরাট শেভ্রলে গাড়ি এসে হঠাৎ থেমে পড়ল তার ঠিক পাশে।

লোকটি মৃদু হেসে হাত দুটি মাথার ওপরে তুলল। গাড়ির ভেতরে উপবিষ্ট ড্রাইভার শ্রেণীর লোকটিও হাত দুটি মাথার ওপরে তুলে ধরল।

খালাসী শ্রেণীর লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির ভেতরে উঠে বসল।

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে গাড়িখানা ছুটে চলল।

ওপাশে সরু গলিটার বাঁকে একটা ছোট্ট অষ্টিন গাড়ি আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ঝিমুচ্ছিল। সেও যেন এবার হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল। পূর্বোক্ত শেভ্রলে গাড়িটাকে অনুসরণ করে এটিও ছুটে চলল তীব্রবেগে বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।—

গাড়ি দুটি ছুটে চলল গতির শেষ সীমায়—যেন বাঁধনহারা কল্পনার অগ্রদূত—

যশোর রোড ধরে এগিয়ে চলেছে দুটি গাড়িই তীব্রবেগে। একটি বাঁকের মোড়ে এসে সামনের গাড়িখানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে দ্রুত লক্ষ্যহীন ইতস্ততঃ গুলিবর্ষণ করে চলল—গুড়ুম্, গুড়ুম্ গুম্...

পেছনের অনুসরণকারী গাড়ির আরোহী যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষায় তৎপর হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ গুলি বর্ষণের পর সামনের গাড়িটা আবার যখন ছুটতে সুরু করল তখন পেছনের গাড়িখানির টায়ারটা ফেঁসে গিয়ে সমস্ত গাড়িখানাকে সম্পূর্ণ অচল করে তুলেছে।

সম্মুখের গাড়িটা চলে যাবার পর পেছনের গাড়ির আরোহী কিছুটা এগিয়ে চাকার দাগগুলোর দিকে মনঃসংযোগ করল। এভাবে সামনে থেকে শিকার ফস্কে যাওয়ায় সে যে যথেষ্ট মনঃক্ষুন্ন হয়েছে তা তার ভাবভঙ্গির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ নজরে পড়ল এক টুকরো কাগজ পড়ে রয়েছে। ওটা কি? হঠাৎ কোত্থেকে এল? এগিয়ে গিয়ে কুড়িয়ে নিল সে। তারপর পকেট থেকে টর্চটা বের করে দেখতে পেল একটা চিঠি:

বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চাটার্জী—

বহুদিন পরে তোমার সাথে মুখোমুখি দেখা হলো! কিন্তু ভাগ্য বিরূপ পাশার চালে হেরে গেলে তুমি। কিন্তু সাবধান। যা করেছ বা যতদূর এগিয়েছ তার সব সংবাদটুকুই আমি রাখি। কিন্তু আর এক পাও নয়। হুঁশিয়ার! এরপর আর এক পা এগুলেই ধ্বংস সুনিশ্চিত জেনো। মনে রেখো বাজপাখি মিথ্যা ভয় দেখায় না। তার প্রমাণ তুমি মুখোমুখি বহুবার পেয়েছ। তোমার মত একজন ধীশক্তিসম্পন্ন লোককে বৃথা হত্যা করতে চাই না। তাই এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালে যে সরাতে আমার মনে এতটুকুও দ্বিধা হবে না, তা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বেশ ভাল করে—

তোমার বহু পুরোনো বন্ধু **বাজপাখি**

দীপকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল কিনা রাতের অন্ধকারে তা বোঝা গেল না।

—আট—

৭ই জুন—বেলা আটটা।

রায়বাহাদুর চন্দ্রশেখরের বাড়িটা অসংখ্য পুলিশ প্রহরীবেষ্টিত হয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতই পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

দোতলার হলঘরে বসেছিলেন রায়বাহাদুর একটি বড় সোফায়। পাশে বসে স্বয়ং ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ গুপ্ত। কোমরে ঝোলান ছয় ঘরা অটোমেটিকটি যেন রায়বাহাদুরের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে অটুট গাম্ভীর্যে শোভা পাচ্ছিল—

মিঃ গুপ্ত বললেন—অহেতুক ভয় আপনার রায়বাহাদুর। হয়ত কেউ আপনাকে মিথ্যা ব্ল্যাকমেল করছে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ওর মধ্যে কোনও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় যে গলদ এবং কি, তা বোঝবার সাধ্য আমার নেই।

—আপনার স্নায়ু বড় দুর্বল রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর হেসে মৃদু তোয়াক্কের ভঙ্গিতে বললেন, হয়ত তা হবে মিঃ গুপ্ত। তবু কেন যে আজ সামান্য কারণে আমার মনটা এত উতলা…

রায়বাহাদুর এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ার থেকে হুইস্কির বোতল বের করে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিলেন। ওতে তাঁর স্নায়ু সবল হলো কিনা জানি না। তবে সাময়িক দুশ্চিন্তার ভার লাঘব হয়ত হলো কিছুটা।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং…

—হ্যালো কে? রায়বাহাদুর ফোন তুললেন।

—তোমার নিয়তি…বাজপাখি…আমার পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না রায়বাহাদুর চন্দ্রশেখর ওরফে শয়তান হরিচাঁদ। সামান্য পুলিশবাহিনী কেন, লালবাজারের সমস্ত পুলিশবাহিনী আমার দুর্বার গতির কাছে এক

গুচ্ছ তৃণের মত তুচ্ছ। মিঃ গুপ্তর মত শত লোকেরও সাধ্য নেই নিয়তির মত করাল আমার রোষবহ্নিকে বাধা দেয়, আর, আধ পয়সার হরিচাঁদ! এবার ভগবানের ধ্যান করতে সুরু কর তুমি—হাঃ হাঃ হাঃ…

রায়বাহাদুর আর থাকতে পারলেন না। প্রাণপণে আত্মদমন করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও হাত থেকে ফোনটা ছিটকে পড়ল। কোনও প্রকারে সেটাকে চেপে রেখে তিনি চুপচাপ চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতে সুরু করলেন—আমি ওকে টাকাটা দিয়েই দিই মিঃ গুপ্ত। আর আমি এভাবে সহ্য করতে পারছি না।

মিঃ গুপ্ত বললেন হ্যালো রায়বাহাদুর! হোয়াই সো নার্ভাস? এভাবে ডাকাতকে প্রশ্রয় দিলে তারা ত আরও পেয়ে বসবে। একটা বাজে ফোন শুনেই এত ভয় পেয়ে গেলেন? হোয়াট এ চাইল্ড ইউ আর?

রায়বাহাদুরের কম্পমান ঠোঁট দিয়ে শুধু ফুটে উঠল একটি মাত্র কথা—বাজপাখি।

—ড্যাম ব্লাডি বাজপাখি! ইউ আর সো হোপলেসলী একজাজেটেড দ্যাট আই য়্যাম অলসো অব নো ইউজ—

রায়বাহাদুরের চোখে মুখে যেন হঠাৎ ফুটে উঠল অদ্ভুত দৃঢ়তা। বললেন—না না, এ হতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মিঃ গুপ্ত। দেখি তার কতবড় সাধ্য।

দীপ নিভে যাবার পূর্বমুহূর্তে একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে। এও কি তবে তাই?

ঠক্ ঠক্ ঠক্। পেণ্ডুলামের দোলনের সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে সেকেণ্ড আর মিনিট। সময় এগিয়ে চলে যেন বিদ্যুতের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে। পনর মিনিট কেটে গেল। কুড়ি···পঁচিশ···আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি···

একজন পুলিশ কনেষ্টবল প্রবেশ করল খটাখট, খটাখট···

—কি চাই? খেঁকিয়ে উঠলেন মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে সে বলল—আজ্ঞে গোয়েন্দা দীপকবাবু আর তাঁর সহকারী রতনলাল, হুজুর···

মিঃ গুপ্তের মুখখানি আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দীপক এসেছে? এক্ষুনি এখানে পাঠিয়ে দাও তাকে, কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন তিনি।

খট্ খট্ খট্···পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

দু'মিনিট কেটে গেছে। ঘরে প্রবেশ করল দু'জন লোক। মুখে তাদের অদ্ভুত দুটি মুখোস। দুহাতে দুটি উদ্যত নিকষ কালো পিস্তল।

—মাথার ওপরে হাত তোল মিঃ গুপ্ত এবং রায়বাহাদুর—

মিঃ গুপ্ত স্তম্ভিতের মত বলে উঠলেন—ও, তুমি দীপক নও? জাল দীপক চ্যাটার্জী সেজে আমাদের প্রতারণা করেছ এভাবে!

মূর্তি দু'টি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

একজন মিঃ গুপ্তের কপালের ওপর পিস্তলটা উঁচিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বলল—টুঁ শব্দ করেছ কি তোমার মৃত্যু নিশ্চিত মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত বিমূঢ়ের মতো বলে উঠলেন—মাই গড।

অপরজন রায়বাহাদুরের বুকের সামনে পিস্তল ধরে হুকুম করল—সোজা ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঐ সিন্দুকটা খুলে ফেলুন।

রায়বাহাদুর মুখে বিস্মিতভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন—কেন ?

লোকটি খল্ খল্ করে হেসে উঠে বলল—ঐ সিন্দুকে আছে বিশ হাজার টাকা। আমি জানি রায়বাহাদুর! আরও জানি যে ঐ লৌহ সিন্দুকের চাবি আছে আপনার কোমরের সাথে বাঁধা। মুহূর্তের বিলম্ব না করে ঐ সিন্দুকের চাবি খুলে বিশ হাজার টাকা আমায় দিন, নইলে এই মুহূর্তই আপনার জীবনের শেষ মুহূর্ত বলে জানবেন।

রায়বাহাদুর বলে উঠলেন—না না, তোমার কথামতই কাজ করছি আমি। কিন্তু এভাবে ভয় দেখিও না, দোহাই তোমার!

দস্যুর কথামত বিশ হাজার টাকা রায়বাহাদুর তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর ওরা দুজনে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে পায়ে পায়ে পিছনের দিকে সরে ঘরের কোণে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু তারা ঘর থেকে বের হবার অবকাশ পেল না। ওদের দুজনের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল বিরাট শক্তিশালী এক ব্যক্তি···দু' হাতে উদ্যত দুটি পিস্তল যেন বিদ্যুতের মত চকচক করছে···

—এক মুহূর্তের মধ্যে হাত থেকে পিস্তল ফেলে দাও, বাজপাখি। এক পাও নড়বার চেষ্টা করলে মৃত্যু তোমাদের অবধারিত জেনো।

—কে তুমি ? আবার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

—যে দীপক চ্যাটার্জীর ছদ্মবেশে তোমরা পুলিশ ব্যূহ ভেদ করেছ শয়তান, আমি স্বয়ং তোমাদের সেই বন্ধু দীপক চ্যাটার্জী। একটুও নড়বার চেষ্টা করলে মৃত্যু···

মুখোশধারী দুজনে পাশের দুটি চেয়ারে বসে পড়ল। দীপক তাদের দিকে এক পা এগিয়ে গেছে এমন সময় তাদের একজন পা দিয়ে মেঝের এক স্থানে চাপ দিল—

সবার চোখের সামনে চেয়ার সমেত দুজনে ভূগর্ভের দিকে অদৃশ্য হলো। যেন ধরণী গভীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে গ্রাস করে নিল তাদের।

দীপক বিপুল আক্ষেপে দুটি গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু সব ব্যর্থ···

ঘরে উপস্থিত অপর দুজনের দেহে যেন তখন আর চেতনার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

দীপক রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে বলল—আপনার ঘরে যদি এমন একটা পালানর সুযোগ করা থাকে তবে কি করে আর তাদের ধরতে পারি বলুন।

রায়বাহাদুর অবাক হয়ে বলে উঠলেন—কিন্তু ওরা কি করে জানল ঐ গোপন সুড়ঙ্গের কথা? উঃ! আমার বিশ হাজার টাকা আর কোনও অবশিষ্ট রইল না। দস্যুরা সবার চোখের সামনে দিয়ে এভাবে টাকা নিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিল!

দীপক রায়বাহাদুরের কথায় মনোযোগ না দিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

* * *

মিনিট দুয়েক পরের কথা

রায়বাহাদুরের বাড়ির কিছুটা দূরে যে চকলেট রঙের মরিস গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল তা চলতে সুরু করল।

মোড়ের মাথায় একটা পাগল ততক্ষণ ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে নাড়াচড়া করছিল। একবার সে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকে বলল, এই ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি ড্রাইভার তার দিকে চেয়েছিল নেহাৎ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। কিন্তু পাগলটা একখানা গোল চাকতি তার সামনে তুলে ধরতেই সে সেলাম ঠুকে গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—আইয়ে হুজুর।

একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত যে, সে আমাদের গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল ছাড়া আর কেউ নয়···

—দশ—

শহরের প্রান্তে চীনে পাড়ায় ক্ষুদ্র অপরিসর একটি গৃহের প্রায়ান্ধকার একটি কক্ষে চলেছে একটি মিটিং।

বড়ো একটা মিটিঙের মতো জনসমাগম এখানে হয়। একটি ঘরের মধ্যে গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন লোক। ঘরের কোণে টিমটিমে যে বাতিটা জ্বলছে তাতে আলোর চেয়ে বোধহয় ধোঁয়া উঠছে আরো বেশী। অন্ধকার তাতে খুব বেশী দূর হয়নি। সবার মুখই দেখাচ্ছে আবছায়ার মত।

ঘরে কোনও জানলা নেই—মাত্র দুটি দরজা। একটি বন্ধ। অন্যটি এমন অদ্ভুত ভাবে আটকান যে, বৈদ্যুতিক বোতাম না টিপলে বোঝাই যায় না যে এখানে এ ভাবে একটি দরজা বর্তমান।

দেওয়ালের একদিকে বিরাট একটা কাপড়ের উপর কালো কালি দিয়ে আঁকা বিরাট বাজপাখির ছবি। ঠিক যেন শিকারের ওপরে ছোঁ মারতে উদ্যত। নিচে টকটকে লাল কালিতে লেখা—বাজপাখি।

সভার লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচজন। চারজন পুরুষ ও একটি নারী। পুলিশের কালোখাতায় ওদের পাঁচ জনেরই নাম লেখা আছে। তবে জনসমাজে সবাই পরিচিত নয়। শুধু আউলিং ও হোয়াংলি জনসাধারণের আতঙ্কের পাত্র। নারীর নাম—মিস্ লীনা। বর্মার বুকে একসময় সবাই ওকে ভয় করত যমের মতো। তবে ভারতে এর নাম ততটা পরিচিত নয়। চৈনিক, বার্মিজ, ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

একটা ঘণ্টা পর পর তিনবার বেজে উঠল।

সভায় উপস্থিত সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসল।

ইলেকট্রিক কারেন্ট সংযুক্ত দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের

ভেতরে প্রবেশ করল মুখোশাবৃত একজন লোক। পোষাক পরিচ্ছদ তার ধোপ-দুরস্ত। তাকেই এই সভার সভাপতি বলা চলে। ইনিই কোলকাতার ধনীত্রাস, পুলিশের বিহ্বলকারী দস্যু বাজপাখি।

উপস্থিত সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতিকে সম্মান জানালো। বাজপাখি আদেশের ভঙ্গিতে হাত দুটো নেড়ে বলল—বসুন আপনারা—

তারপর একটু থেমে বলল—আউলিং তোমার খবর বল…

কণ্ঠে তার ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই—প্রকৃতি ও ব্যবহার রুক্ষ।

আউলিং উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল—ধীরে অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলতে সুরু করল—রায়বাহাদুরের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা আমরা ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছি। দীপক চ্যাটার্জী বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। একটি টাকার তোড়া আউলিং বাজপাখির হাতে তুলে দিল। তারপর বলল—গোয়েন্দা দীপক আমাকেই বাজপাখি বলে ভুল করেছিল। কিন্তু আমি যে আউলিং অর্থাৎ রায়বাহাদুরের ছদ্মবেশী চাকর শ্যামলাল তা ওরা জানত না। যখন রায়বাহাদুরের কাছে চাকরী করতাম তখনই জানতাম যে ওর ঘরের মধ্যে একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই পথ ধরেই আমরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

বাজপাখি বলল—হোয়াংলি এবার তোমার খবর বল।

একটা বিরাট মোটা ফর্সা বাসিন্দা উঠে দাঁড়াল। পরণে লুঙ্গি ও সার্ট, পায়ে শ্লীপার। সে বলে চলল—আমরা যখন পলায়ন করছিলাম তখন দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল একটা মোটরে চড়ে আমাদের ঠিক পেছনে পেছনে অনুসরণ করছিল। আমি ব্যারাকপুরের মোড়ে একটা আগুনে বোমা ছুঁড়ে তার মোটরে আগুন ধরিয়ে দিই। সে এ যাত্রা বেঁচে গেলেও আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি।

ঠিক এমনি সময়ে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করল একজন লোক।

বাজপাখি প্রশ্ন করল—কি রহমান সর্দার, কি খবর?

লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আজ্ঞে তেরো নম্বর কুঠির ওপরে পুলিশ দৃষ্টি দিয়েছে।

বাজপাখি হেসে বলল—ও, সে জন্যে কোনও দুশ্চিন্তা নেই রহমান। এ খবর আমি আগেই জানতাম। ওখান থেকে সব কিছুই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আপাততঃ আমাদের পরবর্তী কাজের সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক।

তারপর একটু থেমে বলল—ইনি হচ্ছেন মহামান্য চীন গভর্নমেন্টের প্রেরিত দূত। এঁর নাম ফু-চাও। আগামী ছাব্বিশে যে তারিখে ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে ভারত গভর্নমেন্টের কতকগুলি গুপ্ত দলিলপত্র মিলিটারীর পাহারায় চালান যাবে। আমাদের কাজ হবে সেগুলি মিলিটারীর কাছ থেকে লুট করে এঁর হাতে দেওয়া। এজন্য চীন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ আমরা দু' লক্ষ টাকা পাব।

ফু-চাও হেসে বলল—এই কাজের জন্য যে টাকা পাওয়া যাবে তার সিকি হবে আমার প্রাপ্য আর বাকি বারো আনাই পাবেন বাজপাখি এবং তাঁর দলবল।

উপস্থিত সকলেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

মা-তান একটু রসিকতা করে বলে উঠল—আমার ভাগ্যে কত পড়বে মিঃ বাজপাখি ?

বাজপাখি হেসে বলল—দেড় লক্ষ টাকা। পঞ্চাশ হাজার আমি আর বাকী এক লক্ষ আপনারা চারজন এবং আপনাদের দলবল।

মা-তান একটা কটাক্ষ করে হেসে বলল—ও, কিন্তু বড় কম হয়ে গেল মিঃ বাজপাখি।

বাজপাখি বলল—ও কাজে এর বেশী পাবে না সুন্দরী। তবে তোমার জন্যে আরও কয়েকটি কাজ আছে, তাতে পুষিয়ে যাবে। শোন তোমরা সে সব কাজগুলি মনোযোগ দিয়ে···

এরপর প্রায় একঘণ্টা সেখানে যে আলোচনা স্রোত বয়ে গেল তা শুনলে

বাইরের কোনও লোক হয়ত ভয়ে আঁতকে উঠবে। কিন্তু ওরা বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই সেগুলি আলোচনা করল। পুলিশ বিভাগের পক্ষেও সে আলোচনার কথা ধারণা করা দুঃসাধ্য।

সভা যখন ভাঙল রাত শেষ হতে তখন খুব বেশী দেরী নেই।

সভা থেকে বেরিয়ে সকলেই ধীরে ধীরে আপন গন্তব্যপথ ধরল।

কিন্তু কেউই অন্যের বিষয় কোন মাথা ঘামান প্রয়োজন মনে করল না। এটাই বোধ হয় বাজপাখির দলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

—এগারো—

দুদিন পর।

সকাল সাড়ে আটটা।

ঘুম থেকে উঠে চা, টোস্ট সহযোগে খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছিল দীপক, এমন সময় ঘন ঘন টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে বললে—হ্যালো···

—মিঃ চ্যাটার্জী ?

—হ্যাঁ।

—সুপ্রভাত। আমি মিঃ গুপ্ত বলছি লালবাজার থেকে।

—নিশ্চয়ই বাজপাখি সংক্রান্ত কোনও খবর ?

—হ্যাঁ। আপনি সত্যি বুদ্ধিমান। এবারের ব্যাপারটা কিন্তু বেশ গুরুতর।

—কি ব্যাপার ?

—গত কাল রাতে রতনপুর স্টেটের রাজার কোলকাতার বাড়িতে সশস্ত্র দস্যুদল হানা দেয়। তারা পিস্তল, বোমা, সোর্ড ইত্যাদিতে সজ্জিত ছিল।

—তারপর ?

—একটা সিন্দুক ভেঙে তারা প্রচুর অলংকার নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চুরি গেছে একটা দামী হীরা। এই হীরাটি এই বংশের প্রাচীন সম্পদ—এর দাম কম করেও লক্ষ টাকা হবে।

—আপনারা কিছু সূত্র পেলেন ?

—না, তেমন কিছু পাইনি। তবু বাজপাখির ছবি-আঁকা একটা কার্ড পাওয়া গেছে। তাছাড়া শুধু চুরিই নয়, রাজার ছোট ছেলে দস্যুদের বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছে। তাকে ভাল চিকিৎসকের অধীনে রাখা হয়েছে যদিও—তবু তার অবস্থা ভাল নয়।

—তবে ত ব্যাপার সিরিয়াস্ !

—হ্যাঁ, তা বটে। ওপর থেকে ঘন ঘন চাপ আসছে অবিলম্বে তদন্তের জন্যে। এখন আপনিই যা কিছু ভরসা দীপকবাবু। তা না হলে···

—আমার সাধ্যমত চেষ্টা ত করছি। তবে বাজপাখির দলকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। তা না হলে বৃথা চেষ্টা।

—তা বটে।

—আমি তার গোপন আড্ডার সন্ধানে আছি—যাতে আচমকা আঘাত হানতে পারি।

—ঠিক আছে। আমার কাছে গোপন সূত্র তাদের কিছু আছে। ফোনে সব বলা যায় না। আপনি যদি আসেন, তাহলে সব বলতে পারি।

—আচ্ছা আমি আসছি।

দীপক ফোন নামিয়ে রাখে। তারপর পাশের ঘরের দিকে চেয়ে ডাকে—রতন !

—কিরে ?

—তৈরী হয়ে নে—এক্ষুনি আমাদের বের হতে হবে।

—ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপার কি ?

—আবার বাজপাখি !

—কোথায় ?

—রতনপুরের রাজবাড়িতে।

—আমরা যাব অকুস্থলের প্রত্যক্ষ তদন্তে ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। কিন্তু গোড়ায় ঘা না দিলে ত কিছু হবে না দীপক।

—তা জানি। এখন দেখা যাক, এদিকে কি ঘটেছে।

*   *   *

দীপক লালবাজারে আসতেই মিঃ গুপ্ত বললেন—আপনার প্রতীক্ষাতেই করছিলাম—চলুন অকুস্থলে যাওয়া যাক।

—চলুন।

দীপক, রতন উঠে বসল পুলিশ জীপে। গাড়ি ছুটে চলল বালিগঞ্জের দিকে।

বালিগঞ্জের বিরাট একটা অংশ জুড়ে রতনপুরের রাজার বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে।

দোতলায় একটা মস্ত বড় হল ঘর। এটাই মহারাজার হীরা জহরত রাখার ঘর।

এক কোণে বিরাট একটা সিন্দুক। পাল্লাটা অবশ্য বাইরে থেকে বন্ধ। এটাতেই হীরা-জহরত, অলংকার ইত্যাদি রাখা হয়ে থাকে।

সামনেই বিরাট একটা তালা ঝোলান।

সেটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিঃ গুপ্ত দীপককে বললেন—সেদিন রাতে প্রায় দুটো নাগাদ দুজন লোক ওই ঘরে প্রবেশ করে এবং এক অদ্ভুত ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে এই সিন্দুকের সামনের পাল্লাটা কেটে ফেলে। তারপর এসিড্ দিয়ে তারা অতি সহজেই তালা খুলে ফেলে।

সেদিন খুব গরম পড়েছিল।

বাজার ছোট ছেলের তাই ভাল ঘুম হচ্ছিল না। এ ঘরে খট্‌খট্‌ শব্দ শুনে সে চমকে ওঠে—নিচে নেমে আসে। ভাবে, নিশ্চয় চোর ঢুকেছে। বন্দুকটা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে দুজন লোক মালপত্র সব একটা থলেতে ভরছে।

রাজকুমার তাদের একজনকে গুলি করলে লোকটি আহত হয়। কিন্তু অন্য-জন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে আহত করে। তারপর দুজনে চলে যায়।

রাজকুমার এভাবে আহত হয়েছে বটে—কিন্তু বাজপাখির দলেরও একজন আহত হয়েছে।

—ঠিক জানেন ?

—হ্যাঁ। মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ দেখা গেছে।

—তাহলে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিন্দুক খোলা—

—বাজপাখির কাছে তা সহজ মিঃ চ্যাটার্জী।

—তা ঠিক।

—ওরা দিনে দিনে যেন অতি দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে।

—আচ্ছা একটা কথা—

—বলুন।

—সিন্দুক থেকে হীরে ছাড়া আর কিছুই কি চুরি হয়নি ?

—হয়েছে।

—কি ?

—অনেক গহনা। তবে সেগুলো হীরের মত দামী নয়।

—সেগুলোর বিবরণ নিয়েছেন ?

—নিশ্চয়।

—তা দিয়ে প্রত্যেক থানায় রিপোর্ট করুন। প্রত্যেক জুয়েলারী দোকানে গোপনে জানান ঐ সব গহনার কথা।

—তা করব। কিন্তু ওরা যদি গহনা গালিয়ে ফেলে সোনা বিক্রি করে ?

—তা পারে। তবে ভুল ত অনেক সময় হয়।

—তা বটে।

—আমরা সেই সুযোগ নেবার জন্যেই প্রতীক্ষা করব। ওদের ভুল না হলে আমাদের সুযোগ আসবে কি করে ?

—তা ত বটেই।

—দেখাই যাক না একটা চান্স নিয়ে। অনেক সময় বেশ ধীশক্তিসম্পন্ন লোকেরাও তুচ্ছ ভুল করে।

—তা বটে।

—আর তাই পৃথিবীতে প্রতিটি ক্রাইম ধরা পড়ে।

তদন্ত শেষ হলো।

দীপক, রতন আর মিঃ গুপ্ত তারপর বেরিয়ে এলেন রাজবাড়ি থেকে।

—বারো—

সেদি সন্ধ্যায়।

মিঃ গুপ্তের কাছ থেকে জরুরী ফোন পেল দীপক।

সঙ্গে সঙ্গে গেল লালবাজারে।

—কি ব্যাপার ?

—একজন লোক একটা গহনা বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে দীপকবাবু।

—কোন গহনা ?

—রাজবাড়ির গহনা।

—লোকটিকে ডাকুন।

লোকটিকে আনা হলো।

দোহারা চেহারার একজন হিন্দুস্থানী। দীপক বললে—তুমি ও গহনা কোথায় পেলে? সত্যি কথা বল—

—আজ্ঞে কাল রেসকোর্সে একটি লোক বহু টাকা হেরে যায়। শেষে এই গহনাটা আমাকে দুশো টাকায় বিক্রি করে। আমি দেখলাম এটার দাম পাঁচ ছশো টাকা হবে। তাই কিনলাম।

—লোকটিকে চেন?

—না।

—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ স্যার।

দীপক মিঃ গুপ্তকে বললে—ওকে ছেড়ে দিন মিঃ গুপ্ত…

—কিন্তু—

—আমি ঠিকই বলছি।

লোকটি চলে গেল।

দীপক রতনকে ইশারা করে বললে—ওকে ফলো কর।

—ঠিক আছে।

—কোথায় যায়, কি করে সব কথা আমাকে জানাবি, বুঝলি?

—আচ্ছা।

রতন বেরিয়ে গেল।

দীপক বললে—চুনোপুঁটিকে খেলিয়েই ত বড়দের সন্ধান নিতে হবে মিঃ গুপ্ত।

—তা বটে।

দীপক বাড়ি ফিরল।

* * *

ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট।

জি. পি. ও-র ঠিক সামনে একটা ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

ঢং ঢং······

দশটা বাজল।

দুটি গাড়ি ডালহৌসী স্কোয়ার ধরে এগিয়ে চলেছে। একটা জাল দিয়ে ঘেরা—অন্যটা আর্মড পুলিশের লরী।

ঘেরা গাড়িটা সামনে আসছে—লরীটা আসছে তার পেছনে।

বুম্ বুম্—

বাতাসকে মথিত করে হাতবোমার সঘন গর্জন যেন ছুটে গেল চারদিকে।

আর্মড পুলিশ কজন লরী থেকে ছিটকে পড়ল চারদিকে। ঠিক লরীটার উপরেই দুটি বোমা পড়েছে।

এমন সময় উল্টো দিক থেকে ছুটে এলো একটা হিন্দুস্থান কালো গাড়ি।

তাতে আটজন আরোহী বসে।

তারা ছিল প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

জাল দিয়ে ঘেরা গাড়ির সামনে চারজন বন্দুক উঁচিয়ে ধরল।

অন্য কজন ধরাধরি করে কটা প্যাকেট গাড়িতে তুলে নিল দ্রুতবেগে।

তারপর দস্যুরা ছুটল গাড়িতে। দস্যুদের গাড়িখানা তীরের বেগে বেরিয়ে গেল লুণ্ঠন শেষ করে।

একটু পরেই সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল এই বিরাট খবর।

প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারে ভারত সরকারের জরুরী দলিল চুরি হয়েছে!

বাজপাখির ভয়াবহ কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে সকলের মনে সৃষ্টি করল এক মহা আতংক।

—তেরো—

ভোর বেলা।

ফোন বাজল ঘন ঘন।

দীপক রিসিভার তুলে বললে—হ্যালো—

—আমি রতন।

—কি খবর?

—বাজপাখির দলবল কোথায় থাকে আর সন্ধান আমি জেনেছি।

—কোথায়?

—চীনে পাড়ায়—সাংহাই হোটেলে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, কিন্তু তারা আজ খুব ব্যস্ত।

—ব্যস্ত!

—হ্যাঁ।

—কেন?

—মনে হচ্ছে সব আজই পালাবে। আমি দু একজনের মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হয় দশটা নাগাদ প্লেনে সব যাবে।

—ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তুই ওদের পেছনে থাক। আমি দমদম এরোড্রোম ঘেরাও করছি।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

তারপর রওনা হলো লালবাজারের দিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

*　　　　　　　　*

বেলা দশটা।

দমদম এরোড্রোম থেকে একটি প্লেন উঠবে আকাশে।

দীপক, রতন, মিঃ গুপ্ত সকলে এসে হাজির হয়ে গেছেন দমদম এরোড্রোমে।

কি আশ্চর্য! এ প্লেনে যাচ্ছে মহামান্য চীন সরকারের রাজদূত। তাঁকে আটকাবার সাধ্য কারও নেই।

দীপক বললে—আমার একটা কথা মনে হচ্ছে কিন্তু মিঃ গুপ্ত।

—কি কথা?

—ও নিশ্চয় আসল রাজদূত নয়—সব ভুয়ো লোক।

—কিন্তু কি করব—আমাদের উপায় নেই। আমরা সরকারের কাছে অর্ডার চেয়েছি। এখনো পাইনি প্লেন সার্চের অর্ডার।

একটু পরে প্লেন আকাশে উঠল।

এক মিনিট···

ফোন বেজে উঠল। মিঃ গুপ্ত ফোন ধরলেন। তার ফোন নামিয়ে বললেন—সত্যি মিঃ চ্যাটার্জী। চীনের রাজদূত ও নয়। ওকে ধরতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লেনে এঁরা উঠে ধাওয়া করলেন আগের প্লেনকে।

আকাশের বুকে দুটি প্লেনে সংঘাত শুরু হলো—কোলকাতা থেকে মাইল পাঁচ সাত উত্তরে।

একটা লোক প্যারাশুটে করে লাফিয়ে পড়ল। তাকে ধরা গেল না।

একটু পরে শত্রু প্লেনটিকে নামান হলো।

দলের সকলে ধরা পড়ল। গুপ্ত দলিল, হীরা সব পাওয়া গেল।

কিন্তু বাজপাখি প্যারাস্যুটে নেমে কোথায় যে পালাল তাকে ধরা গেল না আর!

নৃশংস

১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বর।

তুরিন থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনটি রোম-এ পৌঁছেছে কিছুক্ষণ আগে। যাত্রীরা নিজেদের গন্তব্যস্থানে চলে গেছে। রেলের কামরাগুলি জনশূন্য। রেলওয়ে পুলিশ আবিষ্কার করল দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় বাঙ্কের ওপর দুটি স্যুটকেস পড়ে রয়েছে। স্যুটকেস দুটো বেশ ভারি। পুলিশ অফিসারেরা মালগুলি মালখানায় পাঠাবেন স্থির করলেন। বাঙ্কের ওপর থেকে নীচে নামাবার সময় একটি স্যুটকেসের তালা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে নীচে গড়িয়ে পড়ল একটি নারীমুণ্ড। স্যুটকেসের ভেতরে পুরু ব্রাউন পেপারে মোড়া ছিল মুণ্ডটি। কৌতূহলী পুলিশ অফিসারেরা দ্বিতীয় স্যুটকেসটা খুলে দেখলেন; সেখানে পাওয়া গেল নিহত মহিলার হাত ও পা।

পরদিনও লা স্পেজিয়া থেকে রোম-এর গাড়িতে অনুরূপ একটি স্যুটকেশ এলো। সেই স্যুটকেসে পাওয়া গেল তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন অংশটা। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো মিলিয়ে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিহত মহিলার বয়স প্রায় ত্রিশ, উচ্চতা মাঝারি ধরনের, বাদামী রঙের চুল ও চোখ। বাঁ পা'টি একটু বাঁকা, সর্বাঙ্গে পুরোন ক্ষতচিহ্ন। তার পিঠে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু ডাক্তাররা মন্তব্য করলেন, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা যায় নি, জীবিতাবস্থাতেই তার শরীরের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

নরহত্যা-সংস্থা তদন্ত শুরু করল। দেশের বিভিন্ন স্থানের নিরুদ্দিষ্টা মহিলাদের তালিকা মিলিয়ে দেখল; কিন্তু নিহত মহিলার পরিচয় বার করতে পারল না।

এসব ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগিতার মূল্য অপরিসীম। তাই পুলিশ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ঘটনাটি প্রকাশ করল।

তখনই সত্যিকারের যবনিকা উন্মোচিত হল। প্রথম ট্রেনের দুজন

প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারল, মধ্যবয়স্ক একটি লোক—খুঁচাল তার গোঁফ—তাদের গাড়িতে ওঠে দুটো স্যুটকেস নিয়ে। স্যুটকেস দুটো বাঙ্কের ওপর রেখে সে কোণের একটি সীটে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দেখল, গাড়ি নেপলস্-এ পৌঁছে গেছে আর সেই লোকটি তার লাগেজ ফেলে অদৃশ্য হয়েছে।

এ বর্ণনা থেকে পুলিশ অনুমান করল, অপরাধী লা স্পেজিয়া থেকে গাড়িতে চড়েছিল। সে পিসা পর্যন্ত এসেছিল, কেননা সেটাই ছিল প্রথম স্টপ। সেখান থেকে আবার আপ ট্রেন ধরে লা স্পেজিয়ায় ফিরে যায়।

লা স্পেজিয়ার গোয়েন্দা দপ্তর তদন্তের ভার নিল। সেখানকার হোটেলওলা ও বাড়িওলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। বাড়ি-বাড়ি অনুসন্ধান চালাল, এমন কি পতিতালয়গুলোও বাদ দিল না। কিন্তু কোথাও হত্যা সম্বন্ধে কাণাঘুষা পর্যন্ত শুনল না।

অপ্রত্যাশিত ভাবে এলো একটি সুযোগ। একে ভাগ্যও বলা যায়। কমাণ্ডার দোশীর দৃষ্টি পড়ল সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবরের ওপর।

খবরটি হচ্ছে—রেল স্টেশনের ধারে, জঞ্জালস্তূপের মধ্যে একটা ছোরা পেয়েছে জনৈক যুবক। সে ছোরাটি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রেখেছে। প্রকৃত মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে রেলের মালখানা থেকে ছোরাটা নিতে পারেন।

কমাণ্ডার দোশী সহকারিকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে ছুটে গেলেন। সেখান থেকে ছোরাটি নিয়ে পুলিশ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করালেন। জানা গেল, ছোরটায় মানুষের রক্তের দাগ রয়েছে।

এবার শুরু হল অনুসন্ধানের পালা। দোকানে দোকানে তদন্ত করা হল। এক দোকানী বলল, ছুঁচাল গোঁফওলা মধ্যবয়স্ক একটি লোকের কাছে সে ছোরাটি বিক্রি করেছিল। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি কয়েকটা দোকানের পরে একটি স্যুটকেসের দোকান থেকে জানা গেল, ওই লোকটি তিনটে স্যুটকেসও কিনেছিল।

গোয়েন্দা বিভাগের আর সন্দেহ রইল না স্পেজিয়াতে ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড। এবার বাড়ি-বাড়ি তল্লাশী শুরু করল গোয়েন্দারা, কোন জায়গা বাদ গেল না। তারপর একটি নির্দিষ্ট স্ট্রীটে সীমাবদ্ধ করল তল্লাসী। লা স্পেজিয়ার একটি সরু গলির পাঁচতলার একটি ঘরের ওপর নজর রাখল গোয়েন্দারা।

দুজন সহকর্মী কমাণ্ডার দোশীকে জানাল, ওই ঘর থেকে বাইরে যায় নি কেউ। তাই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন তাঁরা। প্যাঁচাল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন কমাণ্ডার দোশী। তাঁর অন্তর উত্তেজনায় কাঁপছে।

পাঁচতলায় এসে দেখা গেল, সামনের দরজাটি একটু খোলা। কমাণ্ডার দোশী পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে দেখলেন, সেটা রান্নাঘর। সেখানে একটা জিনিস তাঁরা লক্ষ্য করলেন। একটি বালতির মধ্যে কয়েক টুকরো পুরু ব্রাউন পেপার—সেই সুটকেসের ভেতরে যেমন ছিল ঠিক তেমনি। তাঁরা রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি সাজানো হয়েছে অনেকগুলো পুরোন ধরনের আসবাবপত্র দিয়ে। দুটো লোক তাঁদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদের দেখে পকেট হাতড়াতে লাগল তারা। কমাণ্ডার দোশী বললেন, ওখানে দাঁড়াও, এক-পা এগোবার চেষ্টা করে না—এগোলেই গুলি করব।

হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল দুজনে। একজন বলল, আমার পরিচয়টা একবার জানানো দরকার। আমি রোমের পুলিশ কমিশনার এরিকো, আর ইনি হচ্ছেন সিনর মাসকো—আমার সহকারী।

হতভম্ব হলেন কমাণ্ডার দোশী। ক্ষোভে বিরক্তিতে ঘৃণায় ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হল মন। আড়াইশো মাইল দূর থেকে তাঁরই এলাকায় এসে তাঁর ওপর টেক্কা দেওয়া হচ্ছে।

কমাণ্ডার দোশী প্রশ্ন করলেন, কাউন্ট সিজারে সারভিয়েত্তি—যে এখানে থাকে, আর যাকে আমরা গ্রেফতার করতে এসেছি, সে কোথায়?

শান্ত কণ্ঠে কমিশনার প্রশ্ন করলেন, আপনিই কি লা স্পেজিয়ার দোশী?

মনে হল না তিনি বিরক্ত হয়েছেন। তারপর মুহূর্তেক ইতস্ততঃ করে বললেন আমরা তাকেই হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করেছি। সারভিয়েত্তিকে গতকাল গ্রেফতার করা হয়েছে, সে এখন রোমের জেলে।

কেসটি সম্পর্কে কমিশনার এরিকোর সঙ্গে দোশীর আলোচনা হল। তিনি বললেন, এক সম্পূর্ণ অভিনব উপায় অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা। রোমের জনৈক গোয়েন্দা শুরুতেই বলেছিলেন, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকে এই খুনের সূত্র পাওয়া যাবে। তাই তাঁরা সংবাদপত্রের ফাইল ঘেঁটে নোট নিয়ে প্রতিটি পাত্রের চরিত্র ও গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। অবশেষে একটি বিজ্ঞাপন একজন বিচক্ষণ গোয়েন্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লা স্পেজিয়ার কোন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি একটি বিজ্ঞাপন দেয়:

'অভিজাত, সম্পন্ন ও শান্তপ্রকৃতি ভদ্রলোক বিবাহের উদ্দেশ্যে স্বাধীনচেতা নিঝঞ্ঝাট তরুণীর সহিত পত্রালাপ করতে চান।'

রোম-পুলিশ এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে গত নভেম্বর মাসে জনৈকা ত্রিংশতি-বর্ষীয়া গৃহকর্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদের যোগসূত্র খুঁজে পায়। সেই মহিলা তার নিয়োগকর্তাকে জানায় যে, একটি বিবাহের বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছে সে, স্থির করা হয়েছে, সে তার ভাবী-স্বামীর সঙ্গে লা স্পেজিয়াতে মিলিত হবে। পুলিশ সংবাদ সংগ্রহ করেছিল যে, মহিলাটির বাম-পা ছিল খোঁড়া। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও এই খুঁতের কথা বলা হয়েছে। তারপর সেই সহৃদয় অভিজাতকে লা স্পেজিয়াতে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়নি। তবে কমিশনার এরিকো যখন তাঁর সহকারীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন, তখন সে রোমে চলে গিয়েছিল। সেখানকার একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর তারা এসে উপস্থিত হন লা স্পেজিয়ার এই ঘরটিতে—যেখানে সে বিজ্ঞাপনের টোপ গেলা হতভাগিনীদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছিল।

খুনীর বদলে কমিশনারকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছিলেন কমাণ্ডার

দোষী। তাই তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন সেদিন।

এই সান্ত্বনা যে, তাঁরই সংগৃহীত প্রমাণের বলে সারভিয়েত্তি ধরা পড়েছিলেন। তাছাড়া তিনিই প্রমাণ করেছিলেন যে, পাওলিনা গোরিয়েত্তি নাম্নী জনৈকা গৃহকর্ত্রীই ছিল তার সর্বশেষ শিকার। তার হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সঞ্চিত অর্থ হস্তগত করা। সারভিয়েত্তির জীবনধারা থেকেই অনুমান করা যায় তার অপরাধ প্রবণতার কারণ। তার বাপ ছিলেন ইতালীর সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। বিকৃতরুচি জ্ঞানপাপী ছিলেন তিনি। ছেলেকে দিয়ে যান সামান্য কিছু অর্থ আর জীবন সম্বন্ধে এক বিকৃত দর্শন। নারীদের সম্বন্ধে তিনি তাকে বলতেন, আমাদের স্ফূর্তির জন্যই নারীদের অস্তিত্ব। পুরুষকে খুশি করার জন্যই তাদের জীবন। আর কোন উদ্দেশ্য নেই নারীজন্মের।

সারভিয়েত্তির মা এ উপদেশের প্রতিবাদ জানাতেন না, পুত্রের স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জন করারও চেষ্টা করতেন না। সুরাপানে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। গহনাপত্র বেচে শুধু মদ খেতেন। তিনি যখন মারা যান, তখন সিজারের বয়স আঠারো।

সারভিয়েত্তি লেখাপড়া শেখেনি, কোন কাজকর্ম জানে না, সুতরাং লা স্পেজিয়ার একটি মনিহারী দোকানের মালিক এক মহিলার রক্ষিত হিসাব বাস করছিল। মহিলার নাম ছিল রোজ। সে বয়সে তার থেকে দশ বছরের বড়। ভালই চলছিল দিনগুলি। কিন্তু কিছুদিন পরেই শুরু হল মনোমালিন্য ও বিবাদ। তার কারণ হয়তো, সারভিয়েত্তি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করত, রোজ তাকে বেশি টাকা দিতে চাইত না। রোজের ব্যবসায়ে সে কোন সাহায্য করত না। তাছাড়া, রোজের যৌবনে ভাটার টান পড়ছিল, তার লাবণ্য ও আকর্ষণ ক্রমশ কমে আসছিল। যেদিন সারভিয়েত্তি জানাল যে রোজ সন্তানসম্ভবা, তখন সে উত্তেজিত হয়ে একটি লৌহদণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করে হত্যা করে। তারপর তার মৃতদেহটি বাগানের পেছনে কবর দিয়ে একটি ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখে। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সে তার

রোমে নতুন দোকান খুলেছে, এদিককার সব রোমে। সে দোকান ও সরঞ্জাম নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করল, কেউ সন্দেহ করল না তাকে। এভাবে একটি হত্যাকাণ্ড গোপন করতে পেরে তার সাহস ও উৎসাহ বেড়ে যায়, আর সে পরপর আরো হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। সে ক'জনকে ঠিক খুন করেছে জানা যায় নি।

জনৈকা আমেরিকান মহিলার নাম জানা যায়—যে বিবাহের লোভ দেখিয়ে আকর্ষণ করে পুরুষকে হত্যা করত, আর তার দেহের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। সারভিয়েত্তি এমনি জঘন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। সে যে হোটেলে থাকত সেখানেও দুটি হত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বিচারের কয়েক মাস পরে একদিন সকালে তাকে গুলি করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে একরকম টেনে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সে অনুনয় করছিল, আর্তনাদ করছিল—প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাচ্ছিল বারবার। অবশেষে গুলির আঘাতে তার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হয়েছিল।

———

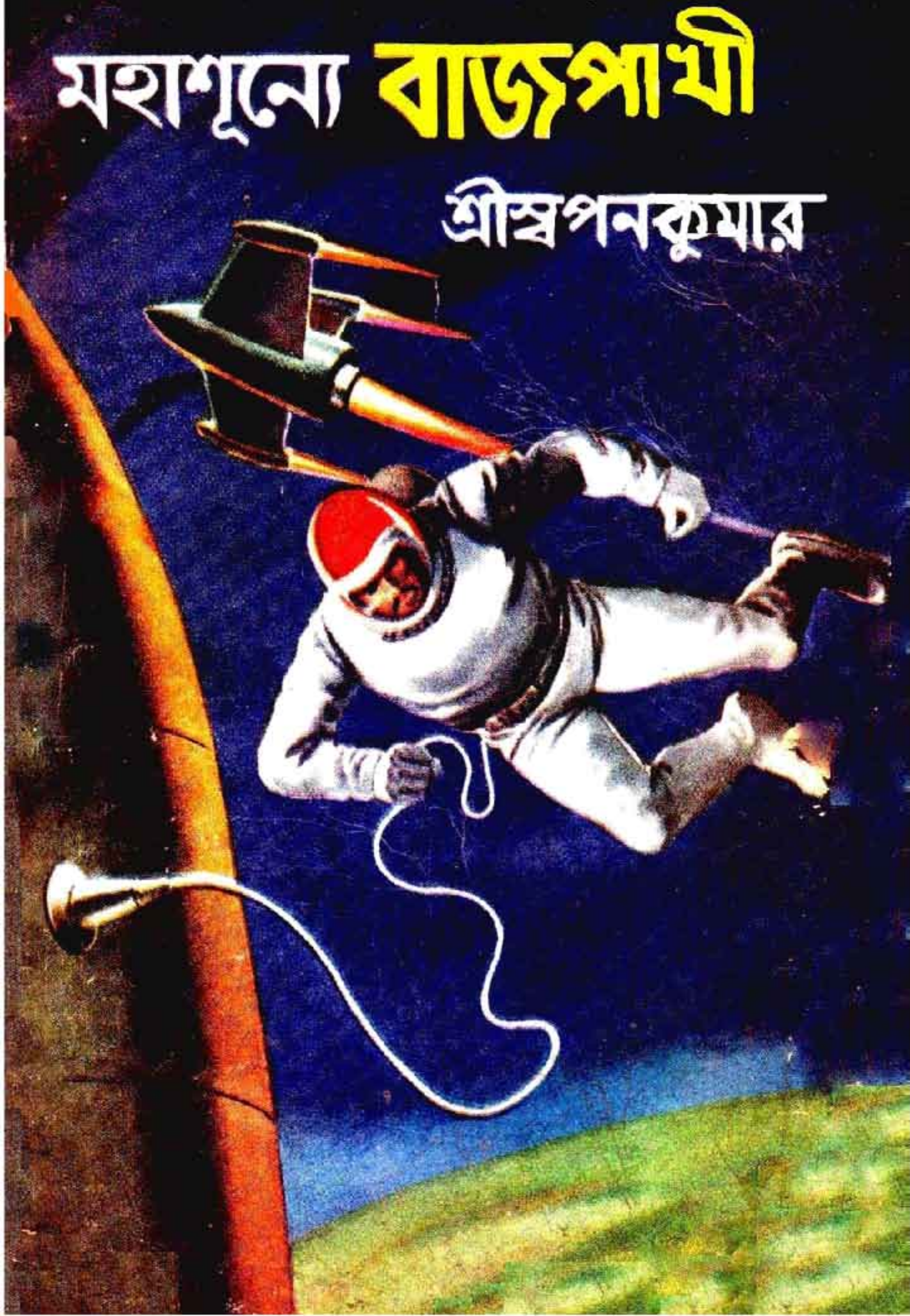
মহাশূন্যে বাজপাখী
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—১৩ নং

মহাশূন্যে বাজপাখি

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশ
শ্রীমহে
মহে কশন
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক :
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৬

এ-বছরের সবচেয়ে সেরা ·
ডিটেকৃটিভ সিরিজ

শ্রীস্বপনকুমারের লেখা

"—বাজপাখি সিরিজ—"

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি
২। বাজপাখির পুনরভিযান
৩। বাজপাখির রক্তলীলা
৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার
৬। হত্যাকারী বাজপাখি
৭। বাজপাখির রহস্যজাল
৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র
১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

মুদ্রাকর :
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ২·৫০

এক

দক্ষিণ ভারতের কোন একটি অঞ্চল···

একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে গভীর অরণ্য। অরণ্যের মধ্যে বাঘ, হায়না। শজারু থেকে হরিণ পর্যন্ত সর্ব শ্রেণীর জীবজন্তুই বাস করে।

এমনি অঞ্চলে জঙ্গলের বুকে ছোট্ট একটি বাড়ি তৈরী করে বাস করছিলেন—বৈজ্ঞানিক বাজপেয়ী।

তিনি অবিবাহিত। সংসারের কোনও বালাই তাঁর নেই। তবে অন্য জাতের আর একটা সংসার তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেখানে।

খরগোস, বানর, শিম্পাঞ্জি থেকে শুরু করে 'গিনিপিগ, ইঁদুরছানা ইত্যাদি জীবজন্তু দিয়ে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিটাকে সজ্জিত করেছিলেন।

বিভিন্ন ধরণের রিসার্চ তিনি করেন এখানে। কিন্তু তাঁর রিসার্চের বিষয়-বস্তু যে কি, তা বাইরের জগতের কেউ জানতে পারে না কখনো।

মিঃ বাজপেয়ী এক বিচিত্র ধরণের মানুষ।

তিনি তাঁর এই গোপন আস্তানাটি ঘিরে রেখেছেন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। আর সেই কাঁটাতারের ভেতর দিয়ে অবিরত সঞ্চালিত হয় হাই ভোল্টেজের ইলেকট্রিক কারেণ্ট।

কোন বাইরের মানুষকে তিনি এখানে প্রবেশ করতে দেন না কখনো।

শুধু মানুষের কথাই বা বলি কেন, কোন জন্তু-জানোয়ারেরও সাধ্য ছিল না সেই কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে তাঁর আস্তানায় ঢোকে।

মিঃ বাজপেয়ীর সর্বক্ষণের সঙ্গী কেবল তাঁর চাকর মংবা। তা ছাড়া অবশ্য আছে ঐ জন্তুরা—যারা সাধারণ মানুষের চোখে জন্তু বলে পরিগণিত হলেও মিঃ বাজপেয়ীর চোখে ছিল তাঁর নিভৃত জীবনের উৎকৃষ্ট সঙ্গী।

মংবা এক বিচিত্র ধরণের মানুষ।

সে বিশ্বের কোন কিছুকে গ্রাহ্য করে না—ভয় করে না। একমাত্র নিজের মনিব মিঃ বাজপেয়ীকেই যা কিছু শ্রদ্ধা-সম্মান ও সমীহ করে।

মিঃ বাজপেয়ী ছাড়া আর কোন মানুষের কথা সে মানে না—কাউকে মানুষ বলেও গ্রাহ্য করে না।

তার কারণও অবশ্য আছে।

মিঃ বাজপেয়ী তাকে নানান দুর্বিপাক থেকে, নানান গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর তাকে এনে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর এই নিবিড় অরণ্যানি ঘেরা নিভৃত আস্তানায়।

তাই মংবা মিঃ বাজপেয়ীকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাঁকে ভালবাসত।

এর মধ্যেই ঘটল একটা ঘটনা।

সেদিন সন্ধ্যায়—

নিকটবর্তী অর্ধশিক্ষিত পার্বত্য জাতির ক'জন লোকের কি একটা খেয়াল জাগল।

তাদের কয়েকজন লোক মিঃ বাজপেয়ীর উপরে নজর রেখেছিল একটা কুদৃষ্টি ঘিরে।

মিঃ বাজপেয়ীকে তারা মনে করত একটা অপদেবতা—শয়তানের অনুচর।

তাই তারা ক'জন গোপনে মিঃ বাজপেয়ীর আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করল

কিন্তু এদিকে ঘটল এক কাণ্ড।

তাদের সাথে ছিল একটা কুকুর। কুকুরটা তারের বেড়া টপকে ভেতরে প্রবেশ করতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কারেণ্ট খেয়ে সেটা মারা গেল হঠাৎ। একটা আর্ত চীৎকার তুলে ঢলে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

দেখে থমকে গেল পাহাড়ীরা। আর কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে সাহসী হলো না।

মিঃ বাজপেয়ী অবশ্য জানতেন না কিছু।

কুকুরের চীৎকার শুনে ছুটে এল মংবা।

জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে?

তারের ওপার থেকে বুনোরা বলল—তোমার মালিক শয়তান,।

মংবা জানতে চাইল—কেন ?

—তার কারণ আছে।

—কী কারণ ?

—রাতের বেলায় এখানে লাল নীল আলো জ্বলে কেন ?

—তাতে তোমাদের কি ?

—আমরা জানতে চাই।

—কোন অধিকারে ?

—আমাদের মহান নেতা কুং-মিং বলেছেন জেনে আসতে।

—এ নিয়ে তোমাদের কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

—ঘামালে কি হবে ?

—ঐ কুকুরটার মতই একে একে মরবে।

বলে মৃত কুকুরটাকে দেখিয়ে দিল মংবা।

—কেন ?

—কেন না স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরিত দূত আমার মনিব। তাঁকে বিরক্ত করলে, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারেন।

—বাজে কথা।

—বাজে কথা কি কাজের কথা, তা একবার এদিকে এসে পরীক্ষা করেই দেখ না।

একজন নির্বোধ গোঁয়ারতুমি করে সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল। তারপর তারের বেড়া টপকাতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের প্রাণ হারাল সেখানেই—কুকুরটা মরেছিল যেমন তেমনি।

তখন অসভ্যদের ধারণা হলো, মংবার কথাই ঠিক। তার মনিব খুব শক্তিমান।

তারা বলল—তোমরা যেই হও, তোমাদের মনিবকে আমরা নমস্কার জানাই।

এই বলে তারা সেখানেই মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে মংবার অদেখা মনিবকে সভয় অভিবাদন জানাল।

সুযোগ পেয়ে মংবা সঙ্গে সঙ্গে জানাল—আর কখনো এদিকে আসার দুর্মতি তোমাদের যেন না হয়। তাহলেই মরবে।

মংবার কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে তারা সব পালিয়ে গেল সেখান থেকে। আর কখনো মিঃ বাজপেয়ীর আস্তানায় হানা দেবার সাহস দেখাবে না বলে শপথও করল।

তারপর থেকে মিঃ বাজপেয়ী সাফল্যের সঙ্গে নির্বিঘ্নে তাঁর কাজকর্ম করতেন এই নিভৃত বাংলোয় আর তার সংলগ্ন বিরাট ঘেরা জমিতে।

সারা ভারতবর্ষের কেউ তখনো তাঁকে বা তাঁর এই সমস্ত রিসার্চকে সন্দেহ করার অবকাশ পায় নি।

ফলে বিনা বাধায়, অনাবিল শান্তিতে মিঃ বাজপেয়ী তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অবশ্য ভারত সরকার যে মিঃ বাজপেয়ী সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে ছিলেন তা নয়, তবে তাঁরা কখনো ভাবতেই পারেন নি যে, সরকারের সাহায্য ছাড়া কখনো কোন নিঃসঙ্গ সাধারণ বৈজ্ঞানিক তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টায় একক ভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

কিন্তু তা সত্যিই সফল হলো—তার ফলেই বিরাট এক পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগল সারা ভারতের বুকে।

সে সব কথায় পরে আসব।

দুই

সেদিন সকালবেলা।

মংবা অন্যদিনের মত ঘুম থেকে উঠে মনিবের এবং সকলের জন্যে প্রাতঃরাশ এবং খাবার তৈরী করে সকলকে খাওয়াল। তাদের খাওয়া শেষ হলে সে নিজের দৈনন্দিন কাজে মন দিল।

এমন সময় এই বাগানবাড়ির দরজার ধারে এসে দাঁড়াল একজন অচেনা লোক।

—কে তুমি? কি চাও এখানে?

মংবা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

—তুমি নিশ্চয়ই মংবা?

—হ্যাঁ।

—মিঃ বাজপেয়ী আছেন?

—আছেন।

—একটা জরুরী কাজে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।

—কি কাজ?

—তোমার মনিবকেই তা জানাব।

—ঠিক আছে।

মংবা মিঃ বাজপেয়ীকে সংবাদ দিল।

মিঃ বাজপেয়ী খবর পেয়ে এলেন। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই?

—আপনাকেই।

—কেন?

—বিশেষ কথা আছে।

মিঃ বাজপেয়ী একটু চিন্তা করে তাকে আহ্বান জানালেন—ভেতরে আসুন।

মংবাকে ইঙ্গিৎ করতে সে আগন্তুককে ভেতরে এনে বসাল। তার মনে জাগল বিস্ময় কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না। এই সে প্রথম দেখল একটা অচেনা বাইরের লোককে এতদিন পরে ভেতরে ঢুকতে।

মংবা জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করল তার মনিবকে—একে ভেতরে ঢুকতে দিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—দেখাই যাক, কি কথা ও বলতে চায়।

—বেশ।

আর কোন কথা বলল না মংবা

* * *

ভেতরে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে বসবার ঘর।

মিঃ বাজপেয়ী তাকে বললেন—বসুন।

—বসছি।

লোকটি বসল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—আমি বিশেষ একটা কাজে এসেছি।

—বলুন।

—আমার কথা একটু গোপনে বলতে চাই। বলে সে তাকাল মংবার দিকে।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—মংবা আমার একান্ত নিজের লোক। ওর কাছে আমার কোন গোপনীয়তা নেই। আপনার যা কিছু বলার ওর সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

—ঠিক আছে।

—আপনার নাম ?

—বাথিন।

—আপনি ভারতীয় নন ?

—না। বর্মী। তবে ভারতীয় ভাষা বেশ ভাল করে জানি।

—ও। বলুন।

—আমি এসেছি দস্যু বাজপাখির কাছ থেকে।

—এঁ্যা !

—বাজপাখির নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

—শুনব না ! অতবড় দুর্ধর্ষ দস্যু—

—আমি তাঁর অনুচর মন্ত্র।

—আমার কাছে আপনাকে পাঠানোর মানে ?

—তিনি চান আপনার মহাশূন্য নিয়ে বিভিন্ন সব রিসার্চের ফরমূলা কিনতে। আপনি যে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রচুর সুনাম পেয়েছেন তাও তিনি জানেন। বর্তমান যুগে আপনার রিসার্চই যে সবচেয়ে সাফল্যময় এবং সম্ভাবনাপূর্ণ তার খবরও তিনি রাখেন।

—কিন্তু আমি যে ফর্মূলা বিক্রি করব এ কথা তাঁকে কে বলল ?

—কেউ বলে নি।

—তবে ?

—দেখুন, এ জগতে টাকা কে না চায় ?

—তা ঠিক।

—তাই বলছি—

—কত টাকা দিতে চান তিনি ?

—ধরুন, পনের লাখ—

—মাফ করবেন।

—পনের লাখ টাকাও আপনার মনঃপূত হলো না !

—তা নয়

—তবে ?

—তিনি এ টাকা কোত্থেকে পাচ্ছেন ?

—কি করে বুঝলেন এ টাকা তাঁর নয় ?

—উনি যে লাইনের লোক তাতে এ টাকা তাঁর হলেও হতে পারে। কিন্তু যে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই লাভ নেই সেক্ষেত্রে মিছিমিছি তার পেছনে

এতগুলো টাকা ঢেলে তিনি কী প্রতিদান পাবেন ? তাই জিজ্ঞেস করছি এ টাকা কার ? কার ছায়া রয়েছে আপনার মনিবের পেছনে ?

আগন্তুক মনে মনে মিঃ বাজপেয়ীর বুদ্ধির প্রশংসা করে প্রকাশ্যে মৃদু হাসি হেসে বলল—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। এ টাকা তাঁর নয়। কোনও এক বিদেশী রাষ্ট্র, আপাততঃ নামটা গোপনেই রাখতে চাই—এ টাকা দিচ্ছে। আমার মনিব আপনার সঙ্গে রফায় আসতে পারলে মোটা টাকা কমিশন পাবেন।

—বুঝলাম।

—এবার আপনার অফার বলুন।

—আমার কোন অফার নেই।

—তার মানে ?

—আমি টাকার লোভে দেশদ্রোহী সাজতে রাজী নই।

—দেশদ্রোহী ?

—নয় তো কি ?

—তা ঠিক নয়।

—হ্যাঁ, তাই ঠিক।

—আপনি ফর্মুলা বিক্রি না করে কি করবেন ? আপনার নিজের কোনও সঙ্গতি আছে কি ? আপনি পারবেন আপনার ফর্মুলা অনুযায়ী বাস্তবে কাজ করতে ? তা যখন পারবেন না তখন ফর্মুলা রেখে লাভ কি ? ওটা তো এখন কয়েক শিট কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়।

—আমার ফর্মুলা আমি ভারত সরকারকে বিক্রি করব।

—তাতে আপনার লাভ ? ভারত সরকার তার বিনিময়ে আমাদের চেয়েও বেশি টাকা দেবে ?

—সুনাম পাব।

— তাতেই পেট ভরে যাবে তো ? এই নিশ্চয়ই আপনার শেষ রিসার্চ নয় ? আরও রিসার্চ চালাবেন। তার খরচ কে দেবে ? আপনার ভারত সরকার ?

—নাই দিক। সুনাম পাব। স্বীকৃতি পাব। দেশের লোকের শ্রদ্ধা-ভালবাসা সম্মান পাব। তা-ই আমার কাছে অনেক। টাকার অঙ্কের চেয়ে বেশি।

—সম্মান আর খ্যাতি নিয়েই তাহলে থাকতে চান?

—হ্যাঁ।

—বেশ। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মতন আপনি শুধু একটা দিকই দেখছেন। এ ব্যাপারের আরো যে একটা দিক আছে তা কিন্তু দেখছেন না।

—কোন দিকের কথা বলছেন?

—বাজপাখির ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা। জানেন, আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে কেউ বাঁচেনি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—আমি বিরুদ্ধাচরণ করলে আমারও মৃত্যু হতে পারে?

—নিশ্চয়ই।

মিঃ বাজপেয়ী এতক্ষণ শান্ত কণ্ঠে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। এই কথার পর তাঁকে একটু উত্তেজিত দেখা গেল। তিনি বললেন—দেখুন মিঃ বাথিন, আপনি অন্যের হয়ে দৌত্যকার্যে এখানে এসেছেন, তাই কিছু বললাম না। অন্য কেউ হলে তাকে আর ফিরে যেতে হতো না এ বাড়ি থেকে।

বাথিন একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—বলেন কি, আপনার এত ক্ষমতা!

—হ্যাঁ। আমার এই বিরাট কারখানার মধ্যে জোর করে ঢোকার বা এখান থেকে বেরোবার কোন উপায়ই এই পৃথিবীতে কারো নেই।

—তাই বুঝি। বেশ বেশ। তবু আমি বলব আপনাকে মিঃ বাজপেয়ী, মিছিমিছি নিজের ওপর বাজপাখির রোষ টেনে আনবেন না।

—ভয় না দেখিয়ে এবারে যেতে পারেন।

—এই আপনার শেষ কথা?

—আমি আমার রিসার্চ শেষ না করে বিয়ে করব না, সে কথা তো আগেই বলেছি।

শীলা চুপ।

—কি চুপ করে আছ কেন?

মিঃ বাজপেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

—কতদিনে এই রিসার্চ শেষ হবে?

—বড় জোর আর ছ'মাস।

—এখনো ছমাস!

—হ্যাঁ, ঐ রকম সময়ই লাগবে। তা, এতে এত মুষড়ে পড়ার কি আছে? ছ-মাস সময় তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

—তা তো যাবে। তারপর ঘনিয়ে আসবে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত।

আনন্দে শীলার চোখ বুজে আসে।

—তুমি এখন কোত্থেকে আসছ?

—মাদ্রাজ থেকে।

—তোমার বাড়ির খবর কেমন?

—ভাল।

—আর তোমার নিজের?

—যাও দুষ্টু কোথাকার। এই! একটা কথা বলব···

—কি?

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, চল না আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—এই তো মাইল তিনেক দূরেই লেক।

—তা তো জানি।

—চল, সেখানেই যাই। তারপর আমি চলে যাব, তুমি কাজ নিয়ে থাকবে।

—বেশ তো চল, গাড়ি তো আছেই।

—হ্যাঁ, তাই তো গাড়ি নিয়ে এলাম।

দুজনে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চাপল। গাড়িতে ড্রাইভার নেই। শীলা নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে।

গাড়ি ছুটল।

শীলা বলল—জান বাবা কি বলেছেন?

—কি?

—না, বলব না।

—বলবে না তো তিনি কি বলেছেন সে কথা শোনালে কেন? আমি তো নিজে থেকে কিছু জানতে চাইনি।

—বাবা রে বাবা। অমনি রাগ হয়ে গেল? বেশ বলছি। বাবা বলেছেন, রিসার্চ করে যখন তুমি জগৎ-জোড়া নাম কিনে ফেলবে, তখন আর আমাকে চিনতেই পারবে না।

—পাগল। তাই কি হয়? তোমায় চিনতে চাইব না আমি? অসম্ভব!

—অসম্ভব কিসের? এমন কি হয় না?

—না।

কথাটা বলেই মিঃ বাজপেয়ী শীলাকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরেন দু'হাতে। শীলা বুঝতে পারে তার আশঙ্কা অমূলক। বিনয় তাকে গভীর ভাবে ভালবাসে। জগৎ-জোড়া খ্যাতি আর অপরিমিত অর্থ পেলেও বিনয় কোনদিনই তাকে ভুলবে না। সে মুখে কপট বিরক্তি দেখিয়ে বলে—এই কি হচ্ছে? সরে বস।

—কেন?

—লোক দেখবে না।

—এখানে লোক কোথায়? বন-জঙ্গল। দূরে পাহাড়। আর থাকবার মধ্যে রয়েছে শুধু পাহাড়ী অসভ্যরা।

—তারা বুঝি মানুষ নয় ?

—তাই কি বলছি ?

—তবে ?

—মানে, ওরা অসভ্য, বুনো। ওরা কি আর শিক্ষিত সভ্য মানুষের মত শিল্প-সুষমায় ভরা প্রেমের অর্থ বোঝে ?

—কেন বুঝবে না, নিশ্চয়ই বোঝে। ওদেরও কি একটা সবুজ মন নেই দেহে ?

একটু থেমে শীলা ফের বলে—এখন তো এত ভালবাসা দেখাচ্ছ, অথচ এতদিন তো একটা খবর পর্যন্ত নাওনি।

—আমার মনের পাতায় তো তোমার ছবি সাত রঙে আঁকা। চোখ বুজলেই দেখতে পাই। তাই খোঁজ নিইনি।

—থাক্।

শীলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে।

• • • • •

পাহাড়ের সানুদেশে, বনের বুকে লেক—

সুন্দর নীল টলটলে জল। দু'পাশে উঁচু উঁচু গাছের সারি। অনেক গাছেই ফুল ফুটে রয়েছে নানান রঙের। মাথার ওপর সুনীল আকাশ—তাতে সাদা সাদা মেঘের আনাগোনা। অপূর্ব দৃশ্য।

শীলা তার প্রিয়তমের গায়ে হেলান দিয়ে বসে প্রগাঢ় স্বরে ডাকে—বিনয় !

—কি বলছ ?

—কি হয়েছে তোমার ?

—আমার আবার কি হয়েছে ?

—বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মনটা কেন যেন আজ খুব ভাল নেই।

—কি করে বুঝলে আমার মনের অবস্থা ?

—তোমার মনের প্রতিটি ভাব আমার যে অতি চেনা গো।

মিঃ বাজপেয়ী একটুখানি সময় নীরবে থেকে শেষে বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছ শীলা। সত্যিই আমার মন তেমন ভাল নেই আজ। তোমাকে পেয়ে, তোমার সান্নিধ্যে ভোলবার চেষ্টা করছি ব্যাপারটা, কিন্তু কিছুতেই পারছি না।

—কি হয়েছে আমায় বলো লক্ষ্মীটি।

—জান, ভারতবর্ষের একজন অতি কুখ্যাত আর দুর্ধর্ষ দস্যু আমার এই রিসার্চ পনের লাখ টাকায় কিনতে চায় ?

—একজন দস্যু কিনতে চায় তোমার রিসার্চ !

আশ্চর্য হয় শীলা।

—হ্যাঁ। তার নাম কি শুনবে ?

—কি ?

—দস্যু বাজপাখি।

—এ্যাঁ! কিন্তু সে কেন—

—বোধহয় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের চর সে।

—ওহ্, কি সাংঘাতিক কথা গো। তা তুমি কি বলেছ তাদের ?

—আমি বলেছি যে পনের লাখ কেন, পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলেও আমার ফর্মুলা আমি বেচব না একজন বিদেশী রাষ্ট্রকে। আমি দেশদ্রোহীতা করতে পারব না। কি, আমি অন্যায় কথা বলেছি শীলা ?

—না, তুমি তোমার উপযুক্ত জবাবই দিয়েছ। তবে এ সংবাদ পুলিশকে জানিয়ে রাখলে ভাল করতে।

—তার আর প্রয়োজন মনে করিনি তাই। ওদের জানাব শুধু আমার নিরাপত্তার জন্যেই তো ? কিন্তু আমার আস্তানায় কারো প্রবেশ করা খুব সহজ সাধ্য নয় বলেই আর পুলিশে খবর দেবার কথা চিন্তা করিনি।

—সব জানি। তবু সাবধানের বিনাশ নেই।

—আমার সারা কারখানা সচল ইলেকট্রিক তার দিয়ে ঘেরা। তাছাড়া

পাঁচিলের ভেতর দিকেও দু'গজ চওড়া তারের জাল। সব সময় হাই ভোল্টেজে কারেন্ট বইছে। ছুঁলেই মৃত্যু। তা তো জান।

—সব জানি, তবু মনটা আমার খুঁত খুঁত করছে। অন্য কোন দস্যুদল তো নয়—স্বয়ং বাজপাখি। তার তুলনা সে নিজে। তুমি এক কাজ কর। ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চাও।

—আমিও তাই ভাবছি।

—ভাববার কিছু নেই। এ কাজ তোমায় করতেই হবে বিনয়। আমার অনুরোধ।

—বেশ।

—আর তাড়াতাড়ি তোমার কাজ শেষ কর।

—অবশ্যই চেষ্টা করব।

—তারপর নানা কথায় দুজনে মেতে উঠল দুই কপোত-কপোতির মত।

চার

পরদিন সকাল।

সেদিনের ডাকে আগত চিঠিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছিলেন মিঃ বাজপেয়ী।

হঠাৎ একটা চিঠি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল।

ছোট্ট চিঠি। তাতে লেখা—

প্রিয় মিঃ বাজপেয়ী,

আমার ক্ষমতাকে হয়ত আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই না পারাটাই আপনার পক্ষে মস্ত ভুল হয়েছে।

যদি আগামী সাত দিনের মধ্যে আপনার ফর্মুলা বিক্রি করতে রাজী না হন তবে আপনার গুরুতর ক্ষতি হবে।

বাজপাখির নখের ধার আর কর্মক্ষমতা যে কত বেশী সে ধারণা আপনার নেই বলেই এত দুঃসাহস আপনার।

রাজী হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন : 'রাজী—বাজপেয়ী'। সময়মত টাকা নিয়ে আমার লোক হাজির হয়ে যাবে।

আর না হলে?

অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্যে অপেক্ষায় থাকবেন।

আশা করি শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে আপনার।

ইতি—

বাজপাখি

চিঠিটা ভাল করে পড়লেন মিঃ বাজপেয়ী।

তারপর উচ্চকণ্ঠে হাঁক পাড়লেন—মংবা!

মংবা এসে দাঁড়াল।

—কর্তা?

—এই দেখ।

—কি ?

—একটা চিঠি।

—কার ? শীলা দিদিমণির ?

—না রে, দস্যুর ?

—ঐ পাখির দলের ?

—হ্যাঁ।

—দূর ! ওসব পাখি-টাখিকে জীবনে আমি গ্রাহ্য করি না।

—সত্যি বলছিস ?

—সত্যি নয় তো কি ? ব্যাটাকে হাতের কাছে একবার পেলে হয়।

—কি করবি ?

—লাঠির বাড়িতে মাথা ছাতু করে ফেলব।

মিঃ বাজপেয়ী হেসে ফেললেন। বললেন—তা না হয় হলো। কিন্তু—

—কিছু ভাবছেন কর্তা ?

—হ্যাঁ।

—কি ?

—ভাবছি পুলিশকে খবর দেব কিনা।

—পুলিশ ?

—হ্যাঁ।

—দূর ! পুলিশ কি করবে ? তাদের তো চোর পালালে তারপর বুদ্ধি খোলে। কাজ দেখায়। ওদের কথায় কেউ কান দেয়।

—তা ঠিক।

—এ সব বাদ দিন তো।

—তুই ভরসা দিচ্ছিস ?

—দিচ্ছি কর্তা।

মিঃ বাজপেয়ী চুপ করে গেলেন। কিন্তু ঠিক স্থির হতে পারলেন না।

বাজপাখির চিঠিটায় যেন একটা চুম্বকশক্তি মিশে ছিল। বার বার অমঙ্গলের আশংকায় তিনি মনে মনে শিউরে উঠতে লাগলেন।

* * * *

দিন তিনেক কাটে।

মিঃ বাজপেয়ী স্থির থাকতে পারেন না। একটা অলক্ষিত ভয় তাঁকে কুরে কুরে খেতে থাকে। তিনি শেষে সব কথা জানিয়ে মাদ্রাজ পুলিশকে একটা চিঠি দেন।

চিঠি পেয়ে মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার নিজে এসে মিঃ বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করেন।

পুলিশ কমিশনার একজন মাদ্রাজী ক্রিশ্চান। নাম মিঃ জন। খুব সাহসী এবং কর্মদক্ষ। বুদ্ধিও ধরেন প্রচুর। পুলিশ বিভাগে তাঁর খুব সুনাম।

পুরো ঘটনা মিঃ জন খুব মন দিয়ে শোনেন মিঃ বাজপেয়ীর কাছে। তারপর জিজ্ঞাসা করেন—আমাকে কি করতে বলেন আপনি ?

—দেখুন। আমি আমার কারখানা বৈজ্ঞানিক কৌশলে দুর্ভেদ্য করে রেখেছি।

—বেশ।

—তাই সেখানে আর পুলিশ গার্ড দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

—বেশ।

—তবে বাজপাখি যে ভয় দেখিয়েছে, সেও তো নিশ্চয়ই কোন একটা মতলব এঁটেই করেছে। নইলে শুধু শুধু ভয় দেখিয়ে লাভ কি ? আমি ছেলেমানুষ নই যে তার চোখ রাঙানিতে ভয় খাব। সুতরাং অবশ্যই সে একটা প্ল্যান করেছে মনে মনে।

—রাইট।

—আমি তাই চিন্তিত।

—কিন্তু শুধু তার চিঠি পড়ে কোন পথে সে অগ্রসর হবে, তা আমরা বুঝব কি করে ?

—তাও ঠিক ।

—সুতরাং এ বিষয়ে তার মর্জির ওপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই । সে যে পথে এগোবে তার প্রতিবিধান কিছু একটা আমাদের করতে হবে । কিন্তু কেমন করে ?

—আচ্ছা, একটা কথা ।

—কি ?

—শুনেছি বাংলার রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী বাজপাখির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ?

—ঠিক বলেছেন ।

—তাঁকে এ ব্যাপারে জানালে কেমন হয় ?

—বেশ তো জানান । বাজপাখির খবর শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন ।

—তাই তো মনে হয় ।

অতঃপর মিঃ জনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর আপত্তি নেই জেনে, মিঃ বাজপেয়ী সেই রাতেই একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দীপক চ্যাটার্জীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন ।

কিন্তু ইতিমধ্যে যে ঘটনাচক্র নতুন পথে মোড় ফিরতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারলেন না ।

পাঁচ

মাদ্রাজ শহরের প্রান্তে।

সমুদ্রতীর থেকে সামান্য দূরে একটা বাড়ি। বিরাট এক ধনশালী ব্যক্তির বাড়ি সেটা। তবে বংশে বাতি দিতে শুধু বেঁচে আছেন মাত্র একজন। তিনি থাকেন দিল্লীতে।

বাড়িটা তাই পড়ে আছে এমনিই জনশূন্য হয়ে। কেউ থাকে না। কেয়ার-টেকারও নেই। ফলে সেটা একটা পোড়া বাড়ির রূপ নিতে শুরু করেছে।

বর্তমানে এই অঞ্চলে যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ ভয়ে ঐ বাড়ির আশেপাশে যান না—দিনেও নয়, রাতেও নয়। নানান বদনাম রটে গেছিল বাড়িটার।

কেউ বলে—এখানে ভূত-পেত্নী বাসা করে আছে।

কেউ বলে—এখানে রাতের বেলার নানান অশরীরী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কখনো কখনো দেখাও যায় নানা রকম ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটায়।

কেউ বলে—রাতের বেলায় বাড়িটায় নাকি নানা রঙের আলোও জ্বলতে দেখা যায় মাঝে মাঝে।

সব মিলিয়ে ঐ পোড়ো বাড়িটা সে অঞ্চলে রীতিমত রহস্য ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল স্থানীয় অধিবাসীদের মনে।

কিন্তু সত্যি সত্যি ঐ বাড়িতে যারা আনাগোনা করে, তারা এ জগতের জীব কি না, তা জানতে গেলে নিশুতি রাতে চুপিচুপি আপনাকে সাহসে ভর করে যেতে হবে সেখানে।

—আসুন আমার সঙ্গে।

রাত বারোটা বেজে গেছে।

চারিদিক নিশুতি। পোড়াবাড়িটার ভেতরের দিকে একটা ঘরে হঠাৎ মৃদু আলো জ্বলে উঠল।

বাড়িটার বেশির ভাগ ঘরই অব্যবহার্য হয়ে পড়লেও এই ঘরটা অনেকটা

ভদ্রস্থ ছিল। না ভুল হলো। বলা উচিত কেউ বা কারা খুব সম্প্রতি এটা মেরামত করে ভদ্রস্থ করে তুলেছে।

৭।৮ জন লোককে সেই ঘরে বসে কথা বলতে দেখা গেল। প্রত্যেকেই কথা বলছিল অনুচ্চ কণ্ঠে। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে।

একজন আরেক জনকে জিজ্ঞাসা করল—কটা বাজে?

উত্তর এল—বারোটা বেজে দশ।

—এখনো কর্তা এলেন না?

—এসে পড়বেন। কর্তার কথার কখনো খেলাপ হয় না।

—কথার খেলাপ করলে কি আর এত বড় দল চালনা করা যায়? বলল আর একজন।

—তা বটে। আচ্ছা, এই ফাঁকে এ চট্ ঘুরে এলে হয় না? এক পাত্তর টেনে আসা যেত।

—অসম্ভব!

—কেন?

—কর্তা জানতে পারলে ধড়ে আর মাথা থাকবে না।

এমন সময় পাশ থেকে একজন বুড়োমত লোক বলল—তার চেয়ে এস এক কাজ করা যাক।

—কি কাজ?

—দু'হাত তাস খেলা যাক।

—মন্দ বলোনি। কিন্তু খেলা হবে কোথায়?

—কেন পাশের ঘরে। ও ঘরটাও বেশ ভাল আছে।

—বেশ, চল তবে।

কিন্তু যাওয়া হলো না ওদের।

তার আগেই ঘরের কোণে হঠাৎ দপ্ দপ্ করে দু'বার একটা লাল আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

তার মানে কর্তা এসে গেছেন।

সবাই প্রস্তুত হয়ে বসল।

ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল দোহারা চেহারার দীর্ঘাকৃতি একজন লোক। পরণে কালো স্যুট, মুখে মুখোস।

তাকে দেখে সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

—বসো তোমরা।

আদেশ দিল সে।

সকলে বসল।

মুখোসধারী বলল—তোমাদের উপর কয়েকটা জরুরী কাজের ভার দেব বলেই আজ ডেকে পাঠিয়েছি। শোন আমীর খাঁ, তুমি আমার লোকের সঙ্গে দেখা করবে কাল হাইড পার্কে। সেখানে নীল কোট পরা লোকটিকে তোমার কোড নম্বর বলে তার কাছ থেকে কাজ জেনে নেবে।

—জী হুজুর।

—রহমৎ খাঁ! তোমার উপর একটা কাজের ভার দিতে চাই।

—বলুন হুজুর।

—তুমি বৈজ্ঞানিক মিঃ বাজপেয়ীর বান্ধবী মিস শীলাকে কি চেন?

—না হুজুর।

—চিনিয়ে দেব। কাল বিকেলে সমুদ্রের ধারে যাবে চারটে নাগাদ। সেখানে পাজামা পাঞ্জাবী পরা একজন লোক তোমার কাছে দেশলাই চাইবে। তুমি তাকে দেশলাই দিলে সে তোমার দিকে তার সিগারেটের প্যাকেটা বাড়িয়ে ধরবে। তুমি তখন তাকে নিজের কোড নম্বর বলবে। সে তোমাকে নিয়ে যাবে কাছের মার্কেটে। শীলা ঐ মার্কেটে প্রতিদিন ঠিক বিকেল পাঁচটা নাগাদ শপিং করতে আসে, তোমায় চিনিয়ে দেবে আমার লোক।

—বুঝেছি হুজুর।

—বেশ। তারপর কি কাজ করতে হবে ঐ লোকটির কাছেই তা জানতে পারবে।

—ঠিক আছে হুজুর।

—ইব্রাহিম! তুমি পরবর্তী কাজে রহমৎকে দরকার মত সাহায্য করবে। বুঝেছ?

—জী হুজুর।

এরপর আরো কয়েকজনকে কয়েকটি কাজের ভার দিল সেই মুখোসধারী। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। তার পর যেমন এসেছিল নিঃশব্দে তেমনি চলেও গেল সাড়াশব্দ না জাগিয়ে।

সে চলে যাবার একটু পরে দলের লোকেরাও এক এক করে বেরিয়ে গেল সেই পোড়োবাড়ি থেকে রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে।

রাত তখন দুটো।

ছয়

সেদিন বিকেলে।

যথারীতি দেখা গেল জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় একটি মাদ্রাজী এসে ইংরাজীতে বলল—মশাই, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

বাঙালী ভদ্রলোক জবাব দিলে—আছে। এই নিন।

দেশলাইয়ের বাক্স মাদ্রাজীটিকে বাড়িয়ে ধরতে সে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বাঙালীর দিকে এগিয়ে দিল।

বাঙালী ভদ্রলোক তখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার ছলে নিজের কোড নম্বর জানিয়ে দিল তাকে।

মাদ্রাজী বলল—আমার সঙ্গে এস।

—চল।

তারা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কাছেই সী-সাইড মার্কেটে এল। মার্কেটে আসবার আগে একটা পানীয়ের দোকান দেখে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল রহমৎ। ভদ্রবেশী সেই বাঙালী বাবু।

—কি হলো?

জিজ্ঞাসা করল তার সঙ্গী।

ইঙ্গিতে দোকানটাকে দেখিয়ে রহমৎ বলল—একটু গলা ভিজিয়ে গেলে হত না? সময় তো যথেষ্টই আছে।

—না, তা হয় না।

—কেন?

—কর্তা রাগ করবেন। আগে কাজ—

—বেশ বাবা, তাই চল।

আর কোন কথা না বলে সঙ্গীকে অনুসরণ করে মার্কেটের দিকে এগিয়ে চলল রহমৎ।

তখনও শীলার আসার সময় হয়নি।

তাই মার্কেটের স্টলগুলির সাজসজ্জা আর শোভা দেখে দেখে সময় কাটাতে লাগল তারা।

এই ভাবে মিনিট কুড়ি কেটে গেল।

উসখুস করছে রহমৎ।

এমন সময় একটি সুদৃশ্য মোটর এসে থামল ঠিক মার্কেটের সামনে। বাদামী রঙের হিন্দুস্থান।

গাড়ি থেকে নামল এক সুন্দরী যুবতী। দামী পোষাক পরণে। গাড়ি থেকে নেমে হাতের ব্যাগ দোলাতে দোলাতে সে গিয়ে প্রবেশ করল মার্কেটে।

একটু তফাতেই দাঁড়িয়েছিল রহমৎ আর তার সঙ্গী সেই মাদ্রাজী। সে ইশারায় দেখিয়ে দিলে শীলাকে।

রহমৎ তাজ্জব বনে গেল। মেয়েছেলে যে কত সুন্দরী হতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। যেন স্বর্গের পরী। যেমন গড়ন তেমনই রূপ।

সঙ্গী বলল—এই মেয়েটির নাম মিস শীলা। একে অনুসরণ করে তুমি এর বাড়ির ঠিকানা জেনে নেবে। তারপর সুযোগ মত অপহরণ করে তিন নম্বর আড্ডায় নিয়ে গিয়ে তুলবে। বুঝতে পেরেছ তোমার কাজ কি?

—বুঝেছি।

—আশা করি কাজটা নির্বিঘ্নেই শেষ করতে পারবে?

— মনে তো হয়।

—বেশ, আমি তবে চলি।

চলে গেল লোকটি।

রহমৎ দাঁড়িয়ে রইল একা।

সে তখন ভাবছিল তার কাজ নিয়ে। ভাবছিল শীলার কথা। যেন এক সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল শীলাকে নিয়ে।

কতক্ষণ ঐ ভাবে কেটে গেছে তার খেয়াল নেই রহমতের। হঠাৎ স্বপ্নের রেশ ছিঁড়ে গেল শীল শপিং শেষ করে ফিরে আসায়।

এসে গাড়িতে চেপে বসল।

রহমৎ তাড়াতাড়ি খোঁজ করতে লাগল একটা খালি ট্যাক্সির। পেয়েও গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার মিটার ডাউন করে জানতে চাইল—কোন দিকে যাব বাবু?

—ঐ বাদামী হিন্দুস্থান গাড়িটা যেদিকে যাবে, তুমিও সেদিকে ট্যাক্সি চালাবে।

—কিন্তু—

ট্যাক্সি ড্রাইভারের সন্দেহযুক্ত দৃষ্টির মানে বুঝে সে চট করে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে সহৃদয় কণ্ঠে বলল—এই নাও। বাড়তি পরিশ্রমের জন্য। একটু মজা করতে চাই। বুঝেছ।

ট্যাক্সি ড্রাইভার কি বুঝল কে জানে, তবে আর আপত্তি না করে বাদামী গাড়িটাকে ফলো করতে শুরু করে দিল।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দু'টি গাড়ি আগু-পেছু ছুটে চলল মাদ্রাজের সী সাইড রোড ধরে।

তারপর মিনিট দশেক বাদে মোড় নিয়ে শীলার গাড়িটা একটা অপেক্ষাকৃত কম চওড়া রাস্তায় একটা বড় দোতলা বাড়ির সামনে থেমে পড়ল।

শীলার গাড়িটাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে যাবার আগে বাড়ি আর রাস্তাটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে রাখল রহমৎ। ড্রাইভারকে আদেশ করল তাকে আবার সেই মার্কেটের সামনে রেখে আসতে।

পথে আসতে আসতে পরবর্তী প্ল্যান ভাঁজতে লাগল রহমৎ। এই বাড়ি থেকে চুরি করতে হবে শীলাকে নিয়ে যেতে হবে তিন নম্বর আড্ডায়। তারপর—

সাত

পরদিন বিকেল।

আজও শীলা গেছিল অন্যদিনের মতই শপিং-এ

কিন্তু সে খেয়াল করেনি যে, মার্কেটের মুখেই একটা মোটরে বসে দুজন লোক তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল বিশেষভাবে।

দু'জনেই আমাদের সুপরিচিত।

একজন রহমৎ অপরজন ইব্রাহিম।

কর্তার হুকুমে রহমৎকে তার কাজে সাহায্য করতে এসেছে।

শীলা গাড়ি থেকে নেমে মার্কেটের দিকে এগিয়ে গেল।

রমহৎ বলল ইব্রাহিমকে—দেখেছিস।

—হাঁ।

—জিনিস কেমন ?

—বহুৎ বড়িয়া।

—একেই হুজুর চুরি করতে বলেছেন।

—কর্তার পছন্দের তারিফ করতে হয়।

—বাঃ! এমন খুবসুরৎ মাল না হলে দাম উঠবে কেন ?

—তার মানে ? ইব্রাহিম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর একে নিজের জন্যে চুরি করাচ্ছেন না ?

—না। শুনেছি, ভাল খদ্দের দেখে বিক্রি করে দেবেন চড়া দামে।

—তা হতে পারে।

—আমি একটা কথা ভাবছি দোস্ত। রহমৎ বলল।

—কি কথা ?

—বিক্রিই যখন হবে তখন হুজুরের হাতে তুলে দেবার আগে নিজেরা ২১ দিন ফুর্তি-ফার্তা করে নিতে দোষ কি ? এমন বড়িয়া জিনিস তো আর বারবার জুটবে না নসীবে।

—তা সত্যি। কিন্তু কোথায় তোলা হবে ওকে ?

—কেন, তিন নম্বর আড্ডাতেই।

—না দোস্ত, ও খেয়াল বাদ দাও।

—কেন ?

—হুজুর জানতে পারলে আমরা বিপদে পড়ব।

—দূর!

ইব্রাহিম খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে।

—এইবার তোর কাজ কর। বলল রহমৎ।

—ঠিক আছে।

ইব্রাহিমের পরণে ছিল দামী পোষাক। দেখতেও ছিল সুন্দর। সে গাড়ি থেকে নেমে শীলার ঠিক সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনিই তো শীলা দেবী ?

থমকে গেল শীলা। আগন্তুককে এক পলক নিরীক্ষণ করে নিয়ে সবিস্ময়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ আমি শীলা। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না।

—আমি দিল্লীর একজন বিজনেস ম্যানের সেক্রেটারী।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি আপনার বাবার বন্ধু। সম্প্রতি এসেছেন মাদ্রাজে। কিন্তু আপনাদের বাড়ি চেনেন না। তাই যদি তাঁকে দয়া করে আপনাদের বাড়িটা চিনিয়ে দেন—

—কোথায় তিনি ?

—গাড়িতে বসে।

—তাই নাকি।

শীলা এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে। নমস্কার জানিয়ে বলে—শুনলুম আপনি নাকি আমার বাবার বন্ধু ?

—হ্যাঁ।

—আমরা থাকি সাউথ সেকশানে।

—যদি আপত্তি না থাকে আসুন না আমার গাড়িতে। আমাকে পৌছে দিয়েই চলে আসবেন।

—না, না, আপত্তি কিসের? চলুন—

শীলা গাড়িতে চাপল।

গাড়ি স্টার্ট নিল তৎক্ষণাৎ।

ইতিমধ্যে ইব্রাহিম অটোমেটিক সিস্টেমে গাড়ির দরজার কাঁচ তুলে দিয়েছে। শীলা প্রতিবাদের স্বরে কী যেন বলতে গেল, তার আগেই রহমতের বলিষ্ঠ হাতের ক্লোরোফর্মে ভেজানো রুমাল তার নাকে মুখে চেপে বসেছে।

ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল শীলা।

সে জ্ঞান হারাল।

গাড়ি ছুটে চলল তিন নম্বর আড্ডার দিকে।

* * *

মাদ্রাজ শহরের আর এক প্রান্তে যখন এসে গাড়িটা দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

একটা ঘরের মধ্যে শীলাকে শুইয়ে দিল রহমৎ। এটা তিন নম্বর আড্ডার একটা ঘর।

রহমৎ ডাক দিল—রাজাম্মা!

একটি বিধবা বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এলো সেই বাড়ির অন্য একটা অংশ থেকে।

বলল—কি সাহেব?

—মাল এনেছি। ওই কোণের ঘরে আছে।

—ঠিক আছে।

—এখনও অজ্ঞান। আমি চলে যাবার পর তুমি ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো।

—ঠিক আছে।

—হ্যাঁ, আর এক কথা।

—কি সাহেব ?

—ওর বোধহয় কিছু খাওয়া হয় নি। ওকে খাবার খেতে দেবে। মনে হয় খাবে না, ফেলে দেবে, তবু দেবে।

—দেব। কিন্তু কি খাবার ?

—রাতের খাবারই দেবে। চাপাটি, তরকারি, মাংস, ডাল, হালুয়া এইসব। হুজুর একে খুব যত্নে রাখতে বলেছেন।

—বেশ।

—আমি এখন যাচ্ছি। আবার রাত বারোটায় ফিরে আসব খবর নিতে।
এই বলে রহমৎ চলে গেল।

* * *

রাজাম্মার চেষ্টায় ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে শীলার। মাথাটা খুব ভারী ভারী ঠেকে। উঠে বসতে ইচ্ছে হয় না তবু উঠে বসল সে।

নিজের হাত ঘড়িতে দেখে রাত দশটা।

তারপর চোখ পড়ে একটি বিধবা স্ত্রীলোকের দিকে। তারই দিকে চেয়ে বসে আছে হাসিমুখে।

কে এ ? সে কোথায় ? এখানে কি করে এল ? জানতে চেষ্টা করে শীলা।

—আমি কোথায় ?

—কর্তার আড্ডায়।

—কে কর্তা ?

—দস্যু বাজপাখি।

শীলা আতকে উঠল। তারপর বলল—কেন তারা আমায় ধরে এনেছে ? কি করেছি আমি ?

—নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে কর্তার।

—কি মতলব ?

—তা জানি না। এই খাবার ঢাকা রয়েছে। রাত অনেক হয়েছে, তুমি খেয়ে নাও।

—না আমি খাব না। আমার খিদে নেই।

—না খেলে তোমারই কষ্ট হবে।

—হয় হোক, আমায় ছেড়ে দাও।

—আমি ওদের ঝি। তোমায় ছেড়ে দেবার মালিক নই। নাও, খেয়ে নাও।

—তবে আর কেন বিরক্ত করছ আমায় ? তুমি যেতে পার।

—তোমায় আবার বিরক্ত করলাম কখন ?

—এই তো খাবার জন্য সাধাসাধি করছ।

—সেটা আমার কর্তব্য। তুমি খেয়ে নাও। আজ রাতে হোক, কাল সকালে হোক, কর্তা তোমাকে অবশ্যই দেখতে আসবেন। তখন তোমার সঙ্গে কথা হবে। কেন ধরে আনা হলো—কি পেলে তিনি ছেড়ে দিতে পারেন তোমায়—জিজ্ঞেস করে নিও। এখন খেয়ে নাও। আরে মেয়ে, যদি পালাবার মতলবই করে থাক এখান থেকে, তবে শরীরে শক্তি থাকা চাই তো। শরীর দুর্বল থাকলে পালাবে কি করে ? তাই বলছি যা পার খেয়ে নাও।

কি চিন্তা করল শীলা সে-ই জানে। তবে ঝিয়ের কথায় কিছু মুখে দিল।

এঁটো থালা-বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝি।

দরজাটা বাইরে থেকে খিল দিয়ে গেল।

আট

রাত বারোটা বাজল ঢং ঢং করে দূরের কোন পেটা ঘড়িতে।

শীলা ঘুমোয় নি। চুপ করে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। কেন তাকে ধরে নিয়ে এল দস্যু বাজপাখি? কি তার উদ্দেশ্য? সে সময় মত বাড়ি না ফেরায় বাবা নিশ্চয়ই ছটফট করছেন। খোঁজ খবর করছেন তার চেনা-জানাদের বাড়িতে। হয়তো পুলিশেও খবর দেবেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু পুলিশ জানবে কি করে সে কোথায় আছে?

হঠাৎই শীলার ভাবনার খেই হারিয়ে গেল এক ভারী পদশব্দে। সে নড়ে চড়ে উঠল। কে আসছে? দস্যু বাজপাখি?

ঘরের দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে মার্কেটের দেখা সেই লোক। যে গাড়িতে তার সঙ্গে আলাপ করেছিল তার বাবার বন্ধু হিসেবে।

—আপনি!

—হ্যাঁ আমি। চিনতে পেরেছ তাহলে?

—আপনিই কি দস্যু বাজপাখি?

—না, আমি তাঁর আজ্ঞাবাহী অনুচর।

—কেন আমাকে ধরে এনেছেন?

—হুজুরের হুকুমে।

—কেন এই হুকুম?

—বোধহয় তোমায় কোন ধনী লোকের কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করে দিতে চান।

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ। শোন শীলা, কোথায় কতদূরে কার হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে। তার চেয়ে যদি রাজী থাক তবে আমিই তোমাকে শাদী করে আমার বিবি বানাতে পারি হুজুরকে বলে।

—আপনার স্পর্ধা তো কম নয়।

—কি হলো, চটে উঠলে যে? আমার কথাগুলো বুঝি মনে ধরল না?

—বাজে বিরক্ত করবেন না।

—বাঃ বেশ তেজ তো। এমনি তেজী মেয়েকেই আমার ভাল লাগে সব সময়। কাছে এস পেয়ারী।

বলতে বলতে রহমৎ এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে শীলাকে। সঙ্গে সঙ্গে শীলা প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা মারে রহমৎকে।

ছিটকে পড়ে রহমৎ।

আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।

প্রচুর মদ খেয়েছিল সে, পা ঠিক করতে পারছিল না।

আবার শীলাকে বাহুর পাশে বন্দিনী করতে এগিয়ে যায় রহমৎ। তার দৃষ্টিতে কামনার পোকা থিকথিক করছিল।

হঠাৎ খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এক মূর্তি।

পরণে কালো স্যুট, মুখে কালো মুখোস।

—রহমৎ!

গলায় যেন বাঘ ডেকে উঠল কালো পোষাকীর।

—কে!

চমকে উঠল রহমৎ।

—একি! হুজুর আপনি।

—তুমি আমার সঙ্গে বেইমানী করেছ রহমৎ।

—না হুজুর! আমি তো—

—স্তব্ধ হও বেইমান! তোমাকে যা করতে বলেছিলাম তুমি তার বেশি এগিয়েছ। কেন এত রাতে আমার বিনা অনুমতিতে এই মেয়েটির ঘরে ঢুকে তুমি তার ওপরে অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিলে?

রহমৎ নীরব।

—যাও, বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে।

কোন কথা না বলে রহমৎ পোষা কুকুরের মত সুড় সুড় করে' বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কালো পোষাকী এবার শীলাকে সম্বোধন করে বলল,—শীলাদেবী, ভয় পাবেন না। এবার থেকে উপযুক্ত যত্ন সহকারেই এখানে আপনাকে রাখা হবে। আর কেউ কখনো অত্যাচারী হতে সাহসী হবে না।

শীলা চুপ।

—আপনার প্রণয়ী, বৈজ্ঞানিক মিঃ বাজপেয়ীর ওপর একটু চাপের সৃষ্টি করতে চাই। তাই আপনাকে ধরে আনা। আমার কোন প্রস্তাবে মিঃ বাজপেয়ী রাজী হলেই আপনার মুক্তি। মনে করবেন না যে আপনি বন্দিনী, আপনি আমার মাননীয়া অতিথি। কয়েকটা দিন একটু মানসিক অসুবিধা ভোগ করুন, তারপর আমার কাজ মিটে গেলেই আপনি আবার সসম্মানে বাড়ি ফিরে যাবেন।

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

—ব্যঙ্গ আপনি করতে পারেন—করুন। তবে তার আগে আপনার করণীয় কি তা শুনে রাখুন।

—কি ?

—কাল আবার আমি আসব। আপনি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দেবেন।

—চিঠি লিখে দেব! কাকে ?

—মিঃ বাজপেয়ীকে। পুরো বয়ান কালই বলব। এখন শুধু তার সারমর্ম শুনুন : আপনি তাঁকে চিঠি লিখে জানাবেন যে, আমার তত্ত্বাবধানে আপনি কোন অসুবিধার মধ্যে নেই। আর তাঁকে তাঁর রিসার্চের ফর্মুলাটা বিক্রি করে দেবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবেন। ব্যস।

—ও, আপনিই তবে সেই দস্যু বাজপাখি ?

—ঠিক ধরেছেন।

—আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই। প্রথমতঃ এমন অন্যায় অনুরোধ আমি তাকে করতে পারব না ; দ্বিতীয়তঃ আমার বরাতে যা ঘটে ঘটুক, বিনয়কে আমি দেশদ্রোহী হওয়ার পরামর্শ দিতে চাই না। সে চিরদিনই লোকের চোখে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাক। আমি আমার ক্ষুদ্র স্বার্থে তাকে সকলের সামনে হেয় করতে পারব না।

—যা বলছেন তা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখুন ম্যাডাম।

—ভেবে দেখেছি।

—তবু আজকের রাত আর কালকের দিনটা সময় দিচ্ছি আপনাকে। এতে শুধু আপনি নন, মিঃ বাজপেয়ী তো বটেই এমন কি আপনার বাবা পর্যন্ত জড়িয়ে যাবেন এক সাংঘাতিক জীবন-মরণ সমস্যায়।

বাজপাখি চলে যায় সেখান থেকে।

নয়

সেদিন সকালে।

দীপককে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন মিঃ বাজপেয়ী। তাঁর ওপর বা তাঁর কারখানার ওপর কোন রকম হামলা চালায়নি শত্রুপক্ষ। যা তিনি আশংকা করেছিলেন।

কেমন যেন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে বাজপাখি।

মিঃ বাজপেয়ী ভাবলেন। তিনি পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছেন দেখে বাজপাখি হয় তো আর বেশি অগ্রসর হতে সাহস পায় নি।

কিন্তু আজকের ডাকে একটা চিঠি পেয়েই সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল তাঁর :

চিঠি বাজপাখির। তাতে লেখা—

প্রিয় মিঃ বাজপেয়ী,

আপনার অনমনীয় জেদের জন্য আমরা বাধ্য হয়ে শীলা দেবীকে আমাদের কাছে বন্দিনী করে রেখেছি। অবশ্য একমাত্র স্বাধীনভাবে যত্র-তত্র ঘোরাফেরা করা ছাড়া আর সব সুখ-সুবিধাই তাঁকে আমরা দিয়েছি।

যদি পত্রপাঠ আপনি আমাদের প্রস্তাব মত কাজ করতে রাজী থাকেন তবে পূর্ব-নির্দেশ মত খবরের কাগজে রাজী বলে একটা বিজ্ঞাপন দেবেন।

নচেৎ সাতদিন পরে আমরা একান্ত নিরুপায় হয়েই শীলা দেবীকে কোন বিদেশীর কাছে বিক্রি করে দেব।

আশা করি এই চিঠির গুরুত্বকে আপনি খাটো করে দেখবেন না। আমার কথামত কাজ না করলে কি ভয়াবহ বিপদে তিনি পড়বেন তা নিশ্চয়ই আপনি অনুমান করতে পারছেন। সাবধান! ইতি—বাজপাখি।

চিঠি পড়ে মিঃ বাজপেয়ীর মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। এত নীচ আর এত শঠ সেই শয়তান। তাঁকে সরাসরি কাবু করতে না পেরে এবার তাই বাঁকাপথ ধরেছে!

মিঃ বাজপেয়ী তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন থানার উদ্দেশ্যে। সব ঘটনা জানালেন। চিঠিখানাও দেখালেন, তারপর ফোন করলেন শীলার

বাবাকে। শীলার বাবাও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মেয়ের খবর পেয়ে তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন ফোনেই।

তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মিঃ বাজপেয়ী তক্ষুণি দীপককে আর একটা টেলিগ্রাম করলেন।

দস্যু বাজপাখির নবতম কীর্তির সন্ধান পেয়ে দীপক সেদিনের প্লেনেই মাদ্রাজে এসে নামল।

সন্ধ্যে তখন ছটা।

প্লেন থেকে নেমে প্রথমে দীপক গেল স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে।

সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে নানান খবর নিয়ে সে মোটরে করে রওনা হলো মিঃ বাজপেয়ীর উদ্দেশে।

যখন মিঃ বাজপেয়ীর আস্তানায় এসে পৌঁছল তখন রীতিমত অন্ধকার নেমে এসেছে সেখানে।

মিঃ বাজপেয়ীর কারখানার সতর্ক-ব্যবস্থার নমুনা পেয়ে দীপক মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না।

মিঃ বাজপেয়ী দীপককে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

—আসুন আমার অফিস ঘরে বসে আলাপ করা যাক।

—ঠিক আছে চলুন।

অফিস ঘরে প্রবেশ করে দু'জনে দু'টি চেয়ার দখল করে বসার পর মিঃ বাজপেয়ী বললেন—বলুন, আপনি কি জানতে চান ?

—আমার প্রথম প্রশ্ন : আপনি কি আপনার রিসার্চে সফলতা অর্জন করেছেন ?

—মোটামুটি।

—একটু খুলে বলবেন ?

—বলছি। আমি কয়েকটি নতুন রকেট তৈরী করেছি, যাতে চেপে মানুষ অনায়াসে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পারে।

—এতে বিপদের আশংকা নেই বলছেন ?

—একেবারে নেই বললে ভুল বলা হবে। প্রথম কাজ তো, তবে সব বিপদই নির্ভর করে মানুষের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার ওপর। তবু এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি রাশিয়া আর আমেরিকা যে রকেট আবিষ্কার করেছে, তার তুলনায় অনেক নিরাপদ। আমার তৈরী রকেট ওজনে হালকা, আকারে ছোট, গতিতে দ্রুততর আর খুব সহজেই চালকের ইচ্ছামত দিক পরিবর্তন করতে পারবে। এতে চেপে ২৮ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদে পৌছান যাবে। মঙ্গলে যেতে ৫দিন।

উত্তেজনা চেপে দীপক জবাব দিলে—বুঝেছি। এ তো দারুণ আবিষ্কার। জানতে পারলে বৈজ্ঞানিক মহলে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।

—তাই এর ফর্মূলা ন্যায়-অন্যায় পথে নেবার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের এত আগ্রহ।

—আপনি আজ অবধি যা কিছু করেছেন সব গোপনেই করেছেন?

—হাঁ। ইচ্ছে ছিল কাজে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করে তবেই ভারত সরকারকে জানাব। কিন্তু আর উপায় না দেখে আমি গত কালই আমার আবিষ্কারের কথা তাদের জানিয়ে দিয়েছি চিঠি পাঠিয়ে।

—ভাল কাজই করেছেন।

—কিন্তু এখন উপায়?

—শীলা দেবীর কথা চিন্তা করছেন?

—হাঁ।

—তাঁকে উদ্ধারের ভার আমি নিচ্ছি। দস্যু বাজপাখি ক্ষমতাবান হতে পারে কিন্তু তার এত ক্ষমতা হয়নি যে দীপক চ্যাটার্জীকে বুদ্ধির যুদ্ধে বার বার হারায়। আর তা সম্ভবপর নয় বলেই সে আজ বাংলা ছেড়ে মাদ্রাজে ঘাঁটি করেছে। জানে এখানে আর যেই থাকুক তার চিরশত্রু দীপক চ্যাটার্জী নেই।

দীপক উঠে দাঁড়াল। তারপর নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল। মিঃ বাজপেয়ী তাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন নিজে।

আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত চলে এল দীপক।

দশ

দীপক আর রতন কদিন ছদ্মবেশে মাদ্রাজ শহরের বার-হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং আর সব মহল্লা যেখানে অপরাধীরা সচরাচর যাতায়াত করে থাকে, সেসব জায়গায় খুব ঘোরাঘুরি করল।

কদিন ঘুরেই বুঝে নিল দীপক, এ শহরে বাজপাখি বেশ ভাল রকমই আড্ডা গেড়েছে।

কিন্তু মূল ঘাঁটি যে কোথায় তাই শুধু হদিস করতে পারল না।

একদিন সন্ধ্যায়—

দীপক একটি হোটেলে ছদ্মবেশে বসে কফি খাচ্ছে, এমন সময় দেখে বাজপাখির অন্যতম কুকর্ম সঙ্গী রহমৎ সেখানে ঢুকছে। সে একটা কেবিনে প্রবেশ করল। তারপর বয়কে ডেকে মদের অর্ডার দিল।

দীপক উঠে গেল তার টেবিলে।

চমকে উঠল রহমৎ। ক্রুদ্ধ হলো।

কিছু বলতে যাবার আগে দীপক মধুর হেসে জিজ্ঞাসা করল—কি দোস্ত, চিনতে কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু তোমার—আমার চেনা পরিচয় তো খুব অল্প দিনের নয়। মনে আছে কলকাতার সেই গার্ডেনরীচ অঞ্চলের—

এবার চিনতে পেরে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। সে শুকনো গলায় বলল —গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী!

—হ্যাঁ। কি হলো? দোস্তকে বসতে বলবে না চিনতে পেরেও।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, বসুন—বসুন। তারপর এখানে কি মনে করে? খবর সব ভাল তো? কবে এলেন মাদ্রাজে?

—বেশিদিন নয়, দিন ৩।৪ মাত্র। জান রহমৎ, আমি সেই পরশু থেকেই এ শহরে তোমার খোঁজ করছিলাম হোটেলে হোটেলে।

—সেকি! কেন?

—বাজপাখির সন্ধানে।

—কিন্তু আমি তো আর ও দলে নেই। দল ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ! কেন?

—আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল বলে।

—তাই ছেড়ে দিয়েছ? ভালই করেছ।

—বিশ্বাস হলো না?

—হয়েছে।

—আমি অবশ্য আপনাকে এখানে দেখতে পাবার আশা করিনি। কদিন ধরে আমিও বড় চিন্তায় রয়েছি।

—চিন্তা! কিসের চিন্তা? বাজপাখির?

—ঠিক বাজপাখির নয় তবে ওরই সম্পর্কিত। জানেন, একটি ধনী ঘরের সুন্দরী মেয়েকে আরব না পারস্য কোথায় মোটা মুনাফায় বেচে দেবার জন্য সে তাকে আটকে রেখেছে তার আড্ডায়।

—কোথায়?

—তিন নম্বর আড্ডায়।

—কোথায় সে আড্ডা?

রহমৎ ঠিকানা বলল।

দীপক ঠিকানা টুকে নিয়ে বলল—ঠিক আছে। খবরের জন্যে ধন্যবাদ। যদি মেয়েটিকে বাজপাখির কবল থেকে উদ্ধার করতে পারি তো, যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে ওর উদ্ধারের জন্য—তার অর্ধেক তুমি পাবে। আর খবর যদি মিথ্যে হয় তবে দীপক চ্যাটার্জীকে তো চেন, তোমায় যাতে জেলে আজীবন ঘানি ঘোরাতে হয়, তার বন্দোবস্ত আমি করে দেব। বুঝলে?

—বিশ্বাস করুন, খবর মিথ্যে নয়।

—ঠিক আছে।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

—দীপকবাবু!

—কি ?

রহমৎ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—দল ছেড়ে দেবার পর থেকে একটু হাত টানাটানির মধ্যে আছি। মেহেরবানি করে যদি কিছু—

—বেশ, এই নাও।

দীপক মানিব্যাগ খুলে খান তিনেক দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলে তার দিকে। তারপর বেরিয়ে গেল। পথে নেমেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে বললে —পুলিশ স্টেশন চল।

• • •

মাদ্রাজের পুলিশ চীফ, মিঃ ব্রাউন দীপকের পরিচয় পেয়ে দারুণ খুশি হয়ে করমর্দন করে তাকে সাদরে বসালেন নিজের চেম্বারে।

—এবার বলুন মিঃ চ্যাটার্জী, ক্যালকাটা ছেড়ে কি উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে আপনার আগমন ? অবশ্যই কোন দরকারী কাজে তা বুঝতে পারছি। সে ক্ষেত্রে আমরা কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন ?

দীপক সংক্ষেপে সব কথা বলে অবশেষে বলল—চলুন মিঃ ব্রাউন, অবিলম্বে পুলিশ ফোর্স নিয়ে অকুস্থলে যাই।

—কোথায় যেতে চান ?

দীপক রহমতের কাছে পাওয়া বাজপাখির তিন নম্বর আড্ডার ঠিকানা জানাল॥

—ও-কে। আমি এখুনি তৈরী হচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হলো পুলিশ-চীফ মিঃ ব্রাউনের নির্দেশে। তাঁদের নিয়ে দুটি ভ্যান ছুটে চলল শহরের বুক চিরে—বাজপাখির তিন নম্বর আড্ডার দিকে।

যথা সময়ে আড্ডায় পৌঁছে গেল পুলিশ। তারপর ভ্যান থেকে টপাটপ নেমে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল ঘটনাস্থল।

বাজপাখি তখন সেই আড্ডাতেই ছিল। অভাবিত বিপদে পড়ে তার মুখ

রাগে কালো হয়ে গেল। সে তার অনুচরদের হুকুম দিলে—গুলি চালাও।

শুরু হলো পুলিশে আর দস্যুতে মুখোমুখি সংগ্রাম। গুলি বিনিময়।

কিন্তু সংখ্যা লঘু হওয়ায় পুলিশের সঙ্গে সেই রক্তাক্ত যুদ্ধে হেরে গেল দস্যুরা। তারা অনেকেই আহত হয়ে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে।

শীলাদেবীকে উদ্ধার করা হলো।

কিন্তু বাজপাখিকে ধরা গেল না।

সে যে পুলিশবাহিনী আর দীপকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে কোথা দিয়ে কেমন করে পালাল, তা রীতিমত বিস্ময়ের বিষয়।

মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন—পালের গোদা কোথায়?

—তা তো জানি না। পুলিশবাহিনী জানাল।

—নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত পথে পালিয়েছে। দীপক বলল।

তাঁরা বাজপাখির পলায়ন নিয়ে নিজে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন, এমন সময় শোনা গেল মোটর গাড়ির শব্দ।

সকলে দেখলে, বাজপাখি মোটরে চেপে পালাচ্ছে।

পুলিশবাহিনীকে সংহত করে তাকে অনুসরণ করার আগেই সে চোখের আড়ালে চলে গেল পথের মোড় ঘুরে।

এগার

গভীর রাত।

দুটি গাড়ি তীরবেগে ছুটে চলেছে আগু-পিছু।

মাদ্রাজ শহর ছাড়িয়ে বাইরে।

একটিতে বাজপাখি একা।

অন্যটিতে দীপক, মিঃ ব্রাউন এবং জন কয়েক পুলিশ অফিসার।

প্রথম গাড়িটি এসে সোজা মিঃ বাজপেয়ীর কারখানার সামনে থামল। মিঃ বাজপেয়ী পুলিশ এসেছে মনে করে গেট খুলে দিতেই গাড়িটা না থেমে সোজা এগিয়ে গেল সেই শেডের দিকে, যেখানে তাঁর তৈরী দু'খানা রকেট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাজপাখি সটান একটা রকেটে চেপে বসল আর রকেটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্টার্টিং সুইচ টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেটি প্রচণ্ড গর্জন, ধেঁায়া আর অগ্নিবর্ষণ করতে করতে উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করল।

মিনিট তিনেক পরে দীপকরাও এসে উপস্থিত।

—কোথায় গেল সেই শয়তান?

জানতে চাইল দীপক।

মিঃ বাজপেয়ী আকাশগামী রকেটকে দেখিয়ে সখেদে বললেন—ঐ যে যাচ্ছে।

সবাই স্তম্ভিত।

মিঃ ব্রাউন বললেন হতাশার সুরে—এখন উপায়?

দীপক বললে—উপায় অন্য রকেটে চেপে ওকে অনুসরণ করা।

—কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না।

বললেন মিঃ বাজপেয়ী।

—কেন ? ফল হবে না কেন ?

জানতে চাইল দীপক।

—কারণ প্রথমতঃ বাজপাখি ৩।৪ মিনিট আগে রওনা হওয়ার সুবিধে পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ওটার গতিবেগ এটার চেয়ে কিছু বেশি। কাজে কাজেই আমরা যতই চেষ্টা করি, সব সময় ওর থেকে কয়েক শত মাইল পেছনে থাকবই।

—তা বটে।

—তা ছাড়া আমরা তাড়া করলে ও সারা মহাকাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তার চেয়ে ওকে তাড়া না করাই ভাল।

—কেন ?

—বাজপাখি রকেটের সব কলকব্জা ভাল করে চেনে না। ফলে ও মহাকাশেই ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে চালিয়ে যেতে পারবে না। কোন গ্রহেও আশ্রয় পাবে না। তাছাড়া ও যদি রকেটের গতি ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তবে সোজা চলে যেতে পারে সূর্যের দিকে। আর তার ফলে সবশুদ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর তা না হলে নিয়ন্ত্রণহীন রকেট যতদিন না অন্য কোন ভাবে ধ্বংস হচ্ছে ততদিন শুধু মহাকাশে পাক খেয়ে বেড়াবে, কিম্বা অনির্দিষ্ট পথে এগিয়েই যাবে। আর থামবে না।

বাজপাখি যত বড় শত্রু হোক তবু তার এই শোচনীয় পরিণতির কথা শুনে দীপক খুশি হতে পারল না। সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কী হবে মিঃ বাজপেয়ী ?

—অতটা কষ্ট তাকে পেতে হবে না। রকেটের সঞ্চিত খাদ্য ফুরিয়ে গেলে তার আগেই উপবাসে মারা পড়বে।

দীপক চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

—কি ভাবছেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—ভাবছি, বাজপাখি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। সেও মেধাবী। ভ্রান্তপথে না চললে বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রচুর নাম করত এতদিনে। সে অত সহজে হার

মানবে বলে মনে করি না। সে বেহিসেবী হয়ে রকেটে ওঠেনি। হয়তো সে আবার ফিরে আসার ব্যবস্থা করেই তবে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে।

—সবই তার ভাগ্য।

বললেন মিঃ বাজপেয়ী।

দীপক বললে—শীলা দেবী মুক্তি পেয়েছেন মিঃ বাজপেয়ী।

—তাই নাকি! অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

—শুধু আমাকে নয় মিঃ ব্রাউনকেও ধন্যবাদ দিন। ওঁর সাহায্য ছাড়া কিছু সম্ভব হতো না এত তাড়াতাড়ি।

—ধন্যবাদ···ধন্যবাদ মিঃ ব্রাউন।

দীপক চেয়েছিল আকাশের দিকে। একটি উজ্জ্বল আর সচল বিন্দুতে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল।

বাজপাখি মহাশূন্যে কোথায় কতদূর চলেছে কে জানে। আর ফিরবে কি না তাও বলা কঠিন। সে ফিরলে দীপক অখুশি হবে না। যদিও সে তার চির শত্রু তবু তার এ হেন শোচনীয় পরিণতি তার কাম্য নয়।

—সমাপ্ত—

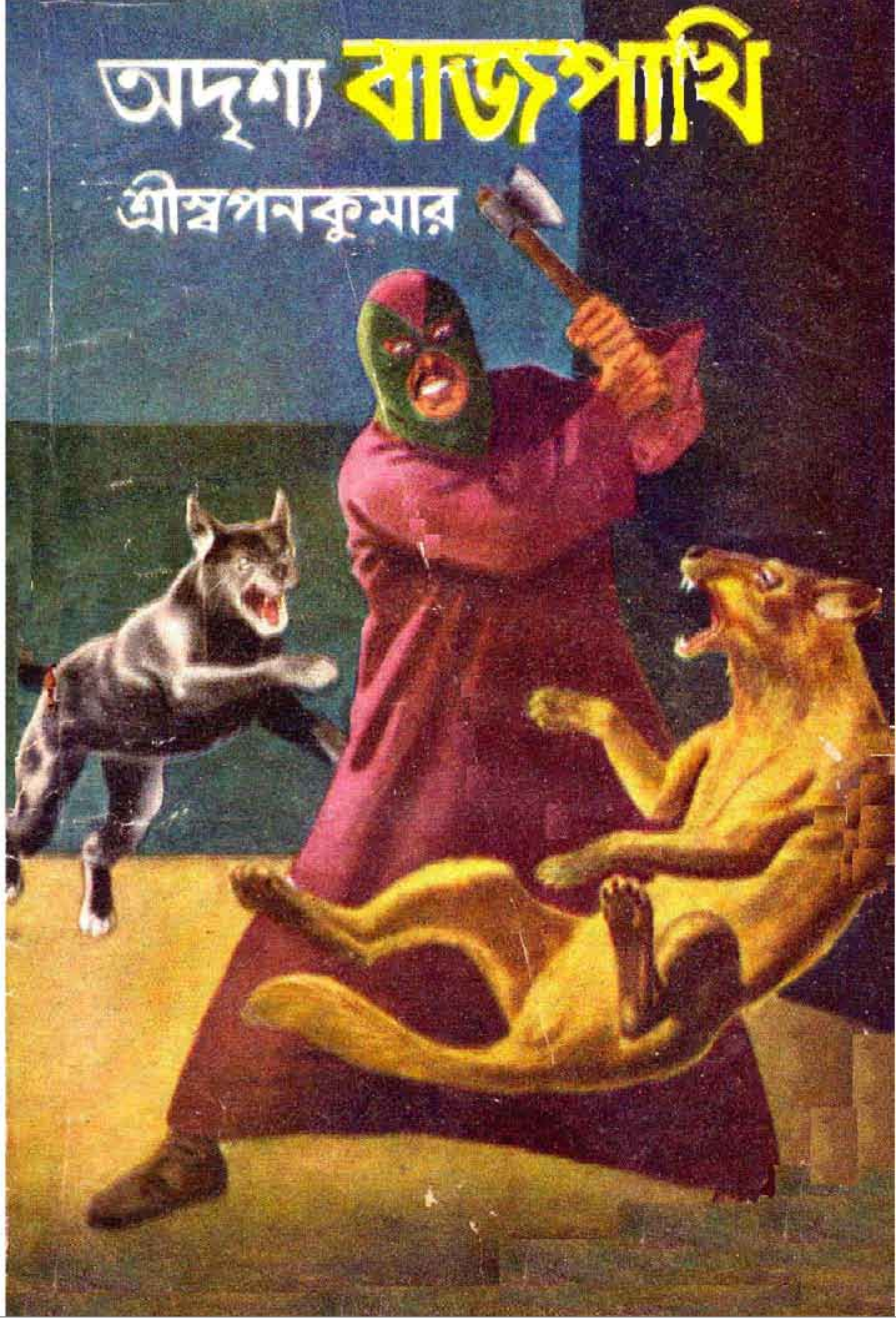
অদৃশ্য বাজপাখি
শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—১৪ নং

অদৃশ্য বাজপাখি

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক
শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩১২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩১২ডি, রবীন্দ্র সরণী.
কলিকাতা-৬

এ-বছরের সবচেয়ে সেরা
ডিটেকটিভ সিরিজ
শ্রীস্বপনকুমারের লেখা
"—বাজপাখি সিরিজ—"

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি	২। বাজপাখির পুনরভিযান
৩। বাজপাখির রক্তলীলা	৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা
৫। বাজপাখির রণহুঙ্কার	৬। হত্যাকারী বাজপাখি
৭। বাজপাখির রহস্যজাল	৮। নীলসমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র	১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

মুদ্রাকর :
তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ২·৫০

॥ এক ॥

মেয়েটি থিয়েটারে অভিনয় করতে এলো। ছিপছিপে চেহারা, মাঝারি আকৃতি, রং ফর্সা। মুখখানা মিষ্টি।

এটা বলা হচ্ছে ১৯৪০ সালের কথা। তখনকার দিনে ভদ্রঘরের মেয়েরা থিয়েটারে এসে ভিড় করত না। থিয়েটারে অভিনয় করত অধিকাংশ রূপোপজীবিনীরা।

কোন একটি থিয়েটারে অনিলের লেখা নাটক অভিনীত হচ্ছিল। অনিলের মোটামুটি খ্যাতি আছে নাট্যকার হিসেবে। খ্যাতি খুব বেশী না হলেও খুব কমও নয়।

ঐ থিয়েটারে অনিলের আসা-যাওয়া ছিল খুব বেশী।

সকালবেলা। বুকিং অফিসে বসে অনিল আড্ডা দিচ্ছিল। থিয়েটারের ম্যানেজার আছেন। আছেন নামকরা একজন অভিনেতা, আর আছেন বিপ্লবী যুগের অনেক নামকরা নেতা—যিনি আজকাল বিপ্লবের পথ ছেড়ে অভিনয়-জীবন শুরু করেছেন।

চা পর্ব শেষ হয়েছে।

আলোচনা চলছে নানারকম। মাঝে মাঝে দু-একজন লোক এসে টিকিট কেটে নিয়ে যাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে আলোচনার মোড় ঘুরল। কথা উঠল, কতদিনে ভদ্রঘরের মেয়েরা এসে থিয়েটারে যোগ দেবে।

ম্যানেজার বললেন—ওরা না-আসাই ভাল। এলে আবার নতুন নানা বিপদ দেখা দেবে। তার চেয়ে এ যা আছে, বেশ ভালই আছে।

—না না, এ-কথার মানে হয় না। বললেন বিপ্লবী নায়ক—থিয়েটার হলো জাতীয় ঐতিহ্য। কিছু লেখা-পড়া জানা মেয়ে এলে ভালই হবে। তা হলে নাট্যকারের দল আরও উঁচু ধরণের নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হবেন।

অনিল বলল—আমার মনে হয় আজ যে এ্যাকটিং চলছে পাবলিক স্টেজে,

শিক্ষিতা মেয়ের দল এলে সেই অভিনয়-ধারার আমূল পরিবর্তন হবে আপনা থেকেই! তাই নয়?

—মাথা হবে! ম্যানেজার বললেন।—যা হবার তাই হবে। মাঝখান থেকে 'ভদ্র' কথাটার সেলামী দিতে দিতে প্রাণ বের হবে।

—তার মানে?

—মেয়েরা ভদ্র কেউ নয়, অভদ্রও কেউ নয়। সবকিছু নির্ভর করে মনের গঠনের উপর। তাই নয়?

বিপ্লবী নায়ক কি যেন ভাবতে লাগলেন।

বোধহয় 'মনের গঠন' কথাটাই তাঁর মনে দোলা দিয়েছে।

আলোচনা আরও চলতো কিন্তু তাতে বাধা দিয়ে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক টিকিট চাইলেন। বললেন, দশ রূপেয়াকা দশ টিকেট দিজিয়ে।

প্রচুর ভাল বৌনি বটে! আজকের দিনে এটা অবশ্য বড় নয়—কিন্তু সে আমলে এত দামের আর এত টাকার টিকিট একযোগে বিক্রী হতো কমই।

বুকিং ক্লার্ক টিকিটে ছাপ মেরে এগিয়ে দিলেন।

লোকটি একশো টাকার একটা নোট বের করে টিকিটগুলো হাতে নিল। তারপর বলল—দেখিয়ে বাবুসাব,—

—বলুন। বললেন বুকিং ক্লার্ক।

—নিরুপমা বিবি আজ পার্ট কোরবেন তো?

—হাঁা, নিশ্চয়ই করবেন।

—আবার শেষ ওলক্ বোলবেন না তো যে, বিবিজীর কুছ্‌না বেমারী হোইয়েসে···

—না না, তিনি ভালই আছেন।

—তব তো ঠিক হ্যায়, নমস্তে। লোকটা নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

ম্যানেজার অনিলের দিকে চেয়েবললেন—দেখলে তোহে নাট্যকার। তোমার নাটকের কোন দাম নেই। তারকবিবি পার্ট করছেন বলে টিকিট বিক্রী হলো।

—তাই তো দেখলাম।

—তা বিবির সঙ্গে ভাব হয়েছে ?

—অভাবও কিছু নেই।

তাহলে এরপর ভদ্র মেয়েরা এলে কি কাণ্ড হবে তা ভেবে দেখেছ কি ? গোড়ায় ভদ্র থাকলেও তাঁরা কি এত টাকার ঝলক দেখে ভদ্র থাকতে পারবেন ?

অনিলের রাগ হলো। সে চেয়ে দেখল ম্যানেজার আর সেই অভিনেতাটি মুচকি মুচকি হাসছেন। সে তাই রেগে বললে—দাদা, চিরকালই কি বাংলা থিয়েটারে এমনি দর্শকই থাকবে বলে মনে করেন ?

—থাকবে না ?

—না। থিয়েটারের সংস্কার করুন। সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিন—সূর্যের নির্মল-উজ্জ্বল আলো এসে পড়ুক পঁচাত্তর বছরের ঝুপসি অন্ধকার জায়গাগুলোতে। আজ যেমন অফিসে বা সিনেমায় কাজ করার জন্যে শিক্ষিতা মেয়েরা ভীড় করতে শুরু করেছে, আগামী বিশ বছরের মধ্যে জীবিকার জন্যে থিয়েটারের দরজাতেও তারা এমনি ভীড় করবে। থিয়েটারের আবহাওয়া বদলালে দর্শকও সঙ্গে সঙ্গে বদলাবে।

—বদলাক। কিন্তু—

কথা শেষ হলো না।

এক ভদ্রলোক একটি মেয়েকে নিয়ে বুকিং উইণ্ডোর সামনে এসে হাজির হলেন।

—ম্যানেজারবাবু আছেন ?

—আছেন। ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন।

ভদ্রলোক ঘুরে এলেন। সঙ্গের মেয়েটিও।

—কী চান ? ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন।

—এই মেয়েটির থিয়েটারে নামার শখ হয়েছে।

—শখ ?

—হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে ওর খুব ঝোঁক।

—আপনার মেয়ে ?

—না, ভাগ্নী। বাপ-মরা। মা আমার কাছে থাকত, সেও মারা গেছে।

—তা থিয়েটারে ?

—দেখুন, আমার নিজের ৫/৬টি ছেলে-মেয়ে। অবস্থাও ভাল নয়। এর বয়স হলো আঠার-উনিশ। ভিক্ষে-সিক্ষে করে বিয়েদিযে দেব ভাবলাম, কিন্তু ও এখনি বিয়ে করতে চায় না। বলে আগে থিয়েটারে নামব—সিনেমায় নামব, তারপর।

—লেখা-পড়া ?

—ক্লাস নাইন অবধি পড়েছে।

—কোথায় থাকা হয় ?

—নৈহাটিতে।

—কী করে রাতে ফিরবে ?

—ও একা একা ঠিক চলে যাবে। আমি না হয় স্টেশানে থাকব।

—আচ্ছা, দেখছি।

উপস্থিত সবাইকার মধ্যে আলোচনা হলো।

অবশেষে ঠিক হলো, মেয়েটি অনিলের কাছেই অভিনয় শিখবে।

দূরে থাকে বলে মাসে তিরিশ টাকা দেওয়া হবে আপাততঃ হাত খরচা হিসেবে।

দশ-পনের দিনে অভিনয় করা শিখে ছোটখাট পার্টে নামতে পারবে। পরে ২/১ বছরে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় আরও পাকা হয়ে উঠলে উল্লেখযোগ্য রোল পাবে। মাইনেও সেই অনুপাতে বাড়বে।

আপাততঃ দিন পনের শুধু অপরের অভিনয় দেখে নিজে শিখবে।

সব কথা শেষ হতে প্রায় আধঘন্টার মত লাগল।

ততক্ষণ মেয়েটা, মানে মালতী অবাক বিস্ময়ে শুধু ওদের কথা শুনছিল।

অবশেষে কথাবার্তা শেষ করে ভদ্রলোক সবাইকে নমস্কার জানিয়ে ভাগ্নীকে নিয়ে বিদায় নিলেন।

॥ দুই ॥

মালতী ভারী লাজুক আর মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। সাধারণ একটা ডুরে শাড়ি পড়ে থিয়েটারে আসত। হাতে ছিল দুটি লাল প্লাস্টিকের বালা। গলা খালি। কানে দুল—পুরোন ধাঁচের।

রোজই আসা-যাওয়া করে। ক্রমে একটু একটু করে অনিলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের জড়তা কমে আসে।

মাসখানেক পর থেকে খুব সহজভাবেই সে অনিলের সঙ্গে কথা বলতো।

কোন কোন দিন নাটক নিয়ে পড়ত। আবৃত্তি করত। কোন কোন দিন বিগত যুগের থিয়েটারের গল্প শুনত—তার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা… অভিনয়ের কথা…পরিচালক/প্রযোজকের কথা। বিশেষ করে স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে থিয়েটারের যোগাযোগের কথা তার মনকে খুবই আকৃষ্ট করত। সে মনে মনে প্রণাম জানাত ঠাকুরকে। আর যাঁরা তাঁর প্রসাদধন্য হয়েছিলেন তাঁদের।

আবার এক একদিন ব্যক্তিগত কাহিনীতে ভরে উঠত ওদের সান্ধ্য-বৈঠক। মালতী আসত বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। চলে যেত রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে।

তিনখানি শাড়ি ওকে সারা মাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরতে দেখা যেত। তার মধ্যে একখানা খয়েরী রঙের ডুরে, একখানা মুর্শিদাবাদী সিল্ক, আর একখানা তাঁতের রঙিন শাড়ি। বাড়তি হিসেবে হাতে লাল প্লাস্টিকের বালার সঙ্গে কিছু রঙিন কাচের চুড়ি আর রং চটা পুরোন ভ্যানিটি ব্যাগ।

মাস দেড়েক পরে অনিল লক্ষ্য করল, মালতী যেন একটু অন্যমনস্ক।

আবৃত্তি করতে করতে বা অভিনয় করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে মাঝে মাঝে।

একদিন থাকতে না পেরে অনিল জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি মালতী? বিয়ের কথা ভাবছ নাকি?

হাসল মালতী। বলল—না, বাড়ির কথা ভাবছি।

—কেন?

—মামা বলছিলেন, আর কিছু টাকা বাড়াতে দিতে নইলে সংসার যে আর চলতে চাইছে না। মাত্র তিরিশটা টাকা, ও তো আমার যাতায়াত গাড়ি ভাড়া আর টুকিটাকির পেছনেই খরচ হয়ে যায়—

—বুঝেছি। কিন্তু অভিনয় করাটা তাড়াতাড়ি শিখে নাও তাহলেই তো টাকার অংক বাড়বে।

—আচ্ছা, সিনেমায় আমার কাজ হয় না? সেখানে তো শুনেছি অনেক টাকা পাওয়া যায়। হঠাৎ বলল মালতী।

—কেন হবে না? অনিল বলল। আচ্ছা, বলে দেখব চেনা-জানা দু-একজনকে। তবে কি জান, অত ছটফট করলে হয় না। আগে নিজেকে তৈরী করতে হবে না হলে আঘাটায় ডুবে মরবে।

চুপ করে চেয়ে রইল মালতী অনিলের মুখের দিকে।

আরও দিন দশেক কাটল।

একদিন অনিল দেখল মালতীর মামা এসেছেন সঙ্গে। নমস্কার বিনিময় করে, নানান ব্যাপারে টুকিটাকি কথা বলার পর তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—অনিলবাবু, মালতীর ভার আপনার ওপর দিয়ে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত। আমরা জানি আপনি ওর পরম মঙ্গলাকাঙ্খী। মালতীর যাতে ভাল হয় এটাই আপনার কাম্য। সেই ভরসায় আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

অনিল বিস্মিত হলেও সে মনোভাব মনেই চেপে জিজ্ঞাসা করল—কী অনুরোধ?

—মালতীকে আপনি বিয়ে করুন।

এ হেন প্রস্তাবের জন্য অনিল আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে বলল—কী বলছেন আপনি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মালতীর মামা বিগলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আপনিও

বামুন, আমিও বামুন। ভাল বংশেরই মেয়ে ও। তাছাড়া নিজের ভাগ্নী বলেই বলছি না, মেয়ে হিসাবে মালতীর তুলনা হয় না। সংসারের হরেক কাজ… আচার-ব্যবহার · স্বভাব-চরিত্র কোন দিকে ওর ত্রুটি খুঁজে পাবেন না। আপনি যদি দয়া করে মালু মাকে আপনার চরণে ঠাঁই দেন, তবে—

অনিল তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু আমি যে বিবাহিত!

শুনে চরম হতাশায় যেন ডুবে গেলেন মালতীর মামা, তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা সরতে চাইল না। টেনে টেনে শুধু বললেন—আপনার অল্প বয়স দেখে মনে করেছিলাম আপনি বুঝি এখনো বিয়ে করেননি।

এবার অনিল পাল্টা প্রশ্ন করল—আপনি হঠাৎ ভাগ্নীর বিয়ে দেবার কথা ভাবতে বসলেন কেন?

—না, ঠিক ভাবিনি, ম্লান গলায় বললেন মামা, তবে ওটা হয়ে গেলে ভাল হত। আচ্ছা, আমি তবে চলি। এই বলে তিনি অনিলকে বিদায় নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

সেদিন কথাটায় কোন গুরুত্ব দেয়নি অনিল। এর দিন তিনেক পরে— শনিবারে—বেলা ছুটো হবে তখন, কলেজ স্ট্রীটের একটা নামকরা রেস্তোরাঁয় অনিল ঢুকল চা খাবে বলে।

হঠাৎ কোণের দিকে চেয়ে সে দেখল, একটা একানে টেবিলে মালতী আর থিয়েটারের অ্যাপ্রেন্টিস গ্রুপের সুনীল নামে একটি ছেলে বসে চা খাচ্ছে আর হেসে হেসে গল্প করছে।

সুনীল ছেলেটাকে দেখতে শুনতে মন্দ নয় তবে যাকে বলে এক নম্বরের ষাঁড়ের গোবর। ন দেবায় ন মানবায়। থিয়েটারে আসে সেজেগুজে, বন্ধু-বান্ধবদের নিজের পয়সায় চা-বিস্কুট খাওয়ায়। ক্যামেরা আছে—পটপট ছবি তোলে। আড্ডা জমায়। অভিনয়ের 'অ'-ও জানে না। শেখবারও চাড় নেই। তাই তাকে কোন রোলও দেওয়া হয় না। তাতে সুনীলের দুঃখ নেই। থিয়েটারে আসাটা তার শখ—জীবিকা উপার্জনের জন্য আসা নয়।

অনিলকে দেখে ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে চমকে উঠল দু'জনে। অনিল কিন্তু না-দেখার ভান করে, নিজের টেবিলে জনৈক অর্ধপরিচিত লোকের সঙ্গে—কী খবর? অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। নাটক নিয়ে এমন চাপের মধ্যে রয়েছি যে, মোটে ফুরসৎ পাচ্ছি না কোন দিকে দৃষ্টি দেবার—ইত্যাদি বলে এমন আলাপ জুড়ে দিলে যে, যেন এই আলাপের ওপর তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কাজের ছক নির্ভর করছে।

অর্ধপরিচিত ভদ্রলোক নিজেও কম অভিভূত হননি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আড়চোখে কোণের দিকে চেয়ে অনিল দেখল, ওরা যেন কখন উঠে চলে গেছে

একটা কথা অনিল বুঝে উঠতে পারল না যে, মালতী আসে তার কাছে, সারাক্ষণ থাকে তার কাছে, অভিনয় শেখে তারই কাছে। অ্যাপ্রেন্টিস গ্রুপের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই নেই। এর মধ্যে সুনীলের সঙ্গে মালতীর আলাপ হলো কী করে?

বিকেলে দেখা হতেই মালতী নিজের থেকে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে বলতে লাগল—মামাতো ভাই একজনের ইস্কুলের বই কেনবার জন্যে আজ দুপুরেই কলকাতায় আসতে হয়েছিল আমায়। কলেজ স্ট্রীটে ঘুরতে ঘুরতে তেষ্টা পেয়ে গেল খুব। তখন চা খেতে ঐ রেস্তোর্যাঁয় ঢুকে দেখি, সুনীলদা সেখানে বসে চা খাচ্ছেন। আমায় চিনতে পেরে ডাকলেন।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ।

—সুনীল কবে থেকে 'দাদা' হলো তোমার?

—বাঃ, এখানে তাই তো নিয়ম। সকলকেই দাদা বলে ডাকতে হয়। আপনাকেও তো দাদা বলি। বলি না কি?

—তাহলে মামাতো ভাইয়ের বই কিনতেই আজ দুপুরে কোলকাতায় এসেছ তুমি?

মালতী একটু থতমত খেয়ে জবাব দিলে—না, ঠিক সে কারণে নয়। আসলে আমি এসেছিলাম বরাহনগরে। মাসীমার কাছে। তার অসুখ। তাঁকে দেখতেই আসা। সেই সঙ্গে মামাতো ভাইয়ের বই—

—ও। অনিল আর কিছু বলল না।

. . . . .

দিন কয়েক পর অনিল দেখল তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মালতী বক্সে বসে থিয়েটার দেখছে।

অবাক হয়ে অনিল জিজ্ঞেস করল—তুমি থিয়েটার দেখছ! বাড়ি যাও নি?

—না, মামা আসবেন নিতে।

—মামা আসবেন?

—হ্যাঁ।

কিন্তু মামা আসেননি। পরের দিন অনিল জানতে পারল, মালতী অনেক রাত্রে থিয়েটার কোম্পানীর গাড়িতে চেপে ফিরে গেছে।

শুনে অনিল বিরক্ত হলো খুব।

ড্রাইভার অখিলকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁরে অখিল, কাল রাতে মালতীকে কোথায় পৌঁছে দিলি?

—কেন, নৈহাটিতে ওর বাড়িতে।

—গাড়ি অত রাতে সেখানে নিয়ে গেলি!

রীতিমত অবাক হলো অনিল।

—তবে সত্যি কথাটা বলব? অখিল হাসল. নৈহাটি নয়, হোটেল পার্কে।

—পার্ক হোটেল! সেখানে তো যত জুয়াখেলা, মদ খাওয়া আর নোংরামির কাজ হয়। বাজে লোকেদের আড্ডা। মালতী সেখানে গেল?

—হ্যাঁ গেল। ছিলও সেখানে।

—একা?

—না, সুনীলবাবু সঙ্গে ছিলেন।

—বলিস কি!

—আরো একটা খবর শুনবেন?

—কী?

—সুনীলবাবু থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, এবার তিনি সিনেমায় নামবার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে মালতী।

অনিলের মুখ গম্ভীর হলো। সে বললে—সত্যি দুঃখ হচ্ছে আমার। অতগুলো দিন আমি মেয়েটার জন্যে বৃথাই নষ্ট করলাম। গ্ল্যামারের নেশা আর অভাবের পীড়ন এক জায়গায় হলে যে কোন মেয়েই পথভ্রষ্ট হতে পারে এক মুহূর্তে।

—তা ঠিক। মেয়েটা এখন টাকার খোঁজে দৌড়চ্ছে।

—বুঝেছি।

তারপর অখিল ফিসফিস করে বলল—দাদা, সুনীলবাবু আরো কি করেন জানেন?

—না। কী করে?

—গোপনে স্মাগলিং-এর কারবার করেন। তাই তো অত টাকা ওড়াচ্ছেন। পুলিশের নাকি ওঁর ওপরে নজর আছে।

—বুঝেছি।

—বেশীদিন নয় হয়তো শীগগিরই জালে জড়িয়ে পড়বেন। তখন অবস্থাটা কী হবে আন্দাজ করুন। অথচ মালতী কি না বোকার মতন ওঁর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—সিনেমায় নামবার লোভে।

—তা বটে। মেয়েটার বয়স কাঁচা, মনটাও কাঁচা আর বড্ড বেশী প্রেমে ভরা। তার ফলে যা হয়—

—অতি উচ্ছ্বাস এই বয়সের দোষ অখিল। তাই হয়েছে মালতীর।

আর কোন কথা হয় না দু'জনে।

অনিল ভাবে, মালতীকে কি সব কিছু খুলে বলবে সে? কিন্তু তাতে লাভই বা কি? মালতী কি শুনবে তার কথা? সে কে তার?

এই বয়সের যা ধর্ম, তা থেকে ওকে এখন বিচ্যুত করা যাবে না।

বাধ্য হয়ে অনিল ভাবল সে চুপ করেই থাকবে। সব কথা জানাবে ম্যানেজারকে।

।। তিন ।।

দু'দিন পরে—

সেদিন বিকেলে মালতী এল। অনিল দেখতে পেল তার কাঁধে নতুন চক্‌চকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছে।

ভাল করে তাকাতে আরও তার নজরে পড়ল—মালতীর শাড়িটাও নতুন। রীতিমত দামী। পায়ের চপ্পল জোড়াও খেলো নয়।

অনিল জিজ্ঞেস করল—ভাল আছ ?

—হাঁ। তারপর অনিলের মনোভাব বুঝেই যেন বলল, মামা বোনাস পেয়েছেন! তাই একটা ভাল শাড়ি—আজ কী শেখাবেন? প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল মালতী।

—কিছু না। অনিল গম্ভীর। আর শোন, কাল থেকে আমার কাছে আর এসো না।

—কেন? অ্যাক্‌টিং শিখব না ?

—দরকার হবে না।

—সে কি!

—এ লাইন তোমার নয়।

—আপনি আমার ওপরে রাগ করেছেন মনে হচ্ছে ?

—তা একটু করেছি। সত্যিকারের অভিনয় কাকে বলে তুমি জান না। জানবার আগেই তুমি এ লাইন থেকে রোজগারের পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ পথে যে কত বিপদ, কত গোলমাল, সে বিষয় তোমার কোন ধারণাই নেই।

কোন কথা বলল না মালতী। মাথা নীচু করে বসে রইল। এক সময়ে ডাকল—অনিলদা!

—কি ?

—মাপ করুন আমাকে।

—না না, আমি কিছু বলতে চাই না। বলার কোন অধিকার নেই। নেহাৎ তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও জান কিছু, তোমায় স্নেহের চোখে দেখেছিলাম—তাই—

—বুঝেছি।

—যদি সত্যি সত্যি অভিনয় শিখতে চাও, আগে মনকে দৃঢ় কর।

—বেশ।

—আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি। পরে বরং একদিন এসো। কেমন?

—তাই আসব। উঠে চলে গেল মালতী।

কিন্তু তারপর একটি মাসের মধ্যে তাকে আর কোন দিনই আসতে দেখা গেল না অনিলের কাছে।

• o •

মাস ছয়েক পরে—

অনিলের লেখা একটি নাটক সিনেমায় উঠছে বলে কথাবার্তা হলো।

ভারতী স্টুডিয়ো বইটির জন্য চুক্তি করল। স্যুটিংও শুরু হলো।

একদিন অনিল ছবির প্রযোজকের নিমন্ত্রণ পেয়ে স্টুডিয়োতে গেল। দেখা করল পরিচালক অমল সেনের সঙ্গে। ভদ্রলোক বেশ জ্ঞানী এবং তৎপর।

সেদিন বেশ ভাল একটা দৃশ্যের স্যুটিং ছিল। ছবিটিতে যারা যারা কাজ করছে তাদের অনেকেই উপস্থিত ছিল সেখানে, এক সময়ে অনিল দেখতে পেল —একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে মালতী এল স্টুডিয়োতে!

অনিলকে দেখেই ছুটে এল মালতী। হঠাৎ তাকে প্রণাম করল। অনিল অবাক।

—মালতী, তুমি!

—চিনতে পেরেছেন তাহলে?

—কেন চিনতে পারব না? কিন্তু তুমি এখানে?

—বা রে। আমার কাজ আছে যে। আমিও অভিনয় করছি এ ছবিতে।

—তাই বুঝি ? বেশ বেশ। কোন রোলে ?

থতমত খেল মালতী। সে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে চাইল সঙ্গী যুবকটির দিকে।

যুবকটি সরে গিয়ে পরিচালকের কাছে কি যেন বলল। পরিচালক মিঃ সেন ঘাড় নেড়ে তাকে বললেন—আচ্ছা।

একটু পরেই শুটিং শুরু হলো।

বাংলার দুই নামকরা নায়ক-নায়িকা জুটি বেঁধে কাজ করছেন এ ছবিতে। তাঁদের ঘিরেই শুটিং চলতে লাগল।

এক সময়ে পরিচালক এক্সট্রা কটি ছেলে মেয়েকে একটি দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য এগিয়ে আসতে বললেন। যারা এল, তাদের মধ্যে মালতীও ছিল।

পরিচালক সবাইকে দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলেন।

মালতী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—আমার কোন ডায়ালগ্ নেই ?

—না।

—কেন ?

—ছোটখাট সীনে জনতার কাজের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে তোমাদের। শুধু চেহারাই দেখাবে—সংলাপ বলবে না। তোমরা হলে এক্সট্রা।

—ও। বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মালতী। তারপর অদূরে দাঁড়ান যুবকটির কাছে গিয়ে অনুযোগ জানাল—তুমি তো আগে আমায় এ কথা বলো নি ?

—কী কথা ?

—এক্সট্রার কাজের জন্যে তুমি আমায় এনেছ।

—এতে আর বলাবলির কী আছে ? আগে নাম হোক তবে তো বড় পার্ট পাবে।

—যাতে অভিনয়েরই সুযোগ নেই তাতে নাম হবে কীভাবে ?

—এর বেশী তো এখন পাবে না। এই ভাবে এগোতে এগোতে কখন কোন পরিচালক বা প্রযোজকের সুনজরে পড়ে যাও, তা তো বলা যায় না।

—বুঝেছি।

যুবকটি আর বেশী কথা বলতে সাহস পেল না। শুধু বললে—আমি চললাম।

মালতী কোন জবাব দিল না।

অনিলের কাছে গেল সে। সব খুলে বলল তাকে। কত লোক ওকে সিনেমায় নামিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে। পরে আবার তারাই তাকে ক্রাউডে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একদিন।

অনিল বলল—আবার কি আশা কর?

—কেন?

—তুমি তো অভিনয়ের কিছু শেখনি। যা নামছ তাও চেহারার জোরে।

—তা বটে।

—একটা কথা বলব মালতী?

—বলুন।

—তোমার এত ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ আসছে কোত্থেকে? আমি তো জানতাম—

মালতী বলল—উপার্জন একটা আছে বৈকি। তবে তা অন্য পথে।

—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

—কী ভেবেছিলেন?

—তোমার পথের ঠিকানা। তুমি যে ইদানীং আর সোজা সরল পথে হাঁটছ না তা বুঝেছি। তুমি বেআইনী পথে মানে স্মাগলিং-এর মধ্যে ঢুকেছ—তাই নয় কি?

—আপনি জানেন?

—জানি মালতী। তোমার চেয়ে দুনিয়াটাকে বেশী দেখেছি আমি।

মালতীর দু-চোখ জলে ভরে উঠল। সে বলল একটা কথা বলব?

—বলো।

—গোপনীয়।

—বেশ, তবে চল ও-পাশে।

মালতী আর অনিল একটু নিরিবিলিতে সরে এল।

একটু ইতস্তত: করে মালতী বলল—অনিলদা, আমি—আমি—অন্তঃস্বত্তা।

—সে কি! কে তোমার এই দুর্দশা করেছে?

—সেই সুনীল। সেই আমাকে স্মাগলিং লাইনে কাজ করার পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

—সে এখন কোথায় থাকে?

—জানি না। বেশ কিছুদিন ধরে তার পাত্তা নেই।

—তুমি কতদিন এ পথে নেমেছ?

—ছ'মাস।

—কোন দলের হয়ে?

—তাও জানি না। শুধু জানি, আমার মত আরও ২০/৩০টা মেয়ে এ দলে কাজ করে।

—তোমাদের নেতা কে?

—নেতা কে তাও জানি না। সে থাকে আড়ালে। তাকে কেউ দেখতে পায় না। শুধু দলের লোকেদের দিয়ে নির্দেশ পাঠায়।

আর বেশী কথা হলো না দু'জনের মধ্যে। সে সুযোগও ছিল না সেখানে। লোকে সন্দেহ করতে পারে। বদনাম দিতে পারে। এই ভয়ে অনিল তাড়াতাড়ি সরে গেল সেখান থেকে।

অনিল ভাবতে লাগল। মালতীর চিন্তা তার মাথায় যেন পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। বিকেলে যে ফুলের ফোটার কথা, সে ফুল সকালে ফুটল। সন্ধ্যায় যার ঝরে যাবার কথা, সে ভোরেই ঝরে গেল।

—চার—

ক'দিন কাটল।

অনিল কিছুতেই আর মনকে স্থির রাখতে পারছিল না। ভাবলে, একদিন সে এ বিষয় জানাবে পুলিশ বিভাগকে। সমাজের বুকের ওপর এভাবে সে অন্যায় অত্যাচারকে কিছুতেই চলতে দেবে না।

করলও ঠিক তাই।

অনিলের এক বন্ধু বিকাশ। সে কাজ করত পুলিশ বিভাগে।

অনিলের সঙ্গে দেখা হলো তার একদিন।

—আরে বিকাশ যে! আয় আয়। কী খবর?

—এই ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। তুই তো ইদানীং বেশ নামকরা লেখক আর সীন নাট্যকার হয়ে উঠেছিস। তোর সঙ্গে কথা বলতে পাওয়াও কম গৌরবের নয়।

—কি যে বলিস! হাসল অনিল। বলল—একটা আশ্চর্যের কথা কি জানিস, আমিও মনে মনে তোকেই খুঁজছিলাম কিছুদিন ধরে। ভগবান কেমন মিলিয়ে দিলেন দেখ।

—তুই সাহিত্যিক আর আমি পুলিশ। সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর লোক। আমাকে খুঁজছিলিস কেন?

—একটা কাজের জন্যে।

—কী কাজ?

—তোদের পুলিশ বিভাগের ভাল ভাল সব ঘটনার ইঙ্গিৎ দিতে পারিস?

—কেন?

—তাহলে রহস্য উপন্যাস বা রহস্য নাটক কিছু লিখতে পারি।

—কথাটা মন্দ নয়।

—প্লট কিছুটা অবশ্য আমিও ভাবছি। একটা ঘটনা দেখলামও নিজের চোখে।

—কি রকম ?

অনিল তখন মালতীর ঘটনা খুলে বলল।

বিকাশ বলল—ভেরী ইণ্টারেষ্টিং।

—আমি ভাবছি এটা নিয়ে কি করা যায়।

—এই সমস্ত অসামাজিক লোকদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই উচিত।

—তা তো বটেই।

—এদের ধরতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু কে এই ভার নেবে বল ?

—অদৃশ্য দলপতি কে জানিস ?

—না।

—তুই বরং এক কাজ করতে পারিস। রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জীকে বলে দেখ না। তিনি প্রাইভেট কাজ করেন তো। ইচ্ছা করলেই কেসটা হাতে নিতে পারেন।

—তা বটে। অনিল মনে মনে তাই ঠিক করল।

০ ০ ০

ক'দিন পরে—

অনিল সত্যিই একদিন গেল দীপকের সঙ্গে দেখা করতে।

বিকাশের লেখা একটা চিঠিও ছিল অনিলের কাছে। সেটা সে দেখাল দীপককে।

দীপক তা দেখে বললে—আমি আপনার নাম শুনেছি।

অনিল হাসল। কোনও জবাব দিল না।

দীপক একটু থেমে বললে—তা কী ব্যাপারে আপনার আগমন, বলুন।

—একটা জটিল ঘটনা।

—কী রকম ?

—একটা স্মাগলিং গ্যাং, তাদের কিছু খবর জানি। তাই—

—খুলে বলুন।

তখন সব কথা খুলে বলল অনিল।

সব শুনে দীপক তো প্রায় লাফিয়ে উঠল। বললে—বলেন কি!

—ঠিকই বলছি।

—এই গ্যাং কত বড় জানেন?

—না।

—সারা ভারতে এদের শাখা আছে। শত শত লোক কাজ করে এই দলে।

—তাই নাকি? আশ্চর্য তো!

—তা বটে। এই অদৃশ্য দলপতি বিরাট একটা দস্যুদলের মাথা। লোকে তাকে চেনে না। কিন্তু আমি চিনি।

—স্ট্রেঞ্জ!

—যাক, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এই কেসটি অনেক আগে থেকেই তদন্ত করছি। তবে যাদের কথা বললেন আপনি, তারা সবাই চুনোপুঁটি।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। তবে তদন্ত কিছুটা এগোলে সব জানাব আমি আপনাকে।

—ধন্যবাদ। অনিল বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

বাড়ি ফিরল অনিল বিকেল নাগাদ।

চাকর গোপাল তাকে বলল—একজন লোক দেখা করতে এসেছিল বাবু।

—কী নাম?

—নাম বলেনি। আপনি নাকি তাকে অনেক দিন ধরেই চেনেন।

—কী রকম দেখতে?

—আজ্ঞে দোহারা চেহারা। পরণে পাজামা আর পাঞ্জাবি। কিন্তু মুখটা ভাল নয়।

—তার মানে?

—মানে দেখলে গুণ্ডা বলে মনে হয়।

—ও।

—আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছে সেই লোকটা।

—কৈ দেখি?

—এই যে।

একটা চিঠি বের করে দিল গোপাল অনিলের হাতে। গোপাল লেখাপড়া জানে না। জানলে চিঠিখানা পড়ে সে নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যেত। তাতে লেখা:
প্রিয় অনিলবাবু,

আপনি সাহিত্যিক এবং আপনাকে বেশ ভদ্রলোক বলেই আমরা জানি। আপনি কেন মিথ্যা এই সব ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চান?

আপনি জানেন না, আমরা কারা।

আমাদের দলটা বিরাট ও সুসংবদ্ধ। তা যদি ঘুণাক্ষরে জানতেন তবে কখনোই এমন বোকামির কাজ করতেন না।

যা হোক, ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের বিরুদ্ধে লাগতে যাবেন না। ভীমরুলের চাকে ইচ্ছে করে ঘা দেবেন না। নইলে ফল খুব মারাত্মক হবে।

আশা করি ভবিষ্যতে কথাটা মনে রেখে কাজ করবেন। ইতি—

অদৃশ্য বন্ধু।

চিঠিটা উল্টে পাল্টে দেখল অনিল। হাতের লেখা অপরিচিত।

অনিল ভাবতে লাগল, কী করা যায়। একটু চিন্তা করে সে গেল সোজা থিয়েটারে।

ম্যানেজার বললেন—আপনি!

—হ্যাঁ, বিশেষ কাজে।

—কী কাজ?

—একটা ফোন করব।

—কাকে?

—এক বন্ধুকে।

—বেশ করুন।

অনিল তখন ফোন করল দীপককে।

—হ্যালো…

—কে?

—আমি অনিল।

—ও। বলুন?

—ব্যাপার বেশ জটিল।

—কী রকম?

—বাড়ি ফিরেই অচেনা লোকের ভয় দেখানো একটা চিঠি পেলাম।

—তাই বুঝি। একটা কথা—

—বলুন।

—আপনি আমার কাছে আর এখন আসবেন না।

—কেন?

—ওরা নজর রেখেছে। বিপদে পড়তে পারেন।

—তাহলে ?

—আমার লোক কাল ছদ্মবেশে দেখা করবে আপনার সঙ্গে ।

—বেশ ।

—কাল বিকেল পাঁচটায় থিয়েটারের দরজার কাছে যে পাগল ভিখিরিটাকে দেখবেন তারই হাতে দিয়ে দেবেন ঐ চিঠিটা ।

—ঠিক আছে ।

—মনে থাকবে তো ?

—নিশ্চয়ই ।

রিসিভার নামিয়ে রাখল অনিল ।

• • •

কিন্তু ঘটনা মোড় ফিরল নতুন এক আবর্তে ।

সেদিন বিকেলের ডাকে অনিল একটা চিঠি পেয়ে চমকে উঠল ।

চিঠিটা লিখেছে মালতী ।

তাতে লেখা :

প্রিয় অনিলদা,

জীবনে এই প্রথম আপনাকে আমি চিঠি লিখছি দায়ে পড়ে । আশা করি চিঠিটা পড়ে একটু ভাববেন আমার কথা ।

আমি জানি, আপনি আমায় বরাবরই স্নেহের চোখে দেখে এসেছেন—আমার মঙ্গলকামনা করেছেন ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি আপনাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি ।

তবু এটুকু আমার ভরসা আছে যে, আমি যত অন্যায় করেই থাকি, আপনি আমার ওপর বিমুখ কোনদিনই হবেন না ।

এবার আসল কথায় আসি ।

আপনি তো আমার সব কথাই জানেন । ইদানীং যে দলের হয়ে আমি কাজ করছিলাম তারা হঠাৎ আমায় ভয়ানক প্যাঁচের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ।

তারা বলেছে, আমি যদি তাদের কথা মত না চলি তবে আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবে। তাছাড়া প্রয়োজন মনে করলে চিরকালের মত এ পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে পারে।

আমি তাদের দলে আর কাজ করতে না চাওয়ায় এই হুমকি।

আমার এই ঘোর বিপদের মধ্যে কেন যে আপনাকে টেনে আনতে চাইছি জানি না। এও জানি না আপনি আমায় এদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন কিনা। তবু এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া অন্য গতি আমার নেই বলেই আপনাকেই সকাতরে জানাচ্ছি : দাদা আমায় বাঁচান।

ওদের ক্ষমতা অসীম। আমার মতন অনেক অনিচ্ছুক মেয়েকেই নাকি ওরা জোর করে বন্দিনী করে বিদেশে বিক্রী করে দিয়েছে। আমার ভাগ্যে কী আছে জানি না।

আমি ভীষণ নিরুপায় আর বিপন্ন।

যদি কোনও মতে আমায় সাহায্য করতে পারেন এই আশাতেই চিঠি লিখলাম।

প্রণাম নেবেন। ইতি—

হতভাগিনী

মালতী

চিঠিটা পড়ে অনিলের হাত-পা যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মালতীর এত বড় বিপদ! এ যে সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাড়াতাড়ি কোন উপায় বের করতে না পারলে তাকে আর বাঁচান যাবে না। চিঠিটা সে যত্ন করে পকেটে রাখল। ভাবল—এটাও সে দীপকবাবুর সহকারীর হাতে দেবে।

।। ছয় ।।

কলকাতা শহরের এক প্রান্তে চলেছে একটি গুপ্ত সভা।

সভায় উপস্থিত ২০/২২ জন লোক। কথা বলছিল আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত একটি মূর্তি।

তাকে সকলে দলপতি বলেই মান্য করে।

দলপতি তখন বলছিল :

—আমাদের কাজের পদ্ধতি এবার কিভাবে বদল হতে চলেছে, সে সম্পর্কে সব কিছুই তোমাদের জানিয়েছি। এটা বিংশ শতাব্দী—বিজ্ঞানের যুগ। প্রতি-পদে চলেছে বিজ্ঞানের প্রাধান্য। প্রতিপত্তি। আমরাও তাই পুরোণ পদ্ধতি আর সাবেকি ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যদি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারি কিম্বা না চাই তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমরা তাই আমাদের আগেকার প্রণালী ত্যাগ করে নতুন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এগিয়ে চলব।

—আপনার আদেশ অনুসারেই আমরা বরাবর কাজ করতে সম্মত।

—বিশ্বাসঘাতকতা করবার সময় এ কথাটা নিশ্চয়ই ভুলবে না যে, বিশ্বাস-ঘাতককে খুঁজে বের করবার উপযুক্ত এক ধরণের যন্ত্র আমি আবিষ্কার করেছি। তাতে সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতককে আমার চিনে বার করতে এক মুহূর্তও দেরী হবে না। এবং তার শাস্তিও আমি কী দিয়ে থাকি তা তোমাদের অজানা নয়।

—হ্যাঁ, আমরা তা জানি।

—হনুমানপ্রসাদের কথা নিশ্চয় তোমরা এখনো ভোলনি ?

—কর্তা, সে এখন অন্ধ হয়ে খিদিরপুরের পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।

—থাক সে কথা। আমার কাছে কথার চেয়েও কাজ বড়। শোন বিজয়রাম, তোমার উপরে আমি দক্ষিণ কোলকাতার ভার দিলাম। যে যে বাড়িতে তোমায় হানা দিতে হবে তার তালিকা আমি তোমায় দিচ্ছি।

—আজ্ঞে, পারিশ্রমিক—

—অবশ্যই পাবে। আমার কাজ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায়নি এমন লোক এখনো পর্যন্ত কেউ নেই এই পৃথিবীতে।

—আর সাহায্য ?

—হ্যাঁ, তোমার যা যা সাহায্যের দরকার তা নিশ্চয়ই পাবে। তুমি সেগুলি তেরো নম্বর কুঠি থেকে নিয়ে যেও। তোমার সংকেত থাকবে—লাল গোলাপ। বুঝেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এবার সামসুল, তোমার খবর বল।

সামসুল উঠে দাঁড়াল। তারপর সসম্ভ্রমে বলল—নতুন খবর আর কিছু নেই কর্তা। শুধু জানাবার আছে যে, গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী বড্ড বিরক্ত করতে শুরু করেছে আমাদের। মালতীর কেস নাকি ও নিজের হাতে নিয়েছে তদন্ত করতে।

—জানি।

—তাহলে তো পুলিশের তীক্ষ্ণ তদন্তের সামনে পড়ে আমাদের নানান অসুবিধের সামনা সামনি হতে হবে কর্তা।

—তুমি ভুল করছ সামসুল। এবার পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করবার জন্যে উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ নিয়েই শুরু হবে বাজপাখির সংগ্রাম। এবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশীর্বাদে আমি সকলের চোখের সামনে নিঃসংকোচে কাজ করে যাব অথচ আমায় ধরা-ছোঁয়ার এতটুকু সুযোগ বা সুবিধে কারুর থাকবে না।

—দীপক চ্যাটার্জীর ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় কর্তা ?

—দীপক চ্যাটার্জীকে নিয়ে তোমাদের বিশেষ কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি যথা সময়েই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

—সে তো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু বর্তমানে ?

—বর্তমানে দু'জন অনুচরকে নিযুক্ত রাখা হবে তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে। তার প্রতিটি কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে তারা আর সঙ্গে

সঙ্গে রিপোর্ট জানাবে আমাকে। আমাদের অনুচরদের সব সময় মনে রাখতে হবে—তারা যেন কোন অবস্থাতেই দীপকের মুখোমুখি না পড়ে।

—বুঝলাম। এবার দয়া করে বলুন কর্তা, আমাদের কার কার উপরে আপনার পরবর্তী কী কী কাজের ভার দিচ্ছেন?

—বলছি, শোন।

—বলুন।

—রহিম!

—কর্তা—

—তোমার উপরে ভার রইল প্রথমতঃ ঐ চোরা আবগারি মালপত্র বিদেশ থেকে আসার পর তার হিসেব রাখা ও বিক্রী করা।

—ঠিক আছে।

—মালের দাম কতটা কী হতে পারে তা আমার অজানা নয়। কাজেই টাকার কোন হেরফের ঘটলে সে দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। বুঝেছ?

—হ্যাঁ, কর্তা।

—লক্ষ্মণপ্রাসাদ!

—কর্তা—

—তুমি মেয়ে পাচারের ভার নেবে।

—যা হুকুম করবেন।

—গাঁয়ের সরল আর সাদাসিধে মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আনাবার কথা ভাবছ তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

—না, শুধু ওতে চলবে না।

—কেন কর্তা? বেশ অবাক হয় লক্ষ্মণপ্রসাদ।

—কারণ আছে। বিদেশে ঐ সব বাজে গেঁইয়া মেয়ে পাঠিয়ে যে দাম

পাওয়া যায় তাতে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে এক পয়সাও লাভ থাকে না। খদ্দের ঐ সমস্ত মেয়ের জন্য ভাল দাম দিতে চায় না।

—তাহলে ?

—আমি চাই শহুরে শিক্ষিতা স্মার্ট মেয়ে।

—আজ্ঞে—

মাথা চুলকোয় লক্ষ্মণপ্রসাদ।

—ভাবছ, অমন মেয়ে পাওয়া শক্ত ?

—হ্যাঁ কর্তা।

—তুমি একটি রাম-বোকা।

—বোকা ?

—হ্যাঁ। কারণ এই বিদেশী প্রভাবের যুগে শুধু টাকা থাকলেই হয় না সেই সঙ্গে বুদ্ধিও থাকা চাই। টাকার টোপের সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রেমের অভিনয় করলেই দেখবে বহু মেয়ে এসে জালে জড়িয়ে যাবে। তারপর বাছাই করে বোঝাই কর।

—বুঝেছি কর্তা। তাই হবে। একটা কথা ছিল কর্তা।

—বল।

মালতী মেয়েটা উড়ু উড়ু করছে ইদানীং। ওকে যদি একেবারে খতম না করে আমরা—

—বিক্রী করতে চাও ?

—হ্যাঁ কর্তা।

—বেশ তো। নিয়ে যেও।

—কোথায় ?

—তিন নম্বর আড্ডায়।

—ঠিক আছে কর্তা।

—বিলায়েৎ খাঁ!

—জী হুজুর।

—তুমি তো নতুন ঢুকছে আমার দলে। তাই না?

—জী।

—কিন্তু অল্পদিনের কাজেই তুমি আমাকে খুশী করেছ।

—হুজুরের মেহেরবানি।

—মেহেরবানি নয়। আমি সত্যিকারের কাজের লোককে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে দিয়ে থাকি।

—শুনেছি হুজুর।

—শোন, তোমার কাজ হবে মেয়েদের দল নিয়ে সমুদ্রতীর থেকে জাহাজে বোঝাই করা। তবে একটা কথা—

—বলুন হুজুর।

—জাহাজে তোলার আগে ওদের কাছ থেকে ঠিক ঠিক টাকা বুঝে নেবে। উপযুক্ত দাম হাতে না নিয়ে মাল ছাড়বে না।

—ঠিক আছে হুজুর।

—তাহলে তোমাদের কর্তব্যকাজ ঠিকঠাক বুঝে নিয়েছ তো সকলে?

—হাঁ। সকলে সমস্বরে জানাল।

—আমি তাহলে চলি। তোমাদের টাকা ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে তোমাদের হাতে।

কালো মূর্তি সবাইকার দিকে তাকিয়ে দু'বার হাত নেড়ে বিদায় নিল।

সে চলে যাওয়ার পর ঘরের এক কোণের দেওয়ালের মাথায় একটা লাল আলো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল দু'বার। তারপর নিভে গেল।

এরা সকলে বুঝল। রাস্তা পরিষ্কার, এবার বেরোন চলে।

ওরা তৈরী হলো। ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলল না তাকাল না পর্যন্ত। দলের এটাই নিয়ম। দলপতির এটাই নিষেধ।

রাত তখন বারোটা।

॥ সাত ॥

দুপুরবেলা—

প্রচণ্ড রোদ্দুরে পথ-ঘাট প্রায় ফাঁকা।

অনিল বসে বসে নিজের ঘরের ফ্যান পুরোদমে চালিয়ে বই লিখছিল।

তার মন ছিল তন্ময়।

দৃষ্টি ছিল খাতার পাতায় নিবদ্ধ। হঠাৎ—

খস্ খস্ শব্দ উঠল জানালায়।

ফিরে তাকাল অনিল।

একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

চমকে উঠল অনিল।

তার টেবিলের ড্রয়ারে ছিল একটা ছোরা। সে লাফ দিয়ে উঠে ড্রয়ার টেনে ছোরাটা মুঠোয় তুলে নিল।

আশ্চর্য!

সে ঘরের বাইরে পা দেবার আগেই শুনল ধুপ্ করে ভারী কিছু পড়ার শব্দ।

লোকটা লাফ দিল জানালা থেকে নীচে।

অনিল দৌড়ে বাইরে এল।

ততক্ষণে লোকটা জোরে দৌড়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে।

এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়াল অনিল। নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল।

তারপর সেও দৌড় দিল লোকটির পিছু পিছু। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না।

মোড়ের মাথায় এসে দেখে, একটা কালো রঙের মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে লোকটা দৌড়ে গিয়ে উঠল সেই গাড়িতে। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল লোকটা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা ছুটতে শুরু করল।

অনিল দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটাকে পাকড়াও করতে না পেরে সে হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবল, আর একটু জোরে দৌড়তে পারলে সে নিশ্চয়ই তাকে ধরতে পারত। বোঝা যেত তাহলে কে, কী উদ্দেশ্যে, তার বাড়িতে হানা দিতে গেছিল।

পরক্ষণেই ভাবল, তা না করে সে ভালই করেছে, অনিল একা আর ওরা দলবল নিয়ে এসেছিল। গায়ের জোরে ওদের সঙ্গে পারত না। কে বলতে পারে ওদের অস্ত্রশস্ত্র কিছু ছিল না? যারা দিন-দুপুরে পরের বাড়িতে চড়াও হতে ভয় পায় না, তাদের হাতে বন্দুক-রিভলবার-ছোরা থাকা বিচিত্র নয়। সে পেশাদারী নয় সুতরাং ছোরা হাতে করেও তাদের ঠেকাতে পারত না।

অনিল ফিরে এল ভাবতে ভাবতে।

যে জানালা বেয়ে লোকটা উঠেছিল কি ভেবে তার সামনে আসতেই দেখে —একটা মোচড়ানো কাগজ পড়ে আছে।

কৌতূহলী হয়ে সেটা তুলে নিল সে।

একটা চিঠি।

তাতে লেখা :

প্রিয় অনিলবাবু,

আপনার সাহসের তারিফ করি। কিন্তু একটা কথা। একটা মাত্র ছোরা নিয়ে একদল মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া যতই সাহসিক ব্যাপার হোক, তবু সেটা নিছক বোকামি। এত বড় বুকের পাটা ভাল নয়।

আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তবে এ ব্যাপারে আর নাক গলাতে আসবেন না; নতুবা ভয়ংকর বিপদে পড়বেন তা বলে রাখছি। আমি অযথা কাউকে আঘাত হানতে চাই না বলেই আপনাকে আবার সাবধান করে দিলাম।

যদি এর পরেও সংযত না হোন, তবে কিন্তু নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারবেন।

আশা করি এতেই আপনার শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে। ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের হাঁড়িতে কাঠি দিতে আসবেন না। ইতি—

অদৃশ্য বন্ধু।

চিঠি পড়ে অনিল বুঝল, সে গোখরো সাপের লেজে পা দিতে বসেছিল। ওদের দলের কেউ না কেউ অহরহ তার কার্যকলাপের উপর শ্যেন নজর রেখেছে।

কয়েক সেকেণ্ড হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও অনিল ফের তার সাহস ফিরে পেল।

সে সাহিত্যিক। সে সত্য-সন্ধানী। রবীন্দ্রনাথের বাণী তার কর্ণে অনুরণন তুলল:

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥"

সত্যকে এড়িয়ে গেলে, অন্যায়কে ভয় পেলে সত্যিকারের সাহিত্যিক হওয়া যায় না।

সে ভাবল, আজ নিশ্চয়ই দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করবে। কিম্বা তার সহকারীর সঙ্গে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

অন্ধকার নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে।

ঠিক এই সময়ে অনিল এগিয়ে চলল থিয়েটার হলের দিকে।

ভাল বই হচ্ছে তাই খুব ভীড়।

অনিল খুব খুশি হলো।

তারই লেখা নাটক চলছে হলে। দর্শক তৃপ্ত হয়েছে নাটক দেখে। অনিলও সার্থক মনে করল নিজের পরিশ্রমকে।

থিয়েটারে ঢুকছিল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

দেখতে পেল একটা পাগল ভিখিরি থিয়েটারের গেটে দাঁড়িয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করছে।

দর্শকদের কেউ হাসছে, কেউ বিরক্ত হচ্ছে। কেউ টিট্‌কিরি দিচ্ছে, কেউ বা ক্রুদ্ধ মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে—একটা জনবহুল থিয়েটারের সামনে ঐ রকম বিতিকিচ্ছিরি লোককে, তাড়িয়ে না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবার জন্য।

অনিল তার কাছাকাছি হলো।

পাগল অনিলকে দেখে হঠাৎ চুপ করে বসে পড়ল। তার অভিনয় বন্ধ হলো।

যারা এতক্ষণ মজা লুটছিল তারা বিরক্ত হলো।

কেউ বলল—এই পাগ্‌লা।

কেউ বলল—এই দিওয়ানা।

নানা জনে নানা কথা বলল।

কিন্তু পাগল আর অঙ্গভঙ্গী করল না। চুপ করে বসে রইল।

জনতা তখন হতাশ হয়ে ভীড় হাল্‌কা করে চলে গেল। সামনের দরজা ফাঁকা হয়ে পড়ল।

পাগল ইতিউতি তাকাচ্ছিল চঞ্চল দৃষ্টিতে। তারপর সুযোগ বুঝে ফিসফিস করে বলল—এনেছেন?

—হ্যাঁ।

—দিন।

—আপনি?

—আমি দীপকের সহকারী। আমার নাম রতনলাল,

—প্রমাণ?

রতন এদিক ওদিক চেয়ে টপ করে ছেঁড়া জামার পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বার করে দেখাল।

—ঠিক আছে।

রতন কার্ডটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

অনিল তখন রতনের হাতে দুটো চিঠিই তুলে দিল একে একে।

রতন বললে—দুটো চিঠি যে?

—হ্যাঁ। দুটোই দরকারী।

—বেশ। এবার আপনি ভেতরে চলে যান। আশে পাশে শত্রুপক্ষের লোক থাকতে পারে। তারা আপনাকে আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দেখলে সন্দেহ করবে। তাতে আমাদের দু'জনেরই বিপদ।

—বুঝেছি।

—আর শুনুন, এই কথা গল্পচ্ছলেও আর কারুর কাছে বলবেন না।

—বলব না।

—এবার যান।

অনিল তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

রতন আরও খানিকক্ষণ বসে রইল সেখানে। পাগলের মত ব্যবহার করতে লাগল মাঝে মাঝে। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নজর ছিল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। যখন নিঃসন্দেহ হলো, কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি, তখন সে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করল।

ওদিকে অনিলও তখন মুগ্ধ-বিস্ময়ে ভাবছে, বাস্তবিক, গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর কাজ করার পদ্ধতিই আলাদা। যেমন বিচিত্র তেমনি মৌলিক।

॥ আট ॥

সেদিন সকালে—

ক'দিন থেকে কাজে যায়নি মালতী। এসব বেআইনী কাজ আর তার মোটেও ভাল লাগছে না। তাছাড়া শরীরও ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসছে।

এ লাইনে আসার পর বাড়ির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছিল। উপায়ও ছিল না। এ লাইনে কাজ করতে গেলে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না। তাতে অনেক অসুবিধে, অনেক বিপদ। দলই তাকে নিষেধ করেছিল। তাছাড়া তার চালচলনে মামা-মামীও উৎসাহিত হননি। তাই কোলকাতার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সে একাই বাস করছিল।

ফ্ল্যাটের ভাড়া অবশ্য তাকে দিতে হতো না। নিজেদের স্বার্থে দলই সেই খরচ বহন করত। এমনকি একটা টেলিফোনেরও বন্দোবস্ত ছিল মালতীর ফ্ল্যাটে।

সেদিন সকালে মালতীর টেলিফোন খবর হয়ে উঠল।

—হ্যালো....

—কে, মালতী?

—হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

—আমি রহস্যসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী।

চমকে উঠল মালতী।

—আপনি! হঠাৎ—?

—কথা আছে।

—বলুন।

—আমি জানি আপনি কী করেন। সব খবরই আপনার রাখি। কিন্তু আমি চাই না আপনার মত একজন ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে বিপদে পড়ুক। তাই যা বলি মন দিয়ে শুনুন। আমাকে আপনি অপনার হিতৈষী বলে মনে করতে পারেন। অবশ্য আমার কথামত কাজ করা বা না-করা আপনার ইচ্ছা।

একটু চিন্তা করে মালতী বলল—বেশ, বলুন কী বলতে চান ?

—আপনি যে দলের হয়ে কাজ করছেন তারা যে কী সংঘাতিক প্রকৃতির তা কি জানেন ?

—কিছুটা জানি।

—আমি কিন্তু সবটা জানি। তাই আপনাকে এই সতর্ক করে দেওয়া।

—ধন্যবাদ।

—শুনুন, পুলিশী অভিযান খুব শীগগীরই হবে দলের বিরুদ্ধে। বড় বড় রুই-কাৎলা সব ধরা পড়বে পুলিশের জালে। আপনাদের মত চুনো-পুঁটিরাও রেহাই পাবে না। তাই আমার একান্ত অনুরোধ বর্তমানে আপনি কোন কাজ-কর্ম অবশ্যই হাতে নেবেন না। মনে থাকবে ?

—থাকবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন।

—কী ?

—এত লোক থাকতে, আমাকেই বা বিশেষ করে এভাবে আপনার সাবধান করে দেওয়া কেন ?

—কারণ আছে।

—কী সেই কারণ ?

—অনিলবাবুকে চেনেন নিশ্চয়ই ? নাট্যকার ?

—হ্যাঁ। তাঁকে আমি দাদার মত ভক্তি করি।

—তাঁর অনুরোধেই আমি আপনাকে বাঁচাতে চাইছি। তাই এই সতর্কবাণী।

—ধন্যবাদ। আর কিছু বলবেন ?

—না।

রিসিভারটা ক্রেডেলের উপর নামিয়ে রাখল মালতী। তারপর আকাশ পাতাল ভাবতে বসল।

ঘণ্টাখানেক পর—

আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা।

—হ্যালো…

—কে, মালতী ?

—হ্যাঁ। আপনি কে ?

—আমি তোমাদের দলের কর্তা। আমাকে তুমি চিনবে না।

—বলুন।

—শোন, তুমি আজ বিকেলে আমার দলের লোকের সঙ্গে দেখা করবে অতি অবশ্য। ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় তুমি আসবে ন্যাশনাল হোটেলে। চেনো তো সেটা ?

—চিনি।

—বেশ। হোটেলের ম্যানেজার মিঃ আয়ারের কাছে তোমার নাম আর সংকেত বলবে। তা হলেই তিনি আমার দলের লোকের সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবেন। তারপর কী করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ সেই লোকটিই তোমায় দেবে।

—কিন্তু একটা কথা—

—বলো।

—আমি আর এই বেআইনী কাজ করতে চাই না।

—কেন ?

—কারণ এতে আমার সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু জুটবে না কপালে।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে একটা ঠাণ্ডা হাসির স্রোত ভেসে এসে মালতীর সর্বশরীর যেন অসাড় করে দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে অবাক হলো দলপতির কথা শুনে। দলপতির বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলছেন তখন :

—আমি তোমার বাধা বুঝি। তুমি চাও ঘর বেঁধে সুখী গৃহকোণ রচনা করতে ? বেশ, তোমায় বাধা দেব না। অনিচ্ছুক কর্মীকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে দলের। কাজ তোমাকে করতে হবে না আর।

—সত্যি ?

—সত্যি। তবে এ কথা জানাজানি হয়ে পড়লে দলের অন্য মানুষেরা ক্ষেপে উঠবে ভয়ে। পাছে তুমি তাদের অনিষ্ট কর। তাই তুমি কাজ ছাড়লেও ওরা তোমায় ছাড়বে না। যে ভাবেই হোক প্রতিশোধ নেবেই। তোমাকে তাই নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে আমায়। আর তোমার শেষ জীবন যাতে সুখে কাটে তেমন ব্যবস্থা করব।

—কী ভাবে ?

—এলেই জানতে পারবে।

—আপনি তাহলে কথা দিচ্ছেন ? এই শেষবার। আর আমায় এই পাপ কাজ করতে হবে না ; আমায় মুক্তি দেবেন ?

—কথা দিচ্ছি।

—বেশ, আমি যাব।

—এলেই দেখতে পাবে শুধু তুমি নও, তোমার মত আরও ২৫/৩০টি মেয়ে যারা এই একই কাজে লিপ্ত ছিল—এখন মুক্তি চাইছে, তাদের সবাইকেই আমি কথা দিয়েছি ছেড়ে দেবার—নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার—তারাও এসেছে সেখানে। তারপর তোমরা কিছুদিনের জন্য যাবে আমার এক নিরাপদ আশ্রয়ে, যতদিন না সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হচ্ছ ততদিন থাকবে। তারপর স্বাধীন।

—ধন্যবাদ।

কানেকশান কেটে গেল।

মালতী ভাবতে লাগল, এখন কী করবে সে ? যাবে দেখা করতে ? দোষ কী তাতে ? দলপতি তো পরিষ্কার বলেই দিলেন যে আর তাকে কাজ করতে হবে না। তবে আর চিন্তা কীসের ?

মালতী মনস্থির করে।

হ্যাঁ, সে দেখা করবে দলপতির সঙ্গে।

॥ নয় ॥

সন্ধ্যা ছটা।

চৌরঙ্গীর ন্যাশনাল হোটেলে গেল মালতী কর্তার লোকের সঙ্গে দেখা করত।

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল সে॥

—কী চাই ?

—আমি মালতী।

—সংকেত ?

—কনক চাঁপা

—ঠিক আছে। আপনি রুম নাম্বার ২৩শে অপেক্ষা করুন। কর্তার লোক আসবে। সব শুনেছি। উইশ ইউ গুডলাক। আপনার মত আরও অনেক মেয়েই অপেক্ষা করছে সে ঘরে।

ম্যানেজার বেল বাজাতেই একজন বেয়ারা এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

—মেমসাবকো তেইশ নম্বর কামরামে লে যাও। আপনি যান ওর সঙ্গে।

মালতী গেল।

সেই ঘরে ঢুকে মালতী দেখল, আরও ৫টি সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ে সেখানে বসে আছে।

তারই মত মুক্তি পিয়াসী তারাও।

হঠাৎ ঘরের কোণে একটা দৃশ্য দেখে সে বেজায় হকচকিয়ে গেল।

একজন লোক হাতে উদ্যত রিভলবার নিয়ে বসে।

—একি! কে আপনি? এমন ভাবে পিস্তল উঁচিয়ে বসে কেন?

—আমি আপনাদের গার্ড। কর্তার আদেশে আপনাদের পাহারা দিচ্ছি। তা না হলে আপনারা বিপন্ন হতে পারেন কিনা।

মালতী চুপ। কথাটা অমূলক নয়।

একজন···দু'জন···তিনজন···

এমনি করে আরও মেয়ে আসতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল—সেই ঘরে মোট আঠারটি সুন্দরী মেয়ের সমাবেশ ঘটেছে।

মালতী অবাক হলো।

বাব্বাঃ এত মেয়ে কাজ করত এই দলে? আরও কত আছে কে জানে। সবাই সুন্দরী আর অল্পবয়স্কা। কিন্তু কেন এল এই দলে? অভাবের তাড়নায়? তার মত সিনেমায় তরকা হবার লোভে? টাকার লালসায়?—কী যে হতে পারে কারণ তা বুঝতে পারল না মালতী। পাশের কাউকে জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। গার্ডের কড়া মানা। এখন এখানে কোন কথা নয়। কর্তার হুকুম।

ইতিমধ্যে আরও জনা চারেক লোক এসে সেই ঘরে ঢুকল। তারা পিস্তল-ধারী লোকটির সঙ্গে নিচুস্বরে কী সব আলাপ করলে। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মেয়েদের।

তারপর তারা এগিয়ে গেল মেয়েদের দিকে। কোন প্রতিবাদ, কোন বাধা মানল না। অসভ্য ইতরের মত প্রত্যেকের গায়ে হাত দিয়ে, উঠিয়ে-বসিয়ে-ঘুরিয়ে নানান ভাবে পরীক্ষা করতে লাগল। মেয়েরা অনেকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল। সে ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করল।

কিন্তু সব বৃথা।

সেই পিস্তলধারী সঙ্গে আরও একজন এসে যোগ দিয়ে পিস্তল দেখিয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা করে রাখল।

মেয়েরা অনেকে কেঁদে ফেলল। মালতীও।

বুঝল তারা ভীষণ ভাবে ঠকে গেছে। ভয়ানক এক ফাঁদে পড়েছে।

॥ দশ ॥

দরদাম ঠিক হলো।

তারপর এলেন একজন ডাক্তার। কোণের সেই পিস্তলধারী লোকটির নির্দেশে তিনি মেয়েদের শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষা করার অজুহাতে তাদের প্রত্যেককে অজ্ঞান করার ইনজেকশান দিতে শুরু করলেন।

ধীরে ধীরে একেকটি মেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়তে লাগল ঘরের মেঝেয়।

মালতীকেও ইনজেকশান দেওয়া হলো।

সবাই অজ্ঞান হয়ে গেলে তাদের ঠিক গরু ভেড়ার মত করে গুণে গুণে একটি বড় আর ঢাকা ভ্যানে তোলা হলো।

প্রতিবাদ করবে কে?

সকলেই তো দলের লোক।

অবশেষে 'মাল' বোঝাই শেষ হলে ভ্যান স্টার্ট দিল। ছুটে চলল পূর্ণ বেগে।

অকস্মাৎ ঘটল এক অঘটন।

খিদিরপুর ব্রীজের মুখেই একটি ট্রাফিক পুলিশ হঠাৎ আটকে দিল ভ্যানটাকে। জিজ্ঞাসা করল—এতে কী আছে?

—বকৃরি হুজুর।

—দেখব।

—কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন হুজুর। এই নিন, পান খাবেন। —বলে দশটাকার খান পাঁচেক নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়ি আবার ছুটে চলল নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে।

• • • • •

মালতীর জ্ঞান ফিরল।

সে দেখে—সে একটা জাহাজের খোলের মধ্যে বন্দিনী।

জাহাজ তখনও ছাড়েনি। শীগগীর হয়তো ছাড়বে। কারণ স্টীম দেওয়া হচ্ছিল পুরোদমে।

ভয় পেল মালতী।

ভোঁ-ও-ও-ও…

জাহাজ শব্দ করল।

তীর ছাড়ার সংকেত।

মালতীর সারা দেহ ভয়ে কুঁকড়ে এল। কোথায় কোন বিদেশে তাদের চালান করা হচ্ছে কে জানে। ভবিষ্যতে কী লেখা আছে কপালে কে জানে।

হঠাৎ—

জাহাজের পাশে প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ আওয়াজে কোন স্টিমলঞ্চের ইলেকট্রিক হর্ণ বেজে উঠল।

পুলিশ—

জল এবং স্থল দুই বিভাগ মিশিয়ে।

জাহাজের দু'পাশে দু'টি লঞ্চ। তাতে বন্দুক হাতে পুলিশের দল। ঘেরাও করেছে জাহাজটিকে।

—বাজপাখি! অবিলম্বে আত্মসমর্পণ কর। নইলে গুলি চলবে!—দীপক চ্যাটার্জীর আদেশ শোনা গেল মাইকে।

কিন্তু কোন উত্তর নেই।

বাজপাখি জলে ঝাঁপ দিল। কাছাকাছিই ছিল একটি স্পীডবোট। সাঁতার দিয়ে তাতে উঠে পালাল।

দীপক সহজে হার মানার পাত্র নয়। সে এই জাহাজের ভার লালবাজারের সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর মিঃ গুপ্ত আর সহকারী রতনলালের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেও একটা পুলিশের স্পীডবোট নিয়ে তাড়া করলে বাজপাখিকে।

গঙ্গার জল কেটে সমুদ্রের দিকে উল্কাবেগে ছুটে চলল দু'টি স্পীডবোট।

০ ০ ০ ০ ০

সুন্দরবনের কাছে এসে বাজপাখির স্পীডবোটের তেল ফুরিয়ে গেল। আর উপায়ন্তর না দেখে বোটটাকে তীরে ভেড়াল বাজপাখি। প্রায় নিরস্ত্র সে।

বোটেও অস্ত্র নেই। শুধু একটা হাত কুড়ুল ছাড়া। ওদিকে দীপকের হাতে রিভলবার।

বাজপাখি অসীম সাহসে ভর করে বনের মধ্যে প্রবেশ করল। একটু পরেই দীপকও এসে পৌছল সেখানে। ব্যাপার দেখে সে তক্ষুনি কাছাকাছি ডায়মণ্ড-হারবার পুলিশ স্টেশনে খবরটা প্রচার করে দিলে।

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটছে বাজপাখি। তাকে অনুসরণ করে দীপক। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। কাছাকাছি ছিল দুটো বুনো কুকুর। তারা বাজপাখিকে আক্রমণ করল। বাজপাখিও ঘুরে দাঁড়াল। হিংস্র, রক্তলোলুপ দুই ভীষণকায় কুকুরের সঙ্গে লেগে গেল তার লড়াই।

আত্মরক্ষা করতে করতে কুড়ুলের ঘায়ে একটা কুকুরকে নিকেশ করে ফেলল সে। আরো একটা আছে তখনো। সেটা পেছন থেকে আক্রমণ করল বাজপাখিকে। বাজপাখি পড়ে গেল। আর বুঝি রক্ষা নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময় দীপকের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। অপর কুকুরটাও প্রাণহীন দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল বাজপাখি। বললে—প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ দীপক চ্যাটার্জী। কোনদিন সুযোগ পেলে এর প্রতিদান তুমি পাবে।

দীপক হেসে বললে—আগে সুযোগ তো তুমি পাও তারপর না হয় প্রতিদান দিও। আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি বাজপাখি।

—কাজটা কি ভাল করলে বন্ধু? আমার প্রাণ বাঁচালে কি যাবজ্জীবন জেলের ঘানি টানবার জন্যে? এতটা অনুদারতা আমি তোমার কাছে আশা করিনি দীপক চ্যাটার্জী। বেশ। চল, কোথায় নিয়ে যাবে। ওহোঃ সঙ্গে ফোর্সও এনেছ দেখছি। একেবারে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছ। আসুন আসুন মিঃ গুপ্ত। হাতকড়া পরবার জন্য হাত আমি বাড়িয়েই রয়েছি।

এই বলে বাজপাখি দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল।

মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হলো দীপক। মিঃ গুপ্ত সদলবলে এসেছেন মনে করে

সে যেই ঘাড় ঘুরিয়েছে পেছন দিকে ঠিক সেই মুহূর্তে বিরাট একটা মুগুরের মত ভারী আর জোরাল আঘাত এসে লাগল তার চোয়ালে। দীপক মাটিতে পড়ে গেল। একটা গাছের গুঁড়িতে সজোরে মাথাটা ঠুকে গিয়ে সে জ্ঞান হারাল।

যখন জ্ঞান হলো, দেখলে—বাজপাখি উধাও; সেই সঙ্গে রিভলবারটাও। পাশেই এক চিলতে ছেঁড়া কাগজ। তাতে লেখা:

প্রিয় দীপক চাটার্জী

শিকারী বাজপাখিকে খাঁচায় পোরা অত সহজ নয়। আর একা একা ধরতে আসাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তার প্রমাণ তো পেলে। ইচ্ছে করলে তোমায় প্রাণেও মারতে পারতাম কিন্তু বাজপাখি অকৃতজ্ঞ নয়। রিভলবারটা নিজের প্রয়োজনে নিয়ে যাচ্ছি।

আশা করি আবার দেখা হবে দুজনের।

ইতি

তোমার চিরশত্রু

বাজপাখি।

দীপক চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের মনেই বললে—এক মাঘে শীত পালায় না। আবারও শীত আসবে। এদানে তুমি জিতলে কিন্তু পরের দানেই যে তুমি হার স্বীকার করবে না তাই বা কে বলতে পারে? অপেক্ষা কর বন্ধু।

রক্তরাঙ্গা রাত

রাত তখন সাড়ে নটা।

রুগীপত্র নেই, অ্যাসিস্ট্যান্টরাও চলে গেছে সকাল সকাল, তাই একাই বসেছিলাম চেম্বারে।

এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল একটি যুবক।

আমার প্রথম থেকেই ছেলেটিকে দেখে মনে চমক লেগেছিল। এবার নিশ্চিন্ত হতে বললাম, তুমি কি ধরণীর ছেলে?

—হ্যাঁ। আমার নাম শান্তনু।

তারপর একটু হেসে বলল, আমার বিশ্বাস, আপনি আমার বাবার জীবনের সবকিছু জানেন। আপনার চেয়ে বেশী কেউ তাঁকে চিনত না। আমি এই মুহূর্তে তাঁর বিষয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। সত্যি জবাব দেবেন?

আমি বললাম, জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব। কী তোমার প্রশ্ন?

—আমার বাবা আত্মহত্যা করলেন কেন? আপনি জানেন, আমার বাবা দোষীকে নিজের হাতে হত্যা করে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন?

আমি স্তম্ভিত। বছর খানেক আগে ধরণী মারা গেছে। হ্যাঁ, আত্মহত্যাই হয় তো সে করেছিল। আর খুন? সকলে না জানলেও আমি জানি, ধরণী সেই শয়তানটাকে নিজের হাতে খুন করেছিল—যে তার বাবার মৃত্যুর পর, ধরণীর অসহায় বিধবা মার নানা অভাবের সুযোগ নিয়ে এক দুঃস্বপ্নের মুহূর্তে তার চরম সর্বনাশ করেছিল। ধরণীর মা আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োলেন।

ওর প্রশ্নের কী জবাব আমি দেব? শান্তনু কতটুকু জানে, আমি জানি না। বললাম, মৃত্যুর আগে দু'মাস তোমার বাবা অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। তিনি হাইপোকণ্ড্রিয়ায় ভুগছিলেন, তার ফলে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

না, শান্তনু চেঁচিয়ে উঠল, আপনার ধারণা ভুল। আমার বাবা অপ্রকৃতিস্থ

ছিলেন না। তিনি মারা যাবার একমাস আগে শেষবার যখন দার্জিলিঙে আমার কাছে গিয়েছিলেন, তখন ভুলে ওঁর ডায়েরিটা রেখে এসেছিলেন। সেই ডায়েরি থেকে সব জেনেছি। তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল বাবা মারা যাবার পর এই এক বছর আমার হোস্টেল খরচ ওখানে ঠিকমত পৌছচ্ছে না। চিঠি দিয়েও কোন উত্তর পাই না। তাই নিজেই চলে এসেছিলাম।

আমি নীরব হয়েই ছিলাম।

শান্তনু হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বাবা লোকটিকে খুন করবার পর আপনার কাছে এসেছিলেন ?

বললাম, না, তবে খুন করার ঠিক আগের মুহূর্তে এসেছিলেন।

আমার চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে সেই সন্ধ্যার সব ঘটনা ছবির মত ভেসে উঠল।

ধরণী উদ্‌ভ্রান্তের মত সে রাতে আমার কাছে যখন এল, তখন ন'টা বাজতে সামান্য বাকি। ঠিক ন'টা বাজতেই ও কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। আপন মনে কি সব বলতে লাগল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি। লোকটা একটা মাদুর বিছিয়ে বসে আছে। কাছে কেউ নেই, জায়গাটা পরিচিত। ওকে গলা টিপে মারছি আমি।

কথাগুলি বলতে বলতে আমাকে কোনরকম সুযোগ না দিয়েই ও উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর ওকে খুঁজতে বেরুলাম। কিন্তু পেলাম না। সকালে খবরের কাগজে দেখলাম—দর্জির দোকানের বৃদ্ধ মালিক শ্যামলাল সামন্ত খুন হয়েছে, আর সেই সঙ্গে আর এক পাতায় ধরণীর রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর সংবাদ।

বলুন, চুপ করে আছেন কেন ? বলুন, আমার বাবা খুন করতে যাবার আগে কি বলেছিলেন ? শান্তনু অস্থির হয়ে উঠল।

বললাম তো, তোমার বাবা মৃত্যুর দু'মাস আগে থেকে এক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন। উনি ঘটনার আগে লোকটিকে দেখতে পেয়েছিলেন মনশ্চক্ষে। বহুদিন আগে এখানকার দোকান উঠিয়ে লোকটি অন্য জায়গায় চলে যায়। তোমার বাবা সেই জায়গার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর সেই অলৌকিক কল্পনার

ছায়ায়। তারপর সেখানে গিয়ে তিনি লোকটিকে গলা টিপে হত্যা করেন। এ কথা কেউ আজও জানে না।

হঠাৎ শান্তনু উঠে দাঁড়াতে ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। একি! তোমার প্যান্টে এত রক্ত কেন?

শান্তনু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বর্ষাতিটা চটপট পরে নিল। তারপর আমার দিকে সরাসরি চেয়ে বলল, আমার বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন, কিন্তু আমি করব না। আমি রাতের অন্ধকারে যেমন এসেছি, আবার রাতের অন্ধকারেই আমার গন্তব্যস্থলে ফিরে যাব। কেউ জানতে পারবে না।

শান্তনু অস্বাভাবিক ভাবে হাসতে লাগল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আমার বাবাকে যে কোনদিন শান্তি দেয়নি, আমি তাকে চিরদিনের মত শান্তি দিয়ে এসেছি।

তার মানে? কী পাগলের মত বকছ?

শান্তনু কয়েক মুহূর্ত ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বাবা যাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন, জীবনে কোনদিন মা বলে তাকে ডাকবার সুযোগ সে আমাকে দেয়নি, সেই মহিলা বাবার জীবনেও কোনদিন শান্তি দিতে পারেনি। বিয়ের পরই বাবা বুঝতে পারেন, বাবার দূর সম্পর্কের ভাই সুমিতের দিকে সে আকৃষ্ট। আমি আজ সন্ধ্যের সময় বাড়িতে এসে যে দৃশ্য দেখেছি, বাবার সব ব্যথা, তাঁর ডায়েরির সব পাতা একত্রিত হয়ে আমায় পাগল করে তুলল। আমি একটা শক্ত লোহার রড দিয়ে—এক বিছানায় দুজনকে—না, না, আপনি ভয় পাবেন না। আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। আমি পাচিল টপকে লুকিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম, আবার ওইভাবে বেরিয়ে এসেছি।

শান্তনু চলে গেল। ওকে বাধা দেবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারলাম না।

জানি, কাল সকালে কাগজে আবার এক নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সকলকে সচকিত করবে—এক মহিলা ও একজন পুরুষ একই বিছানায় কোন ভারী জিনিসের আঘাতে নিহত হয়েছেন। হত্যাকারীকে সনাক্ত করা যায়নি।

হত্যাকারীকে কোনদিন হয়তো সনাক্ত করা যাবে না। কিন্তু আমি কি করব? আমি নিজেই যে আহত।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বাজপাখি

শ্রীস্বপনকুমার

বাজপাখি সিরিজ—১৫ নং

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বাজপাখি

শ্রীস্বপন কুমার

প্রকাশক ঃ

শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত

মহেশ পাবলিকেশন

[illegible] ডি, রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা-৭০[illegible]

পরিবেশক ঃ

জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স

৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ২·৫০ টাকা

মুদ্রক ঃ

শ্রীমতী শক্তি রায়

নিউ শক্তি প্রেস

১/এ, অবিনাশ কবিরাজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বাজপাখি

—এক—

রাইটার্স বিল্ডিং।

বেলা দশটা বাজল।

দলে দলে কেরাণীর দল প্রবেশ করতে লাগল ভিতরে একে একে।

তাদের দেহ শ্রান্ত—মুখ গম্ভীর।

সারাদিন পরিশ্রম করতে হবে এখন, তারপর সন্ধ্যার পর মিলবে বিশ্রাম।

রমেনও তাদের একজন।

রমেন অবিবাহিত যুবক—বয়স আঠাশ হবে। সে হোম মিনিস্টারের স্টেনোগ্রাফার।

ডালহৌসীতে নামল সে।

হঠাৎ একজন প্রৌঢ় তাকে ডাকল—শুনছেন ?

—কি ?

—আপনি রমেনবাবু তো ?

—হাঁ।

—আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

—কথা !

—কিন্তু আমি তো চিনি না আপনাকে।

—তা জানি।

—তবে ?

—দেখুন আমি শীলার কাকা।

শীলা রমেনের প্রণয়িনী। সে কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

রমেন এবারে বুঝল।

বললে—শীলার কাকা আপনি—কিন্তু আপনাকে তো দেখিনি ও বাড়িতে।

—তার কারণ আছে বাবা- -আমি ওখানে তো বেশি যাই না।

—বুঝেছি।

—তোমাকে শীলা একটা প্রাইভেট কথা বলতে বলেছে বলেই আমি দেখা করছি।

—কি কথা ?

—আমার সঙ্গে গাড়িতে এসো—আমি সব কথা বলব।

—আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে।

—জানি, তাড়াতাড়ি কথা শেষ করব।

—বলুন তবে।

রমেন গাড়িতে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দ্রুত ছুটে চলল।

রমেন বললে—এত জোরে গাড়ি চলছে যে ?

চলুক, তোমাকে আবার পৌঁছে দেব।

কথায় কথায় রমেন অন্যমনস্ক হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দুটি হাত বাড়িয়ে রমেনকে অজ্ঞান করে ফেলে একটা রুমাল শুঁকিয়ে।

রমেন বাধা দিতে যায়—কিন্তু পারে না। গাড়ির গতি বেড়ে যায়।

কি একটা গন্ধ এসে লাগে রমেনের নাকে।

সে জ্ঞান হারায়।

গাড়ি তখনও ছুটে চলেছে পূর্ণ গতিতে।

* *

কিছু পরে।

মিনিস্টার তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

যথারীতি তিনি দেখলেন স্টেনো রমেন বসে আছে তার সীটে।

কিন্তু তার গলায় কমফর্টার জড়ানো। মুখের অনেকটা ঢাকা।

তিনি বললেন—কি হয়েছে তোমার ?

রমেন বিকৃতস্বরে বললে—গলায় ঠাণ্ডা লেগেছে স্যার।

—ঠিক আছে—তুমি বসে কাজ করো, আমি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি।

—অলরাইট্ স্যার।

হোম মিনিস্টার চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রমেন যেন সজীব হয়ে উঠল। সে দ্রুত গিয়ে কলিং বেল টিপল।

বেয়ারা ঢুকল।

—স্যার !

—একজন লোক এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—নিচে।

—তাকে ডাক—তুমি উপরে ফিরে এসো।

—আচ্ছা স্যার।

বেয়ারা একটু পরে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে এলো।

—তুমি যাও।

বেয়ারা চলে গেল।

রমেন বসে বসে ভাবতে লাগল নানা কথা।

হঠাৎ—

আট দশজন লোক ঢুকল ভিতরে।

তারা ওদের হাত থেকে কতকগুলো কাগজ নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে—

বেয়ারা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল ঘরে কেউ নেই। হোম মিনিস্টার ফিরে পেলেন তাঁর ঘর থেকে অনেক প্রয়োজনীয় দামী ফাইল চুরি গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রমেনও উধাও।

তিনি ফোন করতে লাগলেন পুলিশ বিভাগকে।

—দুই—

পরদিন।

প্রতিটি কাগজে ছাপা হলো :

বাজপাখির অভিনব কীর্ত্তি !

ভারত সরকারের অতি প্রয়োজনীয় দলিল চুরি।

হোম মিনিস্টারের স্টেনোর ছদ্মবেশে প্রবেশ ও অন্তর্ধান।

যথারীতি পুলিশ বিভাগ চঞ্চল হয়ে উঠল এ খবরে।

দীপক নিশ্চিন্ত ছিল না—সেও চেষ্টা করতে লাগল রহস্যভেদের।

মিঃ গুপ্ত দীপককে ফোন করলেন পরদিন।

—হ্যালো—

—কে ! মিঃ গুপ্ত ?

—ইয়েস ! আমি দীপক।

—কি খবর ?

—বাজপাখির নতুন কীর্তি জানেন ?

—হ্যাঁ।

—বিরাট আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হয়েছে বলে জানলাম।

—বুঝেছি।

—তাকে ধরতেই হবে।

—তাকে ধরতে চান ?

—হ্যাঁ।

—কি পথ তা জানেন ?

—না।

—আপনি এক্ষুণি ভ্যান আনবেন।

—কোথায় ?

—গড়িয়া অঞ্চলে।

—বেশ।

—মোড়ের মাথায় আমি থাকব। তার নতুন আড্ডার সন্ধান আমি জানি।

—তাই নাকি। বেশ আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি।

একটু পরে—

পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল গড়িয়া অঞ্চলে।

দীপক গাড়ি থেকে নামল।

দ্রুত পায়ে চলল তারা।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কোথায় তারা ?

—ঐ বড় বাড়িতে।

—ওটা তো মিঃ সেনগুপ্তের বাড়ি। এ্যাড্‌ভোকেট।

—এসব বাজে পরিচয়।

—তবে ?

—ঐ তো বাজপাখি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। দ্রুত চলুন।

পুলিশবাহিনী গিয়ে বিরাট বাড়িটা ঘেরাও করল।

ভিতরে ঢুকল তারা।

কিন্তু আশ্চর্য !

সারা বাড়িতে একটিও জনপ্রাণী নেই।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কি হলো ?

বোধ হয় পালিয়েছে।

— তা হবে।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করলেন তাঁরা। কিন্তু চুরি যাওয়া দলিলপত্র বা বাজপাখি কারও কোন পাত্তা মিলল না।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এখন উপায় ?

—কোনও ভয় নেই।

—কেন ?

—বাজপাখি পালিয়েছে বটে—তবে তাকে ঠিক বের করব।

—কোথায় ?

—এই বাংলাদেশেই।

—যদি এদেশ ছেড়ে পালায় ?

—তা আমি হতে দেব না।

—অল্ রাইট।

সকলে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো—কিন্তু বাজপাখির হদিশ মিলল না।

—তিন—

মাঝরাতে কলকাতার উত্তরদিকে সহরতলীর এই ঘিঞ্জি অঞ্চলটাতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

পথের মাঝে কিছু কিছু জল জমে আছে তখনও।

বৃষ্টিসিক্ত পথে পথিকের আনাগোনা প্রায় বন্ধ।

ঠিক এমন পরিবেশে সরু রাস্তা ধরে চারিদিক চাইতে চাইতে ধীরপদে লোকটা এগিয়ে চলেছিল, তার ভাবভঙ্গি দেখে কিছুটা সন্দেহ জাগা যে কোন লোকের পক্ষে সম্ভব।

গায়ের ওপর ভারী রেনকোট চাপান। মাথার টুপিটা সামনের দিকে এমনভাবে নামানো যে তাতে মুখের উপরাংশ সাধারণের কাছে প্রায় অদৃশ্য।

পায়ের ভারী বুটটাতে জল এবং কাদায় মাখামাখি।

লোকটা ছোট্ট টিনের চাল দেওয়া বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেকেণ্ড দুয়েক কি যেন ভাবল।

টক্ টক্ টক্…

পর পর তিনটে টোকা পড়ল দরজায়।

কোনও সাড়া নেই।

আবার শব্দ—

টক্ টক্ টক্…

বাইরের জোলো হাওয়ার করুণ নাকী কান্না যেন এই শব্দের তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর জ্ঞাপন করল।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা লোকটির জীবনে প্রথম।

সে যখন যেখানে গেছে আগে থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই গেছে। তাই কোনদিন এভাবে তাকে ব্যর্থতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি।

বাড়িটার জীর্ণ অবস্থা দেখে লোকটার মনে কেমন যেন সন্দেহ হল।

তবে কি এখানে যে থাকত সে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত? কিন্তু সে তো চিরদিনই নির্দিষ্ট নিয়মে তার উদ্দেশে টাকা পাঠিয়েছে।

বার দুয়েক পায়চারী করে লোকটি একসময় জীর্ণ বাড়িখানার পিছন দিকটায় দাঁড়াল।

নিরন্ধ্র অন্ধকার যেন বাড়িখানাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করে রেখে অদ্ভুত এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

না, আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যেতে পারে না। লোকটি মনস্থির করে ফেলল। এক্ষুণি তাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে হবে।

প্রাচীরটা টপ্‌কে বাড়ির উঠোনে লাফিয়ে পড়ল সে। ধুপ করে শব্দ হল একটা।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিতেই ভেসে এলো একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরে পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বাল্‌ল সে।

একি!

বিস্ময়ে লোকটির মুখে কোন কথা ফুটল না।

ঘরের কোণে বসে রয়েছে তার বহুদিনের প্রভুভক্ত সঙ্গী ও সাহসী সহচর রামলাল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। বুকের উপরে একটা বিরাট ছোরা আমূল বিদ্ধ।

লোকটির মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে। বার দুয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারী করল সে। কিন্তু না, কোন সূত্রই নেই। এবার মৃতদেহের উপর টর্চটা ফেলে চাইতেই একটা জিনিস তার চোখে পড়ল।

মৃতের চোখের পাশে একটা পিন্‌ ফুটানো রয়েছে একটা ছোট্ট কাগজ। তাতে একটা কালো ফুট্‌কী।

লোকটির সারা দেহের ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল।

এ ত' সেই রহমান সর্দারের দলের চিহ্ন! কিন্তু রহমান এলো কোত্থেকে! সে তো দীর্ঘদিন আগে তারই হাতে ছুরিকা বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিল। তবে কি সে মরেনি? তবে কি মরণ সাগরের ওপার থেকে প্রাণ পেয়ে ফিরে এলো কোনও একটা প্রতিহিংসাকামী সৈনিক?

উত্তেজিতভাবে বার কয়েক পায়চারী করে লোকটি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। না, এভাবে আর এঘরে সে এক মুহূর্ত ও কাটাতে পারবে না।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই তীব্র একটা হুইশেলের শব্দে লোকটির চমক ভাঙল। ভাল করে চারদিক চেয়ে দেখে দূর থেকে পাঁচ ছ'জন লোক যেন তার দিকেই ছুটে আসছে।

ওরা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী পুলিশ।

লোকটির মাথার মধ্য দিয়ে চিন্তার প্রবাহ খেলে গেল।

তাহলে রহমান সর্দার নিশ্চয়ই তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশে খবর দিয়েছে। আর বিখ্যাত দীপক চ্যাটার্জী বাজপাখির নাম শুনলে তার দলবল নিয়ে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে ছুটে আসবে।

কিন্তু না। বাজপাখিকে ধরা অত সহজ নয়। সামান্য দু'চারটে পুলিশের সাধ্য নেই বিখ্যাত দস্যুসর্দার বাজপাখিকে গ্রেপ্তার করে।

দ্রুতগতিতে নিঃশব্দে মার্জারের মত বাঁ দিকের একটা বাড়ির উপরে উঠে বসল সে। সেখান থেকে হাল্‌কাভাবে লাফ দিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে। তারপর নিরন্ধ্র আঁধারের বুকে সে যে কিভাবে মিলিয়ে গেল তার সামান্যতম চিহ্ন পড়ে রইল না পৃথিবীর বুকে।

বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী, তার সহকারী রতনলাল আর পুলিশ ইন্সপেক্টর দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই চমকে উঠলেন।

ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ।

তার চোখের ওপর পিন্ দিয়ে আটকানো একটি কালো ফুট্‌কি।

সকলে অবাক হয়ে যায়। এটা ত বাজপাখির চিহ্ন নয়।

কিন্তু ওকি! একটু ভাল করে খুঁজতেই ঘরের কোণে পাওয়া গেল আর একখানা কার্ড।

তাতে আঁকা রয়েছে একটি বাজপাখির ছবি। ঠিক যেন শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য উদ্যত।

কিন্তু এদের দুজনের একই সঙ্গে এখানে আবির্ভাব ঘটল কি করে?

আর বাজপাখির দীর্ঘদিনের সহচর রামলালকেই বা হত্যা করল কে?

—চার—

প্রতিকূল বাতাস কেটে ট্রেনখানা ছুটে চলেছিল, দুধারে ঘন জঙ্গল আর মাঝে মাঝে দু'একটা বস্তীর মধ্য দিয়ে।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের যে দুজন যাত্রী, তাদের মধ্যে একজন ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তখন নিবিষ্ট চিত্তে ডায়েরী থেকে এক টুকরো বার করে দেখছিল—তাতে লেখা : 'রহমান এবং কালো ফুটকি'।

এক সাথে দুজনের আবির্ভাব।

আশ্চর্য!

রতনলাল বাইরে আকাশের পানে তাকিয়ে কি সব আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

অকস্মাৎ রতনলালের ডাকে দীপক হাতের কাগজটা পকেটে পুরে বলে উঠল—কি রে কি বলছিস?

মৃদু হেসে রতনলাল জবাব দিল—আকাশের রঙটা দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস……

তাকে শেষ করতে না দিয়ে দীপক বলে উঠল—আকাশের রঙ তো জানি চিরকাল কবি চিত্তকেই প্রলুব্ধ করে তোলে। কিন্তু তুই কি হঠাৎ কবি টবি হয়ে উঠলি না কি?

রতনলাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ চলন্ত ট্রেনখানা মাঝপথে থেমে পড়তেই তারা গভীর বিস্ময়ে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখে দূরে গার্ডসাহেব টর্চ হাতে এগিয়ে আসছেন।

মাঝের একখানা কামরা থেকে একটি লোক তাকে সম্বোধন করে বলল—দেখুন এর নীচে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হচ্ছে।

গার্ডসাহেব তার নিকটবর্তী হয়ে অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—এর ? থেকে ? শব্দটা কেমন বলুন তো ?

লোকটি কামরা থেকে নেমে এলো। কিন্তু তার পানে চোখ পড়তেই গার্ডসাহেবের সমস্ত শরীরটা যেন বেতস পত্রের মত বারেকের জন্য থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। লোকটির হাতে একটি নিকষ কালো পিস্তল এবং তারই বক্ষদেশ লক্ষ্য করে উদ্যত।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে সে কতকটা আদেশের সুরেই বলল—সাবধান! আর এক পাও···

পূর্বের কামরাখানা থেকে তখনও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর কিছু করবার নেই। পাথরে গড়া মূর্তির মতই তিনি বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হতভাগ্য বিপন্নদের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতার মাঝে নিরুপায় যাত্রীদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দশ-বারোজন কালো পরিচ্ছদধারী লুণ্ঠিত জিনিসগুলি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

কিন্তু তার পিছনে কালো চশমা, কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত পরিচ্ছদ আবৃত, পায়ে বুট সেই লোকটিকেও দেখা গেল।

সাথে সাথে শত শত উৎসুক নেত্র একপাশের জানলা দিয়ে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লুণ্ঠনকারীদের গতি লক্ষ্য করতে লাগল। ব্যতিক্রম দেখা গেল শুধু দুটি প্রাণীর। দীপক আর রতনলালের।

অন্ধকারের মাঝে দস্যুদলের ছায়া মিলিয়ে যাবার পূর্বেই দীপক চট করে একখানা কাগজে কি লিখে সেটা গার্ডের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে রতনলালসহ বিপরীত দিকে দরজা দিয়ে নেমে নিবিড় জঙ্গলের অন্ধকার গর্ভে ঝুপ করে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে গার্ডসাহেবের ইঙ্গিতে ট্রেনখানা পুনরায় হেলতে দুলতে চলতে সুরু করলো।

—পাঁচ—

অন্ধকার জঙ্গলের পথ বোধ করি একেবারেই দুর্গম।

প্রতি পদক্ষেপে দীপক এবং রতনলাল হোঁচট খেতে খেতে দস্যুদলের অনুসরণ করতে লাগল। একে গভীর জঙ্গল, তার উপর মশা। প্রতি মুহূর্তে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনায় তাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

হঠাৎ জঙ্গলের মাঝে খানকয়েক ইটের উপর পায়ে হোঁচট খেয়ে রতনলাল সশব্দে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। চমকে দীপক পিছনে ফিরতে সে বলে উঠল—আচ্ছা পথ দিয়ে আমরা চলেছি বটে! এখানে কি আর মানুষ চলতে পারে?

—মানুষ না পারলেও গোয়েন্দাদের না পারবার কথা নয় বন্ধু। দীপক মৃদু হেসে বলল।

পুনরায় তারা অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু দু-এক পা এগোতেই বিস্মিত-ভাবে তারা দেখল দস্যুদল কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও দীপক তাদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলে না।

সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলের পথে তাদের সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া গেল না।

গভীর চিন্তায় অতি অকস্মাৎই দীপকের রগের শিরা দুটো স্ফীত হয়ে উঠল। ভাবতে লাগল এবারে তারা কোন পথে এগোবে? মুহূর্ত পূর্বেও প্রতি পদক্ষেপে বিপদের আশঙ্কায় দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে তারা সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ঠিক তাদেরই কাছ থেকে দূরে চলে

গিয়ে যে এতদূর নিঃসহায় হয়ে পড়তে হবে—একথা দীপক ভাবেনি। এ দুর্গম জঙ্গল পথে তারাই তো ছিল তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

রতনলাল বলল—এ দিকেই তো গেছে, এগোনো যাক।

অঙ্গুলি সংকেতে তাকে চলতে আদেশ দিয়ে দীপক বলল—সাবধান। শব্দ যদি ওরা পেয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় লক্ষ্য রাখছে আমাদের ওপর।

লঘু মার্জারের মতই সন্তর্পিত পদে দীপক অগ্রসর হতে রতনলাল তাকে নিরাপদে অনুসরণ করতে লাগল।

* * *

চারিদিকে লতাগুল্মবেষ্টিত একটি খোলার ঘরের অভ্যন্তরে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। তারই ক্ষীণ আলোয় ভিতরের খানিকটা দেখা গেল। দশ-বারো জন বিরাটকায় লোক চারধারে বসে। মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে অগণিত রৌপ্যমুদ্রা এবং স্বর্ণালঙ্কারাদি স্তূপাকারে সজ্জিত। পাশেই উপযুক্ত ছোরা পিস্তল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র।

সব কটি প্রাণীর মুখেই এখন এক পৈশাচিক আনন্দ ফুটে বেরোচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাদের উল্লসিত কণ্ঠের দু একটি কথা দীপকের কানে এসে বাজতে লাগল।

হঠাৎ একসময় সকলে উঠে দাঁড়াল। দীপক আর রতনলাল অতি মৃদু পদে সন্তর্পণে আর একটু দূরে গিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রদীপটি নিভে যাওয়ায় তারা আর কিছু দেখতে পেল না।

রতনলাল বলল—শুয়ে পড়ল বোধ হয়। আমরা তাহলে এখন কি করি?

দীপক রতনের হাতে একটি সিগারেট দিয়ে নিজে একটা মুখে লাগিয়ে দুজনের অগ্নিসংযোগ করতে করতে মৃদু হেসে বলল—এই জঙ্গলের মাঝে গাছের ওপর ঘুমোব।

—তা কথাটা মন্দ বলিসনি ভাই। রাত্তিরটা কোনরকমে কাটিয়ে সকালে চা খেয়ে দেয়ে ওদের সাথে আলাপ-সালাপ করা যাবে কি বল?

—বেলঘরিয়া পুলিশ স্টেশন হতে মিঃ হাড্‌সনের কাছ থেকে আমার হঠাৎ চলে আসায় ওরা খুব চিন্তায় থাকবে। কিন্তু আজকের এই নরহত্যা, ট্রেনের মধ্যে খুন লুঠতরাজ, পর পর ঘটনার সাথে বিখ্যাত দস্যু বাজপাখির কোন সংশ্রবই নেই।

আমাদের দুজনের একজনের অন্ততঃ সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। ধর চিঠিখানা গার্ডসাহেব ঠিক যদি পৌছে না দেন···

—না দিলে চাকরীটা যাবার আশঙ্কা নেই তাঁর ? এত বড় দরকারী চিঠি যখন।

কথা তার শেষ হবার আগেই উভয়েই সভয়ে দেখল একটি যমদূতাকৃতি লোক সেই খোলার ঘরের অভ্যন্তর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। লোকটার গায়ের রং কালো—বোধ করি মা দুর্গার বাহনের মতই কালো। কেন না অন্ধকারের মাঝে তার দেহটা শুধু একটা ছায়ামূর্তি বলেই বোধ হয়, মানুষ-মূর্তি নয়।

লোকটি ক্রমে দীপকের দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। পিছনে তার আর একটি লোক, তারও পিছনে আর একজন। ক্রমে আট-দশজন লোকই তার আর রতনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ইশারায় রতনলাল দীপককে জানিয়ে দিল। সরে পড়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু দীপক তার উত্তরে বললে—না না সরে পড়লে চলবে না। জলে যখন একবার ডুব দিয়েইছি তখন পাঁক না তুলে আর ছাড়ব না।

প্রথম লোকটা এখন দীপকের প্রায় গা ঘেঁসেই চলেছে। দীপক পাথরের মূর্তির মতই নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। একে একে আটজন তাদের ছাড়িয়ে চলে যাবার পর শেষের লোকটা মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে দীপকের পাশে থমকে দাঁড়াল।

সাথে সাথে রতনলাল পিস্তলটা উদ্যত করতেই দীপক ব্যগ্রভাবে তার হাতখানা চেপে ধরল।

তাদের এই হাতের শব্দে মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল সেই লোকটা।

কর্কশকণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল—কে—কে?

চীৎকার শুনে আগের লোকগুলোও দাঁড়াল। বললে—কে?

কিন্তু দীপক ও রতন তখন নিশ্বাস বন্ধ করে পাথরের মত বসেই রইল।

লোকগুলো বুঝতে না পেরে বললে—ও কিছু না—চল যাই আমরা।

তারা চলে গেলে রতন ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—যাক্‌ বাঁচা গেল।

—তা বটে।

—এখন?

—চুপ—ঘাঁটি আগলে হয়ত কেউ আছে। চল্‌, এবারে লুকিয়ে ভেতরটা দেখে আসি।

—চল্‌।

—ছয়—

দীপকের চিন্তা ভুল নয়।

হঠাৎ টর্চের আলো গিয়ে পড়ল অদূরে—তার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক চীৎকার করল—কে?

একটা হাতে টর্চ, অন্য হাতে পিস্তল দীপকের। সে রতনকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলো—একি শ্যামাদাস—তুমি এখানে?

ভয়ে বিস্ময়ে শ্যামাদাস স্তম্ভিত। সে অবাক হয়ে বলে, একি দেখছি?

—ঠিকই দেখছ। আমি দীপক চ্যাটার্জী।

—দোহাই আপনার—আমি কিছু জানি না। আমি ওদের হুকুমের নাকর মাত্র।

বাধা দিয়ে দীপক বললে—আগে আলোটা জ্বাল তারপর সব শুনব।

—হ্যাঁ জ্বালছি।

কাঁপতে কাঁপতে শ্যামাদাস আলো জ্বালাল।

দীপক বললে—চুপ করে বসে আমার কথার উত্তর দাও—তা না হলে গুলি করে…

—না বাবু, আমি কিছু করব না।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ।

—তুমি এখানে এলে কি করে?

—আজ্ঞে আমার দোষ নেই। পাল্লায় পড়ে আমাকে এসব কাজে নামতে হয়েছে।

—কি রকম?

—কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের হীরাভাইকে চেনেন তো? পানের দোকান আছে। একটি লোকের সঙ্গে সে আলাপ করিয়ে দেয়। আমি তখন কেষ্ট কাফেতে বয়-এর কাজ করতাম। সেখানেই চা খেতেন হরিবাবু। তিনিই আমাকে এখানে এনেছেন।

—এতে লাভ?

—যা মাইনে পেতাম তাতে চলত না।

—কেন, তুমি তো বলদিয়া পাড়ার রবির 'ঠেক্'-এ তাসের কাজ করতে। তাতে…

—সে আর কদিন?

—আর জোড়াবাগানের মণ্টু মুখার্জী—

—সে তো মাঝে মাঝে দশ-বিশ টাকা।

—চুপ কর।

—করলুম।

—বল, যারা বেরিয়ে গেল—তারা ফিরবে ঠিক কটায়?

—ছুদিন পরে।

—হরিবাবু লোকটা কে?

—পরিচয় জানি না বাবু। মুখের আলাপ।

—এখনও এ দলে আছেন?

—হ্যাঁ।

—এদের কারও নাম ঠিকানা জান?

—দলপতির কাছে নাম ঠিকানা আছে—আমাদের কাছে তা কেউ প্রকাশ করে না।

—তবে ডাকে কি করে?

—নম্বর ধরে। তুই নম্বর, নয় নম্বর এমনি করে···

—দলপতি কে? কোথায় থাকে?

—তাকে দেখেছি একবার মাত্র—তাও মুখোশ পরা। শুধু ম্যানেজার ছাড়া কেউ দেখতে পায় না।

—বুঝেছি।

—তিনি সব সময়ই মুখ ঢেকে রেখে কাজ করেন।

—কথা বেশি বলেন না?

—না।

—তবে?

—তু'একটা মাত্র আদেশ দেন।

—কাজের ভার বুঝিয়ে দেয় কে?

—ম্যানেজার।

—তিনি কি করেন?

—কাগজে লিখে আদেশ দেন।

দীপক একটু ভাবে।

তারপর বলে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে হে শ্যামাদাস।

—কি কাজ?

—তোমাকে আমরা ধরব না—শুধু এই কাজটা করলেই মুক্তি পাবে।

—বলুন।

—দলপতির লেখা খাতাটা এনে দিতে হবে।

—সে পারব না বাবু।

—কেন?

—তা হলে আমি জীবিত থাকব না।

—শোন, তুমি এটা আনতে পারলে নগদ এক হাজার টাকা পাবে।

—এক হাজার!

—হ্যাঁ। টাকাটা নিয়ে পালাবে। বাকি জীবন আরামে চলে যাবে।

—আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

দীপক রতনকে বললে—ভোরেই বেলঘরিয়ার পথে পা বাড়াব আমরা।

—ঠিক আছে।

—সাত—

দুদিন পরে।

বেলঘরিয়ার পুলিশ অফিসার মিঃ জনসন-এর ঘরে জরুরী সভা বসেছে।

মিঃ ঘোষ, মিঃ সেন ইত্যাদি যত পদস্থ কর্মচারীরা আছেন সেখানে।

আঙ্গুলের কাছে সিগারেট নিয়ে মিঃ জনসন বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী তো এলেন না। কি করা যায়?

—কাজ সুরু করি আমরা ?

—বেশ।

—আচ্ছা, স্যার চিঠিতে দীপকবাবু কি জানিয়েছেন বলুন না।

—এই যে চিঠিটা

মিঃ ঘোষ চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

'বিশেষ ব্যাপারে পথের মাঝে আটক পড়ে গেছি আমরা। যত তাড়াতাড়ি পারি যাব।

ভাবনা নেই। কাজ হবেই। রতন সঙ্গে আছে। বিপদ বুঝলে রতনকে পাঠাব। ইতি—

দীপক চ্যাটার্জী।'

পড়া শেষ করেই তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পদশব্দ শুনেই পেছনে ফিরে তাকালেন।

—মে আই কাম ইন ? হাসতে হাসতে বলল দীপক চ্যাটার্জী।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। পুলিশ অফিসার মিঃ জনসন সহাস্যে চেঁচিয়ে বললেন—ইয়েস ! আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। এইমাত্র আপনার সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল আমাদের মধ্যে।

দীপক কিন্তু সে হাসিতে যোগ না দিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বলল—রহমান কেমন আছেন ?

বেদনার একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল মিঃ জনসনের কণ্ঠে। তিনি বললেন—তিনি মারা গেছেন।

—মারা গেছেন ? কবে মারা গেলেন ? তার পরেই নাকি ?

—হ্যাঁ বলছি, বসুন। পুলিশ অফিসার মিঃ জনসন দীপককে একটা সিগারেট অফার করে বলতে সুরু করলেন—

সেইদিন ঝড় জলের রাত্রে বারোটা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়ে রহমানের বাড়িতে গিয়ে দেখি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন।

বাড়িতে চাকর ছাড়া আর কেউই ছিল না। এমন সময় তাঁকে বাইরে থেকে গুলি করা হয়। হাসপাতালে মরবার আগে তিনি নিজেই বলে গেলেন এই কথাগুলো।

—কে মারল? কেনই বা মারল? এইসব কথা কিছু বলেছেন কি?

—হ্যাঁ বলেছেন, কিছুদিন থেকে তিনি বাজপাখির সন্ধান করছিলেন গোপনে। জানতে পেরেছিলেন কিছু কিছু। তিনি সন্দেহ করেছেন হয়ত তারা বুঝতে পেরেছিল। তাই তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরী করলো না।

—বাজপাখির বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?

—মরবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি বিকট চীৎকার করে বলে উঠলেন —পায়রাডাঙার এক বিরাট বাড়িতে বাজপাখির অনুচরেরা থাকে। আর দুটো যে খুন হয়েছে এবং হত্যার পরে যে লাল ফুটকির চিহ্ন তারই নায়ক হলো ওই বাজপাখি।

—আর কিছু?

—না আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করতে পারেননি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলিশ অফিসার মিঃ জনসন বললেন—বাজপাখির আস্তানা কোথায় তা বলা বড় কঠিন—কিন্তু রেলওয়ে রিপোর্টারদের কাছ থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে এর আগে, আমার মনে হয় কোলকাতা ছাড়া আরও কয়েকটা আড্ডাস্থল আছে। ওরা জানিয়েছে পায়রাডাঙা স্টেশনের কাছে আস্তানা।

কেন না, জনসন বললেন—পায়রাডাঙ্গা স্টেশনের ধারে একখানা জরাজীর্ণ দোতলা পাকা বাড়ি ও তার চারপাশে বেশ খানিকটা জংলা আভাষও আছে। রিপোর্টাররাও আজকাল মাঝ পথে ট্রেন থামার খবর দিচ্ছে।

কি একটা অজানা আনন্দে দীপকের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলল— ঠিক এমনই জায়গায় মানে জঙ্গলের পরিবেশের মাঝে আটকা পড়েছিলাম।

অধীর আগ্রহে পুলিশ অফিসার মিঃ জনসন বলে উঠলেন—তার মানে?

গত ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করে দীপক বলল—আমাদের মনে হয় ওইটাই বাজপাখির আসল আস্তানা। আর যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে যে আমাদের কবলে পড়তে বাজপাখির আর বেশী দেরী নেই।

এক লহমার জন্যে কি ভেবে নিয়ে দীপক প্রশ্ন করলে—বেলঘরিয়ায় যে দুটি খুন হয়েছে সেগুলো বাজপাখির কীর্তি কি না, রহমানের জবানবন্দী ছাড়া আর কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি?

—নিশ্চয়ই। আমাদের মিঃ ঘোষ তদন্ত করে জেনেছেন এবং একজনকে এ্যারেস্টও করা হয়েছে।

—বেশ তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?

—আমি আর কি বলব, আপনিই ভেবে দেখুন কি করবেন। কেন না আপনি যে খবর দিলেন বাজপাখির সম্বন্ধে আমার মনে হয় আপনাদের ওদিকে থাকাটাই ভাল।

এদিকটা না হয় আমাদের মিঃ ঘোষ দেখাশুনা করুন। আপনি কি কোলকাতায় আজ ফিরে যাবেন এখন?

—না। কোলকাতায় ফিরবো কি না কোন ঠিক নেই। সিগারেট ধরিয়ে দীপক বললে—কেন আপনার কিছু প্রয়োজন আছে?

মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুলিশ অফিসার মিঃ জনসন বললেন—না আপনি যে সংবাদটা এনেছেন আজকে, একটু নজরে······

দীপক তার কথা কেড়ে নিয়ে বললে—পথে একবার এই জায়গাটিতে নেমে যেতেও পারি।

—ধন্যবাদ।

দীপক বিদায় নিলো পরস্পরকে নমস্কার জানিয়ে।

—আট—

বীণা নগর……

কোলকাতার কাছাকাছি হলেও গ্রামটিতে থাকতে কেউ চায় না বড় একটা। কারণও অবশ্য আছে। একে ম্যালেরিয়ার তাড়াহুড়া তাতে আবার গভীর জঙ্গল। যাদের জমি-জিরেৎ আর ভিটেবাড়ি এখানে তারাই শুধু এখানকার মাটি কামড়ে বসে আছে। চারদিকের আবহাওয়াটা থম্‌থমে আর নীরব।

তবু একদিন যখন দেখা গেল কোলকাতা থেকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বিঘাখানেক পরিমাণ জমির উপর বিরাট অট্টালিকা তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন তখন গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের অন্ত রইলো না।

নিজের সুখ-সুবিধার জন্যে বেশ খানিকটা জায়গা সুরকী দিয়ে এবং মোটর চলবার জন্যে স্টেশন পর্যন্ত একটা ইটের রাস্তা তৈরী করে নিলেন। পানীয়ের জন্যে গোটা কয়েক টিউবওয়েল বসালেন। স্নানের উপযোগী দুটো পুকুরও বাঁধিয়ে নিলেন—আরও কত কি। কিন্তু ভদ্রলোকের রুচির পরিচয় দেয় ছোট একটু বাগান। বেশ সুশ্রী এবং শান্ত পরিবেশের মাঝে।

কিন্তু এত করলেন যিনি তাঁকে নাকি গ্রামবাসীরা কেউই একবার স্পষ্ট করে চোখের দেখাও দেখতে পায়নি। মোটর চড়ে তিনি যখন বেড়াতে বার হন তখন তার সর্বাঙ্গ থাকে কালো পোষাকে আঁটা, চোখে কালো রঙের গগ্‌লস। সেই অবসরে যে তাকে এতটুকু দেখে নিয়েছে সেই বলে—ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাট। কেউ আবার প্রতিবাদ করে—না চল্লিশের বেশী হতেই পারে না।

বাড়িটার চারপাশে কাঁটা তার দিয়ে সীমানা টেনে দেওয়ায় এত বড় বাড়িতে যে বাসিন্দা ক'জন—কেউ বলতে পারে না। কতকটা অনুমানের

ওপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলে—বাড়িটাতে গৃহস্বামী ছাড়া থাকে একটি মাত্র চাকর। তাকেও বড় একটা বাইরে বেরোতে দেখা যায় না।

নবাগত গ্রামবাসী এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে আরও কত কথাই না প্রচার হয়ে গেল। কেউ বলল—লোকটা একজন সাহিত্যিক নয় গায়ক। অর্গান বাজিয়ে গান করে। কেউ বলল—সাহিত্যিকও নয়, গায়কও নয়—একজন বৈজ্ঞানিক অষ্টপ্রহর কাচের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত।

* * *

শ্যামাদাসের বন্ধ চোখটা খুলে দিতেই প্রথম কিছুক্ষণ চারদিক সে অন্ধকার দেখতে লাগল। ক্রমে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে এলো, দেখলো যেখানটায় তাকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে সেটা একটা প্রশস্ত হলঘর—কিন্তু সেখানে কেউ নেই—

বাঁ দিকের দেওয়ালের ধারে মেহগিনী কাঠের তৈরী বড় বড় আলমারী—রাশিকৃত বই-এ ভর্তি। ডানদিকের দেওয়ালে নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র। আর একপাশে টেবিলের ওপর কাচের যন্ত্রপাতি। কতরকম ছোটবড় শিশি, বোতল আর রবারের টিউব।

মধ্যস্থলে একটা জ্বলন্ত স্টোভে কি একটা পদার্থ সিদ্ধ হচ্ছিল। তারই সামনে চেয়ারের ওপর দলপতি স্টোভের পানে তাকিয়ে কি চিন্তা করছিল।

সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে থাকায় দ্বিপ্রহরে ঘরখানার ভেতরে রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। স্টোভের স্তিমিত আলোয় সেই অন্ধকার যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

দলপতির দেহ সেই অন্যদিনের মতোই কালো পোষাকে ঢাকা। চোখে সেই কালো চশমা। চশমার ওপর স্টোভের আলো প্রতিফলিত হওয়া কাঁচ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই জ্বলছে।

শ্যামদাসের মনে হলো ভীষণ অন্ধকারে অরণ্যের ভেতর থেকে একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ার হিংস্র লোলুপ দৃষ্টিতে তার শিকারের দিকে তাকিয়ে আছে। এ

দৃশ্য তার কাছে আজ নতুন নয়। এ দলে আসা অবধি বহুদিন তাকে এরকম দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ সমস্ত ঘরখানা তার কাছে একটা বিভীষিকা মনে হলো।

সমস্ত শরীরটা তার থর থর করে কাঁপতে লাগল। মাথাটাও কেমন ঝিমঝিমিয়ে উঠেছিল। যেন সমস্ত ঘরখানা সমেত সে কোন রসাতলে নেমে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই সকলে নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দলপতি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করল না। শ্যামাদাস ভাবতে লাগল আর কতক্ষণ এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে! এর চেয়ে ফাঁসীকাঠের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অনেক সুখের।

সহসা দলপতির ডান হাতটা নড়ে উঠলো। সে ক্ষিপ্রহস্তে একটা শিশি থেকে দু'এক ফোঁটা তরল পদার্থ সেই ফুটন্ত বস্তুটির ভেতর ফেলে দিতেই তা থেকে একটা ফিকা নীল ধোঁয়া উঠতে লাগল। সাথে সাথে একটা বিরাট হাসিতে ঘরখানা যেন শিউরে উঠল।

সেই আকস্মিক অট্টহাসিতে শ্যামদাস ভয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়লো।

দলপতি চমকে উঠে তার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। শ্যামাদাস বজ্রাহতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ম্যানেজার ইঙ্গিত করলে দলপতি তার কানে কানে কি যেন বলে দিল।

ম্যানেজার শ্যামাদাসকে বললে—তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

শুষ্ককণ্ঠে শ্যামাদাস বললে—হ্যাঁ......

—আচ্ছা তুমি সাতদিনের ছুটি নিতে পার।

শ্যামাদাস যেন স্বর্গ পেল। তার আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ থেকে একটা অব্যক্ত স্বর ছাড়া আর কিছুই বার হলো না।

ম্যানেজার বলল—কিন্তু সাবধান দলের একটা কথাও যেন বাইরে প্রকাশ্য না হয়।

—আজ্ঞে না, না বাবু!

দলপতি অন্য সকলকে কি যেন লিখে দেখালো। সকলেই মাথা নত করে আজ্ঞা গ্রহণ করল। শ্যামাদাসকে তা দেখান হলো না। কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝতে পারল, এ আর একটা লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র মাত্র।

খাতাটির পানে চোখ পড়তেই তার বুকটা সহসা কেঁপে উঠলো। এই খাতাখানার মূল্য তার কাছে হাজার টাকা।

* * *

পুনরায় চোখ বেঁধে শ্যামাদাসকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। শ্যামাদাস স্পষ্ট বুঝতে পারল তাকে একটা মোটরে চড়ানো হলো। কিছুক্ষণ পরেই মোটরটা সুরু করল চলতে।

কতক্ষণ চলার পর এক সময় গাড়ীটা থেমে গেল। চোখটা খুলে দিতে শ্যামদাস দেখল রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের মোড়ের মাথায় সে দাঁড়িয়ে। পাশেই ম্যানেজার।

ম্যানেজার আর একবার শ্যামদাসকে সাবধান করে দিল—দলের একটি কথাও যেন বাইরে প্রকাশ না হয়……

সে ঘাড় নেড়ে বললে—না, না।

অতঃপর সে চলতে সুরু করলে—কিছুটা পথ যাবার পর হঠাৎ তার নজরে পড়ল, বিপরীত ফুটপাতে দুটি লোক তার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

মুহূর্তেই তার মাথাটা ঘুরে গেল। তবে কি ওরা দলপতির চর? তাড়াতাড়ি পা ফেলতে ফেলতে সে একটা চায়ের দোকানে এসে চড়া গলাতেই হুকুম করল—এক কাপ চা দেখি।···

খানিক পরেই সেই দুটি লোক বাইরে থেকে এসে তার পাশের চেয়ার দুটো

দখল করে বসলো। তার পানে তাকাতেই সে বলে উঠলো—কি চান আপনারা? আমার পিছু পিছু বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো?

লোক দুটির প্রথম জন অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলল—চাই না কিছু শুধু আপনার সাথে আলাপ করতে এলাম।

—আমার সাথে! কেন?

—আজ্ঞে—আপনি তো ওই গাড়ী থেকেই নামলেন?

—কোন গাড়ী থেকে?

—ওই যে গাড়ী খানা বীণানগরের নতুন বাড়িতে যায়?

ক্রমেই আশ্চর্য হতে লাগল শ্যামাদাস।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ওই গাড়ীখানা আমরা অনেকবার দেখছি। বীণানগরে বাড়ি কিনা আমাদের।

শ্যামাদাস ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল—বীণানগরে কোন বাবুর বাড়িতে গাড়ী যায় বললেন?

—আজ্ঞে তাহলে তো মুস্কিলে ফেললেন। বাবুর নামটা আমাদের জানাবার উপায় নেই। তাঁর মেজাজ যা চড়া তার সাথে আলাপ করে কার সাধ্য। দেখা পর্যন্ত যায় না···যা দু-এক সময় বার হন তাও সর্ব শরীর কাপড় ঢেকে চোখে চশমা এঁটে। পায়ের নখটি পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই।

—নতুন বাড়ির বলেই বলি আমরা।—আর একজন বললে।

চিন্তিত স্বরে শ্যামাদাস আপন মনেই বলে উঠলো—যাক! এতদিনে তবু একটা হদিশ পাওয়া গেল।

পরক্ষণেই লোকটির উদ্দেশে বলল—না, আমি ও বাড়ি থেকে আসছি না।

শ্যামাদাসের কথায় লোক দুটি সন্তুষ্ট হতে পারল না। বাইরে বেরিয়ে এসে দ্বিতীয়টি লোকটি বলল—বলেছিলাম না—আলাপ করা যাবে না। ও বাড়ির কুকুরটারও পর্যন্ত ওই এক মেজাজ।

ওদিকে শ্যামাদাসও তখন মনের আনন্দে সিঙ্গাড়া আর চা খেয়ে নিয়ে পথে নেমে এলো। দলপতির বাড়িটার কথা স্মরণ হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল তার হাজার টাকার নোট এবং পা দুখানা মনে হলো যেন দীপকের বাড়ির দিকে এগোতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ !

—নয়—

দীপক তার ঘরে বসেছিল। হাতে একটা জলন্ত সিগারেট আর সামনেই টেবিলের ওপর পড়েছিল অনাদৃত চায়ের পেয়ালাটা।

অকস্মাৎ ঘরে ঢুকেই ভৃত্য সমরেশ মৃদু কণ্ঠে বলল—একটা লোক আপনার সাথে দেখা করতে চান বাবু।

দর্শন-প্রার্থীকে নিয়ে আসার হুকুম দিয়ে দীপক পেয়ালাটায় একবার চুমুক দিল। তারপর সিগারেটে একবার সজোরে টান দিয়ে আপন মনেই বলে উঠলো—হঠাৎ এ সময়ে আবার এলো কে ?

একটু পরেই সমরেশের পেছন পেছন যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করল—সে শ্যামাদাস।

তাকে দেখেই দীপক গভীর আগ্রহে বলে উঠলো—কি হলো, কি খবর তোমার ? কোন হদিশ পেলে তুমি ?

চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে শ্যামাদাস জবাব দিল—হ্যাঁ হদিশ একটা পেয়েছি। তবে সেটার ভালভাবে সন্ধান না নিয়ে আপনাকে কোন কথা দিতে পারছি না। দিন সাতেকের মধ্যে আপনাকে খাতাখানা এনে দিতে পারব আশা করছি। কিন্তু টাকাটা আমার সাথে সাথেই চাই। কেন না এ দেশ ছেড়ে আমাকে পালাতেই হবে।

—না তোমাকে পালাতে হবে না। আমি তোমার প্রাণ বাঁচাবো। তবে টাকা আমি তোমাকে সাথে সাথেই দেবো কোন ভয় নেই। হ্যাঁ ভাল কথা তুই আমার সাথে দেখা করবে কবে ?

লহমার জন্যে ভেবে নিয়ে শ্যামদাস বলল—আজ থেকে সাতদিন পর রাত এগোরোটার থেকে বারোটা পর্যন্ত আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন···

—কিন্তু কোথায় ?

—মালয় কেবিনে।

—সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই তো তোমার ?

—নেই বলেই মনে হয়।

খুশি ভরা কণ্ঠে দীপক বলল—তুমি যদি আমাকে সাতদিনের মধ্যে খাতাটা এনে দিতে পার তাহলে তোমাকে আরও কিছু টাকা বকশিস দেবো।

অতপর সামান্য দু'চারটে কথার পর শ্যামাদাস সেখান থেকে বিদায় নিলো।

গভীর রাত······

চারধার নিস্তব্ধ—নিথর—মৃত্যুপুরীর মতোই।

বীণানগরের নতুন বাড়িখানার পেছন দিকে যে প্রাচীর ছিল অকস্মাৎ এই সময় দেখা গেল শ্যামাদাস সেটা টপ করে টপকে ভেতরে এসে পড়ল।

দারোয়ান বোধ করি এখন বাইরের দিকে পাহারা দেবার ছলে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বেরোবার পথটা খুলে রেখে শ্যামাদাস ধীর সন্তর্পিত পদে একটার পর একটা ঘর সন্ধান করে ফিরতে লাগল।

অকস্মাৎ একখানা ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। ঈষদুন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলে দলপতি তখন সেই খাতাখানায় কি যেন লিখছে।

পরণে তার এখন আর নেই কালো পোষাক, কালো চশমা। টেবিলের ধারে পড়ে রয়েছে।

শ্যামাদাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। অতপর সে কি করবে ? এক এক করে পাঁচ দিন পার হয়ে গেছে। আজ শেষ করতে না পারলে আর

আশা নেই। হাজার টাকা। ওঃ যার এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই—সেই হাজার টাকা তার কাছে এখন এক মহাসাম্রাজ্য।

শ্যামাদাস অধীর হয়ে উঠল। বারম্বার সে মনে মনে ভাবতে ও বলতে লাগল—আজই—আজ রাত্রেই খাতাটা সে কোন রকমে তাকে হস্তগত করতে হবে।

অকস্মাৎ দলপতি ধীরে ধীরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল।

শ্যামাদাস বারান্দার অপর দিকে একটা গুপ্তস্থান থেকে বিস্ফারিত নেত্রে দলপতিকে দেখতে লাগল॥

দীর্ঘ বলিষ্ঠ তার দেহ। আকর্ণ বিস্তৃত চোখদুটি তার ভাবে নিমগ্ন। ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত। প্রশস্ত ললাটে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে চিন্তার রেখা। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। হাত দুটি পিছনে নিবদ্ধ। অতি ধীরে পদক্ষেপে তার ফুটে উঠেছে দৃঢ়তা, গভীর চিন্তাশীলতা।

হঠাৎ ঠোঁট দুটো তার কেঁপে চিন্তার উত্তেজনায় তখন আপন মনেই কথা বলতে সুরু করেছে।

গভীর আগ্রহের সাথেই শ্যামাদাস তা শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার একবর্ণও সে বুঝতে পারল না।

সহসা দলপতি নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে হেসে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রমে পদশব্দ তার মিলিয়ে গেল। শ্যামাদাস গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে দলপতির ঘরে প্রবেশ করল। সামনেই টেবিলের ওপর খাতাটা খোলা রয়েছে। পাশেই একটা পিস্তল। খাতাখানা ছোট—একখানা নোট বই।

কম্পিত হস্তে সেখানা পকেটেস্থ করে পিস্তলটা হাতে নিয়ে শ্যামাদাস ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু বারান্দায় আসতেই সে থমকে দাঁড়ালো। সামনেই তীব্র দৃষ্টিতে চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দলপতি।

সাথে সাথে ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে দলপতি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তারপর স্বুরু হলো প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি। একবার দলপতি একবার শ্যামাদাস— দুজনেই মাটির বুকে গড়াতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর শ্যামাদাস পিস্তলের ট্রিগারটা দিল টিপে।

ছুম্ করে একটা শব্দ হবার সাথেই দলপতি একবার চীৎকার করে বসে পড়ল। গুলিটি তার ডানহাতের কব্জি ভেদ করে চলে গেছে।

দৌড়ে শ্যামাদাস গিয়ে উঠলো সেই সুউচ্চ প্রাচীরটার ওপর। দলপতি ছাড়বার পাত্র নয়। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে তার পিছনে ছুটতে লাগল। প্রাচীর টপকে পথে পড়ল শ্যামাদাস।

তারপর স্বুরু হলো ছোটার প্রতিযোগিতা। কিন্তু আহত ডান হাতখানা চেপে ধরে দলপতি বেশীক্ষণ আর পারল না তাকে অনুসরণ করতে। সেই-খানেই ধপাস করে বসে পড়ল।

তার চোখের সামনে থেকে শ্যামাদাস অদৃশ্য হয়ে গেল।

—দশ—

রমেন মজুমদারের আস্তানায় জুয়ার আড্ডা কোনদিন রাত চারটের আগে ভাঙ্গে না। কিন্তু আজ খেলতে বসেই আধ ঘণ্টার ভেতরে সর্বস্বান্ত হয়ে রাত এগারোটা না বাজতেই খেলা বন্ধ করে দিয়েছে সে।

সকলে একে একে চলে গেছে। কিন্তু জয়ন্ত শেঠ তখন রমেনের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছিল।

জয়ন্ত শেঠের কথায় সায় দিয়ে রমেন বললে—হ্যাঁ দাদা আজকাল পকেট মেরেও সুখ নেই। দেশের অবস্থা যা হয়েছে। কারোর পকেটে একটি পয়সা থাকে না।

কথা শেষে সে মৌনভাব কতক্ষণ হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার ধুমোদ্গিরণ করতে লাগল।

জয়ন্ত শেঠ বললে—যাক্ দাদা খেলা যখন শেষ হলো, এবার উঠি।

রমেন শ্যামবাজারের বুক স্টলে একজনের কাছে দশ টাকা আগের পাওনা ছিল, সেটা আনবার জন্য বাইরের দিকে পা বাড়াল। রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবছে, এ পর্যন্ত কখনও যা হয়নি, আজ নিশ্চয়ই জোচ্চুরি হয়েছে। হঠাৎ অদূরে গ্যাস পোস্টের কাছে নজর পড়তেই দেখল একটি লোক পড়ে আছে।

রমেন ধীরে ধীরে সেদিকে পা বাড়াল। মাথা নীচু করে লোকটির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই সে আতঙ্কে শিউরে উঠল।

লোকটির মুখ থেকে রক্তস্রোত বইছে। ভয়ে আতঙ্কে সারা মুখখানা বীভৎস রূপ ধারণ করছে।

রমেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল পুলিশে খবর দেবে—পর মুহূর্তেই ভাবল যদি পুলিশ তাকেই আটক করে?

ধীরে ধীরে মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে সে পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে যা পেল সব তুলে নিয়ে দ্রুত গতিতে সে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো।

অদূরে দাঁড়িয়ে একটা লোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। রমেনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেও সেইদিকে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

* * *

রাত একটা।

শ্যামাপদর কাছে খাতাটা পেয়ে দীপক রতনলালকে সঙ্গে করে সোজা লালবাজারে এসে হাজির হলো।

পুলিশ কমিশনার তাঁরই সহকারী মিঃ জোন্সকে তখুনি ডেকে পাঠালেন।

আরও দু-চারজন উচ্চপদস্থকে ডেকে পাঠাতে ভুললেন না। জরুরী আলোচনা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই এলেন। পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার দীপকবাবু ?

—বাজপাখির সন্ধান পেয়েছি। অবশ্য এ সন্ধানটার জন্য হাজার টাকা খরচ হয়েছে। যাক। পকেট থেকে খাতাখানা বার করে নিয়ে দীপক পুলিশ কমিশনারের হাতে তুলে দিল।

দীপকের হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে কমিশনার খাতা উল্টে দেখলেন।

* * *

বীণানগর।

দীপক এসে প্রথমেই বাড়িখানা ঘিরে ফেলল। তারপর প্রায় দশ বারো জন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে দীপক আর রতনলাল বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল।

হঠাৎ সামনের ঘরখানায় দীপকের দৃষ্টি পড়ল। ঘরের ভেতরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্ত শরীরে কালো পোষাকে আচ্ছাদিত, চোখে কালো রংয়ের চশমা। টেবিলের ওপরে স্টোভে করে ফুটবলের মত কি একটা পদার্থ গরম হচ্ছে।

সকলে সাবধানে বারান্দায় উঠল। দীপক ইঙ্গিত করে সকলের অগ্রগামী হলো। ভেতরে লোকটি নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছে। তার সামনে এতগুলো পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে তার খেয়াল নেই।

পাঁচ মিনিট।

দীপক পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলল—আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি বাজপাখি।

তবু লোকটা দৃকপাত করল না। দীপকের কথাগুলো নিজের কানেই উপহাস বলে বোধ হতে লাগল। একি অদ্ভুত ব্যাপার।

ঘরের ভেতর দীপক এক পা এগিয়েই সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে উচ্চৈস্বরে বলে উঠল—একি, জয়ন্ত তুমি এখানে ?

দলপতি বাজপাখির ডানপাশে দূরে দু'টি লোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি ম্যানেজার, অপরটি জয়ন্ত।

জয়ন্ত দীপকের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। শুধু কি মুচকি মুচকি হেসে ডান হাতে একখানা খাতা তুলে দিল।

দীপক রেগে উঠল।

বললে—ওঃ শয়তান, সি. আই. ডি.তে ঢুকেছিলে ওদের গুপ্তচর হয়ে?

জয়ন্ত হাসতে হাসতে খাতা তুলে দিল ওদের হাতে।

বললে—তোমার সব দলিলপত্র এর মধ্যেই আছে দীপক চ্যাটার্জী।

বলে সে একটা সুইচ টিপে দিল। হুম্ হুম্……

সারাটা বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠল।

সকলে পালাল। আগুন নিভে গেলে দেখা গেল বাজপাখি নেই।

———

গোলাম চোর

পড়া শেষ হলে হাতের কেস ফাইলটা মুড়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সহ-অধিকর্তা লেঃ কর্নেল ওরেস্টি পিন্টো। তারপর দুই আগন্তুকের মধ্যে যিনি বয়োকনিষ্ঠ আর সুদর্শন—সেই তরুণ অতিথিটিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের দুজনের সম্বন্ধে ওয়েস্ট সাসেক্সের পুলিশ রিপোর্ট পড়লাম। তবে পুলিশ রিপোর্টে আপনাদের পালিয়ে আসার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা খুবই সংক্ষেপিত ও অসম্পূর্ণ। আপনার যদি অসুবিধে না হয় বলতে, তবে গোড়া থেকে পুরো ঘটনাটা আর একবার আমায় শোনালে আমি খুব খুশি হবো মঁসিয়ে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মৃদুকণ্ঠে বললেন ভিকমৃতি, 'শুনুন তাহলে—'

তিনি বলতে লাগলেন, 'দ্বিতীয় মহা সমর আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ফ্রান্স নিজেকে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে ফেলল এই সর্বনাশা যুদ্ধে। ফ্রান্স ক্ষুদ্র দেশ কিংবা হীনবল নয় তবু সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেও দুর্ধর্ষ জার্মান সেনাবাহিনীর দুর্মদ আর দুঃসাহসিক অগ্রাভিযানকে রুখতে পারল না। একের পর এক ঘাঁটির পতন ঘটতে লাগল হিটলারের ব্লিৎস্ক্রিগ রণনীতির সামনে।

'আমি আর আমার বাবা— দুজনেই সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলাম। ছত্রভঙ্গ ফরাসী ব্যাটেলিয়ন যখন ফ্রণ্ট থেকে রিট্রিট করে পালিয়ে যাচ্ছে যত্রতত্র, আমি তখন রণাঙ্গন থেকে সোজা আমার গ্রামে ফিরে এলেও, বাবা কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা যান।

'তারপর একদিন এক জার্মান ট্রুপস এসে আমাদের গ্রামটাও দখল করে নিল। এবং জার্মান কম্যাণ্ডাণ্ট, ভন ক্রুগার সবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে, গ্রামের সবচেয়ে বড় সরাইখানাটায় নিজের হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করে বিজয়োৎসব পালনে মত্ত হলেন।

'মানুষ হিসেবে এই জার্মান সেনাধিনায়ক মহাশয় ছিলেন খুবই চতুর এবং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান।

'তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিলেন যে,আজ যদি তিনি গ্রামের জমিদার ভিকম্‌তি পরিবারের ওপর নিজের অত্যাচারী হস্তের কিছু অশুভ ছায়া ফেলতে উদ্যোগী হন, তবে গ্রামের মানুষ কিছুতেই ক্ষমা করবে না তাদের। এবং এর প্রতিক্রিয়া যা দাঁড়াবে, তার ফলাফল তেমন আরামদায়ক কিম্বা নিরাপদ বলেও বিবেচিত হবে না জার্মানদের পক্ষে।

'যাই হোক, ক্রুগার আর তাঁর দলবল আমার সঙ্গে যত ভদ্র ব্যবহারই করুন না কেন, আমি কিন্তু ভুলতে পারছিলাম না ওরা আমাদের দেশের ও জাতির শত্রু···আমার পিতৃহন্তা। তাই আমার মন সারাক্ষণ ছটফট করত তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিজেদের দুরপনেয় কলঙ্ক মুছে আবার মরিয়া হয়ে লড়বার জন্য—কিন্তু কিছুই করতে না পেরে নিজের মনেই নিজে গুমরে বেড়াতে লাগলাম।

'যুদ্ধ যখন বাধে নি তখন আমার বাতিক ছিল মোটর রেসিং আর অ্যামেচার পাইলটশিপ। দুটো বিদ্যেই বেশ ভালো করেই রপ্ত করেছিলাম। ইচ্ছে করত, সব বাধা-নিষেধের বেড়া-ডিঙিয়ে কোথাও না কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাই চিরকালের মত।

'এমনি যখন মনের অবস্থা, একদিন সকালে দৈনন্দিন প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছি আমার গ্যারাজের সামনে দিয়ে, হঠাৎ নজর পড়ল—মার্সেল তার রুটিন মত আমার রোলস রয়েস কারখানাকে সযত্নে ধোয়া-মোছা করছে একমনে। যদিও কীই বা আর তার প্রয়োজন জানি না। পেট্রলের অভাবে গাড়িটা তো অনেকদিন ধরেই অচল অবস্থায় পড়ে আছে স্বস্থানে।

'কোন কৌতূহলই ছিল না, তবু কেন কে জানে, চলতে চলতে পায়ের গতির মোড় ফিরিয়ে হঠাৎ ঘুরিয়ে দিলাম গ্যারাজের দিকে। মার্সেল তখন গাড়ির

বনেট খুলে, মাথা নীচু করে, দু-হাতে কি যেন নাড়ানাড়ি ও ঘষাঘষি করছিল নিজের মনে।

'সত্যি কথা বলতে কি কর্নেল, সেদিন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিদ্যুৎ-চমকের মত পালাবার এই আইডিয়াটা জেগে উঠেছিল আমার মাথায়। শুধু সেই বনেট-খোলা ইঞ্জিনটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অস্বচ্ছ একটা স্বপ্ন··· অস্ফুট একটা আশা যেন হঠাৎ দল মেলতে শুরু করল মনের এক নিভৃত কোণে।

'আমি জানতাম, প্লেনের ইঞ্জিনগুলো এই রোলস রয়েস জাতীয় ইঞ্জিনেরই সমগোত্রীয়। সুতরাং আমার গাড়ির এই ইঞ্জিনটা খুলে, ওকে যদি একটা প্লেনের ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করা যায় আর সেই ইঞ্জিন-বসানো প্লেনে চেপে যদি—

'এ নিয়ে ক'দিন ধরে ভাবনা-চিন্তা করতে করতে অবশেষে একদিন কপাল ঠুকে কথাটা পেড়েই বসলাম মার্সেলের কাছে। কারণ, এ কাজ একাকী করা আমার কর্ম নয় এবং একা একা এ কাজ করাও যায় না।

'তার কাছে আশ্বাস এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে, শুরু হলো আমার পলায়ন-পর্বের প্রাথমিক প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ।

'কর্নেল ক্রুগারকে ভজিয়ে ভাজিয়ে, আমার গ্রাম থেকে প্যারি পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাতায়াতের একখানা অনুমতিপত্র আদায় করলাম। তাঁকে বোঝালাম—এস্টেটের কাজে রাজধানীতে যাওয়া আমার একান্ত এবং আশু প্রয়োজন। তিনি যখন আমাকে এতটাই সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখেছেন, তখন আশা করি আমার জন্য আরো একটু সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে তাঁর বাধবে না নিশ্চয়ই।

'ক্রুগার খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে অবশেষে আমার আবেদন মঞ্জুর করলেন।

'ক্রুগার আর গেস্টাপোদের চোখে ধুলো দেবার জন্য, সত্যি সত্যিই এস্টেটের কিছু কিছু কাজকর্ম নিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করে কাটালাম কয়েকদিন

যখন বুঝলাম, এবার আমি সন্দেহমুক্ত হয়েছি, তখনই আরম্ভ হলো আমার নিজস্ব ও অভীপ্সিত গোপন কর্ম। লাইব্রেরি লাইব্রেরি ঘুরে এয়ারক্রাফট্ কনস্ট্রাকশান সংক্রান্ত বিবিধ বই জোগাড় করে, সব আগাগোড়া পড়ে ফেলতে লাগলাম একে একে।

'দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে আমার কল্পনা আর কল্পনায় না থেকে শরীরী রূপ নিয়ে দাঁড়াল বাস্তবে। দেখতে হলো ঠিক প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাটকায় একটা টেরোডাকটিলের মতন। কিম্ভূত ও কুৎসিত। চেহারা যাই-ই হোক—কাজের হলো কতখানি, তাই-ই পরীক্ষা করে দেখা হলো আর এক সমস্যা। কারণ পেট্রল নেই।

'আমার গ্রাম থেকে ইংল্যাণ্ডের নিকটতম উপকূল কম করেও আড়াইশ' কিলোমিটার দূর হবে। এক ইঞ্জিনওলা একটা প্লেনের পক্ষে সেখানে উড়ে যেতে হলে অন্তত পঞ্চাশ লিটার পেট্রলের প্রয়োজন—তাছাড়া এসব বিপদসঙ্কুল কাজে একেবারে নিক্তির ওজনে তেল মেপে নিলে চলে না। সুতরাং এমার্জেন্সি ইউজের জন্য আরো পঁচিশ লিটারের মত পেট্রলের মার্জিন আমায় রাখতেই হবে।

'কিন্তু এই পঁচাত্তর লিটার পেট্রল এখন পাই কোথায়?

'শহরের ও গ্রামের পেট্রল পাম্পগুলি জার্মানদের দখলে। কড়া সৈন্যপাহারা প্রত্যেকটিতে। অ্যাম্বুলেন্স···ফায়ার ব্রিগেড··· সমর-সম্ভার ও খাদ্যোপকরণবাহী লরী এবং নাজী অফিসিয়ালরা ছাড়া; আর কেউ বিনা অনুমতিতে সেগুলি থেকে একফোঁটাও পেট্রল সংগ্রহ করতে প্যারে না।

'অথচ পেট্রল আমার চাই-ই চাই।

'মার্সেলই যে যাত্রায় আমায় উদ্ধার করলে নিদারুণ সেই সঙ্কটের হাত থেকে। সমস্যার সমাধান সে-ই করে দিলে আচমকা। মার্সেল বলল—আমি যদি মাসে একবার-দু'বার করে কম্যাণ্ডাণ্ট ক্রুগার আর তাঁর দলবলকে যে কোনও একটা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করে আনি ম্যানসানে—তবে কেমন হয়?

প্রত্যেকে তাঁরা অবশ্যই স্টাফ কারে চেপে আসবেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে;

তাঁরা যাবেন দোতলায় খানা-পিনা…গান-বাজনা সারতে, আর তাঁদের শোফার কিম্বা অ্যাটেণ্ডাণ্টদের ব্যস্ত রাখা হবে অন্যত্র—সার্ভেণ্টস কোয়ার্টার্সে—অবশ্যই সে জন্যে কয়েকটি সুন্দরী মেয়ের দরকার—মার্সেলই তাদের জোগাড় করে আনবে যেখান থেকে হোক। আমার কাজ হবে শুধু অর্থ ব্যয় করা।

'এইভাবে ভন ক্লুগার আর তাঁর সঙ্গী সাথীদের প্রত্যেকেই যখন নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবেন, সেই অবসরে মার্সেল প্রতিটি স্টাফ কারের ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল সরাতে শুরু করবে। এমন সুকৌশলে আর সাবধানে সে কাজ শেষ করতে হবে, যেন না কেউ ধরতে পারে তেল-চুরির ঘটনাটা।

'এইভাবে একটার পর একটা পার্টি অনুষ্ঠিত হয় আর মার্সেলের ভাঁড়ারে পেট্রলের পরিমাণ একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। ওর কৌশল, চাতুর্য আর বিচক্ষণটার গুণে আমার জার্মান অতিথিরা আদপেই ধরতে পারলেন না এই পেট্রল চুরির ব্যাপার।

'অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই চরম আর পরম লগ্নটি ঘনিয়ে এল আমাদের সামনে। একে তমিস্র রাত তায় ব্ল্যাক আউট। সারা গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছি শুধু আমরা দুজনে।

'মার্সেল একবার বলেছিল, ট্রায়াল ফ্লাইটসের কথা। আমি কিন্তু মাথা নেড়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করলাম তার প্রস্তাবে। ট্রায়ালের আর অবকাশ নেই—ইট ইজ টু বী নাউ আর নেভার।

'ককপিটে বসে, দুরু দুরু বক্ষে আর কম্পিত হস্তে ড্যাশবোর্ডের চাবি ঘোরাতেই, ঈশ্বরের কৃপায় প্রথম সুযোগেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিনটা।

'মার্সেল উঠে পড়েছিল আমার পেছনে। শেষবারের মত নিজের বাড়িটাকে এক পলক দেখে নিয়ে, প্লেনের ব্রেক রিলিজ করে দিলাম।

'আকাশে উঠে, আমাদের প্লেন যখন ইংল্যাণ্ডের নিকটতম উপকূলভাগ লক্ষ্য করে মহারবে ধেয়ে চলল, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের মত হবে

আর মাটি থেকে মাত্র কয়েক হাজার ফিট উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে সে। এটাই ছিল তার সীমাবদ্ধ শক্তির সর্বোচ্চ বিন্দু।

'এমন কিছু উঁচু দিয়ে যাচ্ছিলাম না আমরা যদিও, তবু কেউ নজর করল না আমাদের, কেন কে জানে।

'সবই যেন আশ্চর্যের—সবই যেন ঈশ্বরের করুণা বলে মনে হলো আমার।

'LE TREPORT-এর দক্ষিণ দিক দিয়ে ফ্রান্সের ভূমি-সীমানা ছাড়ালাম আমরা। সবে ইংলিশ চ্যানেলের আধাআধি পথ অতিক্রম করেছি, এমন সময়ে আপনাদের খানকয়েক জঙ্গী স্পিটফায়ার বিমান সন্দেহবশতঃ রুখে দাঁড়াল আমাদের।

'পথে এ রকম কিছু একটা বিপত্তি ঘটতে পারে ভেবেই, সঙ্গে সাদা একটা টেবিল ক্লথ নিয়েছিল মার্সেল, সেটাই সে সাত তাড়াতাড়ি দু'হাতে মেলে ধরল আমাদের প্লেনের বাইরে। হাওয়ার ঝোঁকে ঠিক একটা শ্বেত-পতাকার মতই পত্ পত্ করে উড়তে লাগল টেবিল ক্লথখানা।

'স্পিটফায়ারের পাইলটেরা শান্তির এবং সন্ধির নিশানা উড়তে দেখে, আক্রমণে ক্ষান্তি দিয়ে আমাদের প্লেনের চারদিকে বূ্যহ রচনা করে, বন্দী করে নিয়ে এল নিজেদের ওয়েস্ট সাসেক্স বেস স্টেশনে। বলা বাহুল্য এক চান্সে ওঠার মত মাটিতে নামাও গেল এক চান্সে। কোন বিপত্তিই ঘটল না।

'সেখানে মিলিটারি পুলিশ আর সিভিল পুলিশের জিম্মায় বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে এখানে আসছি আমরা।'

গল্প-বলা শেষ হয়ে গেলেও কর্নেল পিন্টো অনেকক্ষণ কোন কথা কইলেন না। যদিও কাহিনীর কিছু কিছু অংশ তাঁর কাছে বেশ অবাস্তব বলে মনে হয়েছে, তবু ওই দুটি অসম সাহসী মানুষের নেহাৎই খেয়ালের বশে এভাবে বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে যে দৃঢ় সঙ্কল্প, স্থির বুদ্ধি আর অবিচল সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা তার মনকে আন্তরিকভাবেই স্পর্শ করল।

অভিভূত এবং মুগ্ধ হবার ভাবটি আরও ঘনীভূত হলো, পরদিন সকালে যখন তিনি ওয়েস্ট সাসেক্সে গিয়ে ওদের হাতে গড়া বায়ুযানটি নিজে পরিদর্শন করলেন।

ওয়েস্ট সাসেক্স থেকে লণ্ডনে নিজের অফিসে ফিরে এসে ভিকমৃতিকে ডেকে পাঠালেন নিজের চেম্বারে। ভিকমৃতি এলে, তাঁকে বসতে অনুরোধ করে, গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল পিণ্টো, 'গোটা দুই-তিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর পরিষ্কার-ভাবে বুঝে নেব বলেই ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে, আশা করি সে জন্যে আপনি আমার ওপরে বিরক্ত হবেন না, মঁসিয়ে ভিকমৃতি।'

'না, না, বিরক্ত হব কেন? করুন না কি প্রশ্ন করবেন। ওটা যেমন আপনার কর্তব্য—উত্তর দেওয়াটাও তো ঠিক আমার কাছে তাই।'

কর্নেল পিণ্টো কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার প্রথম প্রশ্ন—পেট্রল সম্পর্কে। আচ্ছা মঁসিয়ে, আপনি নিজে কখনও কি জার্মান স্টাফ কার থেকে পেট্রল সরিয়েছেন?'

'না।' উত্তর দিলেন ভিকমৃতি। 'ও কাজটা মার্সেলই করে এসেছে দফায় দফায়। আমার দায়িত্ব ছিল জার্মান অফিসারদের আদর আপ্যায়নের ভেতর দিয়ে কোনও গতিকে আটকে রাখার; ফলে দশ মিনিটের জন্যে হলেও, আসর থেকে কোন রকমেই অনুপস্থিত থাকা সম্ভবপর ছিল না আমার পক্ষে।'

'বেশ, এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আপনার 'রোলস রয়েস' গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে। ইঞ্জিনটার কার্যকারিতার বিষয়ে আপনি আশাবাদী হবার পর, মোটরকারের বনেট তুলে ওটাকে প্রকৃত পক্ষে বিমুক্ত করেছিল কে?—মার্সেল না আপনি?'

'মার্সেল।' নির্দ্বিধায় জবাব দিয়ে গেলেন মঁসিয়ে ভিকমৃতি। বললেন, 'স্ক্রু—নাট—বল্টু খুলে ইঞ্জিনটাকে তার অরিজিনাল হোম থেকে নামিয়ে আনার কৃতিত্ব ওরই। অবশ্য দুজন মানুষের পক্ষে অত বড় ভারি জিনিসটাকে অক্ষত অবস্থায় মাটিতে নামানো সত্যি সত্যিই বেশ সমস্যাসঙ্কুল কঠিন কাজ ছিল

সন্দেহ নেই—আমি কেবল মাঝে মধ্যে ঠেকা দিয়ে গেছি, বাকি সব কিছুর জন্য প্রশংসা মার্সেলেরই প্রাপ্য।'

'কার থেকে এয়ার ক্রাফটের মধ্যে ট্রান্সফার করার আগে বা পরে, আপনি ইঞ্জিনটার কোন কোন অংশে অলটারেশান বা অ্যাডিশান জাতীয় কিছু করেছিলেন কিনা বলতে পারেন ?'

'ইঞ্জিনে অদল-বদল!' বেশ খানিকটা বিস্ময়ান্বিত হয়েই উত্তর দিলেন ভিকমৃতি। 'নো, হোয়াই শুড আই ? পৃথিবী-বিখ্যাত ইঞ্জিন যখন, তখন আমার মতন একজন 'বই-পড়ে ইঞ্জিনীয়ার'য়ের পক্ষে ওর সামান্য একটা পার্টস বদলানোও তো মহা হাস্যকর প্রচেষ্টা—সে প্রচেষ্টার কোন মানে যেমন নেই, তেমনি প্রশ্নও কোন নেই। তবে স্ক্রু—নাট—বল্টুগুলো যথাযথ টাইট করে আটকানো হয়েছে কিনা—সেটা একবার পরীক্ষা করেছিলাম আমি। বুঝেছেন তো, ওরই ওপরে নির্ভর করছিল আমাদের দুটি প্রাণীর জীবন-মরণের সমস্যা। মার্সেলকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলেও, জীবন এমনই জিনিস যে, নিজে একবার যাচাই করে না দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি নি সেদিন।'

'তা ঠিক। আচ্ছা, সত্যিকারের কোন ইঞ্জিন নিয়ে হাতে-কলমে নেড়ে-চেড়ে ঘেঁটে দেখার অভিজ্ঞতা এর আগে আপনার কখনও হয়েছে ?'

ভিমৃতি কাঁধ দুটোকে একবার 'শ্রাগ' করে নিয়ে হাসি-মুখে জবাব দিলেন, 'খুব সামান্যই। মোটর বা প্লেনের ইঞ্জিনের কোন্ অংশের কাজ কি—সে বিষয়ে একটা সাধারণ আর মোটামুটি থিয়োরী অবশ্য জানা আছে আমার। তাছাড়া ছোটখাটো মেরামতির কাজও আমি সেরে ফেলতে পারি অনায়াসে। কিন্তু এ বিষয়ে মার্সেলই আমাদের দুজনের ভেতরে ওস্তাদ। আমি বুঝি এয়ারোডাইনামিক্স কিন্তু সে চেনে ইঞ্জিন। আমরা একে অন্যের প্রতিপূরক—একাকী অফ নো ভ্যালু।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ মঁসিয়ে। আমার যা যা জানার প্রয়োজন ছিল, সবই আমি জেনে গেলাম আপনার কাছে। আচ্ছা, এবার তাহলে আপনি বিশ্রাম করুন। কেমন ?'

তরুণ ভিকমৃতিকে বিদায় দিয়ে, কর্নেল পিণ্টো এবার তাঁর দপ্তরের কিছু সহকর্মী আর সেই এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোককে সঙ্গে করে একটা আলোচনা-চক্রে বসলেন। উদ্দেশ্য এই দুই অনাহুত অতিথির প্রতিটি কাজ-কর্ম এবং উক্তি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা।

দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা পরে আলোচনা সভা ভঙ্গ হলো। কর্নেল সবাইকে বিদায় দিয়ে নিজের চেম্বারে একাকী রইলেন গম্ভীর বদনে। কিছু পরে মার্সেলকে ডেকে পাঠালেন তার সেল থেকে।

মার্সেল এসে সামনে দাঁড়ালে, কর্নেল পিণ্টো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদ-মস্তক জরিপ করে নিয়ে, সহসা অত্যধিক ঠাণ্ডা গলায়—বিনা ভূমিকায়—সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'এ কাজ তুমি কেন করতে গেলে মার্সেল ?'

প্রশ্ন শুনে মার্সেল তো হতভম্ব ! কয়েক সেকেণ্ড মুখে কোন কথাই জোগাল না। তারপর খানিকক্ষণের প্রচেষ্টায় নিজের অপার বিস্ময়বোধকে কিঞ্চিৎ দমন করে সে শুধোল, 'কি করেছি আমি ?'

'নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছ জার্মানদের হাতে !' কাটা কাটা স্বরে কথাটা উচ্চারণ করলেন কর্নেল পিণ্টো।

'কী বলছেন আপনি মঁসিয়ে ? জার্মান কুত্তাদের আমি মনে-প্রাণে ঘেন্না করি। ওরা আমাদের শত্রু !' রাগে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল মার্সেলের।

'হতে পারে।' ধীরভাবে বললেন কর্নেল পিণ্টো। 'আমার কিন্তু মনে হয়, জার্মানদের তুমি যে পরিমাণে ঘৃণা করো, ঠিক সেই পরিমাণেই ভালবাসো নিজের জীবনকে। ভিকমৃতিকে তুমি ঠকাতে পার। তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, তাঁর চোখে ধুলো দিতে পার তুমি, কিন্তু আমাদের তুমি ঠকাতে পারবে না।'

দিশেহারা হয়ে বিপন্নমুখে জিজ্ঞাসা করল মার্সেল, 'আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মঁসিয়ে।'

'শোনো মার্সেল, আর অভিনয়ের দরকার নেই। তুমি আমাদের কাছে

ধরা পড়ে গেছ। তোমার কৃতকর্মের তিনটি কৃতিকর্মই এক্ষেত্রে ধরিয়ে দিয়েছে তোমায়। সে তিনটি কি কি তা জানতে চাও? তবে জেনে নাও, প্রথমটি হলো—ইঞ্জিন। তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে, কেউ তেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে না প্লেনের ইঞ্জিনটাকে—তাই না মার্সেল? তাছাড়া এ-ও বোধ করি তুমি আশা করেছিলে যে, ল্যাণ্ডিংয়ের সময়ে চিরাচরিত রাণওয়ে না পাওয়ায় জখমও হয়ে যেতে পারে প্লেনটা। কিন্তু তোমার সে আশা পূর্ণ হয় নি দেখতেই পাচ্ছ। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ইংল্যাণ্ডের একজন অন্যতম এয়ারোনটিক্যাল এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি ইঞ্জিনটা। ভদ্রলোক আমায় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্লেনের ইঞ্জিনে হাই কমপ্রেসান পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। এবং এও অনুমান করা চলে যে, সেই মেকানিক তোমার জার্মান বন্ধুদের কেউ।'

'একথা বলছেন কেন? আমার মনিব বিদ্বান মানুষ। তিনি এ সব তথ্য ভালই জানেন। কাজেই তিনি হয়তো—'

কিন্তু কর্নেল পিণ্টো বাধা দিলেন তার কথায়, 'না, তা সম্ভব নয়। আমাদের সন্দেহের তীর যে তোমাকেই নির্দেশ করছে মার্সেল। তুমি না হলেও—তোমারই অ্যাকমপ্লিস কেউ।

'তারপর দ্বিতীয় জিনিসটি হলো—পেট্রল। খুব উচ্চমানের জ্বালানী তেল না হলে, সাধারণ তেলে এয়ারোপ্লেন চালানো যায় না—তা সেই ইঞ্জিন যতই কেন না শক্তিশালী হোক। সাধারণ মানের পেট্রলে ইঞ্জিন চললেও মোশান পাবে না তাতে। এখন জিজ্ঞাস্য হলে—কে এই হাই অক্টেন পেট্রল জোগাড় করেছে প্লেন চালাবার জন্য?—মঁসিয়ে ভিকমৃতি? না! কারণ, তিনি তো সর্বক্ষণই দোতলায় তাঁর অতিথিদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। ওদের 'কার' থেকে তেল জোগাড় করার ভার ছিল তোমার ওপর! কাজেই, আমি যদি অনুমান করে নিই—তোমার জার্মান বন্ধুরা আলাদা ট্যাঙ্কে করে ওই তেল স্পেশালি তোমার জন্যেই এনে, সাপ্লাই দিয়েছে তোমায়—বিশেষ কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে, তবে কি আমি ভুল অনুমান করব মার্সেল?'

কোন উত্তর দিতে পারল না সে।

'এইবার তৃতীয় বিষয়ের কথা বলি। দেয়ালে টাঙানো ওই ম্যাপটার দিকে একবার চেয়ে দেখ মার্সেল। দেখছ? এটা যে LA BELLE FRANCE-এর ম্যাপ তাও নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছ? যে পথরেখা ধরে তোমরা দুজনে উড়ে এসেছ, তা আমি লাল কালি দিয়ে দেগে দিয়েছি। লক্ষ্য করে দেখ এই জায়গাটায়—জার্মান জঙ্গী বিমানের ঘাঁটি থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূর দিয়ে পাস করেছ তোমরা; আর LE TREPORT-এর কাছে তোমাদের প্লেনখানা তো আরেকটা জার্মান ফাইটার বেস-এর প্রায় মাথার ওপর দিয়েই উড়ে গেছে বলতে গেলে। তাছাড়া LE TREPORT-এর উপকূলভাগ জুড়ে এ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট ব্যাটারি সার সার বসানো: অথচ তোমাদের লক্ষ্য করে কেউ একটা গোলা-গুলিও খরচা করল না···মেসারস্মিট্, ফোক-উল্‌ফ কি নিদেন পক্ষে একটা লুফ্‌ট্‌ ওয়েফও তেড়ে এল না তোমাদের দিকে—কেন? তোমাদের যাত্রাপথে কম করেও অন্তত ডজনখানেক মরণ-ঘাঁটি পেরিয়ে এসেছ তোমরা, অথচ একবারও মৃত্যুদূতের নজরে পড় নি তোমরা—কেন? বল মার্সেল, জবাব দাও, কেন তারা তোমাদের এতটা পথ নিরাপদে আসতে দিল···কেমন করে তোমরা ওদের শ্যেনদৃষ্টি এত সহজে এড়াতে পারলে? এর উত্তর আমি জানি। শুনতে চাও? শোন—' বলতে বলতে গভীর উত্তেজনায় চেয়ার থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কর্নেল পিন্টো বলতে লাগলেন, 'ওরা আগে থেকেই জানত যে তোমরা আসবে আর তাই তো অত অক্লেশে আর নির্বিঘ্নে তোমাদের পার হতে দিয়েছে তাদের ঘাঁটির ভেতর দিয়ে।

'তুমি কবে থেকে ঘৃণ্য জার্মান এজেন্ট হয়েছ, তা আমি জানি না বটে, তবে তুমি যে একজন স্পাই, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। মঁসিয়ে ভিকমৃতির মুখে যেই তুমি তাঁর পালিয়ে যাবার ডেয়ারিং প্ল্যানের কথা শুনলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে দিলে তোমার বন্ধুদের কানে। তারা তোমায় পরামর্শ দিল, ভিকমৃতিকে পদে পদে উৎসাহ আর সাহায্য দিতে। পথে যেতে গিয়ে

তুমি যদি মারা পড়, তবে খুবই লোকসান হবে তাদের পক্ষে। পক্ষান্তরে তোমায় নির্বিঘ্নে ইংল্যাণ্ডের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলে, জার্মান এজেন্ট হিসেবে অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য তুমি জোগাতে পারবে বৃটেন থেকে।

'যাই হোক, আশা করি তুমি এবার তোমার নিজের দেশ আর দেশবাসীর মুখ চেয়ে, অবিলম্বে তোমার পূর্ণ স্বীকারোক্তি দেবে আমাদের কাছে?'

কিন্তু মার্সেল হচ্ছে জাত-চাষীর বাচ্চা। ভাঙবে তবু মচকাবে না। কর্নেলের কাছে কোন কনফেসান তো সে দিলই না, উল্টে নিজের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তুমুল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে চলল সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিটি অফিসারের কাছে।

তার বিরুদ্ধে যা কেস, তা পিয়োরলি সারকামস্ট্যান্সিয়াল, তাছাড়া তখনো পর্যন্ত সে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন অন্তর্ঘাতমূলক কার্যে লিপ্ত হয় নি, সুতরাং ইংল্যাণ্ডে ওর বিচার করা চলে না, কর্তৃপক্ষ মার্সেলকে তাই যুদ্ধ-বিরতি পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডেই আটক করে রাখলেন একজন সম্ভাব্য গুপ্তচর সন্দেহে। তারপর ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ থামলে তাকে বিচারার্থ চালান করে দেওয়া হলো তার স্বদেশে —ফ্রান্সে। সঙ্গে পাঠানো হলো পুরো কেস হিস্ট্রি।

ফ্রান্সে পৌঁছল মার্সেল। আদালতে ওর বিরুদ্ধে যথারীতি অভিযোগ দায়ের করা হলো—গুপ্তচর বৃত্তি—দেশদ্রোহিতা নিয়ে।

কিন্তু কার বিচারের ব্যবস্থা কোথায় হয়ে আছে, তা কেউ বলতে পারে না। উপরন্তু জন্ম হলো আরো একটি রহস্যের।

জুডিশিয়াল ইনকোয়ারির ব্যাপারে একদিন সন্ধ্যের সময় মার্সেলকে সশস্ত্র প্রহরাধীনে তার বন্দীশালা থেকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবেমাত্র রাস্তা পার হচ্ছে সে; দুজন প্রহরী একটু এগিয়ে গেছে—মাঝে হাতকড়া বাঁধা একাকী মার্সেল আর পেছনের প্রহরী দুজন খানিকটা পিছিয়ে—এই যখন পরিস্থিতি, আলো নেভানো অবস্থায় পথের ধারের অপেক্ষমান একটি গাড়ি

অকস্মাৎ সচল হয়ে ছুটে এসে প্রবলবেগে ধাক্কা মারে মার্সেলকে। তারপর পথচারী আর প্রহরীরা তৎপর হয়ে উঠে কিছু করবার আগেই পূর্ণ গতিতে অপসৃত হয়ে যায় দূরের দিকে।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে মার্সেলের। শুধু তাই-ই নয়, তার বুকেও দেখা যায় বুলেটের গর্ত। সম্ভবতঃ সাইলেন্সার লাগানো থাকায় শব্দ শোনা যায় নি।

কি পথচারী—কি পুলিশ, কারোরই আর বুঝতে বাকি থাকে না, এ কীর্তি কাদের। ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্যান্স পার্টির লোকেরা দেশদ্রোহীদের যে এইভাবেই সাজা দিয়ে থাকে, এ তথ্য ফ্রান্সের প্রায় অনেকেরই জানা।

মঁসিয়ে ভিকমৃতি যখন নিজেকে সর্বাংশে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে, সম্ভ্রম আর প্রশংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হলেন সকলের কাছে, তখন তাঁর কাছে একদিন আহ্বান এল মাতৃভূমির সেবা করার।

ভিকমৃতি সানন্দে সে ডাকে সাড়া দিয়ে বৈমানিক হিসাবে যোগদান করলেন ফ্রী ফ্রেঞ্চ ফোর্স-এ, সংস্থাটি বৃটেনের সহায়তায়, বৃটেন-প্রবাসী ফরাসী পলাতক ও শরণার্থীদের নিয়ে গঠিত। তারপর উত্তর আফ্রিকায় জার্মানদের বিরুদ্ধে বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করে, শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রেই মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন।

তাঁর সেই 'পুষ্পক রথ'-এর কথা কিন্তু আর কিছু জানা যায় না পরবর্তীকালে। সম্ভবতঃ বৃটেনে জার্মান এয়ার রেডের সময়েই ধ্বংস হয়ে গেছিল সেটা। নতুবা এক দর্শনীয় বস্তু হিসেবে বৃটিশ সরকার জিনিসটাকে জাতীয় সামরিক সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখতেন দর্শকসাধারণের কৌতূহল ও মনোরঞ্জন বৃদ্ধির জন্য।

———